ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য

ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য

গীতা চট্টোপাধ্যায়
এম.এ., পি-এইচ.ডি.
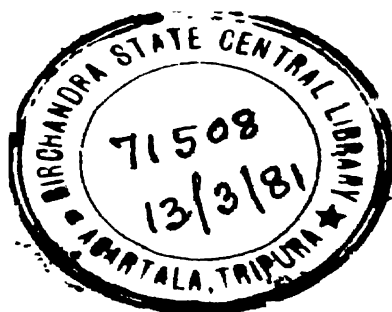
কবি ও কবিতা
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বিশ্রুতকীর্তি মাতামহ
স্বর্গত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
পুণ্যশ্লোক পিতৃদেব
স্বর্গত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
স্মরণে

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি

ভূমিকা

"ইদং পুস্তকং নায়কমিব হারবিন্যস্তং করোমীতি"—শ্রীজীব গোস্বামীর উত্তর-গোপালচম্পূতে [২৯।৮৪] দেখছি, বৃন্দাদেবী হারের মধ্যমণি-রূপে ভাগবত-গ্রন্থকে স্থাপন করছেন।

বস্তুত, ভক্তিশাস্ত্র-রূপে সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে কী অদ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিল, উত্তর-গোপালচম্পূ কাব্যে বৃন্দাদেবীর গ্রন্থ-বিন্যাসে তা পরিস্ফুট। কিন্তু শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনেই নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির ধ্যান-ধারণা মনীষা-ভাবুকতার ক্ষেত্রেও ভাগবতের স্থান অবিসংবাদিত। একখানি পুরাণগ্রন্থ ভাগবতকে আশ্রয় করে একটি জাতির বিপুল ভাব-আন্দোলন এই বাঙ্‌লাদেশেই ঘটেছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের দিব্যপ্রেরণায়। চৈতন্য-রেনেসাঁস তাই নামান্তরে ভাগবতীয় ভাব-আন্দোলন। মূলত বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাগবতীয় ভাব-আন্দোলন কী অপূর্বতা লাভ করেছিল, তার আলোচনাই এ-গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য। 'এহোত্তম'। ভাগবত শুধুই অনন্য ভক্তিশাস্ত্র নয়, অপূর্ব কাব্য। পদে পদে এর রহস্য, পদে পদে এর দুরধিগম্যতা। এর প্রেমভাবনা এর সৌন্দর্যকল্পনা যুগে যুগে বাঙালী কবি-মনীষার চিত্তলোক আলোড়িত করেছে। কবি জয়দেব থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সাত-আটশো বৎসর ব্যাপী বাঙালীর সেই ভাগবত-আস্বাদনেরই প্রামাণ্য ইতিহাস-সংকলনের প্রয়াস এ-গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে ইতিহাসাশ্রিত দৃষ্টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

মধ্যযুগে ভাগবত-আস্বাদন চলতো ভক্তিগ্রাহ্য পথে! "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্য, বুদ্ধিতেও নয়, টীকাতেও নয়—এই সূত্রই সেদিন পরিকরবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে আছে :

"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥" [চৈ.চ. মধ্য। ২০]

"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে"—ভক্তি ছাড়াও ভাগবতের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা সে-যুগেও চলতো, এখনো চলে। তা হলো বুদ্ধিযোগে

বিচার, পাণ্ডিত্যের বিচার। প্রাজ্ঞোক্তি-মতে, "বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা"।

প্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নিচ্ছি, ভাগবতের আলোচনায় ভক্তি বা বিদ্যাবত্তা কোনোটির দাবীই আমার নেই। আমি ভক্ত বা পণ্ডিত নই। এক্ষেত্রে তাই পূর্বসূরিগণের প্রদর্শিত পথেই আমার পরিক্রমা। কালিদাসের উক্তি উদ্ধার করে বলা যায় :

"অথবা কৃত-বাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥" [রঘু° ।১৪]

ভাগবত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার মহান্ পূর্বসূরিগণ অখণ্ডমণিকে ইতোমধ্যেই হীরকবিদ্ধ করে গেছেন, আমার পক্ষে সেই বজ্রসমুৎকীর্ণ পথে সূত্রচালনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। বস্তুত, দুই সহস্রাধিক বৎসর অনুশীলিত হওয়ার ফলে ভাগবতচর্চার দুরূহতা আজ অনেকাংশে সরলীকৃত। পাঠককে দুর্গম পথ পার করে দেবার জন্য বোপদেব, মধ্বাচার্য, শ্রীধরের তুল্য টীকাকারগণ উপস্থিত আছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অবশ্য সবচেয়ে সাহায্য করেছেন সনাতন গোস্বামী। ভাগবতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি সম্প্রদায়নিষ্ঠ হয়েও সম্প্রদায়ের সীমিত গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে চিরকালের কাব্যরসিক চিত্তের আস্বাদনযোগ্যতা নানাভাবে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর ভাগবতচর্চায় লোকোত্তর রসিকভাবুক শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা সর্বাংশে সার্থক। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণাপ্রাপ্ত শ্রীজীবও ভাগবত-অনুশীলনে সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক-অনুসরণে রসানুগ্রাহিতার অনবদ্য নিদর্শন রেখে গেছেন। পক্ষান্তরে বিদেশীয় আলোচকগণের মধ্যে বিশেষ করে Burnouf-এর নাম করতে হয়। ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্যের প্রতি তিনিই প্রথম প্রতীচীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আমার গ্রন্থে পূর্বাচার্যগণের সিদ্ধান্ত 'সূত্রে মণিগণা ইব' সংকলিত হলেও বলা বাহুল্য তা বিচারবুদ্ধি-সম্মত পথেই হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রে আমার সীমিত ও সামান্য জ্ঞান নিয়েই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মূল গ্রন্থরাজি তথা অন্যান্য আকর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও অনুসরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যে-সব ক্ষেত্রে আমি পূর্বাচার্যগণের অনুসরণ না করে নিজের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছি, সে-সব ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য অবশ্যই রসগ্রাহী পণ্ডিত সমাজের বিচার ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। বিশেষত ভাগবত-বিচারে আমি

কোথাও কোথাও আধুনিক কাব্যবিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করেছি; সে সকল স্থলে একজন আধুনিক কাব্যরসিকের মন নিয়েই আমি আমার বিস্ময়-প্রেম-কল্পনাকে সম্বল মাত্র করে দুর্গম ভাগবত-তীর্থ পরিক্রমায় বহির্গত হয়েছি। ক্রমে ভাগবত ও ভারতবর্ষ আমার কাছে এক হয়ে গেছে। ভাগবত ভারতবর্ষের মতোই বিরাট সজীব নিত্যস্পন্দিত একটি নাম। ভারতধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে ভাগবতধর্মেও সর্বদেশ সর্বধর্মের ঊর্ধ্বে বিশ্ব-প্রেমের এমন একটি চিরন্তন মন্ত্র নিত্য-উচ্চারিত, যার আবেদন আধুনিক কালেও নিঃশেষিত হয়ে যাবার নয়। ভাগবতের এই আধুনিক যুগোপ-যোগিতার দিকটি রসিক ভাবুকের নিকট যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তবেই এই গবেষণা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য অংশত সফল হবে।

মূল ভাগবত-আলোচনায় যেমন, মধ্যযুগীয় বাঙালীর ভাগবত-অনুশীলনের ইতিহাস-সংকলনেও তেমনি পূর্বসূরিবৃন্দের পথনির্দেশে আমার যাত্রাপথ সুগম হয়েছে। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করি 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ'-প্রণেতা ডক্টর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের নাম। বাঙলা গীতিকাব্যের আদিগঙ্গোত্রী জয়দেবের কাব্যে ভাগবতীয় প্রভাবের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তিনিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই বৈষ্ণব পণ্ডিত ও রসিকপ্রবরের আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভে কৃতকৃতার্থ। তাঁর স্নেহঋণ অপরিশোধ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদনায় বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় সম্পাদনায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত কাব্যদুটিতে ভাগবত-প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয়ে সার্থক আলোচনার সূত্রপাত করে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। মধ্যযুগীয় বাঙালী বৈষ্ণব টীকাকারগণের ভাগবত ব্যাখ্যাকে সুহৃজ্জ সরল বাঙলা ভাষায় পরিবেষণ করে ভাগবতামৃত-বর্ষিণী টীকাকার বৈষ্ণবপ্রবর রাধাবিনোদ গোস্বামীও উত্তরসূরিগণের কৃত্য সহজসাধ্য করেছেন। আজীবন অনলস সাধক ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ চৈতন্য-লীলায় ও চৈতন্যচরিতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে ও দর্শনে ভাগবতের প্রভাব বিশ্লেষণে পরবর্তী গবেষকগণের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। পদাবলী-রসিক সতীশচন্দ্র রায় ও ভাগবতরত্ন বিমানবিহারী মজুমদার বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে ভাগবত-ভাবনার প্রসঙ্গটি স্থানে স্থানে উত্থাপন করে পরবর্তী গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণবেতর বাঙলা সাহিত্যে ভাগবতীয় প্রভাব সম্বন্ধে যাঁদের আলোচনা পড়ে উপকৃত হয়েছি, তাঁদের মধ্যে আচার্য

দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লার দ্বিতীয় নবজাগরণের লগ্নে আধুনিক জীবন-মননে দীক্ষিত বাঙালীর চেতনায় মধ্যযুগীয় ভাগবত-ভাবনা কিভাবে নানা বাধাবন্ধ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও জয়ী হলো, সে-ইতিহাসও এ-গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল অদীক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি-মনীষিগণের ধ্যানধারণায় ও সৃষ্টি-কর্মে ভাগবতের পুনর্মূল্যায়নের ইংগিত দেওয়া হয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষায় লিপিবদ্ধ না হলেও, রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদধন্য স্বামী বিবেকানন্দের ভাগবত-আস্বাদন আমরা আমাদের গ্রন্থে উদ্ধার না করে পারিনি। বস্তুত ভাগবতের যা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সেই গোপীপ্রেম সম্বন্ধে আধুনিককালে তিনিই প্রথম আমাদের সচেতন করে তুলেছিলেন। উনবিংশ শতকে অদীক্ষিত সমাজের চিন্তা ও চেতনায় ভাগবতের এই পুনর্মূল্যায়নের আলোচনা এতাবৎকাল বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি। এ বিষয়েও তাই আমাদের স্বাধীন মতামত বিদ্বৎসমাজের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

দুরূহ গবেষণাকর্মে ব্রতী হয়ে আমি নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রয়োজনীয় গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা আমাকে নানাভাবে বিপন্ন করেছে। তবে গ্রন্থপ্রকাশের গুরুতর সমস্যার আংশিক সমাধানে আমার পরিবার আমাকে বিশেষভাবেই উৎসাহিত করেছেন। কৈশোরে পিতৃহীনা কন্যাটির প্রতি একাধারে মাতাপিতার কর্তব্যপালনে পরমস্নেহময়ী জননী শ্রীমতী মাধবীলতা দেবী আমার মাতৃঋণভার বহুগুণিত করেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগণ এবং অনুজারা আমার নিত্যপ্রেরণার অক্ষয় ভাণ্ডার। পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃমাতুল শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপরিমেয় স্নেহবশে যেভাবে আমার জন্য গ্রন্থ-সংগ্রহ করে দিয়েছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। আমার অভিন্নহৃদয়া বান্ধবী অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা বন্দ্যোপাধ্যায় অবসন্ন মুহূর্তে এনে দিয়েছেন প্রীতি-সঞ্জীবনী।

আচার্যকুলের মধ্যে প্রথমেই আমি আমার পরমপূজনীয়া অধ্যাপিকা ডক্টর সতী ঘোষের প্রতি সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা জানাই। লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে চার বৎসর ছাত্রীজীবন অতিবাহিত করার কালে তিনিই আমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। আমার গবেষণাকার্যের শিক্ষক ও পরীক্ষক পরমপূজ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশ্বর দাশশর্মা মহাশয়ের

নিকটও আমার ঋণ সর্বাংশে স্বীকার্য। সংস্কৃত কাব্য-পুরাণ-দর্শনশাস্ত্রবিদ এই ছাত্রবৎসল শিক্ষক-মহোদয় নানাভাবে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা করে আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার গবেষণাগ্রন্থের অপর পরীক্ষকদ্বয় পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর সিতাংশু বাগচী ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এ-গ্রন্থটিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. উপাধির যোগ্যরূপে বিবেচনা করে আমাকে ধন্য করেছেন। পরিশেষে প্রণাম নিবেদন করি আমার পরমভক্তিভাজন আচার্যদেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পদপ্রান্তে। তাঁরই আদেশে আমি 'ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য' বিষয়ক গবেষণায় ব্রতী হই। আমার গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় তাঁরই আশীর্বাদে ও উপদেশে লিখিত। তাঁর নিকট ঋণস্বীকার ধৃষ্টতামাত্র জেনে উপসংহারে শুধু এটুকুই নিবেদন করি, আধুনিককালে ভাগবতের তুল্য একখানি প্রাচীন পুরাণকে আশ্রয়ের মূল প্রেরণা তিনিই আমার মধ্যে ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনা থেকে সঞ্চারিত করেছেন :

> "ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে, আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে : পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও।
>
> তিনি কহিবেন : ওঁ ইতি ব্রহ্ম।
>
> তিনি কহিবেন : ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
>
> তিনি কহিবেন : আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।"

গীতা চট্টোপাধ্যায়

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

গৌরীচাঁপা নদী, চন্দ্রা

মীনাক্ষ সোপান,

সপ্ত দিবানিশি কলকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভাগবত-পরিচয়

ভাগবত-পরিচয়

ভাগবতেই বোধ করি ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয়েছে: শুকমুখ থেকে গলিত এই ভাগবত নিগম-কল্পতরুর অমৃত রসফল, আমোক্ষ-কাল তা জগতের যতো রসিক-ভাবুকের মুহুর্মুহু পানের যোগ্য।[১] কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে ভাগবত-মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, রস তো বৃক্ষের মূল থেকে শাখাগ্র পর্যন্ত সর্বত্রই প্রবাহিত, কই তাতে তো কোনো আস্বাদন নেই! কিন্তু ঐ রসই যখন পৃথকাকারে ফলে পরিণত হয়, তখনই তা হয় নিখিল বিশ্বের আস্বাদনীয়। বেদোপনিষদের সারজাত ভাগবত-কথাও ঠিক একই-ভাবে ফলাকারে পৃথকৃভূত হয়েই অত্যুত্তমা।[২]

"অত্যুত্তমা" কিনা সে-বিচার অন্যেরা করবেন, কিন্তু আমরা শুধু এটুকুই স্বীকার করবো, বেদোপনিষদের সুরভি-নিষ্ণাত ভাগবতে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির একটি পরমাসিদ্ধি ফলরূপে বিকশিত। ধর্ম ও দর্শনের, ইতিহাস ও কাব্যের উত্তর- ও দক্ষিণবাহিনী বিচিত্র ধারা এতে প্রাণরস হয়ে মিশেছে। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ পুরুষের সন্ধানে, তাঁর প্রেমঘন শ্যামলসুন্দর প্রকাশের সঙ্গে বিরহমিলন-লীলার নিত্য তরঙ্গভঙ্গে, ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিচিত্র মার্গ অনুধাবনে, নগনদী নক্ষত্র পর্বতমালায় ঘেরা এই ভারতবর্ষের কাহিনী-শতকে গড়া ভাগবত চিরকালের রসিক-ভাবুকের হাতে যে-রসফলটি তুলে দেয়, এককথায় তা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।'[৩]

বারোটি স্কন্ধে তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে ও আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিশিষ্ট এবং ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে ও সংহিতায় অনন্য। কলিযুগে 'কৃষ্ণ-প্রতিনিধি' রূপে 'পুরাণার্ক' ভাগবতের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। তাই কেউ একে বলেন হরির সাক্ষাৎ শব্দময়ী মূর্তি,[৪] আবার কেউ করেন এর দ্বাদশ স্কন্ধের সঙ্গে ভাগবত-পুরুষ 'স্বয়ং ভগবান' শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলনা।[৫] ভাগবত নিজেকে নিজে বলেছে

---

১ "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥" ১।১।৩

২ পাদ্মোত্তর খণ্ড, ভাগবত মাহাত্ম্যম্, ২।৬৭-৬৮

৩ ভা°, ১।১।১৯

৪ "তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ততে হরেঃ"। পাদ্মোত্তর, ৩।৬২

৫ 'ভক্তমাল', নাভাজী প্রণীত

'ব্রহ্মসম্মিত পুরাণ'[১] তথা 'মহাপুরাণ'।[২] এই পুরাণ-মহাপুরাণের প্রশ্নই ভাগবত-পরিচয়ের সর্বাদি জিজ্ঞাসা।

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ইতিহাস ও পুরাণ 'পঞ্চম বেদ' রূপে কথিত[৩]—অর্থাৎ বেদের পরেই এদের স্থান। বেদের পরেই ইতিহাস-পুরাণের স্থান নির্দিষ্ট হল কেন, তা স্পষ্ট হয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে সৌতিবচনে। নৈমিষারণ্যে সমবেত শৌনকাদি মুনিবর্গকে উদ্দেশ করে সেখানে সৌতিকে বলতে শুনি,

ইতিহাস-পুরাণের দ্বারাই বেদকে বিস্তারিত করতে হয়। কেননা, 'এ আমাকে প্রহার করবে' ভেবে বেদ অল্পজ্ঞকে ভয় করেই চলে।[৪]

আর্যসমাজে স্ত্রী-শূদ্রাদি জাতি তথাকথিত 'অল্পজ্ঞ'ই ছিলেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম গ্রহণ করে সমিৎপাণি হয়ে অতি-নিগূঢ় গুরুমুখী বেদবিদ্যা আয়ত্ত করেন, এরূপ-অবসর তাঁদের কোথায়? তাঁরা তো পারিবারিক তথা বৃহত্তর সামাজিক সেবায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিরন্তর নিযুক্ত! অথচ 'বেদ' সাক্ষাৎ জ্ঞান-স্বরূপ—সর্বজীবে তাকে সঞ্চার করাই হিতব্রত। এই হিতব্রতেই 'পঞ্চম বেদে'র পরিকল্পনা. স্ত্রী-শূদ্র দ্বিজ-বন্ধু[৫] প্রভৃতি অল্পজ্ঞের কাছে বেদকে সহজবোধ্য করাই এই পঞ্চমবেদের কাজ ছিল।

পঞ্চমবেদ-রূপে পুরাণ আবার অথর্ববেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে ইতিহাসেরও মর্যাদাভাগী হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দিক্‌দর্শনে অথবা বংশানুচরিত-সম্বলিত ইতিহাস প্রণয়নেও পুরাণের ভূমিকা অবিসংবাদিত। স্বভাবতই পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। অথর্ববেদেই প্রথম পুরাণের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেলেও অনেকেই বিশ্বাস করেন পুরাণ বেদের চেয়েও প্রাচীনতর। ঋগ্বেদের বধ্র্যাশ্ব দিবোদাস সুদাস সোমক প্রমুখ নৃপতিবর্গ পুরাণের বংশানুচরিতে বহু পরবর্তী রাজারূপে উল্লিখিত। বেদোপনিষদের কিছু দুর্বোধ্য রূপক-উপমারও গ্রন্থিমোচন হয়

ভা° ১।৩।৪০

ভা° ১২।৭।১০

ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে"। ভা° ১।৪।২০

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥" মহা°, আদি। ১, ২২৯

ভা° ১।৪।২৫

পুরাণেরই আখ্যানভাষ্যে। সুতরাং 'বেদ আগে না পুরাণ আগে' এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। তবে বেদোপনিষদের পরেও যুগে যুগে পুরাণের নব-সংস্করণ বা বর্ধন-পরিবর্জন সমানে চলেছে। তাই দেখি এর বংশানুচরিতে প্রাক্-ঋগ্বেদীয় যুগের কয়েকজন বিখ্যাত রাজারও নাম পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য তারপরই বিবরণ কাল্পনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কন্দপুরাণ থেকে জানা যায়, প্রথমে শতকোটি শ্লোকাত্মক একটিমাত্র[১] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণই প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস তা অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত করেন। মৎস্যপুরাণেও বলা হয়েছে, "পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ"।[২] আধুনিক গবেষকদের মধ্যে Pargiter এ-মত স্বীকার করে নিয়েছেন। Winternitz অবশ্য জানান, এ-পুরাণ বা ইতিহাস এক বা একাধিকও হতে পারে। তবে কালক্রমে তা যে অষ্টাদশ পুরাণের রূপ নেয়, সে বিষয়ে কারো কোনো সংশয় নেই। এই অষ্টাদশ পুরাণ যথাক্রমে—বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণু, মৎস্য, ভাগবত, কূর্ম, বামন, লিঙ্গ, বরাহ, পদ্ম, নারদীয়, ব্রহ্ম, এবং স্কন্দপুরাণ। সংখ্যা নিয়ে নয়, তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গুরুতর মতভেদ বর্তমান। যেমন, শাক্তসম্প্রদায় ভাগবতের পরিবর্তে মহাভাগবত বা কালিকাপুরাণকে এর অন্তর্গত করতে চান। আধুনিক গবেষকগণের অনেকেই শেষোক্ত পুরাণখানিকে উপপুরাণের অন্তগত করেছেন। পক্ষান্তরে ভাগবতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও বিপুল প্রসিদ্ধি লক্ষ্য করে একে তাঁরা স্বস্থানচ্যুত করার কোনো যুক্তিই খুঁজে পান নি। বিষ্ণুপুরাণে অষ্টা[illegible]শ পুরাণের যে-তালিকা পাই তাতেও ভাগবত পুরাণ উল্লিখিত —সেখানে এর স্থানও পঞ্চম। শুধু ভাগবতই ভাগবতকে 'মহাপুরাণ' বলেনি, ব্রহ্মবৈবর্তও একে একই আখ্যায় ভূষিত করেছে। প্রসঙ্গত পুরাণ ও মহাপুরাণের পার্থক্য নিরূপণ এখানে অপরিহার্য।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে পুরাণের পঞ্চলক্ষণ[৩] দেখিয়েছিলেন অমরকোষ-প্রণেতা। এই পাঁচটি লক্ষণ যথাক্রমে 'সর্গ' বা সৃষ্টি, 'প্রতিসর্গ' বা প্রলয়ের

১ "একমেব পুরা হ্যাসীদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং শতকোটিধা।
ততোঽষ্টাদশধা কৃত্বা বেদব্যাসো যুগে যুগে"॥ প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্, ২।৮-৯

২ মৎস্য, ৫৩।৪

৩ "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্"॥

পর পুনঃসৃষ্টি, 'মন্বন্তর' বা মনুর অধিকৃত যুগবিভাগ, 'বংশ' বা দেববংশের বিবরণ এবং 'বংশানুচরিত' বা ঋষি ও রাজবংশের বর্ণনা। ভাগবতে এই পাঁচটি লক্ষণের পরিবর্তে পাই দশটি[১] লক্ষণের উল্লেখ। এগুলি যথাক্রমে 'সর্গ' 'বিসর্গ' 'স্থান' 'পোষণ' 'উতি' 'মন্বন্তর' 'ঈশানুকথা' নিরোধ 'মুক্তি' ও 'আশ্রয়'।[২] নূতন লক্ষণের মধ্যে 'স্থান' বলতে বোঝাচ্ছে সৃষ্টবস্তুর যথাযথ শৃঙ্খলারক্ষা, 'পোষণ' বলতে ভগবানের অনুগ্রহ, 'উতি' বলতে জীবের বাসনা বা কর্মসংস্কার, 'ঈশানুকথা' বলতে অবতার এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তজনের চরিত, 'নিরোধ' ভগবানে জীবের অন্তর্ধান, 'মুক্তি' জীবের কর্তৃত্ব-ও ভোক্তৃত্ব-ত্যাগ, আর পরিশেষে "'আশ্রয়'—সর্বজীবের গতির্ভর্তা নিবাস সাক্ষী পরমেশ্বর। ভাগবতে কিভাবে এই দশটি লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে অতিসংক্ষেপে এর বিষয়বস্তুর পরিচয়-দানেই তা স্পষ্ট হতে পারে।

মূল ভাগবতের সূত্রপাত দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে—আর শেষ দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। বাকী প্রথম স্কন্ধ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অবশিষ্ট অধ্যায়কে বলা যায় যথাক্রমে উপক্রমণিকা ও উপসংহৃতি। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের অনুরোধেই সূতপাঠক এ-পুরাণকাহিনীর অবতারণা করেন। কথোপকথনের এই বিশিষ্ট ভঙ্গি ভাগবতে আরো বহুবার অনুসৃত হয়েছে। বিদুর-উদ্ধব সংবাদ, মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ, ভগবদ্-উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধ্যে মধ্যে রুদ্রগীতা উদ্ধবগীতাদির পরিবেষণও মনোজ্ঞ। ভাগবতের মূল বক্তা কিন্তু সূতপাঠকাদি নন, স্বয়ং ব্যাসপুত্র শুকদেব। গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে তিনি যা শুনিয়েছিলেন, তাই আসল ভাগবত। সেই 'আসল' ভাগবতেরই কথারম্ভ দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে শুকদেবের "নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে"[৩] মঙ্গলাচরণ পাঠে। কথাশেষ হয়েছে দ্বাদশের

১ "তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্" ॥ ২।৯।৪৪

২ "অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥" ২।১০।১

৩ "নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীত শক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে॥" [২।৪।১২]

মহিমার আধার যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রয়োজনে রজঃ সত্ত্ব তমোমূর্তি ধরে আবির্ভূত হন, সেই পরমপুরুষের ধ্যানে এ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ এই বারোটি[১] শ্লোক উৎসারিত। চতুর্বিংশ শ্লোকটি পিতা-ব্যাসের প্রতি নমস্কার-বাক্য।

পঞ্চম অধ্যায়ে, আর শুকদেবকে বিদায় নিতে দেখছি তারই অব্যবহিত কাল পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে। ভাগবতের মহাপুরাণিক দশ লক্ষণ আমরা এই দীর্ঘ শুকভাষণের মধ্যেই স্পষ্ট খুঁজে পেতে পারি। যেমন 'সর্গ' বা সৃষ্টিবর্ণনা পাবো দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে ও দ্বাদশে। 'প্রলয়' স্থান পেয়েছে তৃতীয় স্কন্ধেরই একাদশ অধ্যায়ে পরমাত্মার কালাখ্য মহিমা বর্ণনায়—প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি বা 'বিসর্গ'ও একই অধ্যায়ে লক্ষণীয়। 'স্থান', ভাষান্তরে সৃষ্টবস্তুর শৃঙ্খলারক্ষাই তৃতীয় স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত পঞ্চম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের ভূগোলবর্ণনা, ঊনবিংশের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা, একবিংশের খগোলবিবরণ অথবা ষড়্‌বিংশের নরক-উন্মোচনও মনে পড়বে। 'পোষণ' বা ভগবানের অনুগ্রহ তো সমগ্র ভাগবতে নিরন্তর কীর্তিত। তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে অজামিল ও গজেন্দ্রের প্রতি তাঁর অসীম কৃপা। এই অজামিলোপাখ্যান ও গজেন্দ্রোপাখ্যান দুটি পাচ্ছি যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম স্কন্ধে। 'ঊতি' বা জীবের বাসনা ও কর্মসংস্কার, 'নিরোধ' বা সেই ঊতি-ক্ষয়ে জীবের ভগবানে অন্তর্ধান, পরিশেষে 'মুক্তি' তৃতীয় স্কন্ধে কপিল-ভাষ্যে, চতুর্থ স্কন্ধে সনৎকুমার-ভাষ্যে, সর্বোপরি ভগবদ্‌-উদ্ধব সংবাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। শুকদেব নিজেও ভাগবতের উপক্রমে দ্বিতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'মন্বন্তর' বা মনুর অধিকৃত কালাদি বিভাগেও ভাগবত তার পুরাণিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে পুরোপুরি। চতুর্থ স্কন্ধে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ-বর্ণনা দিয়েই এর সূত্রপাত। অষ্টমে মন্বন্তরানুবর্ণনায় তারই শুভ সমাপ্তি। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে— স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, বিবস্বত, শ্রাদ্ধদেব,[১] সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি—এই চতুর্দশ মনুর শাসনকাল, তাঁদের বংশাবলী ইত্যাদি। উপরন্তু এঁদের কালে হরি কোন্ কোন্ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন কেই-বা ছিলেন ইন্দ্র, আর সপ্তর্ষিই-বা কারা কারা, তাও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। যেমন, চতুর্থ মনু তামসের কালে হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে আবির্ভূত ভগবান্ 'হরি' নামে খ্যাত। ভাগবতের বিবরণ অনুসারে তিনিই কুম্ভীরের গ্রাস থেকে গজেন্দ্রকে রক্ষা

১ শুকদেবের কালে এই শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত সপ্তম মনু বর্তমান ছিলেন জানা যাচ্ছে, তাঁরই উক্তিতে: "সপ্তমো বর্তমানো" [৮।১৩।১]

করেন।[১] তখন ত্রিশিখ ছিলেন ইন্দ্র, আর জ্যোতির্ধাম প্রমুখেরা ছিলেন সপ্তর্ষি। আবার পঞ্চম মনু রৈবতের কালে বিকুণ্ঠাসুতরূপে 'বৈকুণ্ঠ' নামে ভগবানের স্বকলায় আবির্ভাব।[২] বিভু তখন ইন্দ্র, হিরণ্যরোমা-বেদশিরা প্রমুখেরা সপ্তর্ষি। স্মরণীয়, এই মন্বন্তরের মধ্যেই ঋষিবংশাদির বিস্তৃত বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। তবে মন্বন্তরের চেয়েও 'ঈশানুকথা' বা ঈশ্বরের অবতার ও ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তজনের চরিতকথাই ভাগবতে অধিকতর পরিসর লাভের অধিকারী হয়েছে। অবতার সমূহের মধ্যে মৎস্য-রূপ অষ্টম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বন্দিত, কূর্ম-রূপ অষ্টমেরই দশম অধ্যায়ে, বরাহ-রূপ তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশে, নৃসিংহ-রূপ সপ্তম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে, বামন-রূপ অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে, পরশুরাম ও রাম নবম স্কন্ধের পঞ্চদশে ও দশমে, বলরাম দশম স্কন্ধে এবং প্রচলিত দশাবতারের তালিকায় অবশিষ্ট অবতারদ্বয় বুদ্ধ ও কল্কি ভাগবতে উল্লিখিত মাত্র। কিন্তু এ তালিকার বাইরেও ভগবানের নানা অবতার ভাগবতে স্বীকৃত হয়েছেন। যেমন, পৃথু অবতারের প্রসঙ্গ পাই চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চদশ থেকে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত, ঋষভাবতারের প্রসঙ্গ চতুর্থ-ষষ্ঠ অধ্যায়ে, নরনারায়ণের প্রসঙ্গ একাদশের চতুর্থে। ভাগবতে কপিলাবতারের প্রসঙ্গটি তুলনায় খুবই দীর্ঘ—তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায় থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত মোট দশটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে সাংখ্যকারের জীবনবেদ। অবতারের এই দীর্ঘ উপাখ্যানের পাশাপাশি ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তজনের চরিতও কিছু কম গুরুত্ব পায়নি। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় চতুর্থ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্রুবচরিত, সপ্তম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রহ্লাদচরিত, নবমের চতুর্থ অধ্যায়ে অম্বরীষ-কথা, একবিংশে রন্তিদেব-মহিমাখ্যাপন। ঈশ্বরানুগৃহীত এই ভক্তবৃন্দের নামকীর্তনে ভাগবত প্রকারান্তরে এঁদের আরাধ্য সেই দশম লক্ষণ 'আশ্রয়ে'রই জয়গান করেছে। শ্রীধরস্বামী ভাগবতের মহাপুরাণিক দশম লক্ষণের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বস্তুত প্রথম পাঠেই বোঝা যায়, 'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণই ভাগবতের দশম লক্ষণ বা 'আশ্রয়'। দশম স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়ের বহুবিস্তৃত পরিসরে সেই 'আশ্রয়ে'রই নরবপুধারণের অত্যাশ্চর্য লীলা অতুলনীয় কবিত্বে ও ভাবুকতায় উদ্গীত।

১ ভা° ৮।১।৩০
২ ভা° ৮।৫।৪

এইভাবেই ভাগবতে দশ লক্ষণ যথাযথ মর্যাদালাভ করেছে। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে এদের ঈষৎ ভিন্ননামে[১] উল্লিখিত হতে দেখি বটে, তবে সেখানেও 'বৃত্তি' এবং 'রক্ষা', অর্থাৎ ভক্তদের কর্তব্য এবং ভগবান্-কর্তৃক তাঁদের রক্ষা যথাক্রমে স্থান ও পোষণেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে। আর নিরোধই 'সংস্থা'। ঊতি বা বাসনাই তো পুনর্জন্মের কারণ বা 'হেতু' এবং আশ্রয়ই তো 'অপাশ্রয়'।

ভাগবতের এই দশটি লক্ষণ দেখেই একে অনেকে 'অর্বাচীন পুরাণ' বলেছেন। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। পুরাণ-পুঁথির পরিচয়দানে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডে মুখবন্ধে তিনি জানান, যেহেতু অমরকোষ-প্রণেতা ছিলেন বৌদ্ধ, তাই তাঁর কাছে হিন্দুপুরাণ ছিল কতিপয় পুরাকাহিনীর সমষ্টি বা ইতিহাস মাত্র, আর কিছু নয়। কাজেই পঞ্চলক্ষণের নির্দেশে পুরাণের ধর্মীয় আবেদন আদৌ রক্ষিত হল কিনা, তা বিবেচনা করে দেখবার কোনো প্রয়োজনই তিনি বোধ করেননি। ভাগবতের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষেপে দশলক্ষণ নির্দেশের মধ্যেই এর প্রথম প্রতিবাদ এলো বলা যায়। দশলক্ষণের অন্তর্গত 'বৃত্তি' ও 'রক্ষা'র দ্বারা পুরাণের সেই ধর্মীয় দিকটির মর্যাদাই সর্বাংশে রক্ষিত।[২]

অতঃপর কোনো আধুনিক গবেষক যদি মন্তব্য করেন যে, পুরাণের পঞ্চলক্ষণ থেকে দশলক্ষণে বিশদীভবন পার্থিব প্রকৃতি থেকে এ-শ্রেণীর সাহিত্যের সুউচ্চ আধ্যাত্মিকতারই মণ্ডন বুঝতে হবে,[৩] তখন কথাটি নিতান্ত অবহেলার যোগ্য মনে হয় না। তবে এ-মণ্ডন নিশ্চিতই অর্বাচীন কালে ঘটেছে কিনা ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যথাস্থানেই তা আমরা স্পষ্টীকৃত করবো। এখানে শুধু এটুকুই জেনে রাখতে হবে, ভাগবত নিজেকে মহাভারতের পরবর্তী রচনা বলে উল্লেখ করেছে।[৪]

১ "সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ॥" [১২।৭।৯]

২ A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, Preface, p. Cxxvii

৩ Siddhesvara Bhattacarya : The Philosophy of the Srimad-Bhagavata Introduction, Vol. 1. p. VII

৪ ভা° ১।৪

যা এককথায় "মহদদ্ভুতম্"[১] তথা "সর্বার্থপরিবৃংহিতম্"[২] বলে কথিত, সেই মহাভারতের পর ভাগবত প্রকাশিত হওয়ায় মহাভারতের মহদদ্ভুত সর্বার্থ-পরিবৃংহিত স্বভাব ভাগবতেও অনুসৃত হয়েছে বলতে হয়। শুধু তাই নয়, মহাভারতের পরেও বেদব্যাসের অপরিতৃপ্তি এবং ভাগবতে তারই সার্থকতা প্রাপ্তির[৩] প্রসঙ্গে মনে হয়, ভাগবতেরই মহাভারতাতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রতি এ হল নিগূঢ় ইংগিত। এই নিগূঢ় ইংগিত যে বেদগুহ্য 'অহৈতুকী প্রেমভক্তি'রই ব্যঞ্জনা তা ভাগবতধর্ম প্রসঙ্গে অন্যত্র আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করবো। কিন্তু মহাভারতের পরম্-অদ্ভুত সর্বশাস্ত্র-সঞ্চয়ন-প্রতিভা কিভাবে ভাগবতেও বিকাশলাভ করেছে তার ঈষৎ আভাস না দিলে আমাদের বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'—মহাভারত সম্বন্ধে এ-উক্তি তো প্রবাদবাক্যের মতোই প্রচলিত। বস্তুত মহাভারতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গপ্রাপ্তির পথনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ভূতত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি অপরাবিদ্যারও কোনো শাখাই একেবারে অনালোকিত থাকেনি। একই সঙ্গে এই পরা ও অপরাবিদ্যার পরিবেষণে ভাগবতও তুল্যমূল্য। ভাগবত প্রেমভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ নিরূপণ করেছে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছে। বিশ্ববিজ্ঞান ভূপরিচয় বা ভারতবর্ষীয় ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দু'একটি উদাহরণ যোগে আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত করা চলে যেমন, বিশ্বসৃষ্টির মূল রহস্যের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করতে করতে ভাগবতও আধুনিক বিজ্ঞানের মতোই পৌঁছেচে পরমাণুতে। কিন্তু অতি-আধুনিক বিজ্ঞানের মতো সেও সেখানেই থামেনি। বরং বলেছে, শেষ পর্যন্ত পরমাণুও সত্য নয়। পরমাণু স্বীকার না করলে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল কার্য ও পদার্থ সিদ্ধ হয় না বলেই বৈশেষিকগণ এর কল্পনা করে থাকেন।[৪] এক্ষেত্রে উপনিষদের মতো ভাগবতও শেষ পর্যন্ত পৌঁছেচে 'জ্যোতি'তে—"সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতির্বিং"।[৫] ভক্তি-শাস্ত্রের নিজস্ব পরিভাষায় তাকেই বলেছে

১, ২ ভা° ১।৫।৩
৩ ভা° ১।৪
৪ ভা° ৫।১২।৯
৫ ভা° ৫।১৬।৩

'বিশুদ্ধ সত্ত্ব',[১] নামান্তরে 'বাসুদেব'[২]। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানও এসে থেমেছে জ্যোতিতে। বলা বাহুল্য আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যখন পরীক্ষানিরীক্ষা-মূলক বিশুদ্ধ গাণিতিক পথে আসে, ভাগবতাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তখন আসে একান্তভাবেই বোধির পথে। তবে দুই পথ যখন কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐক্যসূত্রে মিলে যায়, তখন ভারতবর্ষীয় বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিস্ময়কর অগ্রগতির কথা এর পর তোলা যায়। কোপারনিকাস গ্যালিলিও নিউটনের বহুপূর্বেই ভারতবর্ষে আহ্নিক-বার্ষিক গতি বা অভিকর্ষ-মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে ভাস্করাচার্যের অভিকর্ষাদি সূত্রের আবিষ্কার ভাগবত-পরবর্তী কালের বটে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের হিন্দু জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের গ্রহ-বিষয়ক গতিসূত্র আবিষ্কার পুরাণ-রচনা তথা নবসংযোজনার কালেই ঘটেছে। ফলত ভাগবতে খগোল বিবরণে[৩] প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানভাণ্ডার উজাড় হয়ে যেতে বাকি থাকেনি। সূর্যকে ঘিরে গ্রহের গতি রয়েছে, একথার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাগবত যখন বলে শুধু গ্রহাদিরই নয়, সূর্যেরও গতি আছে, তখন চমক্ লাগে বৈকী। কুম্ভকারের চক্রের সঙ্গে সূর্য প্রভৃতি নক্ষত্রের তুলনা করে সে বলেছে, চক্রটি যখন ঘোরে, তখন তার ওপরে যদি কোনো পিপীলিকা থাকে তবে চক্রের গতির অনুরূপ একটি গতি তারও হয়। পক্ষান্তরে সেই চক্রের ওপরই পিপীলিকাটি যখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিপরীত মুখে চলতে থাকে তখন তার আর একটি বিপরীত গতিও স্বীকার করতে হবে। ঠিক এইভাবেই সূর্যাদি নক্ষত্রেরও উভয়বিধ গতিই স্বীকার্য।[৪] ভাগবতের মতে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্যতম মহাপ্রভাবশালী কালই গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ককে নিরন্তর পরিচালিত করছে। বলদের যেমন খুঁটি—ধ্রুবই তেমনি এদের 'মেধীস্তম্ভ'। এরাও সেই মেধী-স্তম্ভকে ঘিরে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশে কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশ পরিভ্রমণ করে ফেরে, কদাপি ভূতলে পতিত হয় না।[৫] লক্ষণীয়, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ যতই কেন না বিজ্ঞানের সত্য সংগ্রহ করুক, শেষ পর্যন্ত তারা

---

১ ভা° ৫।১২।১১

২ ভা° ৫।১৬।৩

৩ ভা° ৫।২১

৪ ভা° ৫।২২।২ ৫ ভা ৫।২৩।২

উপনীত হয় দার্শনিক পারমার্থিক ধারণাতেই। তাই দেখি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সব কৌতূহল ভাগবত নিবৃত্ত করেছে নিখিল জ্যোতিশ্চক্রের দ্বারা কল্পিত শিশুমার-মূর্তির ধারণায়, তথা সেই শিশুমারকেই পরমপুরুষের জ্যোতিঃ-শরীর রূপে উপাসনা করার বিধিদানে।[১]

শুধু আকাশের ধ্যানেই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টির ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত ভাগবতের সেই সর্বোপরি পারমার্থিক দৃষ্টিরই সন্ধান মিলবে। ভূমণ্ডলের স্থূলরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাগবত একে "কুবলয়-কমল-কোষাভ্যন্তরকোষো"[২] বা পদ্মস্বরূপ বলেছে। জম্বুদ্বীপ কেন্দ্রস্থ কোষ আর বাকি আটটি বর্ষ রয়েছে তারই চারপাশ ঘিরে। এর মধ্যে ভারতবর্ষের নাম পূর্বে অজনাভবর্ষ ছিল বলে জানানো হয়েছে, পরে ঋষভের জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের নামানুসারে এর নাম হল ভারতবর্ষ।[৩] মলয়-মঙ্গলপ্রস্থ-মৈনাক, বিন্ধ্য-শুক্তিমান-ঋক্ষগিরি-চিত্রকূট-গোবর্ধন-রৈবতক প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যানগম্ভীর পর্বতশোভিত ভারতবর্ষকে, তথা তাম্রপর্ণী-কৃতমালা-কাবেরী-যমুনা-সরস্বতী-দৃষদ্বতী বিতস্তা-অসিক্নী-বিশ্বা অন্ধ-শোণ নদী-মহানদের জপমালাধৃত ভারতবর্ষকে ভাগবত বলেছে ন'টি বর্ষের মধ্যে একমাত্র কর্মক্ষেত্রভূমি—আরগুলি হল স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্যভোগের ক্ষেত্র, তাই তারা 'পার্থিব স্বর্গ'। কিন্তু পার্থিব স্বর্গ দূরে থাক্, দেবতারা নিত্যস্বর্গভূমিকেও ভারতবর্ষের তুলনায় তুচ্ছজ্ঞান করেন। এক্ষেত্রে ভাগবত ঠিক ব্রহ্ম ও বিষ্ণু-পুরাণের মতোই দেবতাদের ভারত-মহিমা-গান তুলে ধরে :

"অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥"[৪]

আহা, যাঁরা ভারতভূমিতে ভগবান হরির সেবার উপযোগী নরজন্ম লাভ করেছেন, না জানি তাঁরা কোন্ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান

১ ভা° ৫।২৩
২ ভা° ৫।১৬।৫
৩ ভা° ৫।৪।৯, ৫।৭।৩
৪ ভা°

করেছিলেন। মনে হয় হরি বিনা-সাধনেই তাঁদের প্রতি প্রসন্ন। তাই আমাদের কেবল ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই জাগে, কিন্তু জন্মলাভের সৌভাগ্য আর ঘটে না।

ভাগবতের কথাকোবিদও এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন :

"কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সন্নস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥"[১]

কল্পায়ুর্জীবী দেবতাদের স্থান যে-স্বর্গভূমি, তা লাভ করার চেয়েও অল্পায়ু হয়ে ভারতবর্ষে পুনর্জন্ম লাভ করা শ্রেয়তর। কেননা চিরজীবী দেবতাদের আবার জন্ম হয়, কিন্তু ভারতবাসী পুরুষ মরণশীল দেহকে আশ্রয় করে ক্ষণকালেই কৃতকর্ম পরিহারে হরির অভয়পদই লাভ করে থাকেন।

কে বলে ভারতীয় সাহিত্যে দেশপ্রেম একেবারে বহিরাগত? "কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ," কল্পায়ুর্জীবী দেবতাদের নিবাস স্বর্গে জন্মলাভের চেয়েও ক্ষণায়ু হয়ে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করা শ্রেয়তর, প্রাচীন ভারতীয়ের এই একান্ত প্রার্থনাই তো চিরকালের ভারতবর্ষীয় জনগণের কণ্ঠভূষণ হওয়ার যোগ্য।

এইসঙ্গে আমরা আরও একটি প্রচলিত বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রাচীন ভারতীয়গণ ভারতবর্ষের কোনো ইতিহাস রচনা করে যাননি এবং তাঁদের ইতিহাসজ্ঞানের চরম অভাব ছিল— কোনো কোনো প্রতীচ্য গবেষকের এ-দুটি অভিযোগই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে বিশ্বাস। আটষট্টি বৎসর আগে ১৩০৯ সনে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এঁদেরই লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

'ইতিহাস সকলদেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথ্‌চাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খ্রীষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে: যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্‌তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-

১ ভা° ৫।১৯।২২

পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন 'যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের' তাঁহারা ধানের খেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল খেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।"[১]

সুখের বিষয়, ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস-গবেষণার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তাই এখন ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাসপথের অনুসন্ধানে বিদেশী গবেষকরাও আর "ধানের খেতে বেগুন খুঁজতে" যাওয়ার বিড়ম্বনার শিকার হন না। ১৯২২ সনে লণ্ডনের অক্সফোর্ড প্রেস থেকে প্রকাশিত 'Ancient Indian Historical Tradition' গ্রন্থের ভূমিকায় F. E. Pargiter-ই তো স্পষ্টভাষায় বলেছেন, শুধু বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের ওপর নির্ভর করায় তথা পুরাণিক ও মহাকাব্যিক ঐতিহ্যকে অবহেলা করায় পণ্ডিতসমাজে এই ধরণের অভিমত গড়ে উঠেছে যে, ভারতবাসীর ইতিহাস-জ্ঞানের শোচনীয় অভাব বর্তমান। আসলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি অসাধারণ প্রকৃতি আছে। এ ইতিহাস মূলত ধর্মতাত্ত্বিক। কিন্তু সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই যদি ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে হয় তো এর পুরাণগুলির আশ্রয় নিতে আমরা বাধ্য। প্রসঙ্গত তিনি বিভিন্ন পুরাণের কাল, সূর্য-চন্দ্রাদি রাজবংশ তথা ভার্গবাদি ঋষিবংশের তালিকা ও তথ্যাদিও যথাসম্ভব সংকলন করেছেন।

বংশানুচরিত মোটামুটি সব পুরাণেই অনেকটা এক। কিন্তু ভাগবতের যা অনন্য বৈশিষ্ট্য সেই বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসের কিছু কিছু ইংগিত সম্বন্ধে নীরব থাকলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ভাগবত পুরাণে 'ভাগবত' শব্দটি দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত—এক 'ভাগবত শাস্ত্র,' দুই 'ভক্তিরসপাত্র'। এর মধ্যে ভক্তিরসপাত্র বোঝাতে 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ প্রাচীন বলে গবেষকগণ মনে করেন। পাদ্মতন্ত্র নামক প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতায় এই ভাগবত-সম্প্রদায়কে বোঝাতে যে-বিভিন্ন প্রতিশব্দ পাচ্ছি, তার মধ্যে 'সাত্বত' এবং 'একান্তিক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুলনায় 'বৈষ্ণব' নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের, অর্থাৎ, গুপ্ত আমলের বলে মনে

১ 'ভারতবর্ষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ° ৩৮০, বি. ভা সং

করেন কেউ কেউ। এঁদের মতে, ভাগবত ধর্ম সর্বপ্রথম প্রচার করেন বৃষ্ণি-যাদব-সাত্বত গোষ্ঠীর মহানায়ক দেবকীপুত্র বাসুদেব কৃষ্ণ। গোষ্ঠী-গত ভাবে তখন এর নাম ছিল সাত্বত ধর্ম। এই ধর্মের মূল গ্রন্থ হিসাবে ভাগবত তাই 'সাত্বতী শ্রুতি' বলেই সুখ্যাত, আর এ-ধর্মের প্রবক্তাও নিজে পরিচিত "সাত্বত-শাস্ত্র-বিগ্রহ" রূপে। কালক্রমে সাত্বত-ধর্ম আবার বিশেষ গোষ্ঠীর সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়। তখন বাসুদেব কৃষ্ণই হয়ে উঠলেন 'স্বয়ং ভগবান্', তাঁর সম্প্রদায়ও তখন নাম নিল ভাগবত-সম্প্রদায়,—সাত্বত গোষ্ঠী এতেই হয়ে গেল লীন। দক্ষিণের বিষ্ণুভক্ত একান্তিক-সম্প্রদায়ও ক্রমশ ভাগবত সম্প্রদায়েরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পাঞ্চরাত্রের চতুর্ব্যূহবাদও ভাগবতধর্মে অদ্বয় কৃষ্ণতত্ত্বে পরিণতি লাভ করলো। তদুপরি, ভাগবত ধর্ম প্রচারের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভক্তিবিশ্বাসের ধারাটিও যথাসম্ভব বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে মৈত্রীরক্ষা করেই এসে যুক্ত হলো এ-ধর্মে। অর্থাৎ, যজ্ঞ-সম্পাদনের পূর্ণ প্রভাব যে-যুগে বর্তমান ছিল, সেযুগ থেকে আরম্ভ করে বৈদিক-প্রভাববিস্মৃত একান্তিক সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভাগবত-ধর্মের বহুকালব্যাপী বিপুল ইতিহাসের সমুদয় নিদর্শনই অতিগূঢ় ইংগিতে ভাগবত পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই দুই প্রান্তসীমার দুটি মাত্র উদাহরণ যোগেই বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারি।

ভাগবতের বিবরণ অনুসারে ঋষভপুত্র রাজা ভরতকেই যজ্ঞাদির নব ব্যবস্থাপক বলা চলে। জৈনশাস্ত্রে ঋষভদেবকে চব্বিশজন 'অর্হৎ' বা তীর্থঙ্করের আদিতম বলা হয়েছে। এই তীর্থঙ্কর সারির সবশেষের জন যিনি, সেই মহাবীর বা বর্ধমান বুদ্ধের সমসাময়িক বলে যুগপৎ জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে জানা যায়। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে মহাবীরকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ধর্মপ্রচারক বলতে হয়। কাজেই তাঁর ত্রয়োবিংশতিতম উর্ধ্বতন ধর্মগুরু ঋষভদেবের কাল যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর একাধিক শতক পূর্বে, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের তখন বিশেষ প্রাবল্য। এরই মধ্যে রাজা ভরত আনলেন এক যুগান্তর। বস্তুত সনাতন যজ্ঞপদ্ধতির কঠোর বিধিবদ্ধ অচলায়তনে তিনি যে কী নবযুগের হাওয়া বইয়ে দিলেন, তা আমরা অত্যাধুনিক কালের মানসিকতা নিয়ে সম্যক্ অনুধাবন করতে পারবো না। তিনি ইন্দ্র প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় দেবতার পরিবর্তে পরমপুরুষ-জ্ঞানে

বাসুদেবের উদ্দেশে যজ্ঞাহুতি প্রদান করতেন। শুকদেবের বক্তব্যক্রমে সেই অভূতপূর্ব যজ্ঞক্রিয়া নিম্নরূপ :

যজ্ঞ আরম্ভ হলে অধ্বর্যু অর্থাৎ যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিকরা যখন আহুতিদানের জন্য হবিঃ গ্রহণ করতেন, তখন যজমান ভরত সকল ক্রিয়ার ফল 'ধর্ম', যজ্ঞপুরুষ-রূপী পরমব্রহ্ম বাসুদেবের মধ্যেই অবস্থিত চিন্তা করে বিষয়-বাসনা ক্ষয় করেছিলেন, কেননা, তিনি মনে করতেন, ইন্দ্রাদি দেবতারও আবার নিয়ামক স্বয়ং বাসুদেব। তিনি তাই সূর্যাদি সকল দেবতাকেই ভগবান্ বাসুদেবের চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের মধ্যে অবস্থিত জেনেই একমাত্র তাঁর ভজনা করতেন।[১] তাঁর আবৃত্ত সাবিত্রী মন্ত্রও[২] তাই সূর্যমন্ত্র নয়, সূর্যেরও অধিষ্ঠাতা যিনি সেই বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমজ্যোতিরই ধ্যানমন্ত্র।

এরই পাশে দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে নবম শতকে একান্তিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে রচিত বলে বহুজনস্বীকৃত দ্বাদশ স্কন্ধের সেই বিখ্যাত ঘোষণাটি উদ্ধার করা যায় :

> "কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
> দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥[৩]

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর যজ্ঞনিষ্পাদনে কিংবা দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্যায়, কলিতে তাই একমাত্র হরিনামকীর্তনেই লভ্য, একথা অনুভব করে দাক্ষিণাত্যের একান্তিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় ভক্তিধর্মের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক বিপুল সম্ভাবনাময় বিরাট যুগের সূচনা করে গেছেন। রাজা ভরত যেখানে যজ্ঞের নববিধান প্রণয়নে বৈদিক যুগের সঙ্গে আপোষ করেছেন, বোধকরি সেখানেও নয়, যেখানে একান্তিকগণ বাহ্য সকল ধর্মীয়-অনুষ্ঠানের বাহুল্যমুক্ত হয়ে একমাত্র হরিনামকেই নিষ্কিঞ্চনের সম্পদ করে শুধু অকৃত্রিম অশ্রুজলেই পৃথিবীর অবিশ্বাসী ধূলিকে পরমবিশ্বাসে উর্বর করে কয়েক শতাব্দী পরের রামানন্দ কবীর রবিদাস নানক তুকারাম পুরন্দরদাস শ্রীচৈতন্যদেব শঙ্করদেব দাদূ প্রমুখের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করেছিলেন, বোধকরি সেখানেই ভাগবতধর্মের ইতিহাস যথার্থই মহাদিগন্তে প্রথম প্রসারিত হয়। গোমুখী থেকে সাগরসংগম—ভাগবতধর্মের এই দীর্ঘকালব্যাপী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভাগবতের রচনাকাল তাই বহু-যুগ-বিস্তৃত হয়ে দাঁড়ায়।

১ ভা° ৫।৭।৬ ২ ভা° ৫।৭।১৪ ৩ ভা° ১২।৩।৫২

ভাগবতের স্থান-কাল

বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে ভাগবত অপৌরুষেয়। অর্থাৎ, এটি কারো রচিত নয়, যুগে যুগে পরম-ভক্তজনের উপলব্ধ। সৃষ্টির আদিতে পাদ্মকল্পে স্বয়ং ভগবান্ শব্দ-শরীরে আবির্ভূত হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী[১] উপদেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তা আবার দিলেন নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে। জ্ঞানীরা একেই বলে থাকেন 'ভাগবত'[২], এবং তাঁদের মতে এই ভাবেই পরম্পরাক্রমে ভাগবতের প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ, চতুঃ-শ্লোকীই ভাগবতের মূল, এই চতুঃশ্লোকী শুনিয়েই নারদ ব্যাসদেবকে সদ্যমুক্তি দান করেছিলেন।[৩] এককথায় ভক্তের অভিমত অনুসারে ভাগবত অনাদিসিদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে এ হলো নিত্য, শাশ্বত, ব্রহ্মসম্মিত।

কিন্তু এতে তো আধুনিক ইতিহাস-গবেষকের কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না। নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের মতো আধুনিক গবেষকও বারংবার প্রশ্ন[৪] তুলবেন, ভাগবত পুরাণ,

(ক) "কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেঽয়ং"—কোন্ যুগে প্রবর্তিত হয়েছিল? এবং

(খ) [কস্মিন্] "স্থানে বা"—কোন্ স্থানে?

শৌনকের সব শেষের প্রশ্ন দুটি—

(গ) "কেন হেতুনা"—কোন্ কারণে প্রবর্তিত হয়? এবং

(ঘ) "কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং মুনিঃ"—
কার দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই ভাগবতী সংহিতা প্রচার করেছিলেন,

সে-সম্বন্ধে আধুনিক গবেষকের কৌতূহল না থাকলেও "কস্মিন্ যুগে" এবং "স্থানে বা" তাঁর মূল জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত। এবিষয়ে ভাগবত নিজে কি বলে, অতি সংক্ষেপে জেনে নিয়ে অন্যের অভিমত অনুসন্ধান করা যাবে।

ভাগবতের মতে, এ পুরাণ মহাভারতের পর প্রচারিত এবং ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে শম্যাপ্রাসতীর্থে ব্যাসদেবের সমাধিমগ্ন চিত্তে স্ফুরিত।

---

১ ভা° ২।৯।৩৩-৩৬

২ ভা° ৩।৪।১৩

৩ পাদ্মোত্তর খণ্ড, ভাগবত-মাহাত্ম্য, ২।৭২-৭৩

৪ ভা° ১।৪।৩

অর্থাৎ ভাগবত উত্তরভারতে প্রকটিত। পাদ্মোত্তর খণ্ডে 'ভাগবত-মাহাত্ম্য' প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে, বেদ-বেদান্ত 'সুস্নাত' ব্যাসদেব এমনকি গীতা-রচনার পরও যখন অজ্ঞান-সমুদ্রে মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তখনই নারদের কাছে পেলেন ভাগবতের উপদেশ। অর্থাৎ এখানেও ভাগবত মহাভারতের পরবর্তী বলে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে, অষ্টাদশ পুরাণের পর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। সুতরাং মাৎস্যমতে বলতে হয়, ভাগবতের পর ভারত। এই দুই বিপরীত বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীব বলেন, প্রথমে ব্যাসদেব সংক্ষেপে ভাগবত প্রকাশ করে মহাভারত সম্পূর্ণ করেন, তারপর আবার ভাগবতের বিস্তার ঘটান তিনি।[১] সমাধানটির মধ্যে আদৌ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা দেখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নভোলীন পুরাণ-স্বর্গ থেকে নেমে আধুনিক ইতিহাস-গবেষণার ভূমিস্পর্শ করাই সংগত।

গবেষকগণের মধ্যে ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনটি মত সাধারণত সুপ্রচলিত। প্রথমত, একদল মনে করেন, ভাগবত অতিশয় প্রাচীন রচনা। ঠিক এর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে আর একদল বলেন, এ হল নিতান্তই অর্বাচীন পুরাণ। তৃতীয় দল মধ্যপন্থী—এঁরা ভাগবতকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা বলে বিশ্বাস করেন। তিন দলের মধ্যেই বিখ্যাত মনীষী ও গবেষকগণের অভাব নেই। যেমন প্রথমোক্ত দলে আছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর বিশ্বাস, ভাগবত খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রচনা। আবার দ্বিতীয়োক্ত মতের পোষক হিসাবে Burnouf, Wilson, Colebrooke ভাগবতকে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন। Winternitz এই কালসীমাকে আর একটু পিছিয়ে একাদশ শতাব্দী করার পক্ষপাতী, আর Farquhar দশম শতাব্দী, Eliot নবম-দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও ভাগবতের প্রাচীনত্বে বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না। তাই 'কৃষ্ণচরিত্রে' তিনি মন্তব্য করেন: "এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?"[১] অপরাপর ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে ভাণ্ডারকর ভাগবতের রচনাকালকে আনন্দতীর্থের দুই শতক পূর্বে নির্দিষ্ট করতে চান, ডি. এস. শাস্ত্রী নির্দিষ্ট করতে চান ৮২৫-৮৫০

১ তত্ত্বসন্দর্ভ, ৪৮ অনুচ্ছেদ

১ কৃষ্ণচরিত্র, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

খ্রীষ্টাব্দে, কৃষ্ণমূর্তি শর্মা ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, এ. এন. রায় ৫৫০-৬৫০-এ এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা ৬০০তে। উল্লেখযোগ্য, একদল গবেষক আবার বোপদেবকে ভাগবতের রচয়িতা বলে মনে করেন। বোপদেব ছিলেন মহারাষ্ট্রের দেবগিরি রাজ্যের মন্ত্রী হেমাদ্রির আশ্রিত। অর্থাৎ এঁদের মতে, ভাগবত ত্রয়োদশ শতকের সৃষ্টি।

ভাগবতের রচনাকালের মতো ভাগবতের জন্মস্থান সম্বন্ধেও নানাজনের নানা অভিমত। ভাগবত উত্তর-ভারতের দান—এ ধারণা সমধিক প্রচলিত থাকলেও Farquhar, ভাণ্ডারকর প্রমুখ গবেষকগণ মনে করেন, ভাগবত দক্ষিণ ভারতেরই কোনো অংশে রচিত। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা ভাগবতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকসমূহ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, দাক্ষিণাত্যের বিশেষ যশোগান করে ভাগবতেই বলা হয়েছে, কলিতে নারায়ণভক্ত কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করবেন বটে, কিন্তু দ্রাবিড়দেশে তাঁদের সংখ্যা হবে ভূরি ভূরি—তত্রস্থ প্রবাহিত তাম্রপর্ণী কৃতমালা কাবেরী মহাপুণ্যা প্রতীচী মহানদীর জল যাঁরা পান করেন সেই মহাত্মারা প্রায়শই ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হয়ে থাকেন।[1] এই নারায়ণ-ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গ যে দক্ষিণ ভারতীয় বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত-গোষ্ঠী 'আলবার' বা 'আড়বার'দেরই ইংগিত, সে বিষয়ে ভাণ্ডারকর নিঃসন্দেহ। তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে ঐতিহাসিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানান, শুধু একাদশ স্কন্ধেই নয়, ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও এই 'আলবার'দের ইংগিত পাওয়া সম্ভব। গ্রাহ-কর্তৃক নিপীড়িত গজেন্দ্রের বিষ্ণুস্তুতিতে দ্রাবিড়দেশীয় ভক্তগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। গজেন্দ্রের উক্তিতে যে "একান্তিনো"[2] ভগবৎপ্রপন্নদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা যে ভক্তিরসের আনন্দসাগরে নিমগ্ন এবং ভগবানের বিচিত্র মহিমাকীর্তনে তৎপর আলবার ভিন্ন আর কেউই

১ "কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥" ১১।৫।৩৮-৪০

২ "একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ" ॥ ৮।৩।২০

নন, সে বিষয়ে তাঁর সংশয় মাত্র নেই। Farquhar-এর অনুসরণে তিনিও তাই ভাগবত পুরাণের পরিশিষ্ট বলে গৃহীত পাদ্মোত্তর খণ্ডে ভাগবতমাহাত্ম্যে উল্লিখিত ভক্তিদেবীর কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন, ভক্তির জন্মস্থান যে দ্রবিড়দেশ, ভক্তিদেবীর মুখে কৌশলে এখানে তাই বলানো হয়েছে। অর্থাৎ, ভাগবত পুরাণে বর্ণিত বিচিত্র রূপসমন্বিত, আবেগময়, ভাবসমৃদ্ধ ভক্তি দক্ষিণদেশীয় আলবারদেরই বিষ্ণুভক্তি-বিভাবিত মাত্র।[১]

ভাগবতের রচনাকাল ও জন্মস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষকগণের বিভিন্নমুখী গবেষণার মোটামুটি ভাবে এই হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন এগুলি সাবধানে বিচার করে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

ভাগবতকে যাঁরা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলে মনে করেন, তাঁদের মতবাদ নস্যাৎ হয়ে যায় ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ আলবেরুনীর ভারতবিবরণে ভাগবতের উল্লেখে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব কর্তৃক ভাগবত রচিত হওয়ার স্বকপোলকল্পনাটিও একই সঙ্গে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। বোপদেব ভাগবতের 'পরমহংসপ্রিয়া' টীকারচনাই করেছিলেন. মূল ভাগবতের কিছু শ্লোকও তাতে উদ্ধৃত আছে। ড° রাধাগোবিন্দ নাথ রামানুজের বেদান্ত-তত্ত্বসারে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন।[২] এও তো একাদশ শতাব্দীর কথা। আবার সপ্তম আলবার কুলশেখরের মুকুন্দমালায় ভাগবতের ১১।২।৩৬ সংখ্যক শ্লোকটি উদ্ধৃত হতে দেখি। ভাণ্ডারকর এঁকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের অন্তর্ভুক্ত করার যত চেষ্টাই করুন, এঁর কালসীমা অন্তত দু'এক শতাব্দী প্রাচীনতর তো বটেই। বস্তুত 'ভাগবত-তাৎপর্য'-প্রণেতা মধ্বাচার্য, 'পরমহংসপ্রিয়া'-প্রণেতা বোপদেব কিংবা 'ভাবার্থ-দীপিকা'-প্রণেতা শ্রীধরের তুল্য সর্বলোকমান্য টীকাকারগণের পক্ষে ভাগবতটীকা রচনা এইজন্যই সম্ভব হয়েছে যে, ভাগবত বহুকাল-প্রচলিত বহুজন-শ্রদ্ধেয় পুরাণ বলে বহুদিন ধরেই প্রসিদ্ধ। ভাগবত অর্বাচীন পুরাণ এ অভিমত এভাবেই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। বিশেষত আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত 'সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ' গ্রন্থের 'বেদান্ত-পক্ষ প্রকরণে' ভাগবতের উল্লেখ থাকায়[৩] এ [illegible] অর্বাচীন বলা যায় না।

১ 'পঞ্চোপাসনা' : ড° জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ° ৮০,

২ 'শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা' : ড° রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃ° ৮

৩ শ্রীভাগবত-সংজ্ঞে তু পুরাণে দৃশ্যতে [illegible] [৯৮-৯৯]

ড° রাধাগোবিন্দ নাথ-ধৃত পাঠ, গৌড়ীয় [illegible] দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃ° ভূ° ১৩০

প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবতে খ্রীষ্টপূর্ব তথা আদি-খ্রীষ্টীয় যুগের বৈশিষ্ট্য কিছু কম নেই। আমরা ভাগবতের ভাষাবৈশিষ্ট্য আর ছন্দোবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেই এর প্রাচীনতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি। বস্তুত, এ হলো ভাগবতের রচনাকালের একেবারে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ, আর এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বিস্ময়কর প্রবেশের অধিকার নিয়ে যে-অভিমত প্রকাশ করে গেছেন, আজও তা প্রায় অখণ্ডনীয় বলেই প্রমাণিত হবে। পুরাণ পুঁথির পরিচয়দানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ক্যাটালগের পঞ্চম খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি বলেন, বোপদেব তাঁর ভাগবতটীকা 'পরমহংসপ্রিয়া'তে ভাগবতের প্রায় এক সহস্র ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ দেখিয়ে তাদের 'আর্ষপ্রয়োগ' বলে নির্দেশ দিয়েছেন। বোপদেবের সমসাময়িক হেমাদ্রিও ভাগবতের এ-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নেন। ভাগবতের দ্বিতীয় ভাষাগত বিশেষত্ব এর গদ্য-রীতি। Pargiter যে তাঁর Purāṇa Texts of the Dynasties of the Kali Age-এ এই গদ্যকে কাদম্বরীর অনুকরণ বলে মন্তব্য করে এর কালসীমা নির্দেশ করেছেন সপ্তম শতকে, তার বিরুদ্ধেও শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি খুবই জোরালো। তাঁর অভিমত অনুসারে এ গদ্যে প্রভূত পরিমাণে "হ" "বাব" প্রভৃতি পাদপূরণের ব্যবহার থাকায় তথা "ব্যাখ্যাস্যামঃ" পদ-প্রয়োগের ফলে বুঝতে হয়, এ এমন এক যুগের গদ্যরীতি যখন 'ব্রাহ্মণে'র ভাষাবৈশিষ্ট্যও একেবারে বিস্মৃত হয়ে যায়নি, আবার সূত্ররীতিও অপ্রচলিত হয়ে পড়েনি। অর্থাৎ, ভাগবতীয় গদ্যকে তিনি 'ব্রাহ্মণ' ও পরবর্তী সাহিত্যিক গদ্যের মধ্যবর্তী বলতে চান। আর এর কালসীমাকেও অন্তত খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক। প্রসঙ্গত তিনি ভাগবতীয় 'স্কন্ধ' শব্দটির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন, এই শব্দ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয় শতকে বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচলিত হয়েছিল। সুতরাং বলতে হয়, ভাগবত যখন রচিত বা নবসংস্কৃত হয়, তখন সমাজে তথা ভাষারীতিতে বৌদ্ধপ্রভাবের প্রাবল্য ছিল খুবই। এই সকল ভাষা কারণে শাস্ত্রী মহাশয় ভাগবতকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী রচনা বলতে চান।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন ভাগবতের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিচারে এর বহু প্রাচীন প্রয়োগ 'আর্ষ' প্রয়োগ রূপে চিহ্নিত হবার প্রসঙ্গ তোলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান তেমনি তুলেছে ভাগবতের

অপরিচিত ছন্দ-প্রসঙ্গ। উক্ত অভিধান থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধার করা হল :

"শ্রীমদ্‌ভাগবতে ছন্দোবিষয়ে বহু ব্যতিক্রম আছে ; তাহাতে দুইটি সমাধান মনে হয়—আর্ষ প্রয়োগ ত আছেই ; ছন্দের পূর্বকালীন প্রচলন এবং প্রস্তারের[১] নিয়মে নূতন রচনাও হইতে পারে"।[২]

অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও সেই প্রাচীন প্রয়োগ। সন্দেহ নেই, ভাগবতের অংশবিশেষ সত্যই বহু পুরাতনকালের চিহ্ন বুকে ধারণ করে আছে। কিন্তু তাহলে তন্ত্রের প্রভাবের ব্যাখ্যা কি দেওয়া যাবে? মূলত অষ্টম শতকেই নবসংস্করণের দিনে পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে তন্ত্রপ্রভাব প্রবেশ করে বলে গবেষকগণের বিশ্বাস। সম্পূর্ণ খ্রীষ্টপূর্ব যুগের রচনায় অষ্টম শতকের তন্ত্রপ্রভাব দুর্বোধ্য নয় কি? আর হূণদের ব্যপকভাবে ভাগবতধর্ম আলিঙ্গনের যে-তথ্য ভাগবতে মেলে, সেও তো খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত আমলের ঘটনা। তাছাড়া ভাগবত যে নিজেকে মহাপুরাণ বলে পঞ্চলক্ষণের পরিবর্তে দশটি লক্ষণ দেখিয়েছে, তাও তো অনেকের মতে অষ্টম শতকের আগে ঘটা সম্ভব নয়।

ভাগবতের রচনাকাল বিষয়ক এই গুরুতর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটি অতি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী নিঃসন্দেহে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। মহাভারতের পূর্বে ব্যাসদেব একবার সংক্ষিপ্ত ভাগবত প্রকাশ করেছিলেন, পরে তারই আবার বিস্তার ঘটান তিনি—শ্রীজীবের এ-অভিমত তো আমরা ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। বস্তুত ভাগবতের এই একাধিক সংস্করণের প্রতি আমাদের অবহিত করে তুলে শ্রীজীব যেন প্রকারান্তরে আধুনিক ভাগবত গবেষণারই সূত্রপাত ঘটিয়ে গেছেন। বিভিন্ন যুগে ভাগবতের নব নব সংস্করণের সূত্রেই একমাত্র এর রচনাকালের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। বলা বাহুল্য, এ সংস্করণের কাল যেমন খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু হয়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তেমনি এ-সংস্করণের স্থানও উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত আসমুদ্র-হিমাচল। যুক্তিযোগে আমাদের মতবাদ স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১ ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়াবিশেষ—মদীয়।

২ গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৩ খ°, পৃ° ১৭০৯

ভাগবতে বারংবার চতুঃশ্লোকীকে অতি প্রাচীন বলা হয়েছে। ভগবান্ কর্তৃক পাদ্মকল্পে এটি প্রথম প্রচারিত হয়—রূপকভঙ্গ করলে এই বোঝা যাবে, ভাগবতের চতুঃশ্লোকী বহু পুরাতন কালেই প্রচারলাভ করে। আমাদেরও বিশ্বাস মূল ভাগবত—চতুঃশ্লোকী এবং আরো কিছু বেদার্থ-নির্ণায়ক শ্লোকে সীমাবদ্ধ থেকে—খ্রীষ্টপূর্ব শতকেই প্রচলিত ছিল। এই অতি-সংক্ষিপ্ত মূল ভাগবত মহাভারতের পূর্বে, এমনকি বৃষ্ণি-যাদব-সাত্বত গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিক কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। 'রাম না হতেই রামায়ণ'—এ তো ভারতবর্ষের বহুদিনের ঐতিহ্য। তাই বোধকরি দেবকী-পুত্র বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ভাগবতে এসেছে ন' ন'টি স্কন্ধের পরে দশমে। ভাগবতের উপক্রমণিকা পর্বে যে-কৃষ্ণভগবত্তার ঘোষণা শুনি বা কৃষ্ণলীলার তথা মহাভারতের সারসংক্ষেপ দেখি তার সমাধান কি, যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখানে মূল ভাগবতের নব নব সংস্করণগুলিই একমাত্র বিবেচ্য। মৎস্যপুরাণে ভাগবতের যে-দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যেমন 'হয়গ্রীব অর্থবিস্তার' ও 'বৃত্রাসুরবধ'[১] তা আমরা ভাগবতের পরিবর্ধিত রূপের প্রথমাবস্থা বলে মনে করি। ভাগবতের গদ্যাংশ একালেই রচিত হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত অনুসারে এটিকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ফেলা যায়। ভাগবতের সর্বাপেক্ষা বর্ধিত সংস্করণ ও পরিবর্ধন, ভাষান্তরে প্রায়-নবরূপায়ণ ঘটলো বোধকরি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর কিছু পরের আমলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে। ভাগবতে সুরনগরী বর্ণনায় গুপ্তসাম্রাজ্যের হীরামুক্তা-মাণিক্যের ইন্দ্রজাল-ইন্দ্রধনুচ্ছটাকেই পাবো। গুপ্তযুগের পূর্ণ পরিণত অবতারবাদও এতে স্থান পেয়েছে। বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে 'হিন্দুধর্ম'কে নব-ভাবে গঠনের যে গুপ্ত সম্রাটীয় প্রয়াস তাও এতে মিলবে। গো-ব্রাহ্মণ-হিতের গুপ্তযুগসম্মত ধুয়াও এ-পর্বে ভাগবতকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল মনে হয়। তাই দেখি, দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ হয়ে গেছেন ব্রাহ্মণ-গো-রূপ সমুদ্রের বর্ধনকারী চন্দ্রস্বরূপ।[২] ভাগবত সংস্করণের চতুর্থ পর্বে এতে দাক্ষিণাত্যের প্রথমযুগের আলবারগণের প্রেমভক্তির স্পর্শ লাগা অসম্ভব নয়। ভাগবতে বারাঙ্গনা পিঙ্গলার বরাঙ্গনায় উন্নীত হওয়ার কালে উচ্চারিত সেই নিগূঢ় সাধ

১ "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥"

২ "... দ্বিজকুলাম্বুধিবৃদ্ধিকারিন্"। ১০।১০।১৪

"রেমেঽনেন যথা রমা"[১] রমার মতোই অনুক্ষণ তাঁর সঙ্গে রমণ করব—যেন শ্রীরঙ্গনাথের সঙ্গে রমণাভিলাষিণী গোদা বা অণ্ডালেরই অন্তঃস্থিত নিত্য-স্পন্দিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। ভাগবতের পঞ্চম বা সর্বশেষ সংস্করণ ঘটলো বোধকরি আলবার সন্তদের শেষ সীমায় আচার্য সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের কালে তন্ত্রের প্রবল প্রচারের পটভূমিকায়। সেটি অষ্টম শতাব্দীতে হওয়াই সম্ভব।

অর্থাৎ আমরা ভাগবতের একাধিক সংস্করণে বিশ্বাসী। আমাদের এ-বিশ্বাসের ভিত্তিরচনা অনেকটাই করে গেছেন শাস্ত্রী মহাশয়। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে 'The Age of the Bhāgavata' অনুচ্ছেদে তিনি তো স্পষ্টই ঘোষণা করেন, মূলে ভাগবত সাতদিনের মধ্যে পাঠযোগ্য, আবৃত্তিযোগ্য বা ব্যাখ্যাযোগ্য সংক্ষিপ্ত রূপেই ছিল। কেননা সাতদিন পরেই শ্রোতা পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে মারা যাবেন, তাই জেনেই শুকদেব সেই প্রায়োপবিষ্টকে সম্পূর্ণ ভাগবত শোনাতে বসেছিলেন। কাজেই মূলে ভাগবত যে খুব বড় ছিল না, এ কথা তিনিও স্বীকার করেন। এই মূল অংশটুকুর প্রাচীনত্বেও তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। সেইসঙ্গে কালক্রমে এর নানা সংস্করণেও আস্থাবান তিনি। তাঁর মতে, এক একটি কথোপকথনের অবতারণাই এর এক একটি নবসংস্করণের স্মারক হয়ে আছে। এই সংস্করণের ক্ষেত্রেও তিনি আবার প্রাচীন ও আধুনিক দুটি পৃথক্ ধারা লক্ষ্য করেছেন। তন্মধ্যে প্রাচীন সংস্করণে যে কথোপকথন যুক্ত হয়েছে তা মূলত ধর্মীয় ও দার্শনিক কারণেই। যেমন, তৃতীয় স্কন্ধের মৈত্রেয়-বিদুর সংবাদ। অন্য দিকে আধুনিক সংস্করণে যেখানে এই কথোপকথন যুক্ত হয়েছে তা মূলত ভাগবতকে পূর্ণাঙ্গ পুরাণের রূপদানের চেষ্টাতেই। এই সূত্রবলে তিনি ভাগবতের পুরো প্রথম স্কন্ধ এবং শেষ স্কন্ধের অর্ধেকেরও বেশী পরে সংযোজিত বলতে চান। আমরা অবশ্য প্রথম স্কন্ধের পুরোটাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রক্ষিপ্ত বলার আদৌ পক্ষপাতী নই। কেননা, মৎস্যপুরাণ কথিত ভাগবতের প্রাচীন ও বিশিষ্ট লক্ষণ 'গায়ত্রীর অর্থবিস্তার' এই প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ঘটেছে। তবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে কৃষ্ণজীবনীর যে সংক্ষিপ্ত-সার তথা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-মহাপ্রস্থান পর্ব ইত্যাদি বিবরণ স্থান লাভ করেছে, সেটি মূল ভাগবতের সঙ্গে বেশ কিছু পরবর্তীকালের যোজনা বলেই মনে হয়।

---

১ "সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রেমেঽনেন যথা রমা॥" ১১।৮।৩৫

তবে এ-যোজনাও নিতান্ত অর্বাচীন কালের বললে ভুল হবে। ভাগবতে অর্বাচীন প্রক্ষেপের পরিমাণ অবশ্য নেহাৎ কম নয়। এমনি এক প্রক্ষেপের চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন শাস্ত্রী মহাশয়। একাদশ স্কন্ধের ভগবান্-উদ্ধব সংবাদ এ-স্কন্ধেরই প্রথম সাতটি ও শেষ দুটি অধ্যায়ের মধ্যে জোর করে ঢোকানো। তাই দেখি পূর্বের সাতটি অধ্যায় পরের দুটি অধ্যায়ের সঙ্গে অর্থাৎ ত্রিংশ ও একত্রিংশের সঙ্গে পাঠ্য। কেননা, মোট এই ন'টি অধ্যায় [১-৭, ৩০, ৩১] যদুবংশ-ধ্বংসের বিবরণ। কিন্তু আয়তন বাড়াতে গিয়ে তথা ধর্মীয় আবেদনকে স্পষ্টতর করার প্রয়োজনেও মধ্যবর্তী মোট বাইশটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

বস্তুত, ভারতীয় অপরাপর পুরাণের ক্ষেত্রে যেমন, ভাগবতের ক্ষেত্রেও তেমনি, নানাযুগের নানা সাধকের সাধনার সুফল এসে মিশেছে। কিন্তু অপরাপর প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণের ক্ষেত্রে, বিশেষত মহাভারতের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপ যেমন যত্রতত্র যেমন-তেমন ভাবে প্রবেশ করে পুনরুক্তিদোষে ও সংগতিহীনতায় একটি অখণ্ড অন্তর্লীন সুরপ্রবাহের প্রায়শই তালভঙ্গ করে গেছে, ভাগবতে তেমন নয়। ভারতবর্ষের সব কটি পুরাণের মধ্যে ভাগবতের পুঁথিই পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী—এর জনপ্রিয়তার এ এক বিরাট প্রমাণ। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ভাগবতে প্রক্ষেপের মধ্যে সর্বত্র এমন একটি অপূর্ব অখণ্ড সংগতিসূত্র রক্ষিত হয়েছে যে, মনে হয় ভাগবতের যখন যে নব-সংস্করণই ঘটে থাকুক না কেন, তা শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও রসস্রষ্টার দ্বারাই সুপরিকল্পিতভাবে সম্পাদিত হয়েছে। ফলে নানাযুগে নানা কবি-মনীষার ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ লালিত ও পুষ্ট হয়েও ভাগবত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাকবির অখণ্ড সিদ্ধফল বলে প্রতিভাত হবে। তাই ভাগবতের যে যে 'প্রক্ষেপে'র উল্লেখ আমরা এ পর্যন্ত করেছি, সেগুলি ভাগবতের যেন অপরিহার্য অঙ্গ, তাই এরা প্রক্ষেপ নয়, ভাগবতেরই সম্পূর্ণতার সাধক। প্রকৃতপক্ষে ভাগবতের এই সম্পূর্ণতার আদর্শ, এই সর্বসমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই এ পুরাণ উত্তর ভারতে না দাক্ষিণাত্যে, কোথায় রচিত হয়েছিল তাই নিয়ে গবেষকগণের মধ্যে এত বিতর্কের উদ্ভব। অবশ্য মূলত ভাগবত যে উত্তরভারতে পরিকল্পিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্পই আছে। ভাণ্ডারকর, Farquhar প্রমুখ গবেষকগণ পাদ্মোত্তর খণ্ডের যে-কাহিনীটি আশ্রয় করে ভাগবতকে দক্ষিণদেশের দান বলেছেন, সেই একই কাহিনীকে আশ্রয় করে আমরা সহজেই ভাগবতের উত্তরভারতীয় উৎস

সন্ধান করতে পারি। দেবী ভক্তি দ্রাবিড়ে উৎপন্না হয়ে কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হয়েছেন, পরন্তু মহারাষ্ট্রে কচিৎ কচিৎ সম্মানিতা হয়েও গুজরাটে হয়েছেন বৃদ্ধা ও পাষণ্ডপ্রভাবে ভগ্নদেহ ; অতঃপর বৃন্দাবনে এসেই তিনি আবার নবীনা সুরূপায় রূপান্তরিতা হন।[১] ভক্তি দেবীর এই বক্তব্যের মধ্যে "উৎপন্না দ্রবিড়ে সাঽহং" অংশটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। আমরা জানি, বৈষ্ণব-ভক্তের কাছে ভক্তি "পরমানন্দচিন্মূর্তি সুন্দরী কৃষ্ণবল্লভা."[২] সুতরাং, নিত্যা। কাজেই তাঁদের কাছে ভক্তি আক্ষরিক অর্থে 'উৎপন্না' বা 'জাতা' অর্থাৎ 'ছিলেন না, হয়েছেন' এমন হতেই পারে না। তাই পাদ্মোত্তর খণ্ডের 'উৎপন্না' শব্দে পুরাণকার ভক্তিকে দ্রাবিড়ে আবির্ভূতাই বোঝাতে চেয়েছেন বলতে হবে। পরন্তু বৃন্দাবনই যে তাঁর স্বক্ষেত্র এবং স্বরূপস্ফূর্তির আদিধাম তা তো "বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী" কথাটিতেই স্পষ্ট। বৃন্দা-বনকে এর পূর্বে তিনি আর একবার না পেয়ে থাকলে "পুনঃ প্রাপ্য" অংশটির কি কোনো সার্থকতা থাকতো ? কৃষ্ণভক্তির আদি কেন্দ্র তো দ্রাবিড় নয়, গোকুল-মথুরা অঞ্চল তথা উত্তর ভারত। এই উত্তর ভারতেই কৃষ্ণের বিচিত্রলীলার প্রথম প্রাচীনতম উল্লেখ পাই। আর এখানেই বাসুদেব-কৃষ্ণ সর্বপ্রথম 'স্বয়ং ভগবান্' বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভাগবতে কৃষ্ণের ভগবত্তা ঘোষণায় উত্তর ভারতের এই বিশিষ্ট ভক্তিধর্মেরই জয়গান শুনি।

পক্ষান্তরে আলবার ঐকান্তিক সম্প্রদায় বিষ্ণুভক্ত, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভই তাঁদের শেষ অভিলাষ। কৃষ্ণ তাঁদের কাছে বিষ্ণুর অবতার মাত্র। বস্তুত দক্ষিণভারতে ভাগবত অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণই সমধিক প্রচলিত। বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবতে আমরা যেমন চৈতন্যসম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ-অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজার বিবরণ[৩] পাই, দক্ষিণ ভারতে শ্রীসম্প্রদায়ে তেমনি দেখি পরাশর-পূজার ব্যাপক প্রচলন। স্বভাবতই এই বিষ্ণুভক্তিপ্রধান দাক্ষিণাত্যে

---

[১] "উৎপন্না দ্রবিড়ে সাঽহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
কচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে জীর্ণতাং গতা॥
তত্র ঘোরকলের্যোগাৎ পাষণ্ডৈঃ খণ্ডিতাঙ্গকা।
দুর্বলাঽহং চিরং জাতা পুত্রাভ্যাং সহ মন্দতাম্॥
বৃন্দাবনং পুনঃ প্রাপ্য নবীনেব সুরূপিণী।
জাতোঽহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপা তু সাম্প্রতম্॥"

পাদ্মোত্তর ভাগবতমাহাত্ম্যম্, ১।৪৪; ৪৭-৪৯

[২] ভক্তিরত্ন ১।৫ [৩] চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়

কৃষ্ণভক্তিপ্রধান ভাগবত প্রথম পরিকল্পিত হয়েছিল, মেনে নেওয়া কঠিন। এতৎসত্ত্বেও কেউ কেউ অন্য একটি সম্ভাবনার কথা তুলতে পারেন। আমরা বলেছি, মূল ভাগবত চতুঃশ্লোকী ও আরো কিছু 'বেদার্থপরিবৃংহিত' শ্লোক নিয়ে এমনকি কৃষ্ণজন্মের পূর্বেও প্রচলিত থাকা অসম্ভব ছিলনা। এই মূল ভাগবতকে দক্ষিণাপথে প্রথম আবির্ভূত বলতে পারেন বিরুদ্ধবাদীরা। দক্ষিণের বিষ্ণুভক্তিধারায় পুষ্ট হয়ে পরে এটি উত্তরভারতে এসে উত্তরের বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্তিধারার সঙ্গে মিলে ভাগবতের সম্পূর্ণতা সাধন করেছে বলেও কারো কারো অভিমত থাকতে পারে। ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিধারার পাশাপাশি বিষ্ণুভক্তিধারাও বেশ বেগবতী, সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো চরম নির্ভরযোগ্য নিদর্শনই মেলেনি যার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হতে পারে, প্রথমে দক্ষিণ থেকেই ভাগবতী ভক্তির ধারা উত্তরে এসেছে। বরং নানাঘাট গুহালিপি সাক্ষ্য দেয়, উত্তরভারত থেকেই বৈষ্ণব-ধর্মের প্লাবন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে দক্ষিণাত্যে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সর্বোপরি ভাগবতী ভক্তির কিছু কিছু অন্তর্গূঢ় স্বরূপের সঙ্গে দক্ষিণভারতীয় ভক্তির একটা পার্থক্য থেকেই গেছে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুই পুত্রকে নিয়ে যে-ভক্তি দেবী দ্রাবিড়ে উৎপন্না বা আবির্ভূতা হয়েছিলেন, বৃন্দাবনে এসে একমাত্র তিনিই নবযৌবন প্রাপ্তা হন, পুত্র দুটিকে সুপ্তি থেকে আর জাগাতে পারেন না। দক্ষিণদেশের কিছুটা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভাগবতী নিঃশ্রেয়স অহৈতুকী জ্ঞানশূন্যা ভক্তির এ যেন একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের ইংগিত। অবশ্য ভাগবত তার ভক্তিধর্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ নিয়ে দাক্ষিণাত্যে কোথাও যে প্রভাব বিস্তার করেনি, এমন নয়। কৃষ্ণবেণ্বা-তীরের কবি লীলাশুককেই তো ভাগবত-প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মনে করতে পারেন কেউ কেউ। গোদাবরীতীরে শ্রীচৈতন্যদেবকে রায় রামানন্দ রসরাজ-মহাভাব কৃষ্ণ-গোপীর যে-তত্ত্বকথা শুনিয়েছিলেন, তা অন্তত কয়েক শতাব্দীর কৃষ্ণভক্তি-সাধনার ফল বলতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডীয় উক্তিতে ভক্তিদেবী যে-কর্ণাটকে "বৃদ্ধিং গতা" বা বৃদ্ধি প্রাপ্তির কথা বলেছেন, সেই কর্ণাটকেরই তো কোনো বাসুদেব-পরায়ণ ভক্তবংশের উত্তরপুরুষ চৈতন্যপ্রসাদপ্রাপ্ত রূপ-সনাতন। কিন্তু এ তো বহু পরের কথা। আনুমানিক এই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কালসীমার বহু পূর্বে বিষ্ণুভক্ত আলবার একান্তিক সম্প্রদায়ের সমসাময়িক কালে বা তারও পূর্বে দাক্ষিণাত্যে

কৃষ্ণভক্তির আমরা এমন কোনো নিবিড় ঐকান্তিক পরিবেশের প্রমাণ আজও পাই না, যা ভাগবত-পরিকল্পনার অনুকূল বলে সহজেই স্বীকার করে নেওয়া যায়।

তবে বিষ্ণুভক্তিপ্রধান দক্ষিণদেশে ভাগবতের প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিল এটি স্বীকার করা না গেলেও, ভাগবতের অংশবিশেষ যে দাক্ষিণাত্যের দান সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই। একাদশ-দ্বাদশ স্কন্ধ বহুলাংশে তো বটেই, এমনকি দশম স্কন্ধও কতকাংশে দক্ষিণভারতে রচিত হতে পারে। যেমন অনেকেই ভাগবতের গোপীগীতে বারংবার 'বরদ' 'বরদেশ্বর'[১] ইত্যাদি সম্বোধনের মধ্যে দক্ষিণভারতীয় বরদেশ্বর বিষ্ণুর যোগাযোগ কল্পনা করে থাকেন। আবার আমরা তো জানি, বিষ্ণুর বহু অবতারের মধ্যে কৃষ্ণ ও নৃসিংহই দাক্ষিণাত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ভাগবতের গোপীপ্রসঙ্গে ভ্রমরগীতা কিংবা নৃসিংহ-উপাখ্যানে প্রহ্লাদচরিতের সমশ্রেণী-গত[২] ভাষাগাম্ভীর্য ও ভাবগৌরব অলংকারবহুল দৃঢ়পিনদ্ধ দ্রাবিড়ী

১ প্রহ্লাদও নৃসিংহকে সম্বোধন করেছিলেন 'বরদর্ষভ' বলে, দ্র° ৭।১০।৭।

২ প্রহ্লাদ নৃসিংহ-বন্দনায় বলেছেন :

"ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদানু।" ৭।৯।১৬

অর্থাৎ, সংসারচক্রে ভ্রামিত হয়ে যে-দুঃখ, তাতেই আমার ভয়। যেন গ্রাসকারী হিংস্র প্রাণীর মধ্যে পড়েছি বদ্ধদশায়। কবে তুমি প্রীত হয়ে অপবর্গস্বরূপ তোমার চরণকমলে আমাকে আহ্বান করবে?

আর ভ্রমরগীতার অন্তিম প্রার্থনায় গোপী বলেছিলেন : "ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু"
১০।৪৭।২১

কবে তিনি তাঁর অগুরুসুগন্ধ বাহু আমাদের মস্তকে স্থাপন করবেন?

রসিকজনের অভিমত অনুসারে "শ্রীনৃসিংহস্য বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্" [পূজারী গোস্বামী-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দম্-এর বালবোধিনী টীকা, প্রথম সর্গ, প্রথমগীত।৮] অর্থাৎ, নৃসিংহাবতারের বাৎসল্য-রসাধিষ্ঠাতৃত্ব বুঝতে হবে। আর গোপীরা তো মধুরে সুবিদিতা। এতৎসত্ত্বেও প্রহ্লাদের প্রার্থনাভঙ্গির সঙ্গে গোপীর অন্তিম আকূতির সুর মিলে যায়। "প্রীতোঽপবর্গ শরণং হ্বয়সে কদা নু" আর "ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু" ভক্তিসাধনার তথা প্রেমরসের বিচারে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রান্তের হলেও, প্রকাশশিল্প-গত বিচারে যেন অভিন্ন লেখনী-প্রসূত।

ভাস্কর্যের সঙ্গে যেন কোথায় একান্ত সমধর্মী। ভাগবতের এ-দুটি বিখ্যাত অংশ দাক্ষিণ্যাত্যে রচিত হওয়ার কল্পনা অবাস্তব না হতেও পারে। শেষ পর্যন্ত ভাগবতকে তাই আমরা ভাব ও ভাষা, ভক্তি ও অধ্যাত্মদর্শন সব দিক দিয়েই ভারতবর্ষের উত্তরবাহিনী দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-কৃতপুণ্যা-মহানদীর বহু শত বৎসর-সঞ্চিত পলিমৃত্তিকায় বহু দিন ধরে গঠিত বলেই মনে করি। স্বয়ং ভাগবতপুরুষ কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করলে এ-পুরাণের সর্বসমন্বয়ধর্মী এই বিশিষ্ট প্রবণতা অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠবে বলেও আমাদের বিশ্বাস।

ভাগবতে কৃষ্ণ

ভাগবতে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্: 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।[১] একই সঙ্গে তিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মা নামেও শব্দিত: 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'[২]। তিনিই পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,[৩] যোগ ও সাংখ্যের পরম-পুরুষ,[৪] আর সব অংশকলা মাত্র।[৫] অসংখ্য তাঁর অবতার[৬], অগণ্য তাঁর মহিমা[৭], বসুদেব-পুত্র বাসুদেবরূপে দেবকীগর্ভে যাদববংশে তাঁর আবির্ভাব। এই যাদববংশোদ্ভূত দেবকীপুত্র বাসুদেবেরই 'নরলীলা'র যে বৃত্তান্ত মেলে ভাগবতে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

জন্মের অব্যবহিতকাল পরেই বসুদেব তাঁকে কংসভয়ে মথুরা থেকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসেন গোকুলে নন্দগোপের গৃহে নন্দপত্নী সদ্যপ্রসূতা যশোদার ঘুমন্ত শয্যাপার্শ্বে। দৈব ইচ্ছায় যশোদা তার কিছু পূর্বেই একটি কন্যাসন্তান প্রসব করায় বসুদেবের পক্ষে নবজাতা কন্যাটির সঙ্গে স্বীয় নবজাত পুত্রটি বদল

১ ভা° ১।৩,২৮

২ "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভা° ১।২।১১

৩ "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥" ভা° ১০।১৪.৩২

৪ "নমো ···পুরুষায় পুরাণায় সাংখ্যযোগেশ্বরায় চ" । ভা° ৪।২৪।৪২

৫ "এতে চাংসকলাঃ পুংসঃ" । ভা° ১।৩।২৮

৬ "অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ" । ভা° ১,৩।২৬

৭ "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ" । ভা° ১০।১৪।৭

করা সহজ হয়েছিল। একানংশা বা যোগমায়ারূপে কথিতা সেই কন্যাকে নিজের প্রাণহন্ত্রী ভেবে কংস তাঁকে শিলাপটে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু 'দেবকীর অষ্টম গর্ভ কখনও কন্যা হতে পারে না' এ আশঙ্কা তার দৃঢ়মূল করে দিয়ে যায় দৈববাণী। কংসের আদেশে অতঃপর গোকুল-মথুরা অঞ্চলে ব্যাপক শিশুহত্যা শুরু হলো। কংস-প্রেরিত হয়েই পুতনাদি বাল-ঘাতিনী ও ঘাতকরা নন্দের গৃহে রক্ষিত শিশুপুত্রটিরও বিনাশসাধনে তৎপর হয়। বলা বাহুল্য, তাদের সে-দুশ্চেষ্টা তাদের নিজেদেরই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল মাত্র। নন্দগৃহে গোপনে রক্ষিত বসুদেবের অপর পত্নী রেবতীর পুত্র বলরামের সঙ্গে সহোদর-জ্ঞানে লালিত কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন সকল গো-গোপ-গোপীদের নয়নমণি। এদিকে গোকুলে ক্রমবর্ধমান নানা দুর্বিপাক দেখা দেওয়ায় নন্দ এইসময় অন্যান্য গোপগণসহ গোকুল থেকে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। গোকুলের শৈশবলীলা থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবনের কৈশোরলীলা পর্যন্ত কৃষ্ণ যে-যে স্মরণীয় ক্রীড়া করেছেন, তার মধ্যে বিভিন্ন কংসানুচর-বধ ছাড়াও বিখ্যাত হয়ে আছে ব্রহ্মমোহনলীলা ও গোবর্ধনধারণে ইন্দ্রদর্পচূর্ণনলীলা। সর্বোপরি রয়েছে রাস—একবার শরতে[১], আর একবার অম্বিকা-বনযাত্রার পরে বোধকরি বসন্তেই[২] হবে। ভারতবর্ষীয় কাব্যভাণ্ডারে ভাগবতের শারদরাস সকল শরৎকাব্যকথারসের অক্ষয় আশ্রয় হয়ে আছে। আর অম্বিকাবনযাত্রার শেষেই অজগরদমন তথা বিদ্যাধরকে মুক্তিদান। এরপর রাসান্তেই শঙ্খচূড়-বধ। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় তখন আসন্ন বিচ্ছেদের অন্ধকার নেমে আসছে।

১ "ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥" ১০।২৯।১

এই "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" শারদরাস ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে উনত্রিংশ থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ এই পাঁচটি অধ্যায়ে। এই অধ্যায়-পঞ্চক 'রাসপঞ্চাধ্যায়' নামে সুপরিচিত।

"কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্। মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥
জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্। তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্ছিতম্॥
গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্ছিতা নাবিদন্নৃপ। স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ"॥
১০।৩৪।২০-২৪

শিবরাত্রির পরে অনুষ্ঠিত এই রাস 'বাসন্তরাস' হওয়াই সম্ভব। তবে এ রাসে রাম-কৃষ্ণ দুজনকেই উপস্থিত দেখছি।

কংসপ্রেরিত হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন অক্রূর। মথুরায় মুষ্টিযুদ্ধের আসরে তিনি নিয়ে যেতে এসেছেন রাম-কৃষ্ণকে। ব্রজবধূদের অশ্রুজলে সিক্তপথে মিলিয়ে যায় কৃষ্ণের রথচক্রধূলি। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের পুনর্মিলনের প্রসঙ্গ ভাগবতে উল্লিখিত হয়েছে বহুদিন পরে কুরুক্ষেত্রে সূর্যের পূর্ণগ্রাস উপলক্ষ্যে তীর্থস্থানের বর্ণনা ব্যপদেশে। যাই হোক, ব্রজ পরিত্যাগ করলেও কৃষ্ণ তাঁর সখা গোপদের সঙ্গে অবশ্য মিলিত হয়েছিলেন অব্যবহিত কাল পরেই মথুরায়।

সেখানে কুবলয়পীড়কে দমন করে চাণূর-মুষ্টিককে বধ করে রামসহ কৃষ্ণ কেবল অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শনেই ক্ষান্ত থাকলেন না, সেইসঙ্গে দৈববাণীকে সফল করে পৃথুভার বর্ধনকারী স্বীয় মাতুল কংসকে কেশে আকর্ষণ করে হত্যাও করলেন। এরপর দেবকী-বসুদেবের বন্ধনমোচনে বহুকালপরে মাতাপিতার স্নেহালিঙ্গনের দৃশ্যে এ-কাহিনীর এক অপূর্ব রসমোক্ষ ঘটে। বস্তুত, শুধু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই যে তাঁর এই মাতুল-হনন, পরন্তু রাজ্যলোভে নয়, তা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসানোতেই প্রমাণিত হলো। অবশ্য পাশহস্তে তিনি নিজে রইলেন এ-সিংহাসনের নিরাপত্তা রক্ষায় নিরন্তর নিযুক্ত। এজন্য তাঁকে কালযবন বা জরাসন্ধের বিপুলতম বাহিনীর সঙ্গে একাধিকবার ভীষণ সমরে লিপ্তও হতে হয়েছে। জরাসন্ধের বিরাট সেনাদলকে সতেরো বার তিনি প্রতিহত করতে পারেন, আঠারো বারে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে প্রাণরক্ষা করতে হয়। সেই সময়ই তিনি তাঁর কূটনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে বোঝেন, রাজধানী হিসাবে মথুরা কতদূর অরক্ষিত। অতঃপর রাজধানী স্থানান্তরিত হলো সমুদ্রদুর্গ দ্বারকায়।

রাজ্যের নিরাপত্তারক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করে বাসুদেব এবার গৃহী-জীবনে মনোনিবেশ করেন। যজ্ঞভাগলিপ্সু অযোগ্য শৃগালের গ্রাস জয়-করে-আনা সিংহের মতোই বিক্রম প্রকাশ করে তিনি সমবেত রাজন্যবর্গের মাঝখান থেকে তাঁর প্রতি অনুরক্তা রুক্মিণী প্রমুখা রাজকন্যাদের উদ্ধার করে এনে বিবাহ করেন। এ-বিবাহে প্রদ্যুম্ন সাম্বের তুল্য বীর্যবান পুত্রসন্তান লাভও ঘটে। ইতোমধ্যে দ্বারকার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের ভাগ্য জড়িত হয়ে যাবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ যোগ দেন। সেখানে কৃষ্ণকে সভায় শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্র রূপে মনোনীত করার প্রশ্নে কুৎসিত কটূক্তি করতে থাকেন শিশুপাল। এই বৃথা কৃষ্ণদূষণের দণ্ডস্বরূপ বাসুদেব তাঁকে বধ

করেন। এর পরবর্তী ঘটনা যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্য হারানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে। আমরা জানি, কুন্তী ছিলেন বাসুদেবের ভগিনী। সুতরাং জন্মসূত্রে বাসুদেব পাণ্ডবদের পরমাত্মীয়ই বটেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করে প্রকৃত প্রস্তাবে পাণ্ডবপক্ষের নেতৃত্বই করেছিলেন। বলরাম নিরপেক্ষ থেকে এসময় ভারত-তীর্থ পরিভ্রমণে বহির্গত হন। যখন ফেরেন, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে এসে শুধু ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ হয়েছে। বলরাম এঁদের নিবৃত্ত করতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করলে সেই অবসরে কৃষ্ণের ইংগিতে ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন। রণক্ষেত্রের ধূলিঝঞ্ঝার উপশমে কৃষ্ণ এবার রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে দ্বারকা প্রত্যাবর্তনের সম্মতি চান। যুধিষ্ঠিরাদির বিরহদুঃখ স্বীকার করেই ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগ করলেন কৃষ্ণ। দ্বারকা তাঁকে গভীর আনন্দে পরমোৎসবে গ্রহণ করে।

এবার দ্বারকাতে কালসন্ধ্যা নেমে আসছে। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের যুযুধান ক্ষত্রিয়বংশ প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। বৃথা-পানরত তথা প্রচণ্ড দম্ভী যাদববংশ-ধ্বংসেরও সময় সমাগত। ঋষিশাপের ছলে কৃষ্ণ পরস্পরের দ্বারাই সে কাজ সমাধা করে জরা নামক ব্যাধের তীরে পদবিদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় পৃথিবী ত্যাগ করলেন। বলরাম এর পূর্বেই যোগাসনে দেহবিসর্জন দিয়েছেন। এবার সমুদ্র এসে গ্রাস করে নিল যাদব-বংশের কীর্তিবিজড়িত রাজধানী দ্বারাবতী। "কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে"[১]—এইভাবেই কৃষ্ণ-সূর্যের অস্তগমনে দ্বাপরের শেষে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে প্রবেশ করে নৃপতির বেশধারী কলি। এই কলির ক্রূর প্রভাব থেকে মুক্ত হবার পথস্বরূপ ভাগবতধর্ম কৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পূর্বেই স্বীয় প্রিয় অনুচর উদ্ধবকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। ভাগবতধর্মকে আশ্রয় করে কলিতে কৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ 'পুরাণ-সূর্য' ভাগবতের অভ্যুদয়। ভগবৎ-প্রতিপাদকত্ব আছে যার, সেই ভাগবত-পুরাণের 'আশ্রয় পদার্থ' কৃষ্ণই তাই এখানে কূটস্থ সত্য। ব্রহ্মাদি দেবগণের ভাষায়:

> "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
> সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥[২]

১ ভা° ৩।২।৭

২ ভা° ১০।২।২৬। শ্লোকটির নিম্নরূপ পাঠান্তরও গ্রাহ্য:
"সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। সত্যমৃতসত্যনেত্রং"

অর্থাৎ, সত্য তাঁর সংকল্প, তিনি সত্যপরায়ণ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ত্রিকালেই সত্য তিনি। কেননা পঞ্চভূতের উৎপত্তিস্থল রূপে তাঁর লয় নেই। সত্যবাক্য ও সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তক সেই সত্যস্বরূপেরই শরণ নিয়েছেন দেবতারা।

ভাগবতের এই সর্বোপরি সত্যস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তচিত্তের ভক্তিরঞ্জিত বিগ্রহ মাত্র, নাকি ঐতিহাসিক ; এক, না বহু—অর্থাৎ বৃন্দাবনের গোপালকৃষ্ণ তথা কিশোরকৃষ্ণই কুরুক্ষেত্রের বাসুদেব-কৃষ্ণ কিনা সে-বিষয়ে আধুনিক কালের গবেষকগণের মধ্যে মতবিতণ্ডার সীমা নেই। ভাগবতীয় কৃষ্ণের পূর্ণ-স্বরূপ নির্ণয়ে এ-বিতর্কের ব্যূহে প্রবেশ না করেও উপায় নেই বলে আমরা আমাদের পূর্বসূরী-বৃন্দের পরস্পরবিরোধী মতবাদের আংশিক সংকলনে উদ্যোগী হলাম।

'কৃষ্ণ' নামে আদৌ কোনো যাদববীরের অস্তিত্ব ছিল, এটি অনেকেই মেনে নিতে রাজী নন : বিশেষত পাশ্চাত্য আলোচকদের মধ্যে Barth কৃষ্ণকে জনপ্রিয় সূর্যদেবতা মাত্র বলেছেন, Hopkins বলেছেন পাণ্ডবদের ইষ্টদেবতা, Keith বলেছেন উদ্ভিদ দেবতা। বিষ্ণুদেবতার সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়েই নাকি এই 'কাল্পনিক' দেবতা বৈষ্ণবধর্মের প্রধানপুরুষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী', কৌষীতকিব্রাহ্মণ তথা ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রামাণ্যবলে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরই অন্যতম "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্"[১] সূত্রে 'বাসুদেবক' ও 'অর্জুনক' শব্দ দুটি পাওয়া যায়, যাদের অর্থ যথাক্রমে 'বাসুদেবের উপাসক' ও 'অর্জুনের উপাসক'। সুতরাং বলতে হয়, পাণিনির সূত্র প্রণয়নের কালে, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম একাদশ শতকেই কৃষ্ণার্জুন দেবতা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত অনুসারে বাসুদেব-কৃষ্ণের কাল তাহলে কত? কৃষ্ণচরিত্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদে 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল' প্রসঙ্গে তিনি রাজতরঙ্গিণী-বিষ্ণুপুরাণাদির জ্যোতিষ-প্রমাণ-

ইত্যাদি। তাৎপর্য, তিনি "সত্যাস্থ," অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ। শ্রীধরও তাই বলেন, "সত্যাস্থ যোনিমিতি। সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্‌তেজাংসি, ত্যচ্ছব্দেন বায়্বাকাশৌ এবং সচ্চ তচ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকম্"।

১ অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৮

বলে দেখাতে চান, ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ছিল মহাভারত-যুদ্ধের কাল। অর্থাৎ কৃষ্ণের কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ-চতুর্দশ শতাব্দী।

বৈষ্ণব ধর্মেতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক ড° হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও[১] ঘটজাতক-উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান, খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দে তো বটেই, বোধকরি তারও পূর্বে বাসুদেব-কৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। সাত্বতকুলে জন্ম তাঁর, ঘোর-আঙ্গিরসের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা, পরে ভারতযুদ্ধে মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণ। ভগবদ্গীতায় আঙ্গিরসের কাছে অধীত ব্রহ্মবিদ্যা-আত্মতত্ত্বেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেন ড° রায়চৌধুরী।

বাসুদেব-কৃষ্ণের কাল নিয়ে অবশ্য সকলেই একমত নন। যেমন, কেউ কেউ তাঁকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের জাতক বলতে চান। এঁরা জানান, জৈন শাস্ত্রসমূহে বাসুদেব-কৃষ্ণকে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির সমকালীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অরিষ্টনেমি ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের তীর্থঙ্কর। কাজেই বাসুদেব-কৃষ্ণের কালও একই শতকে নির্দিষ্ট করতে হয়।[২]

আমরা কিন্তু বাসুদেব-কৃষ্ণের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক বলে আদৌ মনে করি না। জৈনশাস্ত্রে যে কৃষ্ণকে অরিষ্টনেমির সমসাময়িক বলা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। আমরা জানি, জৈনধর্মে সর্বাদি তীর্থঙ্কর বা অর্হৎ ছিলেন ঋষভদেব—ভাগবতে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণিত। ভাগবত থেকে আরো জানা যায়, ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত যজ্ঞের নব-ব্যবস্থাপক ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতার পরিবর্তে তিনি যে বাসুদেবকেই সর্বদেবদেব বলে জেনে আহুতি দিতেন[৩], সে তো আমরা পূর্বেই বলেছি। এই 'বাসুদেব' কি বাসুদেব-কৃষ্ণ? এখানে হয়তো অনেকেই ঘোরতর আপত্তি তুলে বলবেন, বসুদেব-পুত্র বাসুদেব নন, "সর্বভূতাধিবাসস্তু

১ Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect-গ্রন্থপ্রণেতা

২ Dr. Dinesh Chandra Sarkar, 'Early History of Vaisnavism', The Cultural Heritage of India, Vol. IV. p. 119

৩ "সম্প্রচরৎসু নানাযোগেষু বিরচিতাঙ্গ ক্রিয়েষপূর্বং যৎ তৎ ক্রিয়াফলং ধর্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎ কর্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্য-মৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্যুভির্গৃহ্যমাণেষু স যজমানো যজ্ঞভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ" ভা° ৫।৭।৬

বাসুদেবস্ততঃ শ্রুতঃ" সর্বভূতের অধিবাস যিনি, সেই বাসুদেব, এতদর্থেই স্বয়ং সর্বব্যাপী ব্রহ্মই ছিলেন ভরত-কৃত যজ্ঞের অধিদেবতা। উত্তরে বলা যেতে পারে, বেদে 'বাসুদেব' নামের কোনোই উল্লেখ নেই, এর প্রথম উল্লেখ পাই উপনিষদেই।[১] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বসুদেব-পুত্র ভগবান্-রূপে স্বীকৃতি লাভের পরেই কি 'বাসুদেব' শব্দও ব্রহ্মবাচী ব্যাখ্যা লাভ করে? বিশেষত, পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে পাণিনির ৪।৩।৯৮-৯৯ সূত্রব্যাখ্যায় কৃষ্ণ-বাসুদেবকেই পরমপূজ্য বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি এক ক্ষত্রিয় বাসুদেবের সঙ্গে এই পরম-বন্দনীয় কৃষ্ণ-বাসুদেবের ভেদরেখাও টেনেছেন। প্রথমোক্ত জন 'পুণ্ড্রক' বাসুদেব নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বাসুদেব-কৃষ্ণের নাম-রূপ-চিহ্নাদির অক্ষম অনুকরণের জন্য যেভাবে পুরাণে ধিকৃত হয়েছেন,[২] তাতে প্রাচীন ভারতবর্ষে বাসুদেব-কৃষ্ণের অদ্বিতীয় মহিমাই ব্যঞ্জিত হয়। ভরতের পক্ষে এর আরাধনা করা নিতান্ত অস্বাভাবিক না হতেও পারে। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের কাল বুদ্ধের সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে হলে সর্বাদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র ভরতের কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব দশম-নবমের এদিকে তো নয়ই। কাজেই বাসুদেব-কৃষ্ণের কালও প্রাচীনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই যে ঐতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ্ণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, এঁর জন্ম যদু বা যাদববংশে। মহারাজ যযাতির চারটি অবাধ্য পুত্রের মধ্যে তুর্বসুর সঙ্গে যদুর নামও ঋগ্বেদে উল্লিখিত।[৩] যদুরই বংশ যাদববংশ নামে সুখ্যাত।[৪] ভাগবতে যদুবংশের যে-ক্রমপঞ্জী পাই তা সত্য হলে বলতে হয়, মহারাজ যযাতি থেকে বাসুদেব-কৃষ্ণ পঁয়ত্রিশ পুরুষ। ভাগবতের অনুসরণে যদুবংশ-লতিকা এখানে প্রস্তুত করে দেওয়া হল। এতে কেবল প্রধান প্রধান পুরুষের নামই উল্লিখিত হয়েছে।

১ দ্র° তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০ম অধ্যায়।

২ ভাগবতে এই 'পুণ্ড্রক' বাসুদেবের বিবরণই পাই ১০।৬৬ অধ্যায়ে। এঁকে বলা যেতে পারে 'নকল' বাসুদেব। কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্মুখসমরে এঁর যথোচিত দণ্ডবিধান করেছিলেন।

৩ ঋ° ১০।৪৯।৮

৪ হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে মথুরানিবাসী এক ইক্ষ্বাকুবংশীয় যদুকে যাদববংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লিখিত দেখি। তবে যদুবংশ যযাতিপুত্রের বংশ—একথা অপরাপর পুরাণাদি ছাড়াও হরিবংশপর্বেও আছে।

যদুবংশ
যযাতি
যদু
সহস্রজিৎ
শতজিৎ
হৈহয়
ধর্ম
নেত্র
কুন্তি
মোহঞ্জি
মহিষ্মান্
ভদ্রসেন
ধনক
কৃতবীর্য
কার্তবীর্যার্জুন
জয়ধ্বজ
তালজঙ্ঘ
বীতিহোত্র
মধু
বৃষ্ণি
ক্রোষ্টু
বিদর্ভ
কুশ
ক্রথ
রোমপাদ
কুন্তি
বৃষ্ণি
নির্বৃতি
দশার্হ
ব্যোম
জীমূত
বিকৃতি
ভীমরথ
নবরথ
দশরথ
শকুনি
করম্ভি
দেবরাত
দেবক্ষত্র
কুরুবংশ
বভ্রু
কৃতি
উশিক
চেদি
দমঘোষ
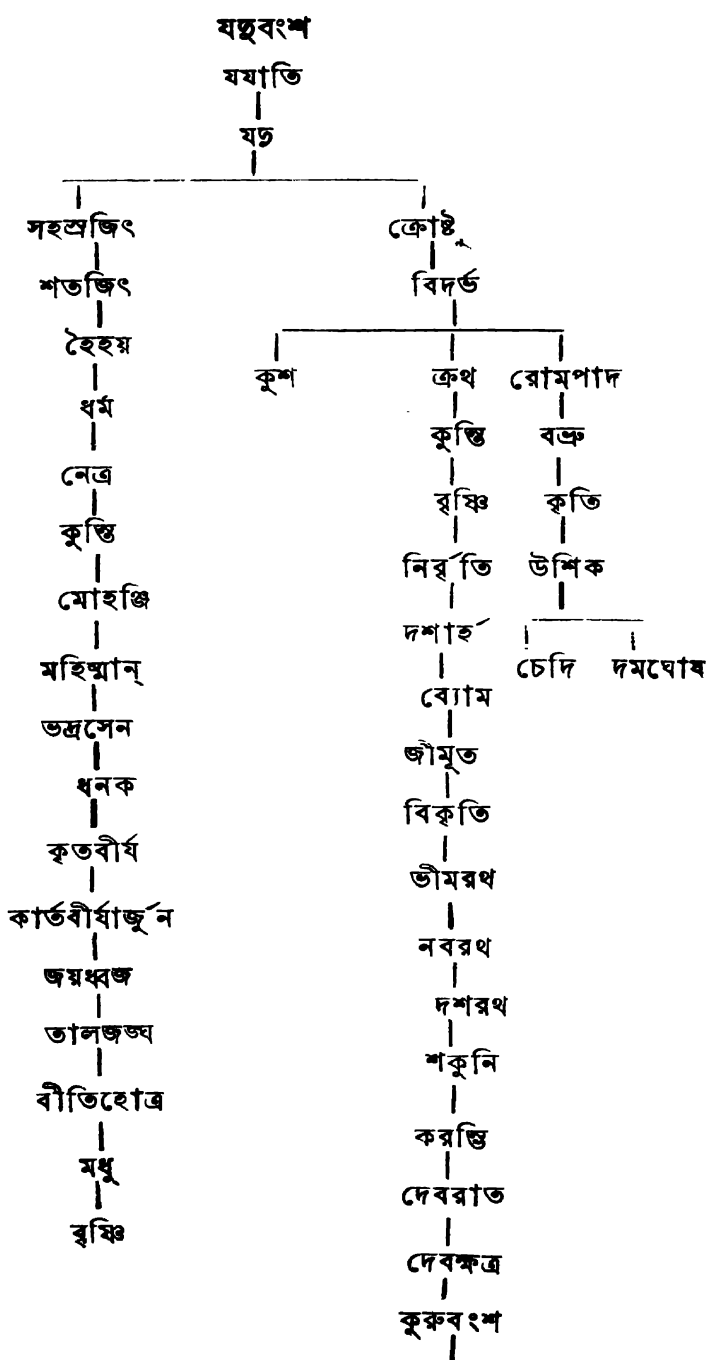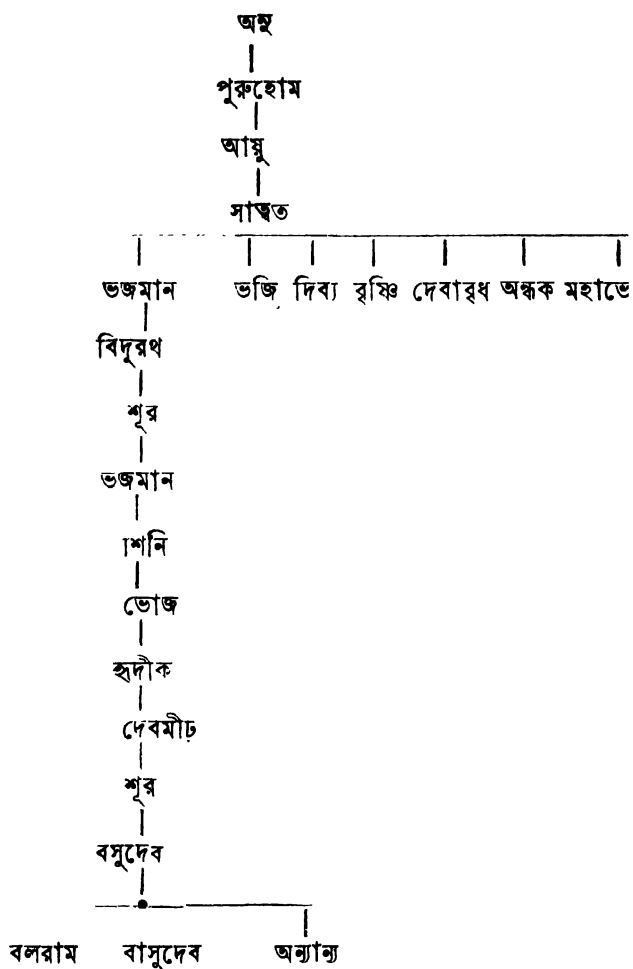
অতি প্রাচীনকাল থেকেই এঁরা মথুরানিবাসী। এঁদেরই অন্যতম গোষ্ঠী-ভুক্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ যাদব-নরপতি সাত্বতের সন্তান ছিলেন : আবার এ-বংশজাত রাজা বীতিহোত্রের পুত্র মধুও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ফলে একই বংশ কখনো যাদব, কখনো বৃষ্ণি বা বার্ষ্ণেয়, কখনো সাত্বত, আবার কখনো-বা মধু বা মাধব বংশ নামেও সুপ্রসিদ্ধ। শিশুপাল তাঁর কৃষ্ণদূষণে এ-বংশকে 'যযাতি-নিন্দিত' বললেও প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়সমাজে এঁদের বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়েছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে ও জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণে বৃষ্ণিবংশ উল্লিখিত। পাণিনির·

অষ্টাধ্যায়ীতেও বৃষ্ণি-অন্ধকের উল্লেখ লক্ষণীয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বৃষ্ণিজনগণের সংঘ বা প্রজাতান্ত্রিক পৌরসংস্থার কথা জানা যায়। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বলে স্বীকৃত গ্রীক ভ্রামণিক মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতবর্ষের 'সৌরসেনয়' নামে এক জাতিকে 'মেথোরা' ও 'ক্লেসোবোরা' নগর দুটিতে বাস করতে শোনা যায়। অদূরবর্তী বৃহৎ নদীটিকে 'জেবারেস' নামে উল্লিখিত হতেও শুনি। আধুনিক ঐতিহাসিক-গণের অভিমত অনুসারে এ হলো যমুনা-তীরবর্তী মথুরা নগরীতে শূরসেন জাতির বাসের কথা। 'শূরসেন' জাতি যাদববংশেরই অন্তর্গত শাখা। তবে 'ক্লেসোবোরা' কৃষ্ণপুর, না গোকুল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। ঘটজাতকেও এই যাদবশাসকগোষ্ঠীর কথাই বলা হয়েছে বলে বিশ্বাস। আর যদুবংশেরই শ্রেষ্ঠ সন্তান বাসুদেবই কুরুক্ষেত্রের মহানায়ক তা তো মহাভারতে ও ভগবদ্-গীতায় অস্পষ্ট থাকেনি। কিন্তু ইনিই কি গোপালকৃষ্ণ তথা কিশোরকৃষ্ণ? বস্তুত আধুনিক গবেষকগণের দৃষ্টিতে এটিই কৃষ্ণজীবনের জটিলতম ব্যাসকূট। আমরা তারই একটু আভাস তুলে ধরতে চাই। সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব সমাধানের ইংগিতও বাদ পড়বে না।

অনেকের মতে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজলীলাদির প্রচার বাসুদেব-কৃষ্ণে বহু পরবর্তীকালের যোজনা ছাড়া কিছু নয়। অন্তত খ্রীষ্টপূর্বকালের তো নয়ই। যাঁরা ব্রজলীলাকে পরবর্তীকালের যোজনা বলে মনে করেন, তাঁদের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন মতের সাক্ষাৎ মিলবে। যেমন একদল গবেষক মনে করেন, চতুর্থ শতকের পল্লববংশীয় রাজা বিষ্ণুগোপের নামেই কাহিনীগুলির জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। তৃতীয়-চতুর্থ শতকের সাহিত্যও এ-জনপ্রিয়তার সহায়তা করেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী বলে স্বীকৃত। তাঁর বালচরিত-গ্রন্থে দামোদর-সঙ্কর্ষণকে বৃষ্ণিকুমার বলা হয়েছে। এ ছাড়াও লক্ষণীয় শৌরসেনী-মাতা কংসের উল্লেখ, তৎসহ যাদবী-মাতা বাসুদেবেরও নামোচ্চারণ। দামোদরের পালক পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার প্রসঙ্গও বর্ণিত হয়েছে। ভাসে রাসও[১] স্মরণীয়। গুপ্ত আমলের মহাকবি কালিদাসেও আমরা গোপবেশধারী বিষ্ণুর[২] উল্লেখ পাই।

১ বালচরিত নাটক, ৩য় অঙ্ক

২ "বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ" পূর্বমেঘ। ১৫

হরিবংশে ও পুরাণে এই গোপবেশধারী বিষ্ণুরই নানা লীলা বিশেষ পল্লবিত হলো বলে একশ্রেণীর সংযোজনবাদীর ঘোষণা।

কৃষ্ণের বালগোপাললীলা খ্রীষ্টীয় শতকের যোজনা বলেও আর একদল গবেষক পল্লববংশীয় বিষ্ণুগোপের ওপরই দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁরা বলে বসেন, বাসুদেব-কৃষ্ণের গোপালরূপ খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আনুকূল্যেই ঘটেছে। অর্থাৎ. খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীর জাতি ভারতে প্রবেশ করে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসকবর্গের সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের নাম-সাদৃশ্যে ও অন্যান্য কারণে শিশু-খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক-কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। জার্মান পণ্ডিত Weber, ভারতীয় গবেষক ভাণ্ডারকর প্রমুখ এ-মতের বিশেষ পরিপোষক। ভাণ্ডারকর আবার এও বলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবধূদের বিতর্কিত সম্পর্ক আভীর জাতির তৎকালীন শিথিল সমাজব্যবস্থারই প্রতিরূপ। এ-মতের পোষকদের জ্ঞানবিশ্বাসে, শিব-দেবতার সঙ্গে কোচবধূর সম্পর্ক-স্থাপন যেমন হিন্দু-ধর্মান্তরিত কোচগোত্রীয়-দের প্রক্ষেপের কল্যাণে ঘটেছে, কৃষ্ণের সঙ্গে গোপবধূর সম্বন্ধস্থাপনও তেমনি আভীর জাতির কৃপায়। ঐতিহাসিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গোপালকৃষ্ণের ধারণা বাহিরাগত বলে মনে করেন। দেবগড়ের দশাবতার বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের একটি প্রস্তর-ফলকে খোদিত কৃষ্ণ-বলরাম ক্রোড়ে নন্দযশোদার বেশভূষায় বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করে তাই তাঁর বক্তব্য :

"হইতে পারে যে শিল্পী কৃষ্ণের পালক-পিতা ও পালিকা-মাতা বৈদেশিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন।"[১]

আমাদের অবশ্য মনে হয়, বেশভূষায় বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কিছুটা বিভ্রান্তিকর। কেননা, ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে বিভিন্ন শিল্পমূর্তি রচনায় দেশবিদেশের নানা শিল্পীর হাতের ছোঁয়া লেগেছে। তাই নিতান্ত ভারতীয় জীবনেরই শিল্পরূপে কোথাও কোথাও বৈদেশিক প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।[২] আর কৃষ্ণজীবনে খ্রীষ্টজীবনের কিছুটা আদলে

১ পঞ্চোপাসনা, পৃ° ৪৮,

২ প্রমাণস্বরূপ অজন্তার ১৬, ১৭, ১ ও ২ নং গুহাচিত্রের উল্লেখ করা যায়। 'ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস' গ্রন্থে অশোক মিত্র উক্ত গুহাচিত্রে বোধিসত্ত্বের দেহরীতিতে তথা পোষাকাদিতে চীনা'ও

পরবর্তীকালে কল্পিত হয়েছে—এ-মতবাদীদের বিরুদ্ধে ড° রায়চৌধুরীর বলিষ্ঠ বক্তব্যই তো উপস্থিত আছে। ভাণ্ডারকরের গোপালকৃষ্ণ সম্বন্ধে মতটি তিনি ঋগ্বেদীয় প্রমাণযোগে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বাসুদেব-কৃষ্ণের গোপাল ও কিশোর রূপ-কল্পনার বীজ ঋগ্বেদে আদিত্য বিষ্ণুর কোনো কোনো বিশেষণের মধ্যেই নিহিত আছে। এ বিষয়ে আমরা কিছু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করবো, এখানে তাই শুধু এটুকুই জেনে রাখতে হবে, এঁর মতে, ভাগবতধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সত্তা বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটলেই বিষ্ণু-সম্পর্কিত উপাধিসমূহ বিশদাকারে কৃষ্ণেও প্রযুক্ত হয়েছিল। ফলত, কিংবদন্তী রচয়িতাগণ এইসব উপাধির ওপর ভিত্তি করে নানারূপ কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করারও সুযোগ পেয়েছেন।

লক্ষণীয়, ড° রায়চৌধুরী গোপাল-কৃষ্ণের ধারণাটি বহিরাগত বলতে চান না বটে কিন্তু তাঁর মতেও এ হলো ঐতিহাসিক কৃষ্ণে আরোপিত মাত্র, পরন্তু বাস্তব সত্য নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য. শুধু গোপালকৃষ্ণেরই নয়, কিশোরকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলাও যে অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে ভাবিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমতই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। ইনি দেখান, খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বেই কতকগুলি জ্যোতিষতত্ত্বই কেমন করে কবি-কল্পনার আশ্রয়ে রূপকধর্মী হয়ে উঠেছে—পরবর্তী কালের মানুষ আদিকালের এই জ্যোতিষতত্ত্ব ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে গেলে রূপকই ধরেছে সত্যরূপ। বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, কৃষ্ণ হলেন সূর্য, আর গোপী—তারকা। কেননা গো-শব্দের এক অর্থ রশ্মি। এইভাবেই প্রমাণ করা যায়,

"……গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন।"[১]

অর্থাৎ, এঁর মতেও গোপীকথার উৎস ভারতবর্ষেই তবে তা জ্যোতিষ-তত্ত্বের পল্লবিত কল্পিত রূপ মাত্র।

পারস্য দেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তার মানেই নয়, বুদ্ধদেবকে চীন দেশীয় বা পারস্য-সম্ভূত বুঝতে হবে।

১ ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৪০। [ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থ থেকে পুনরুদ্ধৃত]

আমাদেরও বিশ্বাস, গোপালকৃষ্ণ তথা কিশোরকৃষ্ণের লীলাকথা মূলে ভারতবর্ষেরই মৃত্তিকাসম্ভব, পুরোটাই বহিরাগত নয়। কিন্তু তার উৎস একমাত্র বেদে বা জ্যোতিষেই অনুসন্ধানযোগ্য, এ সিদ্ধান্তেও আমাদের সবটুকু আস্থা নেই। আমরা মনে করি, ঐতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ্ণের জীবনেই বৃন্দাবনলীলার অন্তত কিছুটারও অস্তিত্ব ছিল। তারই সূত্রপথে পূর্ববর্তী কালের ঋগ্বেদীয় গোপ-গোলোক ধারণা এবং পরবর্তীকালের আভীরাদি জাতির ইষ্টদেবতার রূপভাবনা মিশে গিয়ে বৃন্দাবনলীলার নব নব পর্যায় রচিত হয়ে থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ আমরা কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। এরই উপক্রমণিকা পর্বে পূর্বসূরী-কৃত দু' একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন, খ্রীষ্টপূর্বকালে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোনো উল্লেখ পাই না—পণ্ডিতবর্গের এ-মতবিশ্বাসের মূলেই আমাদের সর্বাদি আঘাত গিয়ে পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্রসহ এই মতবাদীরা যে শিশুপালের কৃষ্ণদূষণকে মহাভারতে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলে ঘোষণা ক'রে উক্ত কৃষ্ণদূষণে উল্লিখিত বাসুদেবের বাল্যজীবনকে একেবারে উপেক্ষা করে যেতে চান, তা সর্বৈব যুক্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়ে যায় পুণা প্রাচ্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণে। যেহেতু নির্ভরযোগ্য সকল পুঁথিতেই এ অংশ পাওয়া যায়, অতএব শিশুপাল-কথিত পূতনাবধ যমলার্জুনভঙ্গ গোবর্ধন-ধারণাদি বাসুদেব কৃষ্ণের বাল্যজীবনেরই অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করতে হয়।

আর ভাণ্ডারকর যে মহাভারতে গোপীদের উল্লেখ মাত্রকেই প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, সে সম্বন্ধেও ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুসরণে বলা যায়:

"মহাভারতের পুণা-সংস্করণে আছে যে, সুভদ্রা যখন বিবাহের পর প্রথম স্বামিগৃহে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গোপালিকা-বেশে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল···গোপীদের বেশভূষা কৃষ্ণের ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই এরূপ বেশ সুভদ্রাকে পরানো হইয়াছিল।"[১]

শুধু মহাভারতেই নয়, ভগবদ্গীতাতেও কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ইংগিত আছে। গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে সম্বোধন করেছিলেন 'কেশিনিসূদন'[২]

১ 'কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক পুনর্বিচার',
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৭২, সংখ্যা ১-৪, ১৩৭২

২ "সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্। ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥"
গী' ১৮। ১

বলে। পুরাণমতে কেশিবধই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছে।

পাশ্চাত্যপণ্ডিত কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের বলে অনুমিত ভগবদ্গীতার পর আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পাতঞ্জল মহাভাষ্যেরও উল্লেখ করা যায়। যে-গবেষকগণ মনে করেন, খ্রীষ্টজীবনের আদলেই কৃষ্ণজীবনে কংসসংক্রান্ত ঘটনা পরবর্তীকালে পরিকল্পিত[১] হয়েছে মাত্র, তাঁদের অভিমত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে যায় পাতঞ্জল মহাভাষ্যের সাক্ষ্যে। এখানে আমরা কৃষ্ণকে স্বীয় মাতুল কংসের হন্তারূপেই উপস্থাপিত দেখছি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সংশয়বাদীর সংশয় ঘোচে না। এঁদের বক্তব্য, কৃষ্ণের পূতনাদি বধ

---

১ খ্রীষ্টের প্রভাব কৃষ্ণে পড়েছে, না কৃষ্ণের প্রভাব খ্রীষ্টে, সে সম্বন্ধে Weber-প্রমুখের অভিমত যেমন একটি চরমকোটিতে অবস্থান করছে, তেমনি আর এক চরম কোটিতে বিরাজ করছে কোনো কোনো ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবের বিশ্বাস। উদাহরণত, পূর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর বিদ্যাবিনোদ, ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য : "শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় অবস্থানকালে দুইবার এবং তাঁহার তিরোভাবের অর্ধশতাব্দী মধ্যে আর একবার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অভিযান সমগ্র জম্বুদ্বীপ বা এশিয়া মহাদেশ জয় করিয়াছিল।...তৃতীয় অভিযানের নেতা পরীক্ষিৎ [ভা° ১।১৬।১৪-১৫]।...শ্রীভাগবত বর্ণিত মত রাজা পরীক্ষিৎ কেতুমাল বর্ষে যে কৃষ্ণলীলা গান শুনিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ঐ বর্ষে অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত (১) ইহুদী বাইবেল (old Testament). (২) খ্রীষ্টিয়ান বাইবেল (New Testament) এবং আরবদেশে অবতীর্ণ (৩) আল্ কোর্ আন্ গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই রহিয়াছে।.. ইহুদী বাইবেলের অন্তর্গত (Songs of Solomon) "সলোমনের সংগীত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

> " I am black but comely O Ye,
> daughters of Jerusalem." Ch. 1. 5.
> " Look not upon me because I am black." Ch. 1, 6.

এইস্থানে প্রশ্ন হয়, জেরুসালেমের এই কৃষ্ণসুন্দর পুরুষটি কে ?" [শ্রীনামভাগবতম্, ১ম খণ্ড, প্রস্তাবনা, ৩৩-৩৫] বলা বাহুল্য, লেখক এখানে " সেই পুরাতন ভুবনমোহন কৃষ্ণ"কেই আবিষ্কার করেছেন!

উল্লেখযোগ্য, উপরি-উক্ত অভিমতটিকে বৈষ্ণব ভক্তসমাজের স্বকপোলকল্পনা বলে সহজেই অগ্রাহ্য করা যেত, যদি-না বিষয়টি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কোনো কোনো ঐতিহাসিকেরও সমর্থন লাভ করতো। ত্রয়ী মহাকাব্যের পরিশিষ্টে নবীনচন্দ্র সেন,হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শে যে-টীকা যোজনা করেছিলেন, তাতেই টডের 'রাজস্থান' থেকে গ্রীক ঐতিহাসিক Diodorus-এর একটি উক্তি তুলে ধরে বলা হয়েছে, হারকিউলিস 'হরিকুলেশ' বলরাম ছাড়া আর কেউ নন। মথুরানিবাসী নাগজাতির কয়েক জন অনুচর সহ তিনি গ্রীসে প্রবেশ করেন। এদিকে মহাভারতেও দেখছি, পাণ্ডবরাও যদুকুলের 'কুকুর' শাখাসহ "লোহিত্যসাগরের কূলে" ও "লবণসমুদ্রের উত্তরতীরে" গমন করলেন। প্রাচ্য-প্রতীচ্য একাধিক ঐতিহাসিকের প্রতিধ্বনি করে অতঃপর নবীনচন্দ্রের ঘোষণা :

মহাভারতের পুণা সংস্করণে পাওয়ার ফলে এ-সম্বন্ধে আর কোনো জিজ্ঞাসা ওঠে না বটে, কিন্তু বলরামের ধেনুকাসুর বধাদির কথা তো খ্রীষ্টপূর্ব কালের রচনায় মেলে না। কাজেই এ-লীলা খ্রীষ্টীয় যুগের যোজনা বলতেই হয়।

এ-বিষয়ে আমরা আমাদের একটি অনুমানকে বিদগ্ধজনের প্রমাণাপেক্ষায় তুলে ধরছি। বেসনগর ও তক্ষশিলায় প্রাপ্ত কয়েকটি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের প্রত্ন-নিদর্শনে গরুড়, তালপত্র ও মকরকে যথাক্রমে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নের প্রতীকরূপে পাই। এর মধ্যে গরুড় প্রতীকটি তো বাসুদেবের সঙ্গে বিষ্ণু-দেবতার যোগকেই প্রমাণীকৃত করছে, যেমন মকরটি সমন্বয় সাধন করছে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মকরকেতন মদনের। কিন্তু তালপত্রের সঙ্গে বলরামের যোগাযোগের সংগতিসূত্রটি কি, এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক। আমরা জানি. একদা ক্ষুধার্ত গোপবালকদের প্রতি সদয় হয়ে বৃন্দাবনের এক বিরাট তালবনকে বলরাম ধেনুকাসুরের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দ্বারকালীলায় যেমন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীকে হলে আকর্ষণ করা বলরামের সুখ্যাত কীর্তি, বৃন্দাবনলীলায় তেমনি ধেনুকাসুর বধ। পূর্বোক্ত প্রত্ননিদর্শনে বলরামের তালপত্র প্রতীকটি কি এই শেষোক্ত লীলারই ইংগিত? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাসুদেবের উদ্দেশে যেমন গরুড়ধ্বজ, বলরামের উদ্দেশে তেমনি তালধ্বজ উচ্ছ্রিত করা ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাগবতগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। মথুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত কুষাণযুগের কয়েকটি নিদর্শনে আবার গো-গোপ পরিবৃত কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণাদি লীলাও উৎকীর্ণ দেখি। খ্রীষ্টীয় শতকের একেবারে গোড়ার দিকেই রামকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা যে কী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, উপরি-উক্ত প্রত্ননিদর্শনে তাই প্রমাণিত।

বস্তুত, কি সাহিত্যগত, কি প্রত্নতাত্ত্বিক, উভয়বিধ নিদর্শন থেকেই এটুকু অনুমান করা বোধ করি ভুল হবে না, বৃন্দাবনলীলা ঐতিহাসিক বাসুদেব

"...গ্রীক ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি পূর্বদিক হইতে জলপথে হিরাক্লিদি ও হারকিউলিস (হরিকুলেশ) গ্রীসে উপনীত হইতেছেন; এবং ইহুদি ইতিহাস খুলিলে দেখিতেছি স্থলপথে একদল ঈশ্বরানুগৃহীত বংশ পূর্বদিক হইতে আসিয়া ঈশ্বর আদেশে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশান্বেষণ করিতেছেন। "লোহিতসাগরের" পূর্বতীরে মহম্মদের লীলাভূমি আরবদেশ, এবং "লবণ সমুদ্রের" বা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে খ্রীষ্টের লীলাভূমি জুদিয়া। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণে ও অর্থে আশ্চর্য সাদৃশ্য! খ্রীষ্ট জন্মিবেন, তাহা ভারতীয় অঘোরী সন্ন্যাসীর মত পূর্বদিক হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ পূর্বে বলিয়াছিলেন, এবং তিনি যে জন্মিয়াছেন, তাহাও পূর্ব দিক হইতে জ্ঞানীরা গিয়া প্রচার করেন।"

নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩২১, ব'সা'প'

কৃষ্ণের তথা সঙ্কর্ষণের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল। মহাভারত ভগবদ্গীতা, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থসমূহ শুধু প্রক্ষেপ আর পরবর্তী যোজনার কল্যাণেই বিরাট এক ফাঁকির ওপর কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার এতবড়ো ইমারত গড়ে তুলেছে, এরূপ কল্পনাকে আমরা খুব পরিণত কল্পনা বলে মনে করি না। তাই 'ব্রজের কৃষ্ণ' ও 'মহাভারতের কৃষ্ণ'কে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাও আমাদের দৃষ্টিতে নিরর্থক। ভাগবতেও দেখি, যশোদার স্তনন্ধয় গোপালই ভগবদ্গীতার উদ্গাতা পাণ্ডবসখা বাসুদেব—অর্থাৎ, রাসে অন্তর্ধানকালে বৃন্দাবনের অটবীতে যে-দুটি পদ আহত হবে ভেবে শঙ্কিতা হয়েছিলেন গোপীরা, সে দুটি পদই একদিন কুরুক্ষেত্রের মহাহবে হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে কৃষ্ণোপাসনার সেই ভাগবত-উচ্চারিত মন্ত্র মনে পড়ে :

হে শ্রীকৃষ্ণ, হে অর্জুনসখা, যাদবশ্রেষ্ঠ, হে অবনীদ্রোহী-নৃপতিদের দহনকারী অক্ষীণবীর্য গোবিন্দ, ব্রজগোপীর তথা সেবকবৃন্দের গীতে তীর্থীভূত হে যশের আধারস্বরূপ শ্রবণমঙ্গল, আপনার ভক্তদের রক্ষা করুন।[১]

এই অর্জুনসখা যাদবশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ তথা গোপাগীত-তীর্থীভূত কৃষ্ণ কিভাবে যে বহু যুগের বহুদেবতার বহু আরাধনাবিধির বহুমুখী ধারার মহাসংগমে সর্বদেবময় 'স্বয়ং ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন, সে-ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চিত্তাকর্ষক। ড॰ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, অনুরূপভাবে 'শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবিকাশ'ও উপযুক্ত গবেষণার অপেক্ষায়। আমাদের পরিসর স্বল্প, কাজেই ঐতিহাসিক কৃষ্ণের নিত্যকৃষ্ণে রূপান্তর গ্রহণের সূত্রমাত্র সংকলিত করতে পারি। তারই প্রথম পর্বরূপে বীরপূজা, দ্বিতীয় পর্বরূপে ঋগ্বেদীয় বিষ্ণু-নারায়ণ তথা পুরাণিক সর্বদেবময় হরির সঙ্গে একীভবন এবং সর্বশেষ পর্বরূপে সর্বকালের সর্বদেবতাকে আকর্ষণ উল্লিখিত হবে।

•

বীরপূজা যদুবংশের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যদুবংশের শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন বীর যে 'পঞ্চবীর' রূপে পূজিত হতেন, তা মথুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রত্নলেখ থেকেই জানা যায়। বায়ুপুরাণের মতে এঁরা হলেন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ। অনার্যমাতা জাম্ববতীর পুত্র বলে অথবা সূর্য-উপাসক বলেও হয়তো এ তালিকা থেকে সাম্ব পরে

১ ভা॰ ১২।১১।২৫

বাদ পড়ে যান। পঞ্চবীরের স্থান নেয় তখন চতুর্ব্যূহ। চতুর্ব্যূহও মূলে চারজন বীরের পূজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু কালক্রমে তা রূপ নিল তত্ত্বের। এ তত্ত্ব অনুসারে ভগবান্ বাসুদেবই জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি ও তেজ এই ষড়্‌গুণের অধিকারী, আর তিনিই ভক্তির পরমপাত্র। তাঁর মধ্য থেকেই সঙ্কর্ষণ ও প্রকৃতি, তা থেকে আবার প্রদ্যুম্ন ও মনস্, প্রদ্যুম্ন ও মনস্ থেকে আবার অনিরুদ্ধ ও অহংকার, অহংকার থেকে আবার মহাভূতের ও ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা থেকে ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ। এখানে উল্লেখযোগ্য, পাঞ্চরাত্রিকগণের প্রধান উপাস্যই এই চতুর্ব্যূহ। তবে কালক্রমে ব্যূহতত্ত্বও আবার শুধু বাসুদেব পূজাতেই পর্যবসিত হয়ে যায়। ভারতবর্ষে বাসুদেব পূজার প্রচলন খ্রীষ্টপূর্ব কালেই হয়েছিল। নতুবা বাসুদেবের মূর্তি নিয়ে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পৌরবসেনার রণযাত্রার যে-চিত্রটি উপস্থিত করেছেন মেগাস্থিনিস, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতবিবরণে, তার আর অন্য কি তাৎপর্য থাকতে পারে? পাতঞ্জল মহাভাষ্যে 'বাসুদেব-বর্গ্য' বা 'বর্গিন্' শব্দপ্রয়োগও বাসুদেব-উপাসকদেরই ব্যঞ্জনা বহন করছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ মহানিদ্দেস ও কুল্লনিদ্দেসও বাসুদেব-উপাসকদের নির্দেশ করে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকেই বাসুদেব পূজার প্রচলন ঘটলেও, বাসুদেব তখনও পরব্রহ্মরূপে বহুজনস্বীকৃত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাই দেখি, ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে, বাসুদেবই সর্বাত্মা একথা ঘোষণা করবার মতো ব্যক্তি অল্পই আছেন।[১]

বহুজনস্বীকৃত না হলেও, অন্তত একশ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাসুদেব সর্বাত্মারূপে খ্রীষ্টজন্মের বহুপূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন; আর সর্বাত্মা-রূপে বাসুদেবের সঙ্গে ঋগ্বেদীয় বিষ্ণুনারায়ণের একীভবনও ঘটে এই সময়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই তো বলা হয়েছে "নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তং নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"[২] উক্ত আরণ্যকে নারায়ণকে 'সনাতন দেব' হরিও বলা হয়েছে। ভাগবতে নারদ হরিকে বলেছিলেন, 'সর্বদেবময় ভগবান্' তথা 'ধর্মের মূল'[৩]। বাসুদেবের সঙ্গে বিষ্ণুনারায়ণ, সর্বোপরি এই

১ "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" গী° ৭।১৯

২ তৈ° আ° ১০।১১

৩ "ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্বদেবময়ো হরিঃ" ভা° ৭।১১।৭

'সর্বদেবময়' ভগবান্ হরির মিলনই ঐতিহাসিক কৃষ্ণের নিত্যকৃষ্ণে রূপান্তর গ্রহণের দ্বিতীয় স্তর। এ-স্তরে ঋগ্বেদের বিষ্ণুদেবতা বা নারায়ণ-ঋষির সঙ্গে কৃষ্ণনামধারী একাধিক ঋষিও যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে গবেষকগণ নিঃসন্দেহ। এবিষয়ে আমরা সর্বপ্রথমে ঋগ্বেদের বিষ্ণু-দেবতার প্রসঙ্গই উত্থাপন করতে চাই।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু হলেন মহান্ দেবতা। 'শিপিবিষ্ট'[১] তাঁর নাম, অর্থাৎ আলোকে আবৃত। অদিতির পুত্র বলে তাঁর আর এক নাম আদিত্য। বেদোপনিষদে ও পুরাণে আদিত্যসমূহের বিভিন্ন নাম ও সংখ্যা পাওয়া গেলেও সর্বত্র বিষ্ণু উল্লিখিত। পরে এই বিষ্ণুই হয়ে ওঠেন আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী—তখন তিনি সূর্যদেবতা মাত্র নন, সূর্যেরও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা[২]। আর সূর্য হয়ে যায় তাঁর বাহন 'অগ্নিময় সুপর্ণ', পরবর্তীকালের ভাষায় 'গরুড়'। ঋগ্বেদের মতে, এই বিষ্ণুই তিনটি পদে জগৎ সংসার আবৃত করে ফেলেছিলেন।[৩] পদক্ষেপ তিনটি বলে তিনি 'ত্রিবিক্রম,' আবার পদক্ষেপ বিস্তৃত বলে তিনি 'উরুগায়' 'উরুক্রম'। এ-নামগুলির সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের বামনাবতারের কাহিনী জড়িত আছে বলে মনে হবে। ঋগ্বেদ বলে, বিষ্ণুর প্রথম দুই পদ দ্যুলোক ভূলোক পরিব্যাপ্ত করে আছে, শেষ পদ 'পরমপদ'—তাই হচ্ছে জীবের শেষলক্ষ্য, মোক্ষধাম।[৪] ঋগ্বেদে এই ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আবার ইন্দ্রসখাও বটেন।

ড° হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন, ঋগ্বেদে বিষ্ণুর কিশোর-রূপ সম্বন্ধেও 'যুবা অকুমারঃ'[৫] বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুকে যে 'নিত্যনূতন'ও[৬] বলা হয়েছে তাও তো আমরা জানি। একই বেদে তিনি 'গোপা'[৭] বা গোরক্ষক বলেও অভিহিত। ভূরিশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে, এমন একটি লোকই[৮] বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ ধাম-রূপে উল্লিখিত। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর আবার 'গোবিন্দ' ও 'দামোদর' নাম দুটিও[৯] পাচ্ছি।

১ ঋ° ৭।৯৯।৭, মোক্ষমূলর-সম্পাদিত, চৌখাম্বা প্রকাশিত, ৩য় স°
২ ঋ° ৭।৯৯।৪, তত্রৈব
৩ ঋ° ১।২২।১৭ "
৪ ঋ° ১।২২।২০ "
৫ ঋ° ১।১৫৫।৬ "
৬ ঋ° ১।১৫৬।২ "
৭ ঋ° ১।২২।১৮ "
৮ ঋ° ১।১৫৪।৫-৬
৯ বৌ° ধ° ১১]৫।২৪

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবতাদের মধ্যে তাঁর সর্বোপরি মাহাত্ম্যকীর্তন-সূচক একটি কাহিনীতে বিষ্ণু আবার 'দ্বারপা' বা দ্বারী-রূপে উপস্থাপিত। শতপথ ব্রাহ্মণের আর এক উল্লেখযোগ্য কাহিনীতে তাঁকে আবার যজ্ঞে নিজের অঙ্গই খণ্ডবিখণ্ড করে আহুতি দিতে দেখি। এ থেকেই তাঁর যজ্ঞ-সংক্রান্ত নামগুলির উদ্ভব। যেমন, 'যজ্ঞ', 'যজ্ঞাবয়ব', 'যজ্ঞেশ্বর', 'যজ্ঞপুরুষ,' 'যজ্ঞভাবন', 'যজ্ঞবরাহ', 'যজ্ঞকৃৎ', 'যজ্ঞত্রাতৃ,' 'যজ্ঞভোক্তৃ', 'যজ্ঞক্রতু,' 'যজ্ঞবাহন,' 'যজ্ঞবীর্য' প্রভৃতি। এই যে যজ্ঞে নিজ দেহকেই আহুতিদান, অনেকের বিশ্বাস, এ হলো বিষ্ণুর বিশ্বময় পরিব্যাপ্তিরই রূপক। তিনি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত এবং তিনি কেন্দ্রস্থও বটেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে তাই 'ঋতগর্ভ'[১] বলা হয়, যার তাৎপর্য, কূটস্থ সত্য। বিষ্ণুর মহিমার কি শেষ আছে ? ঋগ্বেদের ভাষায় :

"বিষ্ণোর্নু কং বীর্যানি প্রবোচং
যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি"[২]

বিষ্ণুর বীর্যসমূহের অন্ত পেয়েছে কে ? একমাত্র পার্থিব ধূলিকণা গণনা করতে পেরেছে যে, সে-ই।

বিষ্ণুর [illegible]ব এবার নারায়ণ ঋষির পুরুষসূক্তে প্রবেশ করা যাক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবতিতম পুরুষসূক্তেই এই ঋষিদেবতা পুরুষ-নারায়ণের উল্লেখ পাই। সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষ তিনি।[৩] পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করেও দশ-অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করছেন[৪] বলায় এই বোঝা যায়, তিনি জগদাত্মক হয়েও জগদতিরিক্ত। সূক্তে আছে [illegible] হয়েছে বা হবে, সবই সেই পুরুষ। যজ্ঞীয় পুরুষ রূপে এখানে তাঁকেই আহুতি দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। অর্থাৎ, সেই সর্বহোম-সংবলিত যজ্ঞ থেকেই নিখিল বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি, এই হলো এ-সূক্তের মূল বক্তব্য বিষয়। অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদে বিশ্বকর্মা-রূপে ইনিই বিরাট জলরাশির মধ্যে আদিসত্তা হয়ে বিরাজ করছেন—বিশ্বভুবন সেই সর্বভূতাশ্রয় 'অজে'রই

---

১ ঋ° ১।১৫৬।৩

২ ঋ° ১।১৫৪।১। ভাগবতে প্রায় অনুরূপ একটি শ্লোকে বলা হয়েছে : "পারং মহিম্ন উরুবিক্রমতো গৃণানো যঃ পার্থিবাণি বিমমে স রজাংসি মর্ত্যঃ। কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মর্ত্য ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য॥ ৮।২৩।২৯

৩ ভা ১০।৯০।১ তত্রৈব

নাভিমণ্ডলস্থিত। বলা বাহুল্য, কারণার্ণবশায়ী পদ্মযোনি বিষ্ণুর কল্পনা এখানেই উৎসারিত।

তাত্ত্বিক রূপায়ণের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও নারায়ণ নামে যে যথার্থই একজন ঋষি ছিলেন, তা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের উদ্গাতার নাম থেকেই প্রত্যয় জন্মায়। পুরাণেও এক নারায়ণ ঋষির নাম পাই, তিনি ছিলেন ধর্মের পুত্র এবং অপর আর এক ঋষি নরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বদরিকাশ্রমে এই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের কঠোর তপশ্চর্যার কথা সর্বজনবিদিত। এঁরা ছিলেন প্রখ্যাত সৌর উপাসক, পরবর্তীকালে এঁদেরই সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সঙ্গে এক করে ফেলা হয়। ক্ষারসমুদ্রের উত্তর তটভূমিতে শ্বেতদ্বীপে বিশেষত নারায়ণ ঋষি কিভাবে পূজিত হচ্ছেন তার পুরাণ-প্রদত্ত বিবরণ অনুধাবন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মহাভারতে শান্তিপর্বের পরবর্তী নারায়ণীয় বিভাগে বলা হয়েছে, বিশ্বাত্মা নারায়ণ ধর্মের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই মূর্তি চতুষ্টয় পরিগ্রহ করেছিলেন। নর ও নারায়ণের সম্বন্ধে আলোচনার পর এবার হরি ও কৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া চলে।

পুরাণে হরিমেধসের পুত্র 'হরি' নামে সুখ্যাত এক অবতারের উল্লেখ পাই। ভাগবতে এঁকেই গজেন্দ্র-মোক্ষণলীলা করতে দেখি। নারদ যাঁকে 'সর্বদেবময়' হরি বলেছেন, হরিমেধসের পুত্র রূপে তাঁরই অংশাবতরণ বলা যায়। এই সর্বদেবময় হরির নিত্যলীলাভূমি আবার যমুনাতীরের মধুবন। ধ্রুবকে তারই ইংগিত দিয়ে নারদ বলেন,

মঙ্গল হোক তোমার বৎস! যাও, যমুনা-তীরবর্তী পুণ্যবন মধুবনে যাও, সেখানেই হরি নিত্য বিরাজ করছেন।[১]

স্মরণীয়, যমুনা-তীরবর্তী মধুবন যেমন পুরাণ-বিখ্যাত, ধেনুধন তেমনি ঋগ্বেদ-প্রসিদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ অত্রি ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বের উক্তি উল্লেখযোগ্য:

"আমি যেন যমুনা নদীর তীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি"[২]।

বাসুদেব কৃষ্ণের বাল্যকৈশোরে এই যমুনাতীরের মধুবন-ধেনুধনের ভূমিকা যে কী অসামান্য, তা তো আমরা সম্যক্ অবগত আছি।

---

১ "তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥" ভা° ৪।৮।৪২।

২ ঋ° ৮।২৬।১৩, রমেশচন্দ্র-অনুদিত

কেউ কেউ বলেন, ঋগ্বেদের কৃষ্ণ নামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় ঋষিদেরও নিত্যকৃষ্ণ ধারণা সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রসঙ্গত ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত উদ্ধারযোগ্য :

"ঋগ্বেদের বিশ্বকায় কৃষ্ণও কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপ কৃষ্ণে প্রতিভাত আছেন ? 'বিশ্বকায়' ও 'বিশ্বরূপ' শব্দ দুইটি প্রায় সমার্থবোধক, এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কল্পনার মূলে বৈদিক 'বিশ্বকায়' কৃষ্ণের প্রভাব বর্তমান থাকিতে পারে।"[১]

শুধু 'বিশ্বকায়' কৃষ্ণ কেন, বিষ্ণু নারায়ণ হরির প্রতিটি স্বরূপলক্ষণও যে নিঃশেষে বাসুদেব কৃষ্ণে সমর্পিত হয়েছে, তা আমরা ভাগবত মন্থন করেই দেখাতে পারি।

'কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে'[২] শ্লোকে উদ্ধব কৃষ্ণকে বলেছিলেন 'সূর্য'—তাঁরই তিরোধানে কলিতে গৃহসমূহ কাল-মহাসর্পের আবাস হয়ে বিগতশ্রী হয়েছে, একথাও জানিয়েছিলেন তিনি। ভাগবতের কোনো কোনো পাঠে কৃষ্ণকে আবার 'সূর্যাত্মা হরি'ও বলতে শুনি[৩]। এ পুরাণে কৃষ্ণকে 'উরুগায়' সম্ভাষণ গোপীগীতে বিখ্যাত হয়ে আছে[৪]। বৃন্দাবনবাসীকে তিনি তাঁর পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিয়েছিলেন, সে-ঘটনাও[৫] আমাদের অবিদিত নয়। আর ভূরিশৃঙ্গ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে এমন লোকটি[৬] গোলোক ছাড়া আর কি ? বিপ্রপত্নীদের উপাখ্যানে কৃষ্ণই যজ্ঞস্বরূপ-রূপে বর্ণিত—দেশ কাল দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্র দেবতা যজমান ক্রতুধর্ম সবই তাঁর বিভূতি মাত্র[৭]।

---

১ পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ৪৩

২ "কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥" ভাঃ ৩।২।৭

৩ "ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ", শৌনকবাক্য

৪ "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন", ভাঃ ১০।২১।১৭ স্মরণীয়।

৫ "তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা॥" ভাঃ ১০।২৮।১৬

৬ "লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্" ভাঃ ১০।২৮।১৪

৭ "দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্" ভাঃ ১০।২৩।১০-১১

ভাগবত তাঁকে শুধু 'সত্য'ই বলেনি, বলেছে সর্বাধ্যক্ষ সর্বসাক্ষী 'সর্বগুহাশয় বিষ্ণু'[১]। সর্বাদি হয়েও তিনি অনুক্ষণ কিশোর মূর্তিতে বিলাস করছেন—পঞ্চবিংশতি-অধিক শতবর্ষে তাঁকে ধরা-পরিত্যাগের আভাস দিতে এসে দেবগণসহ ব্রহ্মা তাই তাঁর অম্লান কৈশোর রূপমাধুরী দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।[২] বস্তুত কে তাঁর অনন্ত গুণাবলী গণনা করবে, কেই-বা করবে তাঁর সমূহ মহিমা কীর্তন? মহাশক্তিধর কোনো কোনো যোগেশ্বর কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা কিংবা সূর্যাদির রশ্মিকণাও হয়তো গণনা করে উঠতে পারেন, কিন্তু হিতাবতীর্ণ কৃষ্ণের অগণ্য গুণাবলী কদাপি নয়:

"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥[৩]

ঋগ্বেদে কীর্তিত বিষ্ণুর অনুরূপ মহিমা গান মনে পড়ে যায়: "বিষ্ণোর্নু কং বীর্যানি প্রবোচং। পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি।" বিষ্ণুর সর্বময় মহিমার সঙ্গে বিষ্ণুর সহস্রোত্তর সহস্র নামও ভাগবতীয় কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেছেন। তারই দু'চারটি হলো জনার্দন, পদ্মনাভ, গোবিন্দ, দামোদর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাগবতে কৃষ্ণের আবির্ভাবলগ্নেই তাঁকে বলা হয়েছে 'জনার্দন'—

"নিশীথে তমো উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে[৪]।" আবার কুন্তী তাঁর পাদবন্দনায় তাঁকে বলেছেন পদ্মনাভ, ভাষান্তরে 'পঙ্কজনাভ'—

"নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ॥[৫]

এই 'পঙ্কজনাভ' 'পঙ্কজমালী' 'পঙ্কজনেত্র' 'পঙ্কজাঙ্ঘ্র' পুরুষ যে গোপাল-গোবিন্দ কৃষ্ণ-বাসুদেব ছাড়া আর কেউ নন, তাও তো তাঁরই স্তোত্রে স্পষ্টোচ্চারিত:

১ "বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ" ভা° ১০।৩।৮
২ "ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্" ১১।৬।৫
৩ ভা° ১০।১৪।৭
৪ ভা° ১০।৩।৮
৫ ভা° ১।৮।২২

"কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"[১]

আবার ইনিই যে 'দামোদর' 'মাধব' তাও ভবন্ বিরহে গোপীর অশ্রু-জলেই প্রমাণীকৃত :

"বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥"[২]

বিষ্ণুর বিচিত্র-নাম কৃষ্ণলীলার নব-নব পর্যায়সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে বলে কারো কারো বিশ্বাস। যেমন, 'দামোদর' নাম কৃষ্ণলীলায় দামবন্ধনের প্রেরণা জুগিয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আস্থা না থাকলেও, বিষ্ণুর নানা নাম কৃষ্ণলীলার আলোকে যে নূতন নূতন ব্যাখ্যা পেয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নেই। প্রসঙ্গত 'উরুগায়' নামটিই তো স্মরণ করা যায়। বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল যিনি, সেই 'উরুগায়' বৃন্দাবনের কৃষ্ণে এসে অর্থ পরিবর্তন করে হয়ে যান, বাঁশিতে গান করেন যিনি।

শুধু কি বিষ্ণু, ভাগবত তো কৃষ্ণকে 'নারায়ণ'ও বলে। প্রমাণস্বরূপ ভীষ্মস্তবই উদ্ধারযোগ্য :

"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥[৩]

যদুকুলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান কৃষ্ণ এখানে স্বয়ং ভ গান্, আদিপুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ। অন্যত্র কৃষ্ণার্জুন নব-নারায়ণ ঋষির অবতার-রূপেও কথিত। যেমন, 'বংশ'-বর্ণনায় :

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥"[৪]

মূলে সূর্যদেবতার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক মোছেনি বলে তিনি ঋগ্বেদীয় ইন্দ্রসখাত্বও বিসর্জন দেন নি। ভাগবত বলে, ইন্দ্রারি দমনের জন্যই যুগে যুগে তাঁর অংশকলায় আবির্ভাব : "ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে

১ ভা° তত্রৈব।২১
২ ভা° ১০।৩৯।৩১
৩ ভা° ১।৯।১৮
৪ ভা° ৪।১।৫৮

যুগে"[১]। আবার ঋগ্বেদে ইন্দ্র হলেন প্রবল পরাক্রান্ত দেবতা। ভাগবতের 'সর্বদেবময়' কৃষ্ণের পদতলে তাঁর মাথা নত করার প্রয়োজনেই হয়তো গোবর্ধনলীলার সাড়ম্বর আয়োজন। আর চতুর্মুখের চারটি মুকুটই তো গোপবেশ বেণুকরের পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে ব্রহ্মমোহন-লীলায়। ভাগবতের মতে, কৃষ্ণের বেদগুহ্যতম স্বরূপের অনুভব আছে যাঁদের, সংখ্যায় তাঁরা তিনজন মাত্র—শিব দেবর্ষি নারদ ও কপিল[২]। তাই ভাগবতে দেখি, পঞ্চানন শিব পঞ্চমুখে হরিনাম গান করেও তৃপ্ত নন। সর্বদেবতার মধ্যে এইভাবেই কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে ভাগবতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। আর সর্বদেবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপেই তিনি ত্রিযুগের সর্ব-ঈশলক্ষণও[৩] আত্মসাৎ করে বসেন। সত্যযুগের উপাস্য 'ধর্ম' 'যোগেশ্বর' 'অমল' 'পুরুষ' 'ঈশ্বর' 'অব্যক্ত' 'পরমাত্মা' তিনিই। আবার ত্রেতার 'যজ্ঞ' 'পৃশ্নিগর্ভ' বলেও সম্বোধিত সেই অদ্বিতীয় কৃষ্ণই। পরিশেষে দ্বাপরে তিনিই ভগবান্ শ্যাম পীতাম্বরধর—নিজ আয়ুধে শ্রীবৎসাদি চিহ্নে করচরণাদির বিশিষ্ট লক্ষণে ভূষিত 'নারায়ণ' 'মহাত্মা' 'বিশ্বেশ্বর'। তিনিই 'বিশ্ব'-রূপ, তিনিই 'সর্বভূতাত্ম'।

বস্তুত, কৃষ্ণের এই সর্বাকর্ষণই ঐতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ্ণের নিত্যকৃষ্ণে তথা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণে রূপান্তর গ্রহণের সর্বশেষ স্তর। আমরা জানি, দেবী চণ্ডিকা মহিষাসুর দমনের উদ্যোগপর্বে এক এক দেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এক এক প্রহরণ। ঐতিহাসিক বাসুদেব কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে—ভারতবর্ষীয় সর্বদেবতা তাঁকে এক এক আভরণে করেছেন ভূষিত। তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী সূর্যের অগ্নি-গোলকাকৃতিটি ছাড়া আর কি? গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ এই তিনটি অগ্নিকে তিনি মেখলা রূপে কটিতে করেছেন ধারণ। ইন্দ্র দিয়েছেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, শ্রী দিয়েছেন পদ্ম-শঙ্খ, বরুণ দিয়েছেন পাশ, সূর্য দিয়েছেন সুদর্শন চক্র, কৌস্তভমণি। তিনি সবিতৃদেবতার কাছ থেকে পেয়েছেন উজ্জ্বলতম স্বর্ণ আভরণ। রাজোচিত মহিমার অঙ্গস্বরূপ তিনি ছত্রচামরযুক্তও হয়ে যান। সেই সঙ্গে দ্রাবিড়ী কল্পনা-ঐশ্বর্যে তাঁর অষ্টসেবিকা রূপে আবির্ভূতা হন পুষ্টি-গিঃ-

---

১ ভা° ১।৩।২৮

২ ভা° ১।৯।১৯

৩ ভা° ১১।৫।১৯-৩৩

কান্তি-কীর্তি-তুষ্টি-ইলা-উর্জা-মায়া। বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার কালে বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি লক্ষ্মীও তাঁর পদসেবাবাসনায় তপশ্চারিণী হন— আর তন্ত্রের শক্তিরূপিণী গোপীরূপে হয়ে যান তাঁর নিত্য-আরাধিকা।

প্রাচীনেরা কৃষ্ণ-নাম ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, 'কৃষ্' ধাতু আকর্ষণার্থে। সর্বাবতারের আকর্ষণই যদি এর দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তবে তা সর্বাংশে সার্থক। ভারতীয় ধর্ম-ইতিহাসের সর্বযুগের সর্বাগ্রগণ্য দেবতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী আকর্ষণ করেই ঐতিহাসিক বাসুদেব-কৃষ্ণ হয়েছেন নিত্যকালের 'নিত্যকৃষ্ণ', ভাষান্তরে 'স্বয়ং ভগবান্'। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের উপাস্য দেবগণের সকল বৈশিষ্ট্য আকর্ষণে তিনিই হয়ে উঠেছেন অবতারী—আর সব তাঁর অংশকলা মাত্র। সম্পূর্ণতার প্রতিভূরূপে তিনিই এখন সাংখ্যের পরমপুরুষ, যোগের পরমাত্মা, উপনিষদের ব্রহ্ম। বাসুদেবই এখন 'পরমজ্যোতিঃ' 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'। সাত্বত-কৃষ্ণে এই ভাবেই সর্বযুগের ভগবৎ-ঐতিহ্য অর্পণ করে ভারতীয় মন বিশ্বসৌন্দর্যের তথা পরমসত্যের এক চিরন্তন বিগ্রহমূর্তির পদতলে মাথা নত করে বলেছে,

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

বলেছে,

"সমগ্র ভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতারেরই সর্বশ্রেষ্ঠতা হইয়া থাকে জানিবে"[১]।

ভাগবতধর্ম

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং"[২] এককথায় এই হলো ভাগবতধর্মের স্বরূপ। অহিংস তথা জীবপ্রেমী মনীষীদের আচরিত এ-ধর্ম কপটতাহীন ফলাকাঙ্ক্ষারহিত মোক্ষবাঞ্ছাশূন্য বলেই 'পরম-ধর্ম' রূপে কথিত। ভাগবত পুরাণের একাধিক স্থলে এ-ধর্ম আবার ভগবান্-কর্তৃক 'আমার ধর্ম' বলেও বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত ভাগবতের অভিমত অনুসারে, এই ভাগবতধর্ম তাই 'নিত্যধর্ম' এবং অনাদিকাল থেকে এর প্রবর্তকও হলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

---

১ সনাতন-প্রণীত বৃহদ্ভাগবতামৃত, ৫ম অধ্যায়, ৯৮-১০০ শ্লো°, ২য় খণ্ড, রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রী অনূদিত।

২ ভা° ১।১।২

আধুনিক ইতিহাস-গবেষকগণ অবশ্য মনে করেন, প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগে, বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের বেশ কিছুকাল পূর্বেই বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক এ-ধর্ম প্রথমত বৃষ্ণি-যাদব-সাত্বত গোষ্ঠীতে প্রচারিত হয়। পরে নানা শাখা, নানা সম্প্রদায় বাহিত হয়ে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত রাজাদের আমলে হিন্দু-ধর্মসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রহরে ভাগবতধর্মের আর একবার নবজাগৃতি ঘটলো। ভারতবর্ষে বিভিন্নকালে আগত নানা বৈদেশিক জাতিকে নিয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-লালিত আর্যসমাজের ক্রমবর্ধমান বর্ণসাঙ্কর্য সমস্যা গুপ্তযুগেই সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সেই সময়েই ভাগবতধর্মের বসুধাবিস্তারী বাহুর সাদর আলিঙ্গনের মধ্যে আশ্রয় নেবার প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্স, আভীর, শুহ্ম, যবন, খসাদি উপজাতি—যাদের নিয়ে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক অস্বস্তি সর্বজনবিদিত, তারাও একবার মাত্র হরিনাম কীর্তনেই শুদ্ধ হয়ে যাবে, ভাগবতধর্মের এই ঘোষণা তৎকালীন সমাজে যে কী বৈপ্লবিক ছিল, আধুনিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে তা অনুমান করাও সম্ভব নয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবতধর্মের মধ্যে এমন একটি সর্বজনীন আবেদন, এমন একটি বিশ্বপ্রেমের কল্যাণব্রত রয়েছে যে যুগে যুগে তা বিভিন্নধর্মালম্বী বিদেশীদেরও দুর্বার আকর্ষণ করেছে। খ্রী° পূ° দ্বিতীয় শতকে তক্ষশিলার গ্রীকদূত হেলিওদোর যে ভাগবতধর্ম বরণ করে নিয়েছিলেন, সে তো বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা নয়—যেমন আকস্মিক নয় খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে আভীর জাতির বা গুপ্ত আমলে হূণদের ব্যাপক-ভাবে এ-ধর্মে শরণলাভ। আসলে এই আপাত-বিক্ষিপ্ত সমুদয় ঘটনাই এক বহুকালব্যাপী ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন:

"ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"[১]

এই যে "মানবজাতির চরম সভ্যতা" ঐক্যমূলক সভ্যতা, ভারতবর্ষে তার ভিত্তিনির্মাণ হয়ে গেছে বেদোপনিষদেই। শ্রুতি-নির্দেশিত সর্বজীবে

১ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ভারতবর্ষ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৮৩ বি° ভা° স°

ব্রহ্মাস্তিবাদের মধ্যে সবকিছুকে স্বীকার করার উদারতা অবশ্য কালক্রমে স্মৃতির কিছু কিছু কঠোর অনুশাসনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে খর্ব হয়ে পড়ে। আচারের মরুবালুরাশি এইভাবে বিচারের স্রোত-পথ গ্রাস করে ফেলার দুঃসময়ে ভাগবতধর্মের আবির্ভাব পরমাকাঙ্ক্ষিত ছিল সন্দেহ নেই। তাই বলে একথা বললেও ভুল হবে, ভাগবতধর্ম সম্পূর্ণ অমূল তরু—ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতির ধারাপথে এর বীজ এসেছে আকস্মিকতার প্রবাহ বেয়ে। আসলে সেই চির-পুরাতন শ্রুতি-স্মৃতি যোগ-তন্ত্রের কাঠামোর ওপরই গড়ে উঠেছে ভাগবত-ধর্মের যুগপৎ দার্শনিক প্রস্থান এবং আচরণ বিধি। সেইসঙ্গে এ-ধর্ম চিরকালের মানবসত্যকেও ভারতবর্ষের মাটিতে আর একবার এমন অকুণ্ঠভাবে ঐকান্তিকতার সঙ্গে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করেছে যে তার আবেদন পশ্চাতের বহু শতাব্দী ব্যাপ্ত করে সম্মুখের আরো বহু শতাব্দীর প্রত্যাশিত নানা রবাহূত অনাহূত সামাজিক ধর্মীয় অনুপ্রবেশের দিনেও জাতি-সংগঠকদের কাছে অনিঃশেষ প্রমাণিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে ভাগবতধর্মের বিধি-নিষেধগত সনাতন দিকটির সঙ্গে প্রথমে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সেরে নিয়ে শেষে এর বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের চিরনূতন দিকটির সন্ধান করাই শ্রেয়।

ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে ভাগবত পুরাণে আমরা কমপক্ষে অন্তত বিশ-ত্রিশবার উল্লেখ পাই। সেই প্রাসঙ্গিক স্থলগুলি অনুধাবন করলে এ-ধর্মের যুগপৎ দার্শনিক ও আচরণগত দিক দুটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব। প্রাথমিক স্তরে মনে হতে পারে, এ-ধর্ম নৈতিক ধর্ম মাত্র। অর্থাৎ কতগুলি আচার অনুশীলনে চিত্তশুদ্ধি সাধন করাই এ-ধর্মাবলম্বীদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সেই শুদ্ধচিত্তে, ভাষান্তরে চেতোদর্পণে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কথা যখন তোলেন তাঁরা, তখন আর বুঝতে বাকী থাকে না, নৈতিক ধর্মের মধ্যে ভাগবতধর্মকে সীমাবদ্ধ করতে যাওয়া মূঢ়তা। আসলে ভাগবতধর্ম ভক্তিধর্ম—নৈতিক বিধি-বিধান সেই আধ্যাত্মিক বৈকুণ্ঠ-লোকে উন্নীত হওয়ার কয়েকটি সোপান মাত্র। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমরা প্রসঙ্গত ভাগবতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধার করতে পারি। নিমিরাজের প্রশ্নের উত্তরে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ ঋষি যে বিধানগুলির নির্দেশ দেন,[১] স্তরপরম্পরায় সে-গুলি দাঁড়ায় এই—

১ দ্র°, ভা° ১১।৩।২৩-৩২

১. মনকে দেহাদিতে অসঙ্গ করা, সাধুসঙ্গে নিবিষ্ট হওয়া, জীবে যথোচিত দয়া-মৈত্রী-বিনয়-পোষণ।

২. শৌচ, তপস্যা, তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, আর্জব [সারল্য], ব্রহ্মকর্ম, অহিংসা পালন তথা সুখদুঃখে সাম্যভাব রক্ষা।

৩. সর্বত্র ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি, অনাসক্তি, চীরবসন ধারণ, যথালাভে সন্তোষ।

৪. ভাগবতে শ্রদ্ধা, কিন্তু অপর শাস্ত্রেও নিন্দারহিত হওয়া, এবং সত্য-শম-দমের অভ্যাসরূপে মন-বাক্-কর্মের দণ্ডবিধান।

৫. হরির জন্ম-কর্ম-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্তন-ধ্যান।

৬. 'ইষ্ট' বা বৈদিক যজ্ঞাদি, 'দত্ত' বা স্মার্ত দানাদি, 'তপ' বা ব্রতাদি, 'জপ্তং' বা মন্ত্রজপাদি, 'বৃত্ত' বা লৌকিক কর্ম, এমনকি নিজের প্রিয় যা কিছু, দারা-পুত্র-গৃহ-প্রাণ, সবই তাঁকে নিবেদনীয়।

৭. সর্বজীবের তথা কৃষ্ণান্তঃপ্রাণ ভক্তজনের সেবা।

৮. অহংকারবিনাশী ভগবদ্-যশের পরস্পর কীর্তন।

৯. নিরন্তর স্মরণে এই ভাবেই তাঁর প্রেমে পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠবে ভক্তবপু। ভক্ত তখন কখনো হাসবেন, কখনো কাঁদবেন, কখনো প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করবেন, কখনো নৃত্যও করবেন, আবার কখনো পরমানন্দে নির্বৃত হয়ে তূষ্ণীভাবও ধারণ করবেন। বলা বাহুল্য, এই শেষেরটি কোনো বিধান নয়, সকল বিধান ছাপিয়ে ওঠা ভক্তিরই বিকাশ বলা যায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি, ভাগবতধর্ম এ পুরাণে ভগবান্-কর্তৃক 'আমার ধর্ম' বলে উল্লিখিত। উদ্ধবগীতায় কথিত তাঁর সেই 'নিজের ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর নিজের দু'একটি উক্তি প্রবুদ্ধ ঋষির বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়—

১০. একাকী বা অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহারাজোচিত উপচারসহ নৃত্য-গীত-বাদ্যে তাঁর পর্ব-যাত্রা-মহোৎসব পালন।[১] সেই সঙ্গে উদ্ধবকে তিনি "মল্লিঙ্গ-মদ্ভক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চনম্। পরিচর্যা-স্তুতি-প্রহ্ব-গুণ-কর্মানু-কীর্তনম্"[২] অর্থাৎ তাঁর বিগ্রহ তথা ভক্তজনের দর্শন-স্পর্শন-অর্চন এবং সেবা-স্তুতি-প্রণাম-গুণকর্মলীলা কীর্তনের বিধানও এর পূর্বেই দান করেছিলেন। "দাস্যেনাত্মনিবেদনম্"[৩] বা দাসভাবে আত্মনিবেদনের প্রসঙ্গও সেখানে বাদ

১ ভা° ১১।২৯।১১
২ ভা° ১১।১১।৩৪
৩ তত্রৈব।৩৫

পড়েনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চিত্তশুদ্ধিই ভাগবতধর্মের শেষ কথা নয়, সভক্তি আত্মনিবেদনই চরম লক্ষ্য। প্রাচীন বর্হিপুত্র প্রচেতাদের দেবর্ষি নারদ যে-কথা বলেছিলেন, এখানে তাও মনে পড়বে—

সদ্বংশে মাতাপিতা থেকে প্রথম জন্ম, উপনয়ন-সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম এবং দীক্ষালাভে তৃতীয় জন্ম—এই ত্রিবিধ জন্মের প্রয়োজন কি? বেদবিহিত কর্মসম্পাদনে বা দেবসুলভ দীর্ঘায়ুতেই বা লাভ কি? যদি-না এ-সবের দ্বারা শ্রীহরিই আরাধিত হন? আর বেদান্তশ্রবণ, তপস্যা, বাগ্‌বিভূতি, চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা—এ-সবেরই বা প্রয়োজন কোথায় যদি-না তা ওই আরাধনায় লাগে? যোগ বল; সাংখ্য বল, সন্ন্যাস বল, বেদাধ্যয়ন বা অপরাপর পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানই বল, কি বা তাদের আবশ্যক যদি-না তাদের দ্বারা আত্মপ্রদ হরিকেই সেবা করলে![১]

হরির গুণকীর্তন, তাঁর সেবা, তাঁর ভক্তজনের বন্দনা ইত্যাদি ভাগবত-ধর্মের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। এমনকি মহাভারতেও এ-ধর্ম ভাগবতের মতোই পরিস্ফুটিত নয়। প্রসঙ্গত মহাভারতাদি রচনার পর বেদব্যাসের অসন্তোষের সেই ভাগবত-কথিত কাহিনীটি মনে পড়ে—সরস্বতী নদীতীরে তাঁর সেই প্রসিদ্ধ সংশয়বাণী:

"কিংবা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥"[২]

তবে কি ভগবান্ অচ্যুত আর তাঁর ভক্তদের পরম প্রিয় ভাগবতধর্ম আমার এখনো নিরূপণ করা হয়নি? তাঁর সংশয়মোচন করে এক্ষেত্রেও নেমে এসেছিল নারদ-বাণী—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে পুরুষার্থরূপে যেমন স্থাপন করেছেন ব্যাসদেব, তেমনি করে কি পরমপুরুষার্থ গোবিন্দমহিমাও কীর্তন করা হয়েছে? বিশেষত, নারদের মতে, এই গোবিন্দ-গুণ-বর্ণনাই জীবের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুশাসন, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান ও দানের পরম ফল স্বরূপ।[৩]

এখানে লক্ষণীয়, ভাগবতধর্মে নারদের ভূমিকা কী ব্যাপক! শুধু নারদই নন, এ-ধর্মে মৈত্রেয়-বিদুর প্রমুখের তুল্য নিষ্কিঞ্চন জনেরই প্রাধান্য।

১ ভা° ৪।৩১।১০-১২
২ ভাঃ ১।৪।৩১
৩ ভা° ১।৫।২২

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের কোনোটিই তাঁদের প্রার্থনীয় নয়—একমাত্র প্রার্থনা বাসুদেবে জন্ম-জন্মান্তর ঐকান্তিক ভক্তি, আর ব্রতও তাঁদের বিশ্বহিত। বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ যিনি, সেই পরমভাগবত বিশ্বহিতব্রতী নারদেরই নির্দেশ শিরোধার্য করে ব্যাসদেব একান্তে ধ্যানস্থ হয়ে লাভ করেছিলেন পরমধর্ম ভাগবতধর্মের সন্ধান, ভগবানে 'অহৈতুকী ভক্তি'ই যার মূলকথা। নিজের 'নির্গ্রন্থ' 'আত্মারাম' পুত্র শুকদেবকে দিলেন তাতেই দীক্ষা, পাঠ করালেন অহৈতুকী ভক্তির আকরগ্রন্থ ভাগবত। বস্তুত, যে-কোনো একপ্রকারের ভক্তি নয়, এই অহৈতুকী ভক্তিই ভাগবতধর্মের প্রাণ। একে কপিল বলেছেন 'অনিমিত্তা' ভক্তি। আমরা জানি, মাতা দেবহূতির কাছে ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি জানিয়েছিলেন, সত্ত্বমূর্তি হরির প্রতি ইন্দ্রিয়াদির যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি : "সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা"[১]। এ বৃত্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী : "অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী"[২]। সমুদ্রে গঙ্গাধারার মতোই এ ভক্তি অবিচ্ছিন্না অব্যবহিতা ; তদুপরি 'তামস' 'রাজস' 'সাত্ত্বিক' কোনো ভক্তির মধ্যেই পড়ে না বলে এ আবার নির্গুণও বটে।[৩] অর্থাৎ, এ ভক্তিতে জীব ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসে, তার রতিও তাই এক্ষেত্রে সম্বন্ধানুগা নয়, রাগানুগা। প্রসঙ্গক্রমে বেণরাজার সেই ব্যাজস্তুতি মনে পড়ছে। রাজ্যের পরমভাগবতদের উদ্দেশ করে তিনি যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন, তা বাহ্যত নিন্দাসূচক হয়েও প্রকারান্তরে অহৈতুকী অনিমিত্তা নির্গুণ ভক্তিরই স্তুতি হয়ে দাঁড়িয়েছে :

> "কো যজ্ঞপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
> ভর্তৃস্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্।"[৪]

পতিপ্রেমকে দূরে রেখে উপপতিতে কুলটার যে অনুরাগ, ঠিক সেই একই অনুরাগ তোমরা যাঁর প্রতি পোষণ করছো, সেই যজ্ঞপুরুষ কে?

ভক্তিধর্মের এই বোধ করি শেষ কথা। ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত-পরিকর ব্রজ-

১ ভা° ৩।২৫।৩২

২ তত্রৈব

৩ ভা° ৩।২৯।১১-১২

৪ ভা° ৪।১৪।২৪। এ তো রাগানুরাগার ক্ষেত্রে, আর বৈধীর ক্ষেত্রে কুলটা-উপপতি হয়ে গেছে "সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা" ভা° ৯।৪।৬৬

বধূরাও ভগবানের সঙ্গে 'জারবুদ্ধ্যাপি' সংগতা হয়েছিলেন। এই পরকীয়া-বুদ্ধির রসের উল্লাসে পরম-ভাগবতদের কাছে স্বভাবতই ভগবান্ আর 'যজ্ঞপুরুষ' মাত্র থাকেন না, হয়ে ওঠেন 'প্রেষ্ঠতম' 'অব্যার্থলীল'। এই সূত্রে ভক্তজন মোক্ষবাঞ্ছাকে 'কৈতবপ্রধান' বলবেন, এ আর বিচিত্র কি! ভাগবতে যিনি মোক্ষকেই 'শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ' বলেছিলেন, সেই সনৎকুমারকেও স্বীকার করতে হয়েছে, সাধকের মধ্যে 'যতি' অপেক্ষা 'ভক্তে'র স্থানই উচ্চতর। কেননা ভক্তগণ তাঁর পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিগুলির কান্তি স্মরণ করতে করতে কর্মগ্রথিত হৃদয়গ্রন্থিকে যেমন অনায়াসে ছিন্ন করতে পারেন, বিষয়-নির্লিপ্ত যতিরা তেমন নয়। তাই তাঁরও শেষ নির্দেশ 'ভজ বাসুদেবম্'[১]—বাসুদেবেরই ভজনা কর।

বস্তুত ভাগবতধর্মকে আমরা কেন যে ভক্তিধর্ম বলেছি, এতক্ষণে তা সুস্পষ্ট হওয়ারই কথা। মিথ্যা নয়, 'ভক্তিধর্ম' ভাগবতধর্মে বহু সাধকের 'ধেয়ানের ধন' এসে মিশেছে, 'বহু পথ বহু মত' ভাগবতধর্মের 'একদেহে' হয়েছে 'লীন'। ভাগবতের পরম-সমন্বয়কামী বৈশিষ্ট্য এর অন্তর্লীন ধর্মকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে ড° সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন[২] ভাগবতধর্মে কিভাবে যোগের পাঁচপ্রকার 'যম' ও পাঁচ প্রকার 'নিয়ম' তথা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই চার প্রকার 'পরিকর্ম' গিয়ে মিশেছে বৈদান্তিক বিধির শম-দম-তিতিক্ষা-উপরতি সমাধি-শ্রদ্ধার সঙ্গে, আবার গীতার নব[illegible] ভক্তিসাধন এক হয়ে গেছে তান্ত্রিক বিধানোক্ত শ্রীবিগ্রহ সেবায়, দীক্ষাদানে ও গ্রহণে, তীর্থ-ভ্রমণে তথা ইষ্টদেবতার উৎসবাদি পালনে। এ-ধর্মে অহিংসার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাও একদিকে যেমন পাতঞ্জলবিধানের, অন্যদিকে তেমনি 'যম'-বিধানেরও প্রভাব নির্দেশ করে। ভাগবতধর্মে বিশিষ্ট আত্মনিবেদন-মূলক ভক্তিবিধিকে আবার কেউ কেউ আর্যসাধনায় অনার্যের পরমদান বলে গণ্য করার পক্ষপাতী। যদি তাই হয়, তবে তো বলতেই হবে, ভাগবত-ধর্ম শুধু ঐতিহ্যাগতই নয়, দুই ধর্মসংস্কৃতির মহাসমুদ্র-সংগমে স্থাপিতও বটে।

কিন্তু এ সবই তো অত্যুচ্চ অধ্যাত্ম্য স্তরের কথা কিংবা কঠোর বিধি-বিধানের প্রসঙ্গ। এর মধ্যে কোথায় ভাগবতধর্মের সেই সজীব উত্তপ্ত

১ ভা° ৪।২২।৩৯

২ The Philosophy of the Srimad-Bhagavata, Vol II. p 169

কোমল ক্ষেত্র যেখানে চিরকালের মানবহৃদয়ের অপরিমিত প্রেম ধর্মাচরণের সকল দুরূহতা ও জটিলতা মুক্ত হয়ে একেবারে সরলভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে? তারই সন্ধানে একবার রন্তিদেবের প্রার্থনা কান পেতে শুনতে হবে। ঈশ্বরের কাছে তিনি অষ্টৈশ্বর্যময় গতি কিংবা মোক্ষও চাননি, চেয়েছেন নিখিল প্রাণীর অন্তঃস্থিত সমূহ ব্যথাবেদনাকে নিজে ভোগ করতে যাতে আর সকলেই দুঃখশূন্য হতে পারে। তাঁর ভাষায়:

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"[১]

এ তো তাঁর মুখের কথা মাত্র ছিল না, চরম অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও অম্লানবদনে শেষমুষ্টি অন্ন তিনি ভিক্ষার্থীকে দান করে দিয়ে 'তাঁর বাণীই তাঁর জীবন' বলে প্রমাণিত করেছিলেন। বুদ্ধদেবের 'মানসং অপরিমাণং' মৈত্রীভাবনার এ যেন পূর্বগামিনী ছায়া। এই যে নিখিল প্রাণে অপরিমিত প্রেম ও করুণা, ভাগবতধর্মের সেটিই বিশ্বজনীন আবেদনের মূলভিত্তি। ভাগবতধর্মকে কেন যে 'অনবদ্য' বলা হয়েছে[২] এখানে এসে তা বুঝতে আর এতটুকু অসুবিধা হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের অন্তরাল রচনার যা সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রবৃত্তি সেই চূড়ান্ত 'তুমি'-'আমি' বা 'তোমার'-'আমার' ভেদরেখা ভাগবতধর্মে অবলুপ্ত।[৩] ভাগবত স্পষ্টতই বলে কামনামূলক বৈদিক ধর্ম রাগদ্বেষাদি বহুল বলে তা মানুষকে কেবল অবিশুদ্ধ, নশ্বর অধর্মেই প্রবৃত্ত করে থাকে, ভুলে যায় পরপীড়ন কখনো ধর্ম নয়।[৪] যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত নারদের সেই উপদেশ মনে পড়ে যাবে—কায়মনোবাক্যে প্রাণীর প্রতি হিংসাত্যাগের মতো পরোধর্ম আর নেই। তাই জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যজ্ঞের পরমরহস্য সম্যক্ অবগত হয়ে নিষ্কাম জ্ঞানপ্রজ্বলিত আত্মসংযমের অগ্নিতেই কর্মময় যজ্ঞসমূহ আহুতি দিয়ে থাকেন (বাহ্য পশুবলিদানে নয়)।[৫]

---

১ ভাঃ ৯।২১।১২
২ "ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্" ৬।১৬।৪০
৩ "বিষমমতির্ন যত্র নৃণাং ত্বমহমিতি মম তবেতি চ যদন্যত্র" ৬।১৬।৪১
৪ ভাঃ ৬।১৬।৪১
৫ ভাঃ ৭।১৫।৮-৯

কুরুক্ষেত্র মহাহবের পর যুধিষ্ঠিরের সেই ঘোষণাও অবিস্মরণীয়: একটি মাত্র প্রাণিহত্যার পাপকে অনেকানেক অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেও কেউ পরিশুদ্ধ করতে পারে না[১]। এই যে অহিংসা এই যে উপশম, ভাগবতধর্মে তাকে কোনো আরোপিত আচরণ বলা হয়নি, বলা হয়েছে স্বাভাবিক ধর্ম: "অহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ"[২]। এ হল একান্তভাবেই সর্বপ্রাণীতে অপৃথক্‌-বুদ্ধিজাত, "স্থিরচর-সত্ত্বকদম্বেষ্বপৃথদ্ধিয়ো"[৩]। নিখিল প্রাণে "ত্বমহমিতি মম তবেতি" তুমি-আমি তোমার-আমার এই ভেদশূন্য প্রীতিকে জীবের স্বধর্ম বলায় ভাগবতধর্মের ঈশ্বর-প্রতীতিও একটি অপরিমেয় প্রেমভাবনায় পরিস্ফূর্তি লাভ করেছে।

নিখিলের আত্মাস্বরূপ ভগবানের শুধু নামগানেই "পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ"[৪]—চণ্ডালও সংসারমুক্ত হয়—ভাগবতধর্মের এ দৃঢ়বিশ্বাস ঈশ্বরের পরম-প্রেমরূপতাকেই প্রমাণিত করছে। ভয়ে নয়, পরমপ্রেমেই যাতে জীবচিত্ত তাঁতে তদ্গত হয়, সেইজন্যই তাঁর "লীলামনুষ্য" মূর্তিধারণ, নানা "ক্রীড়া"দির নিত্য আয়োজন। আসলে ভক্তচিত্তে তাঁর সুদর্শন-চক্রের তো স্থান নেই, আছে তাঁর লীলাসহায়িকা যোগমায়ার। হিরণ্যাক্ষ বরাহরূপী ভগবান্‌কে বলেছিল: যোগমায়াই তোর বল, দৈহিক বল আর কোথায়?[৫] ভাগবতধর্মের প্রেক্ষাপটে এ কথার তাৎপর্য যে কী গভীর বোদ্ধামাত্রেই অনুভব করবেন। ভাগবতে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ অনন্তশক্তির অধিকারী, সন্দেহ নেই। শৈশবে বাল্যেই তিনি শকটভঞ্জন করেন, যমলার্জুন ভঙ্গ করেন, গোবর্ধন পাহাড়টিকে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতেই তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁর বিরাট ঐশ্বর্যলীলাকে কি ভাবে যোগমায়া প্রেমমাধুর্যে আড়াল করে রাখে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিশুর মুখে বিশ্বচরাচর দেখে যশোদার স্নেহরস যখন ত্রাসে শুকিয়ে যেতে বসেছে, তখন যোগমায়াই আবার তাঁর অপত্যবুদ্ধি ফিরিয়ে আনে। শক্তিকে আড়াল করে প্রেমকেই সে বারবার করেছে জয়ী। বার বার সে-ই তো স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, ভগবানের শক্তি ঐশ্বর্যে নয়,

---

১ ভা° ১।৮।৫২

২ ভা° ১১।১৮।২২

৩ ভা° ৬।১৬।৪৩

৪ ভা° ৬।১৬।৪৪

৫ ভা° ৩।১৮।৩

ভালোবাসবার প্রতিভায়। আধুনিক কবি-শিল্পী অনাগত প্রেমের ভুবনের স্বপ্ন দেখে যখন বলেন,

"পূর্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় আসিবে যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে—যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে,"[১]

তখন আমাদের কারো কারো মনে হতেও পারে, ভারতবর্ষের বহুকালের একটি পুরাতন আকাঙ্ক্ষাই এখানে উচ্চারিত। তাই দেখি, দৈহিক বলের ওপর প্রেমের শক্তির জয় ঘোষণা করে বহু পুরাতন ভাগবতধর্মই সে-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছে। ভাগবতধর্মে ভগবান্ শুধু প্রেমেই লভ্য, শুধু প্রেমেরই গুণে তিনি প্রজা করে রেখেছেন তাঁর ভক্তদের। ভাগবতধর্ম শেষ বিচারে তাই প্রেমধর্ম। আর প্রেমধর্ম বলেই ভাগবতধর্ম 'নিত্যধর্ম', কাজেই তার আবেদনও বিশ্বজনীন।

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে ভাগবতের স্থান

ভাগবত নিজেকে বেদোপনিষদ কল্পতরুর গলিত ফল বলেছে। কথাটি বিশেষ ভাবেই মনোযোগের অপেক্ষা রাখে।

আমরা জানি, বেদের মূল গায়ত্রী মন্ত্র। 'গায়ত্রী' বলতে মুলত ঋগ্বেদের অন্তর্গত গায়ত্রী ছন্দে উদ্গাত অপূর্ব সাবিত্রী মন্ত্রটিই বোঝায়। এটিকে শুক্ল-যজুর্বেদেই প্রথম পূর্ণরূপে উদ্ধৃত দেখি :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥[২]

লক্ষণীয়, প্রথমাংশের ব্যাহৃতি-ত্রয় "ভূর্ভুবঃস্বঃ" বহু স্থানেই উৎকলিত হয়েছে। তবে প্রধানত বাজসনেয়ী সংহিতায় ৩।৩৭ মন্ত্রেই এর বিশিষ্ট ব্যবহার চোখে পড়ে। আর শেষাংশের "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো

১ 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' রবীন্দ্ররচনাবলী,
অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২১, বিভাস।

২ শুক্লয ৩৬।৩

যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বিষষ্টিতম সূক্তে বিন্যস্ত। এ অংশের এইভাবে অনুবাদ করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত :

“যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি[১]।”

‘গায়ত্রী’ যে সর্ববেদ-মথিত মন্ত্র তা ওপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়। হরিভক্তিবিলাস-ধৃত গরুড়পুরাণের উক্তিতে ভাগবত এই সর্ববেদ-মথিত মন্ত্রেরই ভাষ্যস্বরূপ বলে উল্লিখিত[২]। মৎস্য পুরাণেও পুরাণদান-প্রস্তাবে ভাগবতের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি যে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছে[৩], তাও তো আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। এখন প্রশ্ন ভাগবতকে ‘গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ’ বলা হলো কেন। প্রসঙ্গত প্রথমেই চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের একটি উক্তি মনে পড়বে :

“গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
‘সত্যং পরং’ সম্বন্ধ ‘ধীমহি’ সাধন-প্রয়োজন॥”[৪]

এখানে ভাগবতের এই গায়ত্রী-অর্থ-প্রতিপাদক “গ্রন্থ-আরম্ভন” সূচক সর্বাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি[৫] ॥

---

১ ঋ° ৩,৬২।১০

২ “গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ”।

৩ “যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ”।

৪ চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য।২৫, ১০৯

৫ ভা° ১।১।১। বৈষ্ণব টীকাকারগণের অভিমত অনুসারে শ্লোকটি ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে : (ক) “জন্মাদ্যস্য যতঃ” অর্থাৎ, “জন্মাদি অস্য” [বিশ্বস্য] এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁ থেকে হয়,

(খ) “অর্থেষু অন্বয়াৎ ইতরতঃ”—কার্যাকার্যের অন্বয় ব্যতিরেকে যিনি সদসৎরূপে প্রতীয়মান হন,

(গ) “যঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট্ যৎ যত্র সূরয়ঃ মুহ্যন্তি ব্রহ্ম য আদিকবয়ে হৃদা তেনে”—যে-সর্বজ্ঞ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ দেবাদির দুর্বোধ্য বেদ অ[illegible]ামিরূপে আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন,

(ঘ) “তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা”—মরীচিকাদিতে জলাদি ভ্রমের মতো যাঁতে অধিষ্ঠিত মায়িক সৃষ্টিও সত্য বলে বোধ হয়,

(ঙ) “স্বেনৈব ধাম্না সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি”—সেই স্বপ্রভাবে মায়াপ্রভাব নিবারণকারী সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি॥

ভাগবতীয় সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে অপরিহার্য উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকটির সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্রের যোগ তো প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। কোনো সন্দেহ নেই, গায়ত্রীর 'ভর্গঃ' বা সবিতৃ-প্রকাশক তেজ-ই ভাগবতে হয়েছে 'স্বরাট্', আবার গায়ত্রীর ব্যাহৃতিত্রয় যথাক্রমে 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' ভাগবতে হয়েছে 'ত্রিসর্গোঽমৃষা'। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। গায়ত্রীমন্ত্র ও ভাগবতের সর্বাদি শ্লোকের মধ্যে গভীরতর অন্বয় সাধিত হয়েছে কোথায়, তা শ্রীধর শ্রীজীব প্রমুখ বিদগ্ধ টীকাকারগণের ব্যাখ্যা ব্যতীত সম্যক্ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শ্রীধর বলেছিলেন, এ শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রের মতোই বুদ্ধিবৃত্তি প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ গায়ত্রীর 'প্রচোদয়াৎ' এবং ভাগবতের 'তেনে' অংশটি সমার্থক বুঝতে হবে। শুধু তাই নয়, গায়ত্রী দিয়ে শুরু করে বস্তুত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যাই যে এ পুরাণে প্রদর্শিত হয়েছে, তাও শ্রীধরের বক্তব্য থেকে জানা যায়। ক্রমসন্দর্ভকার শ্রীজীবও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অংশে প্রণবার্থ সূচিত হতে দেখেন। তাঁর মতে, জন্মাদি শব্দের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। আর ওঙ্কারও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরবাচী। কেননা, ওঙ্কারের অ-কার বিষ্ণুকে, উ-কার মহেশ্বরকে এবং ম-কার ব্রহ্মাকেই ইংগিত করছে।[১] অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বলতে হয়, গায়ত্রীর প্রণবমন্ত্র ভাগবতের আদিতেই 'ওঁ নমো' পদে শুধু সমুচ্চারিতই হয়নি, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অংশে ব্যাখ্যাতও হয়েছে। এই ওঙ্কারই বেদের বীজমন্ত্র, ভাগবতেও তাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ভাগবতের শুধু উপক্রমণিকা পর্বেই নয়, কথারম্ভেও "ওঁ নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে" শ্লোকেও তা আবৃত্ত। কোনো কোনো বৈষ্ণব-টীকাকার আবার এও বলেন, গায়ত্রী দিয়ে ভাগবত আরম্ভ বলে গায়ত্রীই এর প্রধান ছন্দ।

'এহোত্তম'। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেব বলেছিলেন, " 'সত্যং পরং' সম্বন্ধ 'ধীমহি' সাধন-প্রয়োজন"। এবার এই কথাটির তাৎপর্য বিচার করে দেখা যেতে পারে। একাধিক টীকাকারের দৃষ্টিতে, গায়ত্রী মন্ত্রে "বরেণ্যং ভর্গঃ" যিনি, ভাগবতে তিনিই "সত্যং পরং"। আমরা জানি, ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণেরই নামান্তর 'সত্য' এবং 'পর'—তিনি 'সূর্যাত্মা' বলেও যে বর্ণিত তাও নিত্যকৃষ্ণের প্রসঙ্গে ইতোমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং ভাগবতে যিনি সম্বন্ধতত্ত্ব সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাস্বরূপ ভগবান্‌ই

---

১ "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্টো উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"
ক্রমসন্দর্ভ-ধৃত মনুবচন

গায়ত্রীর বরেণ্য ভর্গদেব বলতে হয়। আবার 'ধীমহি' বা 'তাঁর ধ্যান করি' ভাষান্তরে তাঁর ভজন-পূজন-আরাধনাই যে জীবের শ্রেষ্ঠ "সাধন প্রয়োজন" তাও ভাগবতধর্মে বারংবার ঘোষিত। ভাগবতের সার চতুঃশ্লোকীতে এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বই নিষ্কাশিত। শ্রীধর বলেছিলেন, গায়ত্রী দিয়ে শুরু করে বস্তুত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যাই এ পুরাণে প্রদর্শিত হয়েছে, কথাটির পূর্ণ অর্থবোধ ঘটে এতক্ষণে। আর এতক্ষণে এও স্পষ্ট হয় ভাগবত কেন গায়ত্রী-ভাষ্যরূপে প্রসিদ্ধ, কেনই-বা চৈতন্যদেব বলেছিলেন, "গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন"।

বেদের পর উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠবে। ভাগবত নিজেকে শুধু বেদেরই নয়, সর্ববেদান্তেরও সার বলে প্রচার করেছে: 'সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে'। কথাটি কতদূর সত্য দু'একটি প্রমাণযোগেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, উপনিষদ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। শাখায় শাখায় এর সিদ্ধির প্রাচুর্য[১]। এমনি এক সিদ্ধির প্রাচুর্য লক্ষ্য করি উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'আত্মা' বলেই ব্রহ্মকে উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এই আত্মাতেই ঔপাধিক গুণসমূহ একীভূত হয়ে অবস্থান করে বলে পরিপূর্ণ আত্মাই সর্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য[২]। বৃহদারণ্যকের মতে, এই আত্মাই পুত্র থেকে প্রিয়তর, বিত্ত থেকে প্রিয়তর, অপর আর সব কিছু থেকেও প্রিয়তর, কারণ এই আত্মাই অন্তরতম[৩]। একই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যা বলেছিলেন তাও উদ্ধারযোগ্য। পতি জায়া পুত্র বিত্ত ব্রহ্ম ক্ষত্র লোক দেব ভূত প্রভৃতি সর্ববস্তু ও বিষয় থেকে প্রিয় এই আত্মার শেষ তত্ত্ব অভিব্যক্ত করে তিনি সেখানে বলেন, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তা নয়, আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য,

১ 'প্রার্থনা', শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড।

২ "..আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি।
তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য", বৃ° ১।৪।৭

৩ "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা" তত্রৈব; ১।৪।৮

নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মদর্শন ঘটলেই সব কিছু জানা যায়[১]।

পরমাশ্চর্যের বিষয়, উপনিষদীয় এই আত্মতত্ত্বই ভাগবতীয় ব্রজলীলার মুখ্য তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উদাহরণত ভাগবতের দুই প্রখ্যাত লীলা—ব্রহ্মমোহনলীলা ও রাসলীলার উল্লেখ করা যায়। প্রথমোক্ত লীলায় দেখি কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার ছলে ব্রহ্মা কৃষ্ণানুচর সমুদয় ব্রজ-বালকসহ গাভীগুলি অপহরণ করে পর্বতে নিভৃত কন্দরে সকলের অজ্ঞাতে লুকিয়ে রাখলে কৃষ্ণ ঠিক আপন স্বরূপেরই অনুরূপ ব্রজগোপাল ও গাভী সৃষ্টি করেছিলেন। বৃন্দাবনের গোপগোপীরা সেই নবসৃষ্ট গোপালদের পুত্রজ্ঞানেই গ্রহণ করলেন, যেমন গাভীগুলিও বৎসজ্ঞানে গ্রহণ করে গোশাবকদের। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই, উভয়ত তাঁদের অধিক অপত্যস্নেহ দেখা দিল। ব্রজলীলার অন্যত্রও বর্ণিত হয়েছে, ব্রজ-গোপগোপীগণ আপন পুত্রসন্তানদের চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন গোবিন্দকে। স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কি? উত্তরে পরীক্ষিতের কাছে শুকদেবের সেই অপূর্ব ব্যাখ্যা মনে পড়বে :

সকল জীবের আত্মাই প্রিয়তম, আত্মার জন্যই নিখিল চরাচর তাঁর প্রিয় হয়ে থাকে। আর কৃষ্ণই হলেন সর্বজীবের সেই আত্মা। জগতের হিতসাধনের জন্য তিনি স্বমায়াবশে দেহধারণ করে থাকেন। যাঁরা পরমার্থত তাঁকে জেনেছেন, একমাত্র তাঁরাই বিদিত আছেন, এই নিখিল চরাচরে কৃষ্ণ ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নেই[২]।

ভাগবতের রাসলীলাতেও ব্রজগোপীদের যে পতিপুত্র পিতাভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে যেতে দেখি, তাও সেই সর্বপ্রিয় আত্মারই চিরন্তন আকর্ষণে। এটি স্পষ্টতই বোঝা যায় যখন তাঁরা কৃষ্ণকে 'প্রেষ্ঠ' 'তনুভৃত' 'বন্ধু' বলার সঙ্গে সঙ্গে 'আত্মা' বলেও সম্ভাষণ করেন[৩]। উপনিষদের 'আত্মতত্ত্ব' ভাগবতে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার শেষপরিচয় বোধ করি ঈশোপনিষদের আদিশ্লোকের ভাগবতীয় রূপান্তর। লক্ষ্য করলেই দেখা

১ 'ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্"। তত্রৈব, ২।৪।৫

২ ভা° ১০।১৪।৫৪-৫৬

৩ ভা° ১০।২৯।৩২

যাবে, ঈশোপনিষদের "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ভাগবতে হয়ে গেছে "আত্মাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ"[১]। উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বেরও এ বোধ করি শেষসীমা। একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত আবার বৃহদারণ্যকের "স বৈ নৈব রেমে"[২] ইত্যাদি শ্লোকটির আলোকে ভাগবতীয় রাসলীলার আদিশ্লোকে ব্যবহৃত "রন্তুং" পদটির ব্যাখ্যা দিতে চান,[৩] একই উপনিষদের "তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"[৪] শ্লোকটিতেও এঁরা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর হ্লাদিনীর নিত্যমিলনলীলার ব্যঞ্জনা পান। আমাদের মতে কিন্তু উপনিষদের সঙ্গে ভাগবতের শ্রেষ্ঠ যোগ সাধিত হয়েছে পূর্বোক্ত আত্মতত্ত্বেই। ভাগবতীয় দর্শনের স্বরূপনির্ধারণে[৫] ড° সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, এক্ষেত্রে ভাগবত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মতোই "আত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং"[৬] নিরূপণ করেছে। অর্থাৎ, জীব থেকে যাত্রা করেই সে "জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা"য় পৌঁছেচে সেই এক সনাতন "জ্ঞানম্ অদ্বৈতম্" সত্যে, জ্ঞানীর পরিভাষায় যিনি ব্রহ্ম, যোগীর পরিভাষায় পরমাত্মা এবং ভক্তের পরিভাষায় ভগবান্। গোপালতাপনী শ্রুতির মতোই[৭] ভাগবতও এঁকে বলেছে 'শ্রীকৃষ্ণ'। ব্রহ্ম-মোহনলীলায় ব্রহ্মা তাঁকে দেখেছিলেন, "সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক রসমূর্তি"তে[৮]। এ আর কিছু নয় উপনিষদ-কথিত ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ রূপেরই অভিব্যঞ্জক। মায়া এঁর শক্তি মাত্র। পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস, ত্রিপাদ-বিভূতি-মহানারায়ণ উপনিষদে ব্রহ্মের যে-শক্তি 'স্বধা' নামে পরিচিতা, ভাগবতে তিনিই 'মায়া' নামে আখ্যাতা। ভাগবত আবার মায়ার বিভিন্ন বিভাগ করেছে, যেমন, কৃষ্ণপক্ষে যোগমায়া, বিষ্ণুপক্ষে বিষ্ণুমায়া, ব্রহ্মপক্ষে আত্মমায়া। কৃষ্ণের রাসলীলা ছিল এই 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'। রাসে সমাগতা গোপী সম্বন্ধে শুকদেব যা বলেছিলেন, এখানে তাও উল্লেখযোগ্য

১ ভা° ৮।১।১০

২ বৃ° ১।৪।৩

৩ দ্র° 'উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ', রণজিৎ লাহিড়ী সংকলিত ও মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রকাশিত।

৪ বৃ° ৪।৩।২১

৫ The Philosophy of The Srimad-Bhagavata, Vol I, p. 1.

৬ শ্বেতা° ২।১৫

৭ "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং", গো° তা°, পূর্ব।৩

৮ ভা° ১০।১৩।৫৪

"পুরুষঃ শক্তিভির্যথা"[১]। অনেকে মনে করেন, পুরুষের এই শক্তিকল্পনার মূল নিহিত আছে বৃহদারণ্যকে। আমরা অবশ্য এটিকে ভাগবতের ওপর সাংখ্যের প্রভাব বলেই মনে করি। তবে প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষে লীন হলে দুটি পৃথক্ তত্ত্ব সেই আদি অদ্বয় তত্ত্বেই পর্যবসিত হয়, এই পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ঔপনিষদিকও বটে। জীবাত্মা ও পরমাত্মাও অদ্বয় পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয়েই যেন সখাস্বরূপ দুই পাখি: "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ"[২]। স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণকারী ও তার দর্শনকারী এই দুই পাখির রূপকল্পটি ভাগবত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ[৩] থেকে যে কীভাবে স্বীকরণ করেছে তা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করার মতো। ভাগবতে বেদ-বেদান্ত স্বাকরণের এরূপ দৃষ্টান্ত আরও বহু আছে। বস্তুত, ভাগবত বেদোপনিষদ-কল্পতরুর গলিত ফল, কথাটি যে কতদূর সত্য, তা একমাত্র এই স্বীকরণের দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

হরিভক্তিবিলাস-ধৃত গরুড়পুরাণের উক্তিতে ভাগবত সম্বন্ধে আবার এও বলা হয়েছে: "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং"—ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থনির্ণায়ক। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবকেও কথাটি সমর্থন করতে শুনি:

> "চারিবেদ উপনিষদ্—যত কিছু হয়।
> তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
> যেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন।
> ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোকে-নিবন্ধন॥
> অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত"[৪]

"ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত" এ-অভিমতের সত্যতা শ্রীধরাদি টীকাকারগণই প্রমাণ করে গেছেন। ব্রহ্মসূত্রের কোন্ কোন্ মূল শ্লোক বা শ্লোকাংশ ভাগবতে উদ্ধৃত হয়েছে, কোন্ কোন্ শ্লোক বা শ্লোকের তাৎপর্যই বা হয়েছে নিরূপিত, শ্রীধরাদি নির্দেশিত সেই তালিকাটি উপস্থিত করেছেন

---

১ ভা° ১০।৩২।১০

২ ভা° ৩।১০।১৮

৩ তুলনীয়: " দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে॥
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"
শ্বেতা° ৪।৬

৪ চৈ. চ. মধ্য।২৫, ৮২-৮৪

ড° রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর ভাগবতটীকা 'গৌর-করুণা-মন্দাকিনী'র প্রথম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে[১]। সেখানে দেখতে পাওয়া যায়, কিভাবে ব্রহ্মসূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ"[২] ভাগবতের সর্বাদি শ্লোকে অঙ্গীকৃত, কি-ভাবেই-বা "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"[৩] ব্রহ্মসূত্র-ধৃত পরিণামবাদ ভাগবতে পূর্ণ স্বীকৃত। প্রসঙ্গত ব্রহ্মসূত্রের বিখ্যাত টীকা গোবিন্দভাষ্যের প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে কি আলোকপাত করেছেন, তাও বিশেষ-ভাবেই উল্লেখনীয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রাণ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[৪] প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সর্বদোষ-বর্জিত প্রাকৃতাদি স্পর্শশূন্য অনন্তগুণাদিতে ভূষিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু। ভাগবতের ক্ষেত্রেও তাই। ভাগবতে বলা হয়েছে, "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু"[৫] অর্থাৎ পারমার্থিক বস্তু আর কিছু নন, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্ নামে শব্দিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। আবার ব্রহ্মসূত্রের সাম্পরায়ে"[৬] সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাম্পরায় বা প্রেমই প্রয়োজন। ভাগবতেও "ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ"[৭] শ্লোকে প্রীতিভক্তিকেই উপায়রূপে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রোক্ত অভিধেয় তত্ত্বের সন্ধান দিতে গিয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ এ-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় উপক্রমেই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুরাগের হেতু, অর্থাৎ ভক্তি বা সাধন-ভক্তিই অভিধেয় রূপে ব্রহ্মসূত্রে নির্দেশিত। পক্ষান্তরে ভাগবতেও "স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ"[৮] শ্লোকে প্রেমভক্তির প্রাক্‌ভূমিকা হিসাবে সাধন ভক্তিই স্থান পেয়েছে। এইভাবেই ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত-টীকাকারগণের প্রদর্শিত পথে প্রমাণিত হয় : "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত"।

"ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" বা মহাভারতের অর্থবিস্তারক রূপেও ভাগবতের বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। বস্তুত মহাভারত বলতে এখানে মহাভারতের অন্তর্গত বলে পরিচিত ভগবদ্‌গীতাকেই বিশেষ করে বোঝাবে। গীতা-ভাগবতের নিবিড় যোগ তো সর্বজনবিদিত। গীতার অনুসরণে ভাগবত

১ পৃ° ২৮, ১ম স°
২ ব্র° সূ° ১।১।২
৩ তত্রৈব ১।৪।২৬
৪ তত্রৈব ১।১।১
৫ ভাঃ ১।১।২
৬ ব্র° সূঃ ৩।৩।২৮
৭ ভা° ৯।৪।৬৬
৮ ভা° ১১।৩।৩২

'উদ্ধবগীতা' প্রণয়ন করেছে। অর্জুনের দেখা বিশ্বরূপ এখানে উদ্ধবকেই দর্শন করতে দেখি। গীতার মতোই ভাগবত কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ সকল পথেরই অনুসন্ধান শেষে বাসুদেবে শরণাগতিকেই জীবের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে ঘোষণা করেছে। আর ভগবদ্‌গীতার নবাঙ্গ ভক্তিসাধন যে কিভাবে ভাগবতধর্মের মহাসংগমে এসে মিশেছে তা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। সেইসঙ্গে একথাও আমাদের বলতে হবে, গীতার যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানেই শুরু। পরমপুরুষে যে-আত্মনিবেদনের ইংগিতেই গীতা নীরব হয়েছে, ভাগবত সেই আত্মনিবেদনেরই সোপান-পরম্পরায় আরোহণ করে ব্রজগোপীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার চরম-শিখরে হয়েছে উপনীত। ভারত বা গীতার অর্থ ভাগবতে শুধু পরিস্ফুট বললে তাই ভুল হয়। ভারত-গীতার নানা অকথিত বাণীও ভাগবতে যেভাবে নব নব তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে ভাগবতকে ভারতীয় ভক্তি-সাধনার ইতিহাসে অভিনব সংযোজনই বলা উচিত।

গীতার অনুসরণে ভাগবতে অবশ্য কৃষ্ণকে প্রায়শই 'যোগেশ্বর' বা সাংখ্যের 'পুরুষ পুরাণ' বলা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও যোগের সঙ্গেই ভাগবতের সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ। ভগবান্‌-কথিত ধর্মে যোগের কী স্থান, তা তো ইতোপূর্বেই ভাগবতধর্ম বিষয়ক আলোচনাতে যথাসম্ভব বিশদীভূত হয়েছে। এখানে সাংখ্য সম্বন্ধে আলোচনার কিছু অবকাশ আছে।

ভারতীয় পুরাণে তথা জীবনে সাংখ্যের ব্যাপক ভূমিকাটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাংখ্য দর্শন'[১] নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি যথার্থই লক্ষ্য করেছিলেন, বৈরাগ্যপ্রাবল্য, অদৃষ্টবাদিত্ব, তন্ত্রপ্রীতি প্রভৃতি হিন্দুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সাংখ্যদর্শনের প্রভাবজাত। এ-দর্শনের মোটামুটিভাবে মূল কথা হল, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই পুরুষার্থ, পুরুষ একা ও অসঙ্গ, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগই তাঁর দুঃখের কারণ, আর প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ-উচ্ছিত্তিই তাঁর দুঃখনিবারণের উপায়। এই উচ্ছিত্তিই সাংখ্যে 'অপবর্গ' বা মোক্ষ নামে পরিচিত, আর তা লাভ করার পথই বিবেক বা জ্ঞান। শ্রীধর এক কথায় তাই সাংখ্যদর্শনকে 'জ্ঞানশাস্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন। 'জ্ঞানশাস্ত্র' সাংখ্যের কাছে ভাগবতের ঋণ অপরিসীম। ভাগবত

১ বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড

নির্মৎসর মহাত্মাদের অনুষ্ঠেয় এমন এক ধর্মের সন্ধান দিতে চেয়েছে, যার দ্বারা "তাপত্রয়োন্মূলনম্" বা ত্রিতাপহারী শিবদ পরমার্থ বস্তুই মেলে। এ পথে সে "আত্মানাত্মবিবেকে"র প্রসঙ্গও তুলেছে। তবে ধর্মশাস্ত্র-রূপে ভাগবত যে গৌতম-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যের সম্পূর্ণ সমর্থক হতে পারে না, তাতে আর সন্দেহ কী। বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত কপিলদেবকে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে মাতা দেবহূতির কাছে যে-সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ দিতে দেখি, তাও সেশ্বর সাংখ্যই বটে। নিরীশ্বর সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের পাশাপাশি ভাগবতের সেশ্বর সাংখ্য-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব স্থাপন করলেই উভয়ের অন্তর্নিহিত পার্থক্যটি সুপরিস্ফুট হবে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে নিরীশ্বর সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমটি এখানে উদ্ধার করলাম :

"এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান অহংকার। মহৎ মন।

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান।···

তন্মাত্র হইতে অহংকারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।···অহংকার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ-দুঃখ আছে। সুখ-দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে। সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত[১]।"

এবার ভাগবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব। ভাগবতে এ সৃষ্টিতত্ত্ব নানা স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কপিলের সেশ্বর সাংখ্যে তো বটেই অন্যত্রও যে ভাগবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব

১ 'সাংখ্যদর্শন', বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খ°, পৃ° ২২৭, সা° প° স°

মূলত সাংখ্যানুকারী, তা প্রমাণের জন্যই আমরা দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে শুকবাণী থেকে এর নিম্নরূপ ক্রম সংকলন করার প্রয়োজন বোধ করছি :
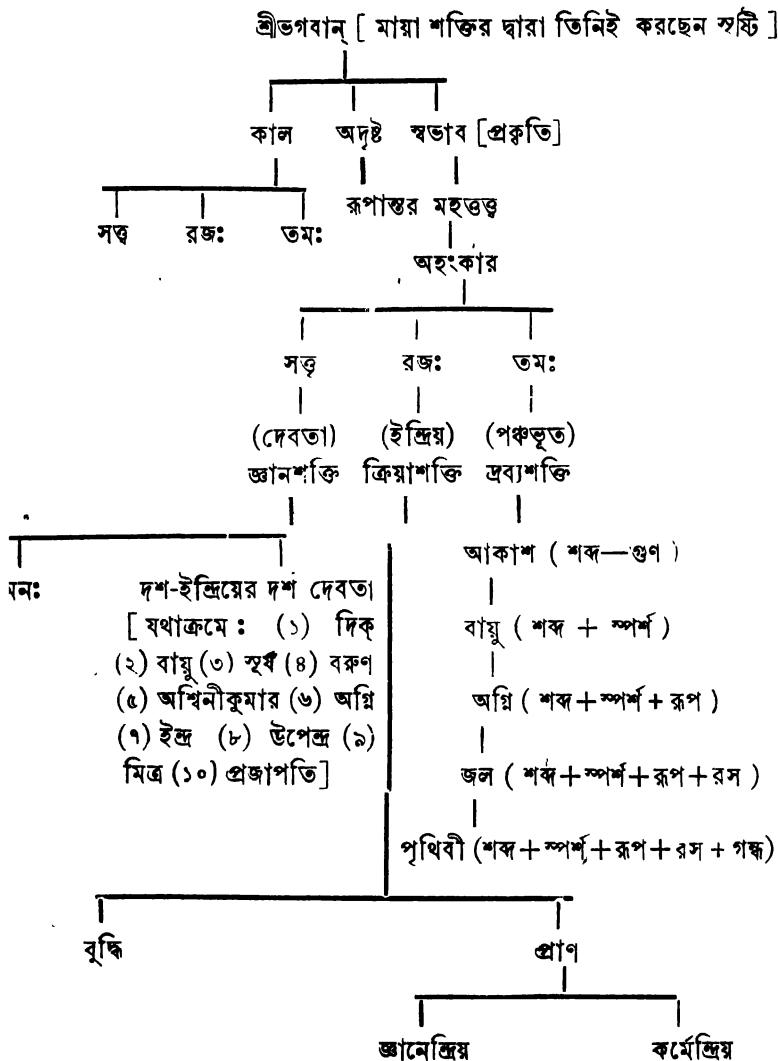
তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেব-প্রদত্ত সৃষ্টিক্রমও অনুরূপ। সেখানেও বলা হয়েছে, ঈশ্বরই পরমপুরুষ বা 'প্রধান পুরুষ'। তিনিই অনাদি আত্মা 'স্বয়ংজ্যোতিঃ' এবং নির্গুণ রূপে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। সূক্ষ্মা দেবী গুণময়ী প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে

"লীলয়া", লীলাহেতু উপগতা হলে তিনি তাঁকে যদৃচ্ছাক্রমে গ্রহণ করেন। তাঁরই বীর্যাধানে প্রকৃতিগর্ভে এইভাবে সৃষ্টি সম্পন্ন হয়[১]।
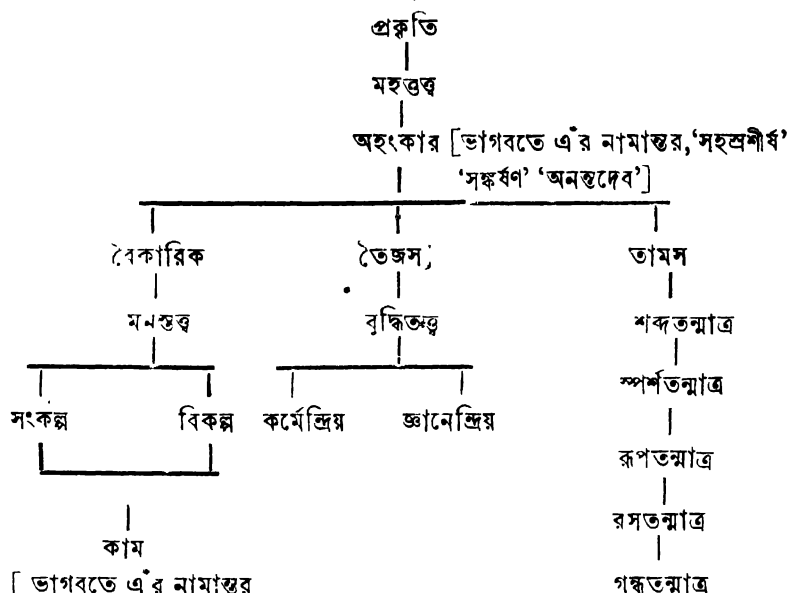
অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ভাগবত "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"—ঈশ্বর অসিদ্ধ, এই নিরীশ্বর সাংখ্যমতের ঠিক বিপরীতকোটিতে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ আস্তিক্যবুদ্ধিতে আত্মনিবেদন করে তার ভক্তিশাস্ত্রগত নিজস্ব চরিত্রই অপূর্বকৌশলে রক্ষা করেছে। এতৎসত্ত্বেও অবশ্য নিরীশ্বর সাংখ্য ও ভাগবতীয় সেশ্বর সাংখ্যের নিগূঢ় যোগ একটা থেকেই গেছে। নিরীশ্বর সাংখ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও, 'সর্ববিৎ সর্বকর্তা' পুরুষ মানে, আর ভাগবত সেই পুরুষকে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে অর্চনা করে, এইমাত্র পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র লেছিলেন :

"সাংখ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে,

১ দ্র', ভা'.৩।৬
২ ভা' ৩।২৬।২৮

পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন"[১]।

"মনোমত" শব্দটি অবশ্যই সর্ববাদিসম্মত হবে না, তবে সেশ্বর সাংখ্যের ধারণায় ভারতবর্ষীয় পুরাণগুলি একটি সাধারণবিন্দুতে এসে মিলেছে সন্দেহ নেই। বিশেষত, বিষ্ণুর বা হরির বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক পুরাণগুলিতে এ বিষয়ে নিবিড় ঐক্য লক্ষণীয়। সেইসঙ্গে আবার এও স্বীকার্য সেশ্বর সাংখ্যের পরমপুরুষ-তত্ত্বটি সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েও হরিবংশ ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণু-পুরাণ ভাগবত সেই পরমতত্ত্বের বিশেষ স্বরূপ নির্ধারণে সর্বত্র একমত নয়। আমরা তো পূর্বেই জানিয়েছি, ভাগবত ভিন্ন অপর পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে হরি বা বিষ্ণুর 'অংশ' বলার প্রবণতাই অধিক। আর ভাগবতের শেষ বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাঘোষণায়। এখানে আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো, শুধু তত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, কৃষ্ণজীবনী পরিবেষণের দিক দিয়েও এ-পুরাণগুলিতে পারস্পরিক বেশ কিছু বিভিন্নতা বর্তমান। যেমন চারটি পুরাণেই কৃষ্ণের ব্রজলীলার বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও দেখি, লীলাক্রম এক নয়। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায়, হরিবংশে আগে শকটভঞ্জন, পরে পূতনাবধাদি। এ লীলাক্রমে এমন একটি নূতন তথ্যও পাই যা আর কোথাও মেলে না। আমরা জানি, গোকুলে নানা অশুভ দর্শন করেই নন্দ ব্রজে বসতি স্থাপনে উদ্যোগী হন। হরিবংশে কিন্তু ব্রজে বসতি স্থাপনের কারণরূপে পাচ্ছি তৎকালীন গোকুলে বৃকের উৎপাত। তথ্য হিসাবে নূতন নিঃসন্দেহ। হরিবংশে রাসকেও অপর একটি নামে উল্লিখিত দেখছি, 'হল্লীশ'। পক্ষান্তরে ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবতে ব্রজলীলার ক্রম অনেকটাই এক। তবে বিষ্ণুপুরাণে দামবন্ধনলীলা পাই না, সেই সঙ্গে যমলার্জুনভঙ্গও। আবার একমাত্র ভাগবতেই যজ্ঞপত্নীদের অন্নগ্রহণাদি লীলার উল্লেখ আছে, অন্যত্র কোথাও নেই। বস্তুত ভাগবত পুরাণেই কৃষ্ণলীলা সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে—অসংখ্য এর শাখা-প্রশাখা-বহুল ঘটনাবলী, বিপুল তার বিস্তার। মোটামুটি ভাবে সকলেরই পরিচিত চব্বিশ-পঁচিশটি প্রধান ঘটনারই তো উল্লেখ করা যায়। যেমন, পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্তদমন, নামকরণ, রজ্জুবন্ধন, যমলার্জুনভঙ্গ, বৃন্দাবনপ্রবেশ, বৎসাসুর-বকাসুর-অঘাসুর বধ,

১ 'সাংখ্যদর্শন', বিবিধ প্রসঙ্গ, ১ম খং, পৃং ২২৮

ব্রহ্মমোহনলীলা, কালিয়দমন, নিশীথ-দাবাগ্নি-নির্বাপণ, প্রলম্ববধ, অগ্নিভক্ষণ, বেণুধ্বনি, বস্ত্রহরণ, বিপ্রবধূদের প্রতি অনুগ্রহ, গোবর্ধন ধারণ, অভিষেক, শারদ রাস, অজগর ও শঙ্খচূড়বধ, কেশী-দমন। ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে একাধিক স্থলে এমনকি আক্ষরিক মিল থাকলেও ভাগবত যে নিজস্ব ধারারই স্রষ্টা, তা এক এই লীলাপর্যায় থেকেই প্রমাণিত হবে। রাসের ক্ষেত্রে এই মৌলিকতার স্বাক্ষর আরো উজ্জ্বল। ব্রহ্মপুরাণ-বিষ্ণুপুরাণের রাস ভাগবতের মতো 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' নয়। উক্ত পুরাণদ্বয়ে ভাগবতের মতো 'বিভ্রান্তা' গোপীদেরও দর্শন মেলে না। 'বংশী-ধ্বনি অকস্মাৎ' গোপীর সংসারজীবনে কী বিপর্যয় এনেছিল, আলোচ্য চারখানি পুরাণের মধ্যে একমাত্র ভাগবতেই তা স্থানে পেয়েছে। কৃষ্ণের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণই যখন বলে "অন্যদেশগতে কৃষ্ণে"[১] বা "অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে"[২] তখন ভাগবতে কৃষ্ণকে বলতে শুনি "ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং",[৩] আমি অদৃশ্যে থেকে তোমাদেরই ভজনা করছিলাম।

বস্তুত ভক্তিশাস্ত্র হয়েও ভাগবত যে কতদূর উচ্চকোটির কাব্য তা মাত্র রাসলীলা আর উদ্ধবদূত থেকেই প্রমাণিত হতে পারে। শেষোক্ত পর্যায়টি আবার ব্রহ্ম-বিষ্ণু প্রভৃতি কোনো পুরাণেই মেলে না। ভাগবতের অনেক পরবর্তীকালের রচনা গর্গসংহিতায় ভাগবতীয় প্রায় সব লীলারই অনুধ্যান লক্ষ্য করি, কিন্তু ভ্রমরগীতার সাক্ষাৎ সেখানেও পাই না। ভারতবর্ষীয় কাব্য-সাহিত্যে পুরাণে ইতিহাসে উদ্ধবদূত বা ভ্রমরগীতা তাই একান্ত-ভাবেই ভাগবতের নিজস্ব দান বলতে হয়। বিরহী যক্ষকে প্রিয়ার উদ্দেশে মেঘদূত পাঠাতে দেখে কালিদাস বলেছিলেন, "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনা-চেতনেষু"[৪]—যে কামার্ত তার কাছে চেতন-অচেতনের ভেদ কোথায়? যক্ষ একে কামার্ত, তায় বিরহী। বিরহীর পক্ষে চেতন-অচেতন বোধশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক। ভাগবতে ভ্রমরগীতায় উদ্ধবকে প্রিয়প্রস্থাপিত ভ্রমরদূত ভাবায় বিরহীচিত্তের প্রায় সেই বিভ্রমই ঘটেছে। ভক্তিশাস্ত্র হয়েও ভাগবত যে

১ ব্রহ্ম° ২২।১৮৯

২ বিষ্ণু° ৫।১৩।২৪

৩ ভা° ১০।৩২।২১

৪ পূর্বমেঘ।৫

কালিদাসীয় কবিকল্পনার কচিৎ প্রতিস্পর্ধী, কচিৎ আবার সমধর্মীয় হয়ে ওঠে, এই বড়ো আশ্চর্য। উদাহরণযোগে ভাগবত ও কালিদাসের কাব্যবিচারের এরকমই দু'একটি অন্তরঙ্গ যোগের আভাস তুলে ধরতে পারলেই ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে ভাগবতের স্থান নিরূপণের কাজটিও সুসম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ভাগবতের রচনাকাল বিষয়ক আলোচনায় আমরা বলেছি, ভাগবতের সবচেয়ে পরিবর্ধিত সংস্করণ গুপ্ত আমলে পুরাণ-পুনরুজ্জীবনের যুগে, অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে ঘটেছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। একাধিক পণ্ডিতের মতে, কালিদাসও এ-যুগেরই মহাকবি, সুতরাং প্রায়-সমকালীন ভাগবত-সংস্করণ ও কালিদাসীয় কাব্যের মধ্যে কোথাও কোথাও কোনো কোনো সদৃশ ধর্ম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত প্রথমেই মনে রাখতে হবে, কালিদাস ভারতবর্ষীয় শৈবমাহাত্ম্যের স্তুতিপাঠক কবি, আর ভাগবত বিষ্ণু-হরি-নারায়ণাখ্য কৃষ্ণমহিমার লীলাকীর্তক শাস্ত্র। তাই কুমারসম্ভবে কালিদাস যখন তারকাসুরের কণ্ঠে এমনকি বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রও প্রতিহত হয়ে যাবার কথা বলেন,[১] এবং শেষোদ্ধার করেন পরমেশ্বর শিবেরই ঔরসজাত দেব-সেনাপতির পরাক্রমের পরিচয়ে, তখন ভাগবতে শিব স্বয়ং পরম বিষ্ণুভক্তরূপে বিষ্ণুরই পাদপাঠতলে নিবেদন করেন, আমি তো একমাত্র আপনার চরণই শরণ করেছি, এতে মূর্খব্যক্তিরা যদি আমাকে আচারভ্রষ্ট বলে জল্পনা করে তো করুক; আপনার অনুগ্রহে আমি তা গ্রাহ্যও করিনা।[২] এতৎসত্ত্বেও ভাগবত ও কালিদাসীয় কাব্যের মধ্যে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করার মতো। ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম, মোট এই ছটি অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞ ও শিবসতীর আখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কাহিনীর দিক দিয়ে কুমারসম্ভবের আখ্যানভাগ যেন ভাগবতীয় উপাখ্যান অংশেরই পরিপূরক। ভাগবতের দক্ষকন্যা সতীই কুমারসম্ভবের হিমালয়কন্যা উমা হয়েছেন। ভাগবতে সতী-উপাখ্যানের অন্তে শুকদেব পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাষ দিয়ে

---

১ "তস্মিন্নুপায়াঃ সর্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহতক্রিয়াঃ।
বীর্যবন্ত্যোষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে॥
জয়াশা যত্র চাস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতার্চিষা।
হরিচক্রেণ তেনাস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবার্পিতম্॥" কুমার° ২।৪৮-৪৯

২ "যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং/জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎপরানুগ্রহেণ॥"
ভা° ৪।৭।২৯

বলেছিলেন, এইভাবে দাক্ষায়ণী সতী পূর্বকলেবর ত্যাগ করে হিমালয়ে মেনকার কন্যা হয়েছিলেন শুনেছি[১]। পুনর্জন্মের আভাস দিয়ে যেখানে ভাগবতীয় সতী-কাহিনীর পরিসমাপ্তি, ঠিক সেখানেই কালিদাসের কুমারসম্ভবের কথারম্ভ। এ-কাব্যে দেবর্ষিকে সেই পূর্ব-ইতিবৃত্তেরই ইংগিত দিয়ে বলতে শুনি, পূর্বজন্মে পতিনিন্দা শ্রবণে মর্মাহতা সতী দেহত্যাগ করায় তখন থেকেই বিমুক্ত-সঙ্গ পশুপতি আর দারপরিগ্রহ করেননি[২]।

সতী যে পরজন্মে পশুপতিকেই লাভ করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে ভাগবত বলেছে, প্রলয়কালীন সুপ্তশক্তি যেমন পুরুষকেই পুনঃপ্রাপ্ত হয়, দেবী অম্বিকাও তেমনি অনন্যভাবৈকগতি হয়ে প্রিয়তম পতিকেই লাভ করেছিলেন। ভাগবতের ভাষায়:

"তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্॥"[৩]

পরজন্মেও উমা যে অনন্য "ভাবৈকগতি"ই প্রাপ্তা হয়েছিলেন তারই প্রমাণ স্বরূপ বটু-ছদ্মবেশী শিবের সমীপে পার্বতীর আত্মঘোষণার অংশবিশেষ কুমারসম্ভব থেকে উদ্ধারযোগ্য:

"মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং"[৪]

আমার মন (তাঁতেই) ভাবৈকরসে স্থির হয়ে আছে। ভাগবতের 'ভাবৈকগতি'ই কি কুমারসম্ভবে 'ভাবৈকরস' হয়েছে?

প্রকাশগত এই মিল উভয়ের মধ্যে আরো অনেক আছে। যেমন হিমালয়-বর্ণনায় ভাগবতকার নন্দানদী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'পর্যন্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া'[৫]—এককথায় সতীর স্নানে পুণ্যতর-সলিলা নন্দা। মুহূর্তে মনে পড়বে কালিদাসীয় কাব্যের সেই স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুবসতি রামগিরি আশ্রমের অনুরূপ পুণ্যচ্ছবি "যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু"।[৬]

---

১ "এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম॥" ভা' ৪।৭।৫৮

২ "যদৈব পূর্বে জননে শরীরং সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ॥" কু° ১।৫৩

৩ ভা° ৪।৭।৫৯ কুমার ।৮২

৪ ভা° ৪।৬।২২

৬ পূর্বমেঘ।১

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভাগবতের ইন্দ্রপুরী বর্ণনা মেঘদূতের অলকাপুরী বর্ণনাকেই স্মরণ করায়। বিশেষত, ইন্দ্রপুরীর সেই নিত্যবয়োরূপা বিরজবাসা বহ্নিশিখারূপিণা 'শ্যামা'[১] রমণীদের প্রসঙ্গে কালিদাসের 'শ্যামা শিখরিদশনা'[২]কেই মনে পড়বে। আর ভাগবতের সেই বাতায়নবর্তী[৩] বর্ণনা, অর্থাৎ স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত গবাক্ষ থেকে নির্গত অগুরুসুগন্ধ শুভ্র ধূমরাশির প্রতিচ্ছন্ন পথে সুরপ্রিয়াদের আসা যাওয়ার দৃশ্যটি খানিকটা মনে করাবে কালিদাসের অনুরূপ কেশধূপসংস্কারের চিত্র[৪]।

শুধু কবিকল্পনাতেই নয়, ধর্মদর্শনের দিক দিয়েও ভাগবত ও কালিদাস একটি সাধারণ বিন্দুতে এসে মিলেছে। সেই সাধারণ বিন্দুটি আর কিছু নয়, পূর্বকথিত সাংখ্যমত। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন,

"কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।"[৫] এই "সাংখ্যানুকারী ব্রহ্মস্তোত্র" ভাগবতে ব্রহ্মার পুরুষোত্তম-বন্দনার যে কত কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে, পাশাপাশি স্থাপন করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। কুমারসম্ভবে ব্রহ্মস্তোত্রে দেবগণ বলেছিলেন. "যদমোঘপা-মন্তরুপ্তং বীজমজ"[৬]—অর্থাৎ হে অজ, আপনার সৃষ্ট কারণবারিতে আপনি অব্যর্থ বীজ নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, সৃষ্টি-বাসনায় আপনি যে স্ত্রী-পুরুষরূপে নিজেকে বিভক্ত করেছেন, সেই প্রকৃতি-পুরুষ মিথুনরূপেই তাবৎ সৃষ্টির মাতাপিতা।[৭]

ভাগবতে ব্রহ্মা একই কথা বলেছিলেন দেবদেব পুরুষোত্তমকে.

"জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনি-বীজয়োঃ।
শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যৎ তদ্‌ব্রহ্ম নিরন্তরম্‌॥
ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ স্বরূপয়োঃ।
বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপদে যথা॥"[৮]

১° ভা ৮।১৫।১৭
২ উত্তরমেঘ।২১
৩ ভা° ৮।১৫।
৪ পূর্বমেঘ।৩২, বিক্রমোর্বশী ৩।১৭
৫ 'সাংখ্যদর্শন', বিবিধ প্রবন্ধ ৬ কুমার° ২।৫
৭ তত্রৈব ২।৪
৮২-৪৩

অর্থাৎ, জানি, আপনিই বিশ্বেশ্বর। জগতের যোনি ও বীজ যে শিব ও শক্তি, প্রকৃতি ও পুরুষ—আপনি সেই উভয়েরই কারণ নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ। ঊর্ণনাভের মতো অবিভক্ত শিবশক্তিরূপে এ-বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করছেন আপনিই।

ভাগবত ও কালিদাসের এই মিলনভূমিতে দাঁড়িয়ে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কোথায়। বস্তুত এ-সংস্কৃতিতে ধর্মদর্শন ও কাব্য পরস্পর বিরুদ্ধকোটিতে বাস করে না। তাই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়েও কালিদাসের কুমারসম্ভব বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের বার্তাবাহক হয়ে ওঠে, আবার প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হয়েও ভাগবত বিদ্যুদ্দস্ত হয়ে ওঠে কাব্যালোকের অত্যুজ্জ্বল অভিব্যঞ্জনায়। এ কথাটি মনে রেখেই ভাগবত-পরিচয়ের সর্বশেষ স্তরে আমাদের উপনীত হতে হবে।

ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্য বিচার

ভাগবত তার সামগ্রিক আবেদন রেখেছে কঠোর ধর্মশাস্ত্রবিদ্ বা শুষ্ক তত্ত্ব-জ্ঞানীর কাছে নয়, জগতের যত রসের রসিক, ভাবের ভাবুকের কাছে। বিষয়টির তাৎপর্য গভীর।

আসলে ভাগবত যখন বলে, "পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ"[১] —ভগবান্ বিশ্বভাবন হলেন পরোক্ষকথার প্রিয়, তখন সহজেই বোঝা যায়, বাচ্যার্থে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থেই এ-পুরাণের সমধিক প্রবণতা। আমরা জেনেছি, 'ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সম্মিতম্'[২]—এই ভাগবত পুরাণ হল ব্রহ্ম সম্মিত। ভগবানের মহিমাকীর্তন করেছে বলেই সার্থক এর নাম ভাগবত। সুতরাং হরির গুণকীর্তনশূন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যও যে এর দৃষ্টিতে "ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থ", নামান্তরে কাক-সেবিত তীর্থ বলে পরিগণিত হবে, এ আর আশ্চর্য কি। কিন্তু তাই বলে ভাগবত কাব্যসৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে, এ কথাও সত্য নয়। পরোক্ষ কথায় তার প্রবণতা কাব্যের মূলীভূত ব্যঞ্জনাধর্মের প্রতি তার সচেতনতাকেই প্রমাণিত করছে। আসলে পারমার্থিক প্রশ্নকে সামনে রেখেও কাব্যসৌন্দর্যের যে একটি রসঘন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা সম্ভব, ভাগবত তারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঋগ্বেদ, ঈশ-কঠ-কেন-ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যক

১ ভা° ৪।২৮।৬৫

২ ভা° ১।৩।৪০

ইত্যাদি উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস এবং ভগবদ্‌গীতাদি মোক্ষধর্মমূলক শাস্ত্রের মতো ভাগবতও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েও একই কালে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যও হয়ে উঠেছে। ঋগ্বেদের সারল্য ও মহিমা, উপনিষদের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-গত গভীরতা, রামায়ণের চিত্তদ্রাবী গুণ ও মহাভারতের জীবনজিজ্ঞাসা-কেন্দ্রিক বিশাল বিস্তার এবং ভগবদ্‌গীতার বিস্ময়রস সবই ভাগবতে পরমাস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্যরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-গোপীর ইহ-দুর্লভ প্রেম-সংগীতের যে নব নব স্বরলিপি আবিষ্কার করেছে, তা পার্থিব মানবীয় প্রেমসাধনার ক্ষেত্রেও অতিদূর স্বর্গলোকের যেন মায়াবিস্তার করে যায়। বস্তুত, ভাগবতের কৃষ্ণ-গোপীকথা পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ প্রেম-কাব্যের সঙ্গেই তুলনায় জয়ী হতে পারে। ভাগবতে পঞ্চাশের অধিক প্রকার ছন্দ নৃত্যায়িত হয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার শব্দ ও অর্থগত অলংকারই হয়েছে নিক্বণিত। এহো বাহ্য। আসলে কাব্যের যা মূলীভূত সৌন্দর্য, এ পুরাণে সেই রসধ্বনির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে একটি শ্যামল-কিশোর নবীন মেঘের আনন্দিত আবির্ভাবকে ঘিরে বিজলীরেখার মতো গূঢ়-সঞ্চারিণী চকিতা একদল আভীর কিশোরীর অপূর্ব অদ্ভুত আত্ম-জাগরণে বেদনামন্থনে। ভারতবর্ষীয় কবি-শিল্পী রসিক-ভাবুক প্রেমিক-দার্শনিকের কাছে এ এমনই এক কাঙ্ক্ষিত ভুবন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের শতধারে উচ্ছ্বসিত বিস্ময় প্রেম কল্পনা ধ্যান ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা এই চির-সৌন্দর্যধাম নিত্য-বৃন্দাবনের অভিসারে যাত্রা করে চলেছে। সংস্কৃতে তথা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পদাবলী, দূতকাব্য-খণ্ডকাব্য-নাটক-বিরুদাবলী রচনায় কিংবা শিলাপটে পর্বতগাত্রে লেখমালায় তূলিমুখে উৎকিরণে-অঙ্কনে অথবা ন্যূনাধিক সহস্র টীকাভাষ্য তথা একাধিক দার্শনিক প্রস্থান-প্রণয়নে ভারতীয় জনমনের সেই প্রবণতাই জয়যুক্ত। আধুনিক বাঙালী কবি যখন বলেন,

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
শ্রাবণের বরিষায় শরতের পূর্ণিমায়
উঠে বিরহের গাথা বনে-উপবনে"

তখন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃন্দাবন-বনস্থলীতে বিরহ-শর্বরীর অশ্রু-বর্ষণশ্রান্ত ভাগবতীয় ব্রজগোপীদের সেই অতিক্রান্ত শরৎ-পূর্ণিমার স্মৃতিচারণের করুণ গাথা সর্ব-ভারতীয় চিত্তের সিদ্ধরসরূপেই আত্মপ্রকাশ করে :

"তাঃ কিং নিশা স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে কণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িত-মনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ"[১]

গোপীরা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবকে, সেইসব রাত্রির কথা মনে পড়ে কি তাঁর? সেই যে কুন্দ-কুমুদে আর চন্দ্রালোকে রমণীয় রাত্রিগুলি আমাদের চরণনূপুরে শব্দিত হত, আর তিনি রাসগোষ্ঠীতে তাঁর এই দয়িতাদের সঙ্গে করতেন ক্রীড়া, অন্তরীক্ষে দেবতাদের কণ্ঠে তখন তাঁরই মনোজ্ঞ লীলাকথা গান।

বস্তুত, ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহবিলাপ যেমন বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের ধ্রুবরস, ব্রজগোপীর 'বিশ্লেষধিয়ার্তি' তেমনি শুক-ভাষিত ভাগবতের ধ্রুবপদ। তাই দেখি, শুধু গোপাগাথাতেই নয়, সমস্ত ভাগবতের কন্দরে কন্দরে বাজছে অনিঃশেষ বিরহসংগীত। পরমদয়িতের সঙ্গে দয়িতার বিরহ, পরমপুরুষের সঙ্গে তাঁর শক্তির, কখনও পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার, বিভুর সঙ্গে অণুর, অসীমের সঙ্গে সসীম প্রাণ-প্রকৃতির, রাজ-রাজেন্দ্র-রাজের সঙ্গে প্রিয়দাসের। একদিকে সংসারের ক্ষুদ্র কোটি তার চতুঃসীমায় নানা মায়ারূপের আড়াল রচনা করে প্রতিদিন বাঁধতে চাইছে তাকে, অন্যদিকে সব কিছু পেরিয়ে উঠে আসছে 'একটি কান্নাধন'—"কস্তদ্বিরহং সহেত"[২]—কে তাঁর বিরহ সহ্য করবে। ভাগবত ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ, সবই সত্য। কিন্তু "তোমার প্রতি অনাদরে প্রতিদিন আমার এ-দেহ বৃথা ব্যয় হচ্ছে"[৩]— এই নিরন্তর ক্রন্দনের অক্ষয় অশ্রুবিন্দুই ভাগবতের বাহ্য সকল ধর্মবিধানের কঠোর শুক্তিমালায় মুক্তা হয়ে ফলে উঠেছে। এখানেই ভাগবতের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে ভাগবত একখানি শ্রেষ্ঠ বিরহ-মহাকাব্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

ভাগবতের কাব্যসৌন্দর্যগত এই পরমবৈশিষ্ট্যের প্রতি না হলেও, তার অপরাপর দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি এমন কি বিদেশী সমালোচকদেরও

---

১ ভা° ১০।৪৭।৪৩

২ ভা° ৩।২।১৯

৩ ভা° ৪।২৪।৬৭

দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পুরাণের মধ্যে ভাগবতই প্রথম য়ুরোপে সম্পাদিত ও অনূদিত হয়।[১] এ কাজে অগ্রণী Burnouf য়ুরোপকে ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত করাতে গিয়ে তাঁর 'Le Bhāgavata Purāna' গ্রন্থের ভূমিকায় ইতোমধ্যে উল্লিখিত বৈদিকরীতির সারল্য ও ওজস্বিতা, মহাকাব্যিক বীররসমহিমা সহ এর এমন একটি বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করেছেন, যা এককথায় চমকপ্রদ। সেটি আর কিছুই নয়, "Great richness of modern poetry," ভাষান্তরে, আধুনিক কবিতার বিপুল ঐশ্বর্য। কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নেই।

কবিতার, বিশেষত আধুনিক কবিতার সর্বাধিক ঐশ্বর্য কোথায়, সে বিষয়ে নানামুনির নানামত। উপকরণ ও প্রকরণ নিয়ে দুই শিবিরের বিবাদ তো চিরকালের। তবু আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা বোধকরি একমাত্র 'রূপকল্পে'র প্রশ্নে এসেই কিছুটা উপশমিত হয়েছে। "Yet the image is the constant in all poetry, and every poem is itself an image."[২] সি. ডে. লুইসের এই বক্তব্যের মধ্যে চিরকালের আধুনিক কবিতার সত্য নিহিত রয়েছে—বাঙালী সমালোচকের ভাষায় বলা যেতে পারে, "বস্তুতঃ কাব্যের প্রাণ ইমেজ-প্রয়োগে। বাক্‌-প্রতিমার আলোচনায় প্রণিহিত হয় কবির শিল্পকারু, সংকেত পাওয়া যায় কবির ভাবজগতের"[৩]। যুগে যুগে নূতন নূতন ভাবধারা আসে যায়, বাক্‌শিল্প বদলায়, ছন্দোরীতি পালটায়, এমন কি মূলীভূত বিষয়বস্তুরও স্বীকৃত পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রাণ হয়ে, কবির অগ্নিপরীক্ষা আর গৌরবোত্তরণ স্বরূপ যুগে যুগে রয়ে যায় কাব্যালংকার। লুইসের ভাষায়, "but metaphor remains, the life-principle of poetry, the poet's chief test and glory."[৪] কাব্যালংকার আবার বিভিন্ন প্রকার, "তার মধ্যে সাদৃশ্যমূলক উপমা-রূপকাদি অলংকারের সঙ্গেই রূপকল্পের

---

১ "the First Purana that has been edited and translated in Europe" Winternitz, 'A History of Indian Literature', Vol.1, p. 555

২ 'The Nature of the Image', The Poetic Image, p. 17.

৩ 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র': রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা, অমলেন্দু বসু, রবীন্দ্রায়ণ ১ম খণ্ড, পৃ° ১৫৭

৪ 'The Nature of the Image', The Poetic Image, p. 17.

জন্মসম্পর্ক"[১] বলে জানিয়েছেন জনৈক সমালোচক। তাঁর মতে, "...অতিশয়োক্তি অলংকারের সঙ্গেই রূপকল্পের যোগসূত্র সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। আলংকারিকগণের কেউ কেউ মনে করেন অতিশয়োক্তি সমস্ত অলংকারের মধ্যেই বর্তমান থাকে। মহাকবিগণ যখন এর প্রয়োগ করেন তখন এক বিশেষ কাব্যচ্ছবি এর দ্বারা পুষ্ট হয়। 'কৃতৈব সা মহাকবিভিঃ কামপি কাব্যচ্ছবিং পুষ্যতি'...অতিশয়োক্তি অলংকারের স্বরূপ-বর্ণনায় আলংকারিক পরিভাষায় বলা হয়েছে এতে 'বিষয়ীর সিদ্ধ অধ্যবসায়' ঘটে। অর্থাৎ উপমেয়কে অন্তরালে রেখে উপমানকেই ইন্দ্রিয়বেদ্য করে তোলা হয়... অতিশয়োক্তি অলংকারে বস্তুরূপ নয়, কবিকল্পিত মায়ারূপেরই একাধিপত্য। এই মায়ারূপেরই অন্যনাম রূপকল্প"[২]। এখানে বলা প্রয়োজন, রূপকল্পেরও আবার চরম সিদ্ধি ঘটে প্রতীকোৎসারণে। এই যে প্রাথমিক স্তরে উপমা-রূপকের সহাবস্থান, তারপর অতিশয়োক্তি অলংকারের পথ বেয়ে রূপকল্পের কবি-কল্পিত মায়াজগতে প্রবেশ এবং তারই অন্তিম লক্ষ্যভেদ প্রতীকোৎসারিতায়—চিরকালের আধুনিক কবিতার এই বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য রূপদী কাব্য হিসাবে ভাগবতে আদৌ লভ্য কিনা বিচার করে দেখতে হবে।

প্রসঙ্গত প্রথমেই ঋগ্বেদীয় সর্বাস্তিবাদ-পরিভাবিত ভাগবতের বিরাট পুরুষের কল্পনাটি উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। "একটি মূর্তির মধ্যে বৈশ্বিক আয়তন দেখার শিল্প" যে কাকে বলে, ঋগ্বেদ-উপনিষদ-ভগবদ্-গীতার পর ভাগবতের বিরাটপুরুষের পুনরুজ্জীবিত ধারণাই তার আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে। তুলনার সুবিধার্থে সর্বাগ্রে 'সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ' পুরুষের বর্ণনায় ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত পুরুষসূক্তের অংশবিশেষ রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদে তুলে ধরা হলো :

"পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল। ইহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত দুই উরু, দুই চরণ, কি হইল? ॥ ১১ ॥ ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল ॥ ১২ ॥ মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু ॥ ১৩ ॥ নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ,

১ রূপকল্প: জগদীশ ভট্টাচার্য, 'কবি ও কবিতা' ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ° ২৮২

২ তত্রৈব।

দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হইল ॥ ১৪ ॥" [১]

পরমপুরুষের ধ্যানে উপনিষদের ঋষিও প্রত্যক্ষ করেছেন :

"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥

দ্যুলোক যাঁর মূর্ধা, চন্দ্র-সূর্য চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণ, বেদসমূহ বাগ্‌বিবৃত, বায়ু প্রাণ, নিখিল বিশ্ব হৃদয় এবং পৃথিবী পদদ্বয় থেকে জাত, সেই যে সর্বভূতান্তরাত্মা, ভগবদ্‌গীতায় তাঁরই 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' প্রকাশবিভূতি। গীতার একাদশ অধ্যায়ে দিব্যদৃষ্টি-প্রাপ্ত অর্জুন তাঁরই "অনেকবক্ত্রনয়নম্ "অনেকাদ্ভুতদর্শনম্" পুরুষোত্তম ঈশরূপ, নামান্তরে, "বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ" দেখে বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিত হয়েছেন। এখানেও ঈশের "অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্"[৩] রূপবৈভব।

পুরুষের বিরাটরূপ-ধারণা সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে ভাগবতে। সমগ্র ভাগবতে একাধিক বার এই বিরাটপুরুষের অনুধ্যান স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে পরীক্ষিতের কাছে শুকদেবের বর্ণনাই কাব্যাস্বাদনের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট। "পাতালমেতস্য হি পাদমূলং"[৪]—পাতাল তাঁর পাদমূল, এইভাবে বিরাটরূপের ধ্যানমন্ত্রের

---

১ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥
ঋ° ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত ১১-১৪ ঋক

২ মুণ্ডক, ২। ১৪

৩ গীতা° ১১। ১৯

৪ ভা° ২।১।২৬

সূচনা করে, "তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত। নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ"[১] আনন্দময় সত্যস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমের বিরাটরূপের ভজনাকেই জীবের নিঃশ্রেয়স নির্দেশ দিয়ে মোট চোদ্দটি শ্লোকে ধ্যানমন্ত্রের সম্পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। এই অপূর্ব ধ্যানে ঋগ্বেদ-উপনিষদ-গীতার অনুসরণে "কর্ণৌ দিশঃ" "চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ" "দংষ্ট্রা যমঃ" অর্থাৎ দিকসমূহ কর্ণ, সূর্যই চক্ষু, কাল দংষ্ট্রা ইত্যাদি বহুপ্রচলিত সুপরিচিত রূপবর্ণনা পেলেও নূতন মাত্রাও কিছু কম যুক্ত হয়নি। যেমন, জনোন্মাদকরী মায়া তাঁর হাসি বলে বর্ণিত, আর বিশাল দুর্গম এই সৃষ্টি তাঁর কটাক্ষ বলে।[২] বস্তুত ভাগবত যখন তাঁর ওষ্ঠকে বলে লজ্জা আর অধরকে লোভ[৩], তখন ওষ্ঠের আনম্র কারুকাজ আর অধরের সুতীব্র জীবনাসক্তিকে লক্ষ্য করার মতো কী সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি তার রয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তুলনায়, পাখিরা তাঁর বিচিত্র শিল্পকৌশল মনু তাঁর মনীষা, আর মানুষ তাঁর নিবাস: "বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং। মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ"[৪] খুব চমকপ্রদ বলে মনে হয় না। বিরাট্‌পুরুষের বর্ণনায় যে-শ্লোকটি আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে, সেটিও যে চাঞ্চল্যকর নূতন কোনো ব্যঞ্জনায় বিদ্যুদ্দন্ত এমন নয়; কিন্তু শব্দচয়নের অমোঘতায়, ছন্দোদোলনের আশ্চর্য মাত্রাজ্ঞানে সেটি এমনই একটি দুর্লভ সুষমা-সৌষ্ঠব লাভ করেছে যা শ্রেষ্ঠকাব্যেরই ইংগিতবাহী। শুকদেব বলছেন পরীক্ষিৎকে, হে কুরুবর্য, জানবেন মেঘপুঞ্জ তাঁর কেশ' সন্ধ্যা তাঁর অম্বর, অব্যক্ত প্রকৃতি তাঁর হৃদয়, আর চন্দ্র তাঁর সর্ববিকারের আশ্রয় মন :

> "ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্
> বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য ভূম্নঃ
> অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ
> স চন্দ্রমাঃ সর্ববিকারকোষঃ ॥"[৫]

১ ভা° ২।১।৩৯

২ "হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া
দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গ মোক্ষঃ" ২।১।৩১

৩ "ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো" তত্রৈব।৩২

৪ ভা° ২।১।৩৬

৫ ভা° ২।১।৩৪

বিরাটপুরুষের সঙ্গে রূপক হিসাবে সমগ্র বিশ্ব এখানে নিঃশেষে আকর্ষিত হতে হতে এমনই চরমতা প্রাপ্ত হয়েছে যে, উপমান হিসাবে তার আর পৃথক্ অস্তিত্ব রইল না। স্বভাবতই বিরাটপুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন বিরাট এক রূপকল্প।

কিন্তু এও তো ভাগবতের সম্পূর্ণ মৌলিক কবি-কল্পনা নয়। মৌলিক কবি-কল্পনার সন্ধানে অতঃপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের আলোচনা করা যাক। প্রথমটি আছে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে—কৃষ্ণের তিরোধানের পর যুধিষ্ঠিরের নানা অশুভ লক্ষণ দর্শনে। পরেরটি মিলবে ভাগবতেরই দশম স্কন্ধের দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে—মল্লযুদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে কৃষ্ণ মথুরায় এলে কংসের ভয়াবহ মৃত্যুভয় বর্ণনায়। দুটি দৃশ্যই অপ্রাকৃত, আধিভৌতিক। এ শ্রেণীর ঘটনা উপস্থাপনে শেক্সপীয়রীয় মুন্সিয়ানার সঙ্গেই সাধারণত আমরা পরিচিত আছি। তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় কবি-লেখনীও যে কত ঋজু, সিদ্ধ এবং দক্ষ, তা নিম্নের উদাহরণদ্বয়ই প্রমাণ করবে।

যুধিষ্ঠির বলছেন, এই যে এই শৃগালীটি সূর্যের দিকে যেন অনল বমন করতে করতে ভীমরবে চীৎকার করছে, আর এই কুক্কুরটিও আমার মুখের দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আর্তনাদ করছে। যাদের দর্শনে মঙ্গল, সেই গো প্রভৃতি পশুরা আমাকে বামে রেখে চলে যাচ্ছে, আর গর্দভ কিনা আমাকে করছে প্রদক্ষিণ! আমার অশ্বগুলির দিকে চোখ পড়লে মনে হয় তারা কাঁদছে। এই কপোতও যেন মৃত্যুদূত। আর কুৎসিত কলরবে যারা আমার হৃদয়-মন কাঁপিয়ে তুলছে সেই পেচক আর কাকের দল কি জগৎ শূন্য করে ফেলতে চাইছে? দিক্‌দিগন্ত ধূসর, যেন মণ্ডলাকারে পৃথিবী ঢেকে দিতে আসছে তারা। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে স-পর্বত মেদিনী, ক্ষণে ক্ষণে শুনছি মেঘগর্জন—বিনামেঘেই একী ভীষণ বজ্রপাত! ধূলিঝঞ্ঝায় চতুর্দিক অন্ধকার করে দুস্পর্শ হাওয়া বইছে, কী বীভৎস, শোণিত-বর্ষণ করছে মেঘ! সূর্য হতপ্রভ, গ্রহরা পরস্পর যুযুধান, শ্বাপদে প্রমথে মিলে দ্যুলোক ভূলোক যেন দহন করে ফিরছে। নদ-নদী-সরোবর জীবহৃদয় সব কিছুই ক্ষুভিত। ঘৃত-সেকেও যখন আর অগ্নি জ্বলেন না, তখন বুঝতে হবে, এই কাল আমাদের কী অমঙ্গলই না বিধান করবেন। বৎসরা দুগ্ধপান করছে না, গাভীরা দুগ্ধদান করছে না, অশ্রুমুখী হচ্ছে গাভী, বিষণ্ণ হচ্ছে গোষ্ঠগত বৃষ। মন্দিরে দেবপ্রতিমাও যেন অশ্রুপাত করছেন, ঘর্মাক্ত হচ্ছেন, কখনো আবার চলিতও

হচ্ছেন। জনপদ গ্রাম নগর উদ্যান আকর আশ্রম সবই শোভাশূন্য নিরানন্দ। না জানি কী অমঙ্গলই ঘটবে। সর্বশোভার আকর যিনি সেই পরমপুরুষের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণের স্পর্শসৌভাগ্য থেকে তবে কি পৃথিবী এতদিনে বঞ্চিতা হল ?[১]

উপরি-উক্ত বর্ণনায় খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবেও যেমন তেমনি মিলিতভাবেও অমঙ্গলের শ্বাসরোধী একটি অখণ্ড পরিবেশ রচনাতেও সমান সার্থক রূপকল্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ অভিনবত্ব থাকলেও এও তো ভারতীয় জীবনের তথা কাব্যের যুগ-যুগান্তর লালিত সংস্কারগুলির সঞ্চয়ন।

তুলনায় কংসের মৃত্যুভয় বরং মৌলিকতায় অনেক বেশী ভাস্বর। ভাগবতের বিবরণ অনুসারে কংস তার প্রবল মৃত্যুভয়ের মুহূর্তে জলে তার প্রতিবিম্ব দেখল—মুণ্ডহীন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে দেখতে লাগল দুই দুই।

---

১ "শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা।
মামঙ্গ সারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ॥
শস্তাঃ কুর্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম॥
মৃত্যুদূতঃ কপোতোঽয়মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ॥
ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ।
নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ॥
বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ।
অসৃগ্‌ বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্বতঃ॥
সূর্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি।
সসংকুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে রোদসী ইব॥
নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ।
ন জলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি॥
ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে॥
দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ॥
মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা॥" ১।১৪।১২-২১

নিজের ছায়াকে দেখল ছিদ্রময়। কানে শুনল একটানা ঘোষধ্বনি। শ্যাম তরুকে দেখল পীতাভ। আর ধূলিতে পড়তে দেখল না নিজের পদচিহ্ন। স্বপ্নে সে শুধু মৃতদেরই সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো, কখনো গর্দভবাহিত হয়ে চলল, কখনো করল বিষপান, শেষে চলে গেল জবাফুলের মালা গলায় তৈলাক্ত নগ্ন দেহে, একা। স্বভাবতই সেই মরণসন্ত্রস্ত চিন্তায় চিন্তায় আর ঘুমোতে পারে না।[১]

এই জবাফুলের মালা গলায় তৈলাক্ত নগ্ন দেহে একা চলে যাওয়ার মৃত্যুভয়পীড়িত দুঃস্বপ্নটি স্বপ্নতাত্ত্বিকদের কাছে বিস্ময়কর প্রতীকোৎসারিতা লাভ করবে।

প্রতীকের প্রশ্নে ভাগবত সম্বন্ধে একটি তথ্য স্বীকার করে নিতে হয়। যেহেতু গোত্রপরিচয়ে ভাগবত হলো পুরাণ তথা ধর্মশাস্ত্র, তাই এর শ্লোকে শ্লোকে বিকীর্ণ রয়েছে নানা সংকেত, নানা মন্ত্ররহস্যের কুহক, প্রতীক-মায়ার আবরণ। কিন্তু এই সংকেতে-মন্ত্রে-প্রতীকে ঘেরা অতীন্দ্রিয় রহস্যপুরীর চাবিকাঠি আদৌ কাব্যলোকের বাসিন্দার হাতে পড়ে কিনা সন্দেহ। এর কক্ষ থেকে আরো দূর কক্ষের ভিতরে যাবার সোপান একমাত্র ভক্তেরই মণিদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, কবির বা কাব্যরসিকের মানস-মায়াদর্পণে প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভক্ত ও কবির মধ্যে এতৎসত্ত্বেও 'কোনোখানে আছে কোনো মিল।' আসলে তাঁদের দাঁড়াবার ভূমি এবং মাথা গোঁজবার আকাশ, এ-দুটি যদি পৃথক্‌ও হয়, অর্থাৎ একজন যদি সংসারের বাইরেই দাঁড়ান, অন্যজন সংসারের মাঝখানেই, একজন যদি বৈকুণ্ঠকে চান, অন্যজন কুণ্ঠাহীনভাবে মানুষকেই, তাহলেও মধ্যের শূন্যটাকে তাঁরা উভয়েই মানুষের ভাষাতেই, বিরহের কান্নাভরা মেঘে কিংবা ক্ষণ-

[১] "অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা॥
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ।
স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্॥
স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যৈকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ॥
অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া॥" ১০।৪২।২৮-৩১

মিলনের আনন্দ-বিচ্ছুরিত আলোর কণাতেই তোলেন ভরিয়ে। তাঁদের উভয়েরই সাধনা রসের সাধনা, প্রেমের সাধনা। তাঁদের দুদলেরই সাধনাঙ্গ 'কীর্তন'। কীর্তনে, নামান্তরে ভাষাবাহিত স্বরসাধিত রসচর্চায় কবির কণ্ঠে যেমন লাগে ভক্তের তন্ময়তা, ভক্তের কণ্ঠে তেমনি আবার ফোটে কবির বৈদগ্ধ্যভণিতি। শ্রেষ্ঠ ভক্তের তাই শ্রেষ্ঠ কবি হতে বাধা নেই—তাঁর ভক্ত-হৃদয়ের গুহামুখে উৎসারিত প্রতীকও তখন আর দুর্বোধ্য নিগূঢ় ধর্মাচরণ-বিধির চতুঃসীমায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে সর্বরসিকচিত্তের আস্বাদনের বস্তুই হয়ে ওঠে। ভাগবতে কৃষ্ণের রূপমাধুর্য এবং ললিত বাঁশরীটিও ঠিক তেমনি সর্বজনীন প্রতীকে পরিণত।

ভাগবতে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'নটাচার্য'। এক এক ভক্তদর্শকের দৃষ্টিতে তাঁর এক এক বররূপ প্রকাশিত। মূলে তিনি সেই একই 'গোপবেশ বেণুকর' হলেও ভক্তচিত্তের ভাবভেদে তাঁর অতি সূক্ষ্ম রূপভেদও ঘটে গেছে। যেমন ধরা যাক্ ভীষ্ম, অন্তিম শরশয্যায় তাঁকে দেখেছেন "ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরবরাম্বরং"[১] মূর্তিতে। এই অখিলশোভন তমালঘন কান্তিকে রবিকরোজ্জ্বল অম্বরখানি ঘিরে থাকার ইংগিতে তুচ্ছ গোপবেশ সহসা যে বিশ্বায়তন লাভ করে বসে,তাতেই বিস্ময়-প্লাবিত হয়ে ভীষ্মের মতো মহাপ্রয়াণযাত্রীর পক্ষে কাছের বিগ্রহে আর "সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" সর্বভূতান্তরাত্মায় "বিধূতভেদমোহ" বা সর্বভেদ-বিগলিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আবার দেখা যাক্ ব্রহ্মা তাঁর কোন্ রূপ দেখে বিহ্বল। বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোষ্ঠে প্রাকৃত আভীর বালকের মতোই ধুলো-খেলে-ফেরা সেই এক 'গোপবেশ বেণুকরে'রই দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মা যা দেখলেন তা ভীষ্মের মতো পরমবিশ্বাসী ভক্তের শান্তরসাক্রান্ত দর্শন নয়। গোপবেশের অন্তরালবর্তী 'ঈড্য' বা বন্দনীয়কে ব্রহ্মা একবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর কাছে পরমদর্শন এসেছে অবিশ্বাসীর সংশয়জাল ছিন্ন-করা অকস্মাৎ বিদ্যুতের মতো। এবার তাই আর তমালবর্ণে রবিকর-গৌরবরাম্বর নয়, অভ্রবপুতে তড়িদম্বর, অর্থাৎ নীলমেঘে খেলছে বিজুলীরেখা। সেই সঙ্গে কর্ণে দুলছে গুঞ্জার অবতংস, চূড়ায় শিখিপুচ্ছ,

১ ভা° ১।৯।৩৩

কণ্ঠে বনপুষ্পমালা, হাতে তাঁর বেত্রবিষাণবেণু, দুইপদে চির-শ্রীনিকেতন।[১]

কৃষ্ণের এই একই 'গোপবেশ' আবার অনুরাগবতী বিপ্রবধূদের দৃষ্টিতে কেমন আর একটু অভিনবত্ব লাভ করেছে, এবার তারই সন্ধান করতে হয়। বিপ্রবধূরা শান্তভক্ত নন। তাঁরা কৃষ্ণে গোপীদের মতোই 'সর্বসম্বন্ধবিস্মারী' প্রেম অর্পণ না করলেও একান্তভাবে মধুর-ভাবাপন্নাই। সুতরাং অশোকের নবপল্লবে মণ্ডিত যমুনার উপবনে তাঁদের সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দয়িত-দর্শন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। তাঁরা দেখছেন "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং"[২]—হিরণ্যপরিধি শ্যাম। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে শৃঙ্গারের বর্ণ শ্যাম। পরমরস মধুরে তাই শৃঙ্গারী শ্যামেরই রূপ পরম ধ্যেয় "শ্যামমেব পরং রূপং"। আর প্রচলিত অর্থে 'হিরণ্যপরিধি' যদিও 'স্বর্ণকান্তি পরিধেয় যাঁর সেই পুরুষ'কেই মাত্র বোঝায়, কিন্তু রাসপঞ্চাধ্যায় যাঁর পড়া আছে, একমাত্র তিনিই বুঝবেন, এই 'হিরণ্যপরিধি' কথাটির মধ্যে পূর্বাহ্ণেই কী ব্যঞ্জনা সঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। রাসে 'গোপীমণ্ডলমণ্ডিত' কৃষ্ণকে বলা হয়েছে "মধ্যে হৈমানাং মহামরকতো"—হেমমধ্যে মহামরকত। এটি তেত্রিশ অধ্যায়ে মেলে, আর হিরণ্যপরিধি তেইশ অধ্যায়ে। দশ দশটি অধ্যায় আগে থেকেই বিপ্রবধূ-সংবাদ ইত্যাদির অবতারণা করতে করতে অন্তরঙ্গ পরিকরদের কাছাকাছি আনতে আনতে ভাগবত-কথক ক্রমশ বহির্মুখী মনকে কিভাবে কূটস্থ রাসলীলার অভিমুখীন করে তুলছেন, এ তারই ইংগিত বহন করছে। তাই হিরণ্যপরিধি শ্যামরূপের কথা বলে উক্ত বধূরা শৃঙ্গার-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণকেই শুধু প্রত্যক্ষ করালেন না, তাঁর মধুর-লীলা-স্বভাবী স্বরূপেরও পূর্বভূমিকা রচনা করে রাখলেন। হিরণ্যপরিধি তাই শুধু

---

১ "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥'
১০।১৪।১

২ "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥'
১০।২৩।২২

পীতবাসের কথাই বলছে না, রসিকের কাছে স্বর্ণকান্তি ব্রজবধূদের কৃষ্ণাশ্লেষ-প্রণয়কে নিবিড় করেও তুলছে। বিপ্রবধূরা কৃষ্ণের যে-রূপ দেখেছিলেন, তাকে বলা হয়েছে 'নটবেশ'—ধাতুপ্রবাল ধারণে অনুব্রতী সখার স্কন্ধে হস্তার্পণে কিংবা দক্ষিণকরে একটি লীলাকমলের সকৌতুক ঘূর্ণনে সে-বেশ তাঁর সম্পূর্ণায়িত। অপরপক্ষে ব্রজগোপীদের কৃষ্ণদর্শন ঘটেছিল তাঁর 'নট' বেশে নয় 'নটবর' বপুতে। স্মরণীয়, ভীষ্ম ব্রহ্মা তো ননই, বিপ্রবধূরাও কেউ ব্রজগোপীদের কৃষ্ণদর্শনের অলৌকিক চক্ষু পাননি। আসলে পরমদয়িতকে দেখতে গিয়ে তাঁদের তো শুধু চোখই নয়, পদ্মলুব্ধ ভ্রমরের মতো একই সঙ্গে উড়ে পড়েছে দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ-রসাস্বাদন আর ঘ্রাণজ মিশ্র সংবেদন। বিশেষত কৃষ্ণ আর তাঁর বাঁশী ব্রজবধূর কাছে যে অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করেছে এমন আর কারো কাছে নয়। বাঁশীই তাঁদের কাছে কৃষ্ণ হয়ে ওঠে যখন দেখি দূরবনে কৃষ্ণের মুরলীধ্বনিই কাছে এসে তাঁদের স্মরবেগে-বিক্ষিপ্ত মনে রূপ নিচ্ছে কৃষ্ণমূর্তির—'বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং'[১]। মনে রাখতে হবে, ইনি চন্দ্রাপীড় নন, বর্হাপীড। চন্দ্র যাঁর শিরোভূষণ সেই চন্দ্রাপীড মদনের বাণে ক্ষণপরাভূত হয়েই ক্রোধে ভস্ম করেছিলেন তাকে। আর ময়ূরপুচ্ছ যাঁর চূড়ায়, তিনি তো মদনমোহিত নন, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ, অর্থাৎ মন্মথকেও মোহিত করাই তাঁর ধর্ম। সুতরাং গোপীরা এঁকে 'নটবর' বলবেন এ আর বিচিত্র কি। গোপীদের দেখা নটবরবপু অবশ্য খুবই অভিনব। কেননা এবার আর গুঞ্জার অবতংস নয় কর্ণিকার শোভা পাচ্ছে দুটি কানে, পরিধানেও কনকে মিশেছে কপিশ, এমন শোভা বনমালাটির যেন সেটি স্বর্গের বৈজয়ন্তী মালাই, অধরসুধায় বেণুরন্ধ্র ভরিয়ে পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করতে চলেছেন তিনি বৃন্দাবনের বনস্থলীতে। এখানে ময়ূরপুচ্ছ, কর্ণাবতংস এবং কনককপিশ বসনে পাচ্ছি দৃষ্টি সংবেদন, বৈজয়ন্তীমালায় ঘ্রাণ-সংবেদন, অধরসুধায় স্বাদ, বেণুরবে শ্রবণ, সবশেষে পদচিহ্নের প্রসঙ্গে স্পর্শ—এক বাঁশীর তানই এইভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়কে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে। বস্তুত আর সর্বত্র কৃষ্ণের রূপমাধুর্য

১ "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্‌।
রন্ধ্রান্‌ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীর্তিঃ ॥" ১০।২১।৫

বংশীচাতুর্য রূপকল্পিত মাত্র, এক ব্রজবধূতেই তার প্রতীকচারিতা। দশম স্কন্ধের এই একবিংশ অধ্যায় থেকেই একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক্।

দূর গোষ্ঠে কৃষ্ণের বেণুনাদ শুনে এক একজন গোপী নিসর্গপ্রকৃতির এক এক আনন্দবিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কেউ দেখাচ্ছেন, বাঁশী বাজলেই হ্রদিনীরা কেমন কমলে পুলকব্যাপ্তা হয়[১]; কেউ দেখাচ্ছেন, মত্ত ময়ূর নাচে, আর তাই দেখে গিরিগুহার অন্য প্রাণীরাও হয় আনন্দবিবশ,[২] কল্পনানেত্রে আবার কেউ এও দেখতে পান যে, কৃষ্ণসারের সঙ্গে হরিণীরা এসে প্রণয়াবলোকনে কৃষ্ণের পূজা করছে[৩]। এমনকি বিমানগতা দেবীদের "মুমুহুর্বিনীব্যঃ" অর্থাৎ মুহুর্মুহু মোক্ষনীবি হতেও দেখছেন কেউ কেউ।[৪] গাভীদের আনন্দাশ্রুকলায় পরিব্যাপ্ত হতেও দেখেন কেউ কেউ,[৫] পক্ষীদের বিগতবাক্ হতে,[৬] নদীদের কমলোপহার নিয়ে ভুজাশ্লেষে তাঁর পদালিঙ্গন করতেও,[৭] —এমন কি প্রেমবশত মেঘের আতপত্র ধারণও[৮] তাঁদের কারো কারো দৃষ্টি এড়ায় না। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে স্থাবর-জঙ্গম নির্বিশেষে দেহধারী মাত্রেই কৃষ্ণের বেণুনাদে অস্পন্দ পুলকিত হয়ে ওঠে।[৯]

এই যে আমরা ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের নবম শ্লোক থেকে উনবিংশ শ্লোকের সারাংশ তুলে ধরলাম, এদের মাঝখানে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক দুটি বাদ পড়েছে। এরই একটিতে আছে, দয়িতা-কুচমণ্ডলের

---

১ "হ্রদিন্যো হৃষ্যত্বচঃ" ১০।২১।৯

২ "মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্" তত্রৈব।১০

৩ "হরিণ্য এতা…/ আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ /
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥" তত্রৈব।১১

৪ "দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা…মুমুহুর্বিনীব্যঃ" ১০।২১।১২

৫ "গাবশ্চ…দৃশাশ্রুকলাঃ" তত্রৈব।১৩

৬ "বিহগা…বিগতান্যবাচঃ" তত্রৈব।১৪

৭ "আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে-
গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ"
তত্রৈব।১৫

৮ "প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্"
তত্রৈব। ১৬

৯ "অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং" তত্রৈব। ১৯

কুঙ্কুম কৃষ্ণের বক্ষ রঞ্জিত করে তারপর স্খলিত হয়ে পড়েছে তৃণদলে, শবররমণীরা তাই মুখে লেপন ও বক্ষে ধারণ করে বক্ষ-তাপ স্মরজ্বালা উপশান্ত করছে দেখে কোনো গোপরমণীর অসূয়া খেদ।[১] অপরটিতে স্থান পেয়েছে কৃষ্ণ-পাদস্পর্শে পুণ্য 'হরিদাসবর্য' বা কৃষ্ণের সেবক-শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন পর্বতের মহিমাকীর্তন।[২] বস্তুত প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শ্লোক দুটি আদৌ বংশীমহিমাগত নয়, কাজেই প্রক্ষিপ্ত। আবার গোপীদের পক্ষে স্মরবেগে বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেও এ-বিপর্যয় ঘটতে পারে। কিন্তু রসিকের দৃষ্টিতে এই আপাত বিপর্যয়ের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে একটিমাত্র সম্ভাষণে। সেটি আর কিছু নয়, সতের সংখ্যক শ্লোকে গোপী কৃষ্ণকে বলেছেন 'উরুগায়'। বেদোপনিষদে উরুগায় হলেন 'বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল যিনি' সেই ত্রিপাদবিভূতি বিষ্ণু—তিনটি মাত্র পদেই তিনি ত্রিভুবন বিজয় করেছিলেন। ভাগবতে তিনিই আবার হয়ে গেলেন "উরুধা গীয়তে ইতি শ্রীকৃষ্ণঃ"—অর্থাৎ বেণুতে গান করেন যিনি সেই বেণুবাদক কৃষ্ণ।[৩] পূর্বাচার্য বৈষ্ণব টীকাকারগণের কেউ কেউ যে 'উরুগায়' শব্দ-প্রয়োগে বেণু-সম্বন্ধ সূচিত হতে দেখেননি, এমন নয়। কিন্তু তাঁরা সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করতে ভুলে গেছেন, বেণুই এখানে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে এসে দাঁড়িয়েছেন গোপীর কাছে, কৃষ্ণের বক্ষ অন্য কোনো সৌভাগ্যবতীর কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়েছিল

১ "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্"
[illegible] । ১৭

২ ভা° ১০।২১।১৮

৩ 'উরুগায়' শব্দটি ব্যাখ্যায় শব্দকল্পদ্রুমের ঈষৎ ভিন্ন ভাষ্যে আছেঃ
"(উরুভির্মহদ্ভির্গীয়তে যঃ। উরু+গৈ+ঘঞ্।)
শ্রীকৃষ্ণঃ। (যথা, শ্রীভাগবতে ২।৩।২০)
"জিহ্বা সতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ"।
বিস্তীর্ণা গতিঃ। যথা, কঠোপনিষদি। ২।১১।
"স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠান্ দৃষ্ট্বা ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ"। উরুগায়ং বিস্তীর্ণাং গতিং।
ইতি ভাষ্যম্।)

এবং তারপর তা তৃণে স্খলিত হয়ে এখন শবরীদের বক্ষ-তাপ নিবারণ করছে, এই পরোক্ষ প্রকাশ-কৌশলের তির্যক্ ভঙ্গিতে পূর্বরাগের লালসোদ্বেগ এবং অসূয়ামূলক বৈয়গ্রাই পরমাস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, সব গোপীদের কাছেই মুরলীধ্বনি এসেছিল দয়িতের দ্বিতীয় রূপ ধরে—তাতেই এক এক জনের এক এক ভাববিকার নিসর্গপ্রকৃতির বিকার-ছলেই আবার গোপনও করতে হয়েছে। কিন্তু যিনি পুলিন্দরমণীদের 'হৃদ্রোগ' উপশমের প্রসঙ্গ তুললেন, তাঁর বিকারই সবচেয়ে চরমতা প্রাপ্ত। মুরলীরব এখানে আর দ্বিতীয় কৃষ্ণরূপ নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রতীতিই—তাই এ প্রতীতির প্রেক্ষাপটে গোপীর ঈর্ষা অকস্মাৎ এমনই নিরাবরণ ভাবে তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে আসে যে, পরক্ষণেই সচেতন হয়ে নিজের অন্তরের অন্তরাল রচনা করতে হরিদাস-বর্য গোটা গোবর্ধন পর্বতকেই টেনে আনতে হলো। সনাতন গোস্বামী, এই দুটি শ্লোক "মহাভাবস্ফুরদুন্মাদতয়া" অর্থাৎ মহাভাব-স্ফুরিতা উন্মাদিনী কোনো গোপীর বলে ভুল করেননি। আসলে অন্যান্য গোপীদের কাছে কৃষ্ণের বনিতোৎসব রূপশীলতা বা গীতকীর্তিমাধুরী আলাদা আলাদা করে যখন উদ্দীপন বিভাব হয়ে আসে, মহাভাবস্বরূপিণী কোনো একজনের কাছে তখন তা আসে একই সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাবার অখণ্ড প্রেরণা রূপে। তাই অন্যের কাছে যখন কৃষ্ণের বাঁশী কৃষ্ণের দ্বিতীয় সত্তা, কোনো একজন মহাভাবোন্মাদিনীর কাছে তখন তা স্বয়ং কৃষ্ণ।

আধুনিক কবিও যখন আধো ব্রজবুলির উজান টানে দূর যমুনার দূরস্মৃত প্রেমতরঙ্গে আর একবার রসের রসিক ভাবের ভাবুক হয়ে অবগাহন করতে চেয়েছেন, তখন তাঁরও প্রেমপ্রবুদ্ধ প্রাণ বাঁশীর গানে শুধু এই দেখেনি যে 'বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,' দেখেছে নীলনীরে ধীর সমীরণের নিঃশব্দ আত্মসর্জনের মতোই আব্রহ্মস্তম্ভ এক পরম-নীলকান্ত বিস্ময়ের কাছে বিকশিত-যৌবন গোপবধূর নির্বৃত আত্মদান :

"......শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল

চরণকমলযুগ ছোঁয়।	কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়!
গোপবধূজন বিকশিতযৌবন	পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর-'পর	ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।	কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়!"

"কো তুঁহু"? কে তিনি, কৃষ্ণ নাকি বাঁশির একটি সুর? কৃষ্ণ ও বাঁশরী, বাঁশরী ও কৃষ্ণ দুইয়ে মিলে এইভাবেই অখণ্ড এক প্রেম-প্রতীক। এই চির-আধুনিক প্রতীক রচনায় ভাগবত তাই চিরকালের আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তার শিল্পসাধিত অধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সন্দেহ নেই, ধর্মশাস্ত্র হিসাবে কখনো কখনো ভাগবত কাব্যের নিয়ম অবশ্যই লঙ্ঘন করে গেছে। সেইসব মুহূর্তে সে এতবড়ো সুন্দর বিশ্বকেও মায়ারচিত স্বপ্নগন্ধর্ব-নগর বলে উপহাস করতেও ছাড়েনি। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও যে নিখিল সৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরমমধুর হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটিই ভাগবতের রস-রসিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে মুহূর্তে সে জেনেছে, এ অনন্ত-চরাচর আনন্দময়েরই পরমরূপের বিকাশ—সে-মুহূর্তটি থেকেই সে যে-কোনো একরূপে যে-কোনো একভাবে জন্মগ্রহণ করে 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া'র অখণ্ড লীলারস-পাত্র নিঃশেষ করতেই চেয়েছে। তখন সমস্ত স্বর্গভূমিই নেমে এসেছে তার সামাস্বর্গের সীমানায়—তখন আচার্যকেই দেখেছে সে সাক্ষাৎ বেদের মূর্তিরূপে, পিতাকে প্রজাপতি রূপে, মাতাকে বসুন্ধরারূপে।[1] তখন ভ্রাতার মুখেই মরুৎপতির, ভগিনীর মুখেই দয়ার, অতিথির মুখেই ধর্মের, অভ্যাগতের মুখেই অগ্নির, নিখিল প্রাণসত্তায় সর্বভূতান্তরাত্মার বিভা দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছে।[2] আনন্দে অধীর হয়ে স্থল-জল-অনিল-আকাশকে শুনিয়ে সে বলেছে :

"অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥"[3]

মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়ে এই যে পুণ্যশ্লোকের কীর্তিগানে শুদ্ধশ্রবণ মহাত্মাদের প্রভূত সংসর্গ পেয়েছি, এর তুলনায় স্বর্গের দেবতা হয়েও জন্মানো কতটুকু। মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ জন্ম, এর চেয়ে পরতর আর কী থাকতে পারে!

১ "আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্মূর্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ॥" ৬।৭।২৯

২ "দয়ায়া ভগিনী মূর্তির্ধর্মস্যাত্মাঽতিথিঃ স্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্তিঃ সর্বভূতানি চাত্মনঃ॥" তত্রৈব।৩০

৩ ভা° ৫।১৩।২১

কঠোর ধর্মশাস্ত্রবিদ্ বা শুষ্ক তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে নয়, রসিক-ভাবুকের কাছেই কেন ভাগবতের সামগ্রিক আবেদন, এখানে এসেই তা সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। চান্দ্রায়ণাদি কোনো একটি ব্রতপালন করে গোপুচ্ছ-ধারণে একবার কোনোমতে বৈতরণী পার হবার ব্যগ্রতা ভাগবতের নেই, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় 'চতুর্বর্গ-ফলপ্রাপ্তির দুরাশাবশে এতবড়ো বিরাটসৃষ্টিকে 'মিথ্যা' বলার জবরদস্তিও নয়, সে তার চারপাশের সমস্ত কঠোর তিক্ত রুক্ষ নির্মম সত্যকে স্বীকার করেও সর্বোপরি একটি গভীর অন্তর্লীন আনন্দের আহ্বানে ক্রমশ আলোর দিকে উদ্গত পদ্মকলির মতোই ফুটে উঠতে চেয়েছে। এখানেই ভাগবতের 'দুশ্চর প্রকাশ-সাধনা, এখানেই তার পরম রস-সিদ্ধি ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস

বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস

বাঙলাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস প্রণয়নে ড° সুকুমার সেনের অভিমত দিয়েই শুরু করা যাক :

"পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সর্বানন্দ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টীকাসর্বস্বে বহু পুরাণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে হরিবংশ আছে বিষ্ণুপুরাণ আছে কিন্তু ভাগবত পুরাণ নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই পরম গ্রন্থখানি তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দে মহিস্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট (ইনিও বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন) অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন 'পদচন্দ্রিকা' নামে। তাহাতে আরও বেশি গ্রন্থের নাম ও উদ্ধৃতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই। সুতরাং এ অনুমান অপরিহার্য হইতেছে যে পঞ্চদশ শতাব্দের প্রথমার্ধেও বাঙ্গালাদেশে ভাগবত পুরাণ অজ্ঞাত ছিল। অথচ দেখিতেছি যে গৌড়-সুলতান সংবর্ধিত মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন এবং গৌড়ে রামকেলি গ্রামে সুলতান হোসেন শাহার মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাব্দের শেষের দিকে ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তীরহুতে ভাগবত পৌঁছিয়াছিল। ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে (১৪৬৮) বিদ্যাপতির হাতে নকলকরা ভাগবত-পুরাণের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১] পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধে বাঙ্গালায় এবং মিথিলায় ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত ॥'

"পঞ্চদশ শতাব্দে কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত পুরাণকে উৎস করিয়া। এই স্রোতের মুখ যিনি প্রত্যক্ষত খুলিয়া দিয়াছিলেন তিনিই চৈতন্যের আগমনের পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরী, অদ্বৈতমতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী কিন্তু কৃষ্ণরসে ভরপুর।...হয়ত মাধবেন্দ্রের দ্বারাই ভাগবত বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।"[২]

ড° সেনের উপরি-উদ্ধৃত এই দীর্ঘ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা মোট দুটি সূত্র পাই :

---

১ 'বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী', পৃ° ১৭

২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃ° ৯৫-৯৬, ১২৬।

১. পঞ্চদশ শতাব্দের শেষার্ধের পূর্বে বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত পরিচিত ছিল না। সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' যা ড° সেনের মতে "দ্বাদশ শতাব্দের মাঝামাঝি" [১] প্রণীত এবং বৃহস্পতি মিশ্রের 'পদচন্দ্রিকা' যা তাঁর মতে "পঞ্চদশ শতাব্দে" [২] রচিত তার একখানিতেও ভাগবতের নাম উল্লিখিত না হওয়ায় এ বিষয়ে ড° সেন নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

২. তীরহুতে অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমদিকেই ভাগবত এসে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। বিদ্যাপতির হাতে নকল করা ভাগবত পুঁথির তারিখ ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবৎ, অর্থাৎ ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। বাঙ্‌লাদেশে তখনও ভাগবত এসেছে কিনা জানা যাচ্ছে না। তবে ১৪৬৮ সনের ঠিক পাঁচ বছরের মধ্যেই ১৪৭৩ সনে মালাধর ভাগবত অনুবাদ করছেন। ড° সেনের অভিমত স্বীকার করলে বলতে হবে, এই সময়ই মাধবেন্দ্রপুরী ভাগবত প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ সনে। অতএব বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত প্রচারের কুড়ি বছরেরও কম সময়ের মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব। অর্থাৎ, প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে—১৪৬৮-১৪৭৩ মাত্র এই পাঁচ বছরেই ভাগবতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ। আর মাধবেন্দ্রই সেই প্রচার-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয়-পুরুষ।

এবার ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত বিচার করে দেখা যাক।

আমরা প্রথম অধ্যায়েই দেখেছি, ভাগবতের রচনা বা 'আবির্ভাব' কাল যে-শতাব্দীতেই হয়ে থাকুক না কেন, ১০৩০ সনের পরে নয়। কেননা ঠিক একই বৎসরে লিপিবদ্ধ আলবেরুণীর ভারতবিবরণে ভাগবত উত্তরভারতে বিশেষ প্রচারিত পুরাণ বলে উল্লিখিত। সেই সঙ্গে আমরা এও দেখিয়েছি, একাদশ শতাব্দী দূরে থাকুক, তারও বহুপূর্বে ভাগবত সারা ভারতব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তাই হিউ-এন-সাঙ্‌য়ের বিবরণে কেউ ভাগবতের নাম পান, কেউ আবার আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত 'সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' গ্রন্থের বেদান্ত-পক্ষ-প্রকরণে ভাগবতের উল্লেখ লক্ষ্য করেন এবং রামানুজের শ্রীভাষ্যে না পেলে' বেদান্ততত্ত্বসারে একই নাম উল্লিখিত হতে দেখেন। সেই সঙ্গে সপ্তম আলবার কুলশেখরের মুকুন্দমালাতেও আমরা পাই ভাগবতের

১ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃ° ৩৮

২ তত্রৈব, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ° ৯৬

১১।২।৩৬ সংখ্যক শ্লোকের উদ্ধৃতি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত বিশেষ প্রচারিত ভাগবত বাঙ্‌লাদেশে পরিচিতি লাভ করতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ গড়াবে, একথা বিশ্বাস করতে পারা কঠিন বৈকী। আর্য-সংস্কৃতি গঙ্গা-ভাগীরথীর পথ বেয়ে বহুদিন পূর্বেই তো বঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত গুপ্তদের দিগ্বিজয়কালে গুপ্তশাসনের অন্তর্গত হয়ে বাঙ্‌লাদেশের ধর্মমত যে অনেকটাই সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে গড়ে উঠেছিল, সে তো ড° সেনও স্বীকার করেছেন। গুপ্ত আমল আবার পুরাণ-চর্চার জন্য সুখ্যাত। বস্তুত. এ-আমল থেকে বঙ্গ-দেশে পুরাণের যে-ব্যাপক চর্চা শুরু হয়, আজও তার বিরতি নেই। এককথায় বাঙ্‌লাদেশে পুরাণচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালেরই বলতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঙালী শুধু পুরাণ-পাঠেই তৃপ্ত হয়নি, এমনকি ব্রহ্মবৈবর্তাদি কয়েকখানি পুরাণের প্রথম পরিকল্পনাও বাঙ্‌লাদেশেই হয়েছে। কতকগুলি পুরাণের আবার বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। বাঙ্‌লা-দেশের বিভিন্ন পুঁথিশালায় নানা পুরাণের যে অজস্র পুঁথি মেলে তারই বা তুলনা কোথা। পুরাণ বা পুরাণ অবলম্বনে রচিত যাত্রা, নাটক, কাব্য, পাঁচালী বাঙ্‌লার জনমনকে যেভাবে আপ্লুত করেছে তাও বিস্ময়কর। বাঙ্‌লাদেশে পুরাণ প্রভাব বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের যত গভীরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও করেছে কিনা সন্দেহ। একখানি মাত্র পুরাণগ্রন্থ ভাগবতকে আশ্রয় করেই চৈতন্য-রেনেসাঁসের তো অতবড়ো ভাবান্দোলন গড়ে উঠতে পারে, বিশ্ব-ইতিহাসে এর নজিরই বা আছে ক'টি? তাই যদি হয়, বাঙালীর পক্ষে ভাগবত-গ্রহণ তবে এত বিলম্বিত হলো কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজতে গিয়ে ড° সেনের পূর্বপোষিত একটি ধারণার প্রতি আমাদের সংশয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়:

"হয়ত মাধবেন্দ্রের দ্বারাই ভাগবত বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।"

বস্তুত, চৈতন্যভাগবতের তথ্য এ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে আদৌ রায়দান করে না। সেখানে দেখি প্রথম দর্শনেই অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্রপুরীকে 'ভাগবতীয়া বৈষ্ণব' বলে চিনতে পেরেছেন। মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই ভাগবতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এমনকি এ-শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় প্রবেশ না থাকলে প্রথম দর্শনেই মাধবেন্দ্রের 'বৈষ্ণবলক্ষণ' চিনে নেওয়া তাঁর পক্ষে

সম্ভব ছিল কি? চৈতন্যভাগবত সে কথাই বলে, "বিষ্ণুভক্তিশূন্য সংসারে" অদ্বৈত আচার্য "কৃষ্ণের কৃপায়" যখন "প্রৌঢ় বিষ্ণুভক্তি" ব্যাখ্যা করতেন, ভক্তি-সংগতভাবে পড়াতেন "গীতা ভাগবত" তখনই তাঁর সঙ্গে মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ। বৃন্দাবনদাসের ভাষায়:

"বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
প্রৌঢ় করি বিষ্ণুভক্তি ব্যাখানে সদায়॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি ব্যাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময় মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥"[১]

কাজেই স্বীকার করতে হয়, মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই 'গীতা ভাগবত' বাঙ্‌লাদেশে পরিচিত ছিল। আবার শুধু পরিচিতই নয়, "গ্রন্থের যে মত" সেই অনুসারে 'গীতা-ভাগবতে'র ভক্তিসংগত ব্যাখ্যা করার মতো মানুষ দুর্লভ হলেও মাধবেন্দ্রের পূর্ব থেকেই বাঙ্‌লাদেশে ছিলেন।

বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, অদ্বৈত ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পিতৃবন্ধু। স্বভাবতই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বেই তাঁর জন্ম। ডঃ সেনও স্বীকার করেছেন, "অদ্বৈত সকলের বড় ছিলেন"[২]। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, চৈতন্যের সূতিকাগৃহে তিনি যখন বন্ধুপুত্রদর্শনে আসেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। বৈষ্ণব অভিধানেও দেখি, ১৩৫৫ শকে, অর্থাৎ ১৪৩৩ সনে তাঁর জন্ম। বিদ্যাপতি তীরহুতে যখন ভাগবত নকল করছিলেন, বাঙ্‌লাদেশে নবদ্বীপে তখন অদ্বৈত আচার্যের পক্ষে সভক্তি 'গীতা-ভাগবত' ব্যাখ্যা অসম্ভব ছিল না। আর শুধু অদ্বৈতই তো নন, গীতা-ভাগবতের প্রচলন বলতে গেলে নবদ্বীপের একটি বিশেষ গোষ্ঠীতে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল চৈতন্যাবির্ভাবের বেশ আগেই। চৈতন্যভাগবতের মতে এই গোষ্ঠীভুক্তরা হলেন,

১ চৈ, ভা, অন্ত্য।৪, ৪২৬-৪২৯

২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' একাদশ পরিচ্ছেদ, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃ° ২৮২, ৪র্থ সং

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল ইঁহা সভার প্রকাশ।
বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ়-মাঝে একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্॥"[১]

চৈতন্যদেবের পরিকররূপে পরবর্তীকালে বিখ্যাত এই ভক্তসম্প্রদায় চৈতন্যের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করে ভাগবতীয় ভক্তিধারার পথপ্রস্তুত করে রেখে-ছিলেন, "ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার"[২]। এঁদের মধ্যে অনেকেই মাধবেন্দ্রের শিষ্যত্ব লাভ করেন, আবার অনেকেই করেন না। যেমন বূঢ়নের হরিদাস। চৈতন্য অপেক্ষা ইনিও বেশ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চৈতন্যাবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব থেকে ভাগবতীয় নামমাহাত্ম্য কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।

আসলে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের আগেই ভাগবত-চর্চা বাঙলাদেশে হয়েই আসছিল। তবে এ-চর্চা দুভাবে হচ্ছিল—প্রথমত, শিষ্ট ভাগবত-সম্প্রদায়ের দ্বারা; দ্বিতীয়ত, অভক্ত পণ্ডিতের দ্বারা। শেষোক্তদের কথাও আছে চৈতন্যভাগবতে :

"গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥"[৩]

অর্থাৎ, মাধবেন্দ্রপুরী ১৪৬৮ থেকে ১৪৭৩ সনের মধ্যে হঠাৎ একদিন ভাগবত প্রচার করে বসলেন এবং হঠাৎ মালাধর করলেন তার অনুবাদ, একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত মালাধরও তাঁর গ্রন্থারম্ভে জানিয়েছেন :

১ চৈ. ভা. আদি। ২য়, ৩০-৩৪

২ তত্রৈব, ২০

৩ চৈ. ভা. আদি। ২য়, ৬৮

"ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক স্থন মহাসুখে॥"[১]

মালাধর, পণ্ডিতের মুখে শুনে ভাগবত অনুবাদ করেছেন, তার মানেই নয় যে তিনি মূল ভাগবত নিজে পড়ে দেখেননি। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা এই বোঝা যায় বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত মালাধরের অনুবাদের পূর্ব থেকেই কথকতা পাঁচালিগানের আকারে প্রচলিত ছিল। আর বেশ কিছুকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্ররূপে এ দেশে প্রচলিত না থাকলে গৌড় সুলতানই-বা অকস্মাৎ কেন ভাগবত শুনতে চাইবেন, মালাধর বসুই-বা কেন এতবড়ো একখানি অনুবাদ গ্রন্থ-রচনায় হাত দেবেন।'

প্রশ্ন উঠবে, ভাগবত যদি দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গদেশে পরিচিতই ছিল, তবে দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে দূরে থাক, পঞ্চদশ শতাব্দীর বৃহস্পতি মিশ্রের পদচন্দ্রিকায় নানা পুরাণের সঙ্গে ভাগবতের উল্লেখ নেই কেন? প্রশ্নের উত্তরে আমরা আর এক প্রশ্নই করতে পারি, রামানুজের শ্রীভাষ্যে ভাগবতের নাম আছে কি? কিন্তু ভাগবত তো তার পূর্বেই ছিল বলে প্রমাণিত।

আসলে আমরা মনে করি, বাঙালীর ভাগবত-পরিচয় ঘটেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে। আর সে-পরিচয়ও যে মূলত মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমেই হয়নি, তাও আমরা চৈতন্যভাগবত থেকেই জানতে পারি। তবে ভাগবত ঠিক কবে এবং কার বা কাদের দ্বারা প্রথম প্রচারিত হয়েছিল, সে বিষয়েও নিশ্চিত করে কিছু বলার 'পাথুরে প্রমাণ' আমাদের হাতেও এই মুহূর্তে মজুত নেই। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর নব নব আলোক-পাতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আপাতত আমরা আমাদের কিছু কিছু তথ্যভিত্তিক অনুমানকেই উদ্ধার করতে পারি মাত্র।

বাঙ্‌লাদেশের কোনো আধুনিক ইতিহাস-প্রণেতাই সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণে উল্লিখিত 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব'কে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে কোনো প্রকার গুরুত্ব দেবারই পক্ষপাতী নন। তাঁরা এইমাত্র স্বীকার করেন, 'পৌণ্ড্র' বঙ্গদেশের অংশবিশেষ হতে পারে, আর সেই সূত্রে মহাভারত হরিবংশ ভাগবত পুরাণাদিতে কথিত জনৈক 'পৌণ্ড্রক বাসুদেবে'র কৃষ্ণ-বাসুদেব হস্তে পরাভবের কাহিনী এই বাঙ্‌লাদেশেরই কোনো নরপতির যাদবশক্তির

---
১ খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, ক° বি° প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' পৃ° ৩

নিকট পরাজয়ের ইংগিত হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত তাঁরা ভীমের পৌণ্ড্র-বিজয়ের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

খ্রীষ্টপূর্ব কালের এই ঘটনাটির তাৎপর্য কিন্তু আমাদের কাছে সুগভীর। ড° দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে পৌণ্ড্রদেশকে বলেছেন 'পাণ্ডুয়া':

"পৌণ্ড্রদেশ—পাণ্ডুয়া। মহাভারতোক্ত পৌণ্ড্র বাসুদেবের সময় হইতে এই দেশ বঙ্গদেশের একটি বিখ্যাত এবং সুবিস্তৃত অংশ ছিল।"[১]

অধ্যাপক উইলসনের মতে, রাজসাহী, দিনাজপুর রঙ্গপুর মালদহ বগুড়া ত্রিহুত এ-অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। শেষ পর্যন্ত দীনেশচন্দ্রেরও অভিমত তাই:

"এককালে পৌণ্ড্রদেশ বলিতে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত।"[২]

বাসুদেব-কৃষ্ণ এই পৌণ্ড্রদেশেরই অধিপতিকে বধ করেন বলে ইতিহাস-পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। ভাগবত আবার বলে, পৌণ্ড্র বাসুদেব কৃষ্ণ-বাসুদেবের বিশিষ্ট ভূষণ লক্ষণাদি অনুকরণ করে নিজেকে 'আসল বাসুদেব' বলে বৃথা দম্ভ প্রকাশ করে বেড়াতেন। বৈষ্ণব অভিধান এও দেখায়, বাসুদেব-কৃষ্ণের লীলাস্থলীর অনুরূপ নাম বঙ্গদেশে ঐ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়েও রয়েছে[৩]। অর্থাৎ, বাসুদেব-কৃষ্ণের পৌণ্ড্র-বিজয়ের পর তো বটেই, বরং তার পূর্ব থেকেই তাঁর বিচিত্র লীলাসমূহ, বিশেষত বৃন্দাবনলীলা সম্ভবত রাখালিয়া গান[৪] বা অন্য কিছুর মাধ্যমে উত্তরভারতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বভারতের পৌণ্ড্র

১ 'বৃহৎ বঙ্গ,' প্রথম খণ্ড, পৃ° ২০

২ তত্রৈব

৩ "মহাস্থানগড—প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্র নগর হইতে অভিন্ন।...মহাস্থানের নিকটবর্তী গোকুল, বৃন্দাবনপাড়া, মথুরা প্রভৃতি নামগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের সময় হইতেই যে প্রচলিত আছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ৪র্থ খণ্ড, ১৯২৩ পৃ°

৪ পুরাণে সংকলিত হওয়ার পূর্বেই কৃষ্ণের সমূহ ব্রজলীলা রাখালিয়া গানের মাধ্যমে বৃন্দাবনের গোপসমাজে তথা তার বাইরেও যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল, এরূপ অনুমানের ভিত্তি ভাগবতেই মেলে। কৃষ্ণের অতি শৈশবেই গোকুল পরিত্যাগের কালে শকটারোহিণী নিষ্ককণ্ঠীদের কৃষ্ণলীলা গান করতে শুনি [১০।১১।৩৩]। দামবন্ধনলীলায় যশোদার গান [১০।৯।২] কিংবা গোষ্ঠলীলায় গোপবালকদের গানও [১০।১৫।১৯] মনে পড়ে। গোবর্ধন ধারণের শেষে দেখি, কৃষ্ণের "তথাবিধানি কৃতানি" গান করতে করতে ব্রজে ফিরছেন গোপীরা [১০।২৫।৩৩]। আর কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপীরা প্রিয়তমের লীলাদি গান করেই তো দিন

দেশেও ছড়িয়েছিল। রাজসাহী জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুরের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে কৃষ্ণলীলা-রূপায়ণও এ-অঞ্চলে বৃন্দাবনলীলার জনপ্রিয়তাকেই সূচিত করছে। ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'History of Bengal' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বাঙ্‌লাদেশে ধর্মীয় ধ্যানধারণা গঠনের আলোচনা করতে গিয়ে ড° প্রবোধচন্দ্র বাগচী যা বলেছিলেন, এখানে তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিমত অনুসারে কৃষ্ণকাহিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন বাঙ্‌লাদেশে যা পাচ্ছি, তা এই পাহাড়পুরেরই প্রত্ননিদর্শন। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দী এর কালসীমা, আর বিভিন্ন যুগের ভাস্কর্যের ছাপও এতে স্পষ্ট। প্রথমদিকের ভাস্কর্যেই কৃষ্ণের যমলার্জুনভঙ্গ, কেশিবধ ইত্যাদি স্মরণীয় হয়ে আছে। বসুদেব কৃষ্ণকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন গোকুলে, কৃষ্ণ-বলরাম বিহার করছেন গোপসঙ্গে বা কৃষ্ণ ধারণ করছেন গিরিগোবর্ধন—এ দৃশ্যগুলিও চিত্তাকর্ষকভাবে শিল্পিত। পাহাড়পুরের কৃষ্ণলীলা-ভাস্কর্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটি সেটিতে এক রমণীসঙ্গে কৃষ্ণকে অবস্থান করতে দেখছি। কে. এন. দীক্ষিত স্ত্রীমূর্তিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয়।

এক কথায় সমগ্র উত্তরভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেও বহুকাল ধরেই ব্রজলীলা সুপরিচিত ছিল। কিন্তু এ-ব্রজলীলা যে ভাগবত-বাহিত পথেই বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে, একথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। তবে অনুমান করা যেতে পারে, রাখালিয়া গানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণগুলির মাধ্যমেও বাঙালী কৃষ্ণকথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পুরাণগুলির মধ্যে ভাগবত অন্যতম হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, যমলার্জুনভঙ্গ তো বিষ্ণুপুরাণে নেই, এ-লীলা ভাগবতেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। পাহাড়পুরে এর প্রভাব পড়া অসম্ভব কি?

অনেকেই অবশ্য অত আগে বাঙালীর ভাগবত পরিচয়ের কথা আদৌ তথ্যনির্ভর বলে মনে করেন না। বরং আনুমানিক একাদশ শতকে সমতটের ভোজবর্মের বেলাবা শাসনে কৃষ্ণ শুধু 'মহাভারতসূত্রধার' রূপেই নন,

অতিবাহিত করতেন [১০।৩৯।৩৭]। কৃষ্ণ প্রেরিত হয়ে উদ্ধব তাঁদের সেই গগনস্পর্শী গানই বৃন্দাবনস্থলীতে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন [১০।৪৬।৪৬]। তাঁর ভাষায় এ-গীত "পুনাতি ভুবনত্রয়ম্‌" [১০।৪৭।৬৩]। কংসের রাজসভার মথুরা-নাগরীরাও বলেছিলেন, ধন্য ব্রজগোপীরা, যাঁরা দুগ্ধ দোহনে শস্য-অবহননে দধিমথনে গৃহাদি উপলেপনে দোলান্দোলনে বালকসান্ত্বনে গৃহমার্জনায় কৃষ্ণানুরাগে অশ্রুকণ্ঠী হয়ে তাঁর লীলা গান করেন [১০।৪৪।১৫]।

'গোপীশতকেলিকার'[১] রূপেও উল্লিখিত হওয়ায় একে তাঁরা ভাগবতীয় প্রভাবের ফল বলতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, এখানে কৃষ্ণ পূর্ণস্বরূপ ভগবান্ রূপে নন, অংশাবতার রূপেই চিহ্নিত, কাজেই এ-প্রভাব মূলত বিষ্ণু-পুরাণের হলেও হতে পারে।

তবে যে অনেকে বাঙ্লাদেশে কলচুরির রাজা কর্ণদেবের সঙ্গে কর্ণাটীদের আবির্ভাবেই এদেশে ভাগবতের প্রথম পরিচয়লাভের কথা তোলেন, তা মোটামুটিভাবে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়। পাদ্মোত্তর খণ্ডে ভাগবত মাহাত্ম্যে ভক্তিদেবীকে "বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা" বলে কর্ণাটকের বিশেষ সাধুবাদ করা হয়েছে, বস্তুত ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত কর্ণাটকে বহুদিন ধরেই প্রচার-প্রতিষ্ঠা লাভ করে আসছিল। যতদূর জানা যায় বঙ্গাভিযানের অন্যতম কর্ণাটী নায়ক কর্ণদেব খ্রীষ্টীয় ১০৪১ থেকে ১০৭০ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কাজেই কর্ণদেবের বঙ্গবিজয়কালে বাঙ্লাদেশে ভাগবতের আবির্ভাব কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়। আর শুধু কর্ণদেবই তো নন, তাঁর পূর্বে ও পরেও একাধিক চালুক্যরাজ কর্তৃক বঙ্গাভিযান চালুক্যলিপিতেই উল্লিখিত হয়েছে। কর্ণাট-দেশীয় এইসব সমরাভিযানকে আশ্রয় করে কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্ত পরিবারের বঙ্গদেশে আগমনও ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন[২]। বিহার-বঙ্গের সেন রাজবংশ এবং পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজবংশ এই দক্ষিণী কর্ণাটী পরিবারেরই উত্তরপুরুষ। স্মরণীয়, উভয় পরিবারই ছিলেন পরমবৈষ্ণব। ভোজবর্মণের বেলাবা শাসনের প্রসঙ্গ তো পূর্বেই উত্থাপিত হয়েছে। এই বেলাবা তাম্রপটে এ-বংশের সঙ্গে যাদব বংশের হরির যোগ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। অপরদিকে লক্ষ্মণসেনের কালেই বৈষ্ণবধর্মের প্রথম প্লাবন আসে বঙ্গদেশে। সেন-আমলে বঙ্গদেশে বাসুদেব পূজার যে-ব্যাপক প্রচারলাভ ঘটে, এমন এর পূর্বে আর কখনও ঘটেনি বলে জানিয়েছেন ড° দীনেশচন্দ্র সেন[৩]। এযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি জয়দেবও কৃষ্ণকে মহানায়ক করে

---

১ "সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ধঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ॥"

২ 'রাজবৃত্ত', বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ড° নীহাররঞ্জন রায় প্রণীত।

৩ 'বৃহৎ বঙ্গ', ১ম খ°

একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটগীতিকাবাই লিখে ফেলেছেন। তাঁর গীতগোবিন্দে "দশাকৃতিকৃতে তুভ্যং নমঃ" বলে অবতারী-রূপে কৃষ্ণের যে বন্দনা আছে, তাতে ভাগবতীয় কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা ঘোষণার প্রভাব আবিষ্কার করতে পারেন কেউ কেউ। উল্লেখযোগ্য ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি দুর্লভ ভাগবত-পুঁথির নিদর্শন মিলেছে পাটনায়।[১] জিজ্ঞাসা জাগে, বঙ্গ-বিহার একই রাজছত্রতলে শাসিত হওয়ার কালে ভাগবত কি পাটলিপুত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল? বঙ্গদেশে দ্বাদশ শতকে সংকলিত বলে স্বীকৃত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে বা সদুক্তি-কর্ণামৃতে কৃষ্ণলীলাকীর্তনের ওপর ভাগবতীয় বৈষ্ণবীয় প্রভাব কি কিছুই পড়েনি? ভাগবতের "গোপীনাং নয়নোৎসবঃ"[২] কৃষ্ণই কি কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের কবি-ভাষিতে "গোপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ"[৩] কৃষ্ণ হননি? সদুক্তি-কর্ণামৃতের 'হরিভক্তি' পর্যায়ের কবি কুলশেখর কি মুকুন্দমালা-প্রণেতা সপ্তম আলবার? ভাগবতের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতে 'হরিভক্তি' পর্যায়ে যে ভক্তিপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত তাও একান্তভাবেই ভাগবত-মুখেই নির্বারিত। বদ্ধাঞ্জলিপুটে নতশিরে রোমাঞ্চিত-কলেবরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদ বচনে, বাষ্পাকুল নয়নে হরিপাদপদ্মের ধ্যানামৃতস্বাদ-গ্রহণে তাঁর সেই আকূতি[৪] কিংবা জন্মে জন্মে হরি-চরণাম্বুজে নিশ্চলা ভক্তির প্রার্থনা[৫] ভাগবতে

---

১ "Another interesting find (in Patna) Is a paper copy of the Bhagavata Purana dated Sambat 1146 (1088 A. D.). This is probably the oldest M. S. on paper yet discovered in India,—Journal of Behar & Orissa Research Society. Vol, V. Pt 1

(January 1919)"

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের পাদটীকা,

পৃ° ॥৶০, ৭ম স°

২ ভা° ১০।৩৬।১৫

৩ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২২

৪ সদুক্তিকর্ণামৃত, 'হরিভক্তি' ১

৫ "জন্মজন্মান্তরেপি। ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগলকে নিশ্চলা ভক্তিরস্তু"

তত্রৈব, ২

অথবা, "অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেস্তু তব প্রসাদাৎ" তত্রৈব, ৫

তু° উদ্ধব প্রার্থনা "ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে" ভা° ১২।১৩।২২

বলা প্রয়োজন, যুগপৎ উদ্ধবপ্রার্থনা ও কুলশেখর-ভক্তিগীতি চৈতন্য-শিক্ষাষ্টকে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। [দ্র° ভাগবত ও শিক্ষাষ্টক]

উদ্ধবের অনুরূপ প্রার্থনাই মনে করিয়ে দেয়। সুদূর দক্ষিণের এই ভাগবত-ভক্ত কেরালা-কবির কবিতা সংকলন করছে বাঙালী দ্বাদশ শতকে, অথচ সারা ভারতব্যাপী প্রভূত জনপ্রিয় ভাগবতের সন্ধান রাখে না সে, এও কি বিশ্বাসযোগ্য ?

আসলে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রচারের পূর্ব থেকেই ভাগবত বাঙ্‌লাদেশে পরিচিত ছিল, তবে তা ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হওয়ার কোনো ইংগিতই কোথাও নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো সর্বসঞ্চয়ন-প্রতিভার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর-স্বরূপ কাব্যেও তাই নানা পুরাণের পাশাপাশি ভাগবত পুরাণের প্রভাব আবিষ্কার এতো কঠিন। মাধবেন্দ্রের কৃতিত্বও সেখানেই, তিনি বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বৈষ্ণবীয় ভাবতরঙ্গটি বহন করে আনেন বৈষ্ণবীয় ভক্তিসিন্ধু ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে। মালাধর সেই দ্বিতীয় বৈষ্ণবীয় ভাব-তরঙ্গকেই শঙ্খনাদসহ পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালীর কুটিরদ্বারে। আর সেই অপার ভাবসিন্ধুরই প্রথম দিগন্তবিস্তার ঘটলো চৈতন্য-ভক্তিরস সাধনায়। চৈতন্যের সমগ্র জীবন সাধনার কেন্দ্রে ছিল ভাগবত। চৈতন্য-রেনেসাঁস তাই নামান্তরে ভাগবতীয় ভাবান্দোলন। আমরা জানি, ভাগবতের ধ্রুবপদ : "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—নরলীল নরাভিমান 'মায়ামনুষ্য'ই সেখানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্। আর চৈতন্য-রেনেসাঁসের ধ্রুবপদ, "গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার"—ভাগবত এখানে 'শাস্ত্র', 'অমল প্রমাণ'।

ষোড়শ শতকের এই প্রথম রেনেসাঁসের পর দ্বিতীয় জাগরণের কালে ঊনবিংশ শতকের নবীন ভাবসাধনার ব্যপদেশে বাঙালা-মনীষীকে তাই বাঙালীর মনে বদ্ধমূল কৃষ্ণ ও চৈতন্য-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-মহিমাকেও চূর্ণ করার চেষ্টায় প্রভূত শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নিবন্ধে নবযুগের প্রবর্তককে তাই বলতে শুনি :

"...শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্তসূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।"[১]

১ দ্র° রামমোহন গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, পৃ° ৫০

শুধু ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য নবধর্মের প্রবর্তক রামমোহনই তো নন, হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের হোতা 'কৃষ্ণচরিত্র'-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়েও ভাগবতকে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের মর্যাদা-দানে কিছুমাত্র উৎসাহী নন। তাঁর কৃষ্ণ মূলত মহাভারত-সূত্রধার, ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মযোগী। তবু পরমাশ্চর্যের বিষয়, তিনিও সর্বোপরি ভাগবতের ধ্রুবপদকেই সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েই রামমোহনের কৃষ্ণনেতিবাদের ওপর কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের অপূর্ব ভাস্কর্য রচনা করেছেন :

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।···আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"[১]

বস্তুত বারংবার বিপরীত-গতি সত্ত্বেও বাঙালী-জীবনে ভাগবত-স্বীকারই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রভাবে অদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের পক্ষেই কৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলে মেনে নেওয়া অবশ্য সম্ভব হয়নি, তবে ভাগবতীয় গোপীপ্রেম বৃন্দাবনের রাখালরাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতিকে সৌন্দর্যস্বপ্নে কবিত্বকলায় অখণ্ড-ভাবরসে যেমন নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছে এমন বোধ করি আর কিছুই নয়। অদ্বৈতবাদী নির্গ্রন্থ বাঙালী সন্ন্যাসী পর্যন্ত সে-প্রেমের অনির্বচনীয়তায় আত্মহারা :-

"কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না।···এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা।···ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস ঐ তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না।"[২]

শেষ পর্যন্ত বাঙালীর ভাগবত-স্বীকারকে মেনে নিয়েই আমরা তাই

---

১ দ্র° বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, পৃ° ৪০৭

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, শতবার্ষিক সং, ৫ম খণ্ড, পৃ° ১৫২-৫৩

চৈতন্যযুগকে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করেছি। এই ভাবেই বাঙালীর ভাগবতা-চর্চার ইতিহাসও তিনটি যুগে বিভক্ত হয়ে গেছে :

এক ॥ প্রাক্‌চৈতন্য যুগ : এ যুগে বাঙ্‌লাদেশের দুটি বৈষ্ণব-ভাবতরঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে, একটি লক্ষ্মণসেনের আমলে গীতগোবিন্দকারের কাব্য আলোচনায়। দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্তর্গত মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায় এবং মালাধর বসু ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। আর এই প্রথম ও দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যবর্তী অদ্যাবধি-বহুবিতর্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও আলাদাভাবে বিচার্য। এ সবই দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কালসীমায় আবদ্ধ।

দুই ॥ চৈতন্যযুগ : এই চৈতন্যযুগেরই অন্তর্গত হয়ে স্বয়ং চৈতন্যদেবের ভাগবতসাধনা তাঁর পারিষদবর্গের নানা দিক দিয়ে ভাগবত-চর্চা, জীবনী-সাহিত্য-পদাবলীসাহিত্য-অনুবাদসাহিত্য তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ব্যাপক ভাগবত-অন্বেষণা বিশেষরূপেই আলোচিত হবে। প্রসঙ্গত বৈষ্ণবেতর সাহিত্যে ভাগবতের প্রভাবও স্বল্প অবকাশে আভাসিত হবে মাত্র।

তিন ॥ চৈতন্যোত্তর যুগ : ঊনবিংশ শতকে বাঙালীর নবজাগৃতির দিনে ভাগবতের নব-মূল্যায়নই এ-পর্বের আলোচনীয়।

এক কথায়, বাঙালীর ভাগবত-চর্চার ইতিহাস ত্রিকালপ্লাবী। এ-পথের পথিকও যেমন সহস্রাধিক সহস্র, এ-পথের সীমাও তেমনি পিছনের সাত আটটি শতাব্দী ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল ॥

তৃতীয় অধ্যায়

ভাগবত ও প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

ভাগবত ও গীতগোবিন্দ

মধুর কোমলকান্ত-পদাবলীর কবি জয়দেব বাংলা গীতিকাব্যের আদি-গঙ্গোত্রী। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, গীতগোবিন্দ-কার কি ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ?

প্রশ্নটির আলোচনা চলতে পারে দুভাবে। প্রথমত, দীক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত উদ্ধার করে। দ্বিতীয়ত, অদীক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে।

দীক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত-স্বরূপ আমরা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন-প্রণীত 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের "শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দ" নিবন্ধটি স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভাগবতের সঙ্গে জয়দেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে উভয় গ্রন্থ থেকে একাধিক সাদৃশ্যমূলক শ্লোক উদাহৃত হয়েছে। যেমন ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণের রাসকেলি-বর্ণনার অংশবিশেষ গীতগোবিন্দের আদর্শস্থল বলে বিবেচিত :

> "কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
> উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
> তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥"[১]

অর্থাৎ, কোনো গোপী কৃষ্ণের সঙ্গে বিশুদ্ধ স্বরজাতির আলাপ করায় 'সাধু' 'সাধু' বলে কৃষ্ণ তাঁর প্রশংসা করলেন। সেই গোপীও তখন আবার অমিশ্র স্বরজাতি ধ্রুবতালে সংগত করে গান করায় অধিকতর প্রীত হয়ে মুকুন্দ তাঁকে বহুমানিত করেন।

পুনরপি,

> "নৃত্যতি গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
> পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥"[২]

তাৎপর্য, নৃত্যগীতে পরিশ্রান্তা কোনো গোপী পার্শ্বস্থিত অচ্যুতের স্বস্তঃসুখকর করকমল নিজবক্ষে স্থাপন করলেন। নৃত্যকালে তাঁর নূপুর ও মেখলা অবিরাম ঝংকৃত হচ্ছিল। মেখলামুখর রাসস্থলীতে এই "গোপীগীতস্তুতি-

১ ভা° ১০।৩৩।১০

২ ভা° ১০।৩৩।১৪

ব্যাজনিপুণ" মধুসূদনের দর্শন গীতগোবিন্দেও পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গান্তর্গত 'সামোদদামোদর' প্রসঙ্গে রামকিরী-রাগে গেয় চতুর্থ গীতটির একচল্লিশ ও পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক দুটি শ্লোক যুক্ত করলেই পূর্বোদ্ধৃত ভাগবতীয় শ্লোকদ্বয়ের পূর্ণচিত্র পাবো :

"পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥"[১]

এবং

"করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥"[২]

অর্থাৎ, কোনো গোপবধূ অনুরাগভরে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গে উন্নীত পঞ্চমরাগে গান করছেন।

কেউ মুরলীধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তালরক্ষা করছেন, তাতে তাঁর বলয়গুলি মৃদু শিঞ্জিত হচ্ছে। হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচরীর প্রশংসা করছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভাগবত ও গীতগোবিন্দ—কেশব-কেলিরহস্যপূর্ণ এই দুই গ্রন্থের মধ্যে রূপকল্পনাগত তথা পদবন্ধগত মিল আরো একটি দেখিয়েছেন সাহিত্যরত্ন মহাশয়। ভাগবতে আছে :

"তদ্বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘ-বিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"[৩]

তাৎপর্য, যে-বাক্যের প্রতিপদে অনন্ত ঈশ্বরের নামযশ অংকিত, তা অপভাষায় রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্তন করে থাকেন, কেননা অনন্তের নামগুণাবলী-পূত বাক্যই জনসমাজের পাপবিপ্লব বিদূরিত করতে সমর্থ। আমরা জানি, বেদব্যাসের নিকট কথিত নারদের এ-উক্তি ভাগবতের একেবারে উপক্রমণিকাপর্বেরই অন্তর্গত।

---

১ গী° ১।৪১
২ গী° ১।৪৫
৩ ভা° ১।৫।১১

সাহিত্যরত্ন মহাশয় মনে করেন, ভাগবতের এই শ্লোক স্মরণ করেই জয়দেব লিখেছেন :

"বাগ্‌দেবতা চরিতচিত্রিতচিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌॥"[১]

অর্থাৎ, যাঁর মানসমন্দিরে বাগ্‌দেবীর চরিত চিত্রিত এবং যিনি পদ্মাবতীর চরণের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, সেই কবি জয়দেব বাসুদেব-রতিকেলিকথা সমন্বিত এই রসপ্রবন্ধ রচনা করছেন।

ভক্তের দৃষ্টিতে, ভাগবতেরই "নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি" গীতগোবিন্দে হয়েছে—"শ্রীবাসুদেব-রতি-কেলি-কথা-সমেতমেতং···প্রবন্ধম্‌।" আর সন্দর্ভ-শুদ্ধি সম্বন্ধে কবির আত্মবিশ্বাসেরও মূলে আছে ভাগবতীয় নারদ-বেদব্যাস সংবাদের সেই সুদৃঢ় অভিমত, যে-বাক্যের প্রতিপদে অনন্ত ঈশ্বরের নামযশ অংকিত, তা অপভাষায় রচিত হলেও মহাপুরুষগণ তারই শ্রবণ-কীর্তন করে থাকেন।

শুধু শব্দার্থের সাদৃশ্যেই নয়, ভাব ও তত্ত্বদর্শনেও গীতগোবিন্দ যে ভাগবতেরই উত্তরসাধক, সে বিষয়েও বৈষ্ণব-ভক্তসম্প্রদায় আমাদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ'-কারের উক্তিটিই উদ্ধারযোগ্য :

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থ রূপে, শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।"[২]

গীতগোবিন্দকে দীক্ষিত সম্প্রদায় যখন "শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপেই গ্রহণ" করেন, অদীক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে আধুনিক ইতিহাস-গবেষক ড. সুশীলকুমার দে তখন গীতগোবিন্দকে ভাগবত-ভাষ্য বলা তো দূরে থাক, জয়দেবীয় কাব্যে ভাগবতীয় প্রভাবকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন :

Nor is it probable that the source of Jaydeva's inspira-

---

১ গী. ১।২

২ 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ,' দ্র: পৃ: ১৩৯, ৩য় সং

tion was the Krsha-Gopi legend of the Srimad-Bhagavata, which avoids all direct mention of Radha...and describes the autumnal, and not vernal Rasa-lila."[১]

যেহেতু ভাগবতে রাধানাম উচ্চারিত নয়, কিন্তু গীতগোবিন্দে রাধাই রাসের কেন্দ্রস্থ নায়িকা এবং যেহেতু ভাগবতে শারদ, কিন্তু গীতগোবিন্দে বাসন্তরাস বিলসিত, সেইজন্যই ড° দে জয়দেবের কাব্যে ভাগবতীয় প্রভাবকে অগ্রাহ্য করতে চান। আমরা কিন্তু তাঁর উভয় যুক্তিকেই খুব জোরালো বলতে পারি না। যেমন অপরিহার্য বলে মনে করিনা গীতগোবিন্দকে ভাগবতের "কবিত্বময় ভাষ্য" বলাও। অর্থাৎ, গীতগোবিন্দ কাব্যে ভাগবতের প্রভাব নির্দেশের পথে আমরা যুগপৎ দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ এবং অদীক্ষিত সম্প্রদায়ের অতিযুক্তিবাদের বাড়াবাড়িকে বর্জন করার পক্ষপাতী। আমরা জানি, গীতগোবিন্দের স্পষ্টতই একটি ধর্মীয় আবেদন আছে, এবং সেখানে বৈষ্ণব শাস্ত্ররূপে ভাগবতের কিছু প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়।

যাঁরা গীতগোবিন্দের ধর্মীয় প্রেরণাকে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুরঞ্জন মাত্র মনে করেন, প্রথমে তাঁদেরই ভ্রান্তিনিরসনে এ-কাব্যের দ্বাদশ সর্গান্তর্গত কবির আপন বক্তব্যকেই তুলে ধরা যায়:

"যদ্‌গান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎ সর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দঃ॥"[২]

সুধীবৃন্দ, যদি গান্ধর্বকলায় এবং বৈষ্ণবের অনুধ্যান-বিষয়ে, যদি বিবেকতত্ত্বে এবং শৃঙ্গাররসকাব্যে ঔৎসুক্য থাকে, তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ বিদগ্ধ জয়দেব কবির 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্য চিন্তা করুন।

যাঁরা গীতগোবিন্দকে শৃঙ্গাররসসর্বস্ব গন্ধর্বকলাতেই পর্যবসিত মাত্র দেখেন, তাঁরা ভুলে যান, বিবেকতত্ত্বের সঙ্গে অন্বিত বৈষ্ণবের ধ্যানকৌশলই গীতগোবিন্দের প্রাণ। স্বভাবতই গীতগোবিন্দের কবি তাঁর কাব্যের প্রারম্ভেই অধিকারীকে চিহ্নিত করে নিয়েছেন:

১ 'Devotional Poetry,' History of Sanskrit Literature, Vol. I., See p. 391. 2nd Edition
২ গী° ১২।২৭

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥"[১]

আমরা জানি, ভাগবতেও 'অধিকারী' চিহ্নিত হয়েছেন "শ্রদ্ধান্বিতঃ" ও "ধীরঃ" রূপে[২]। অবশ্য রসিকের দৃষ্টিতে পুরাণ হলেন মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। কাজেই ভাগবতের তত্ত্বরস গীতগোবিন্দে কান্তাসম্মিত বাণী হয়ে কাব্যরসে বিগলিত হবে, এতে আর আশ্চর্য কি! গীতগোবিন্দের অধিকারীকে তাই শুধু 'শ্রদ্ধান্বিত' ও 'ধীর' হলেই চলবে না। তিনি রসিক তো হবেনই, কিন্তু তারও আগে তাঁর মন হরিস্মরণে সরস হওয়া চাই। কাব্য ও পুরাণের এই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গটি মনে রেখেই গীতগোবিন্দে ভাগবতীয় প্রভাব অনুসন্ধান করতে হয়; তবে এ-প্রভাবও এতদূর নয় যে, গীতগোবিন্দকে ভাগবতের রসভাষ্য বলে ঘোষণা করতে হবে।

আমরা তো পূর্বেই বলেছি, ভাগবত ও গীতগোবিন্দ—কেশবকেলিরহস্য-পূর্ণ উভয়গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবতারণা করা হয়েছে, তবে একটির উপজীব্য শারদরাস, অন্যটির বাসন্ত। স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে পটভূমিকা ও প্রস্তুতিগত কিছু 'দ্বৈবিধ্য'ও লক্ষিত হবে। শারদরাসে কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা কুমারীদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাই ছিল কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য। "ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ"[৩]—ব্রতশেষে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পালন করতেই শারদপূর্ণিমায় কৃষ্ণ বেণুনাদ করেছিলেন। তাঁর বংশীধ্বনিকে অনুসরণ করে ব্যর্যমাণা ব্রজগোপীরা পিতা-ভ্রাতা-পতি-পুত্র পরিত্যাগ করেই রাসস্থলীতে উপনীতা হন।[৪] কৃষ্ণসঙ্গলাভে তাঁরা মানিনী হলে, বোধকরি বিপ্রলম্ভে[৫] তাঁদের প্রেমসাধনাকে সম্পূর্ণতা দেবেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবার কোনো প্রধানা

১ গী° ১।৩

২ ভা° ১০।৩৩।৩৯

৩ ভা° ১০।২২।২৭

৪ "তা ব্যর্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ" ॥ ভা° ১০।২৯।৮

৫ "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে ॥" উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত আর্ষবাক্য

গোপীসহ অন্তর্হিত হলেন। আবার সেই প্রধানা গোপীর কাছ থেকেও একই উদ্দেশ্যে তাঁর পুনরপি অন্তর্ধান। শেষে পরিত্যক্তা প্রধানা গোপীর সঙ্গে অন্যান্যা গোপীর মিলন ও সমবেত প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব। শারদরাসের এই হলো মূল বিষয়বিস্তার।

আপাতদৃষ্টিতে গীতগোবিন্দীয় বাসন্তরাস "স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ"। শারদরাসের প্রসঙ্গে ভাগবতে রাধানাম কোথাও উচ্চারিত হয়নি।[১] অথচ গীতগোবিন্দে রাধাই রাসেশ্বরী। তাঁর গুরু-মানভার গিরিগোবর্ধনধারীর পক্ষেও দুর্বহ। তিনি "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে" সামোদ-দামোদর বহুবল্লভ কৃষ্ণকে "নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং"—যুবতিজনের সঙ্গে নৃত্য করতে দেখে দুর্জয় মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করে যেতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে 'অক্লেশ-কেশবঃ' সর্গটির কবিভণিতি স্মরণীয়:

"বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ।"[২]

প্রীতির ন্যূনাধিক বিচার না করে হরি "সাধারণপ্রণয়", অর্থাৎ সকল গোপীর সঙ্গেই সমভাবে বনে বিহার করছেন, এতে আপনার উৎকর্ষ বিনষ্ট হল, এ-ঈর্ষায় রাধা সেখান থেকে চলে গেলেন।

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যায় পূজারী গোস্বামী "সাধারণপ্রণয়" শব্দের অর্থ করেছেন "সাধারণবিহরণ"। প্রণয়ের তারতম্য সত্ত্বেও গোপীদের প্রতি কৃষ্ণের "সাম্যব্যবহার"ই যে রাধার মনে "সাধারণী প্রিয়া" হওয়ার ঈর্ষাভিমান উদ্রিক্ত করেছে, সে বিষয়েও টীকাকার আমাদের সচেতন করে তুলেছেন।[৩]

১ সনাতনাদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ অবশ্য ভাগবতীয় শারদরাসের নিম্নলিখিত শ্লোকে 'রাধা'-নামের আভাস পান:
"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" ভা° ১০।৩০।২৮
আক্ষরিক অর্থে, সেই রমণীকর্তৃক ভগবান্ নিশ্চয়ই আরাধিত হয়েছিলেন, তাই আমাদের পরিত্যাগ করে প্রীতমনে গোবিন্দ তাঁকে নিয়েই নির্জনে গমন করেছেন।

২ গী° ২।১

৩ "অথ সখীবচনং নিশম্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রীকৃষ্ণস্য সাধারণবিহরণং বিলোক্য ঈর্ষোদয়াৎ তদ্দর্শনমপ্যসহমানাঽন্যতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি।...কীদৃশী? ঈর্ষয়ান্যত্র গতা। ঈর্ষাপি-কুতঃ? তাস্বপি সর্বাসু সমানঃ প্রণয়ো যস্য তথাভূতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতো নিজোৎকর্ষঃ অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবংরূপো. যস্তস্মাৎ প্রণয়-তারতম্যাদ্বিহারস্য সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবান্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়া অন্যতো গতেত্যর্থঃ।" বালবোধিনী টীকা ২।১

জয়দেব গোস্বামীর "সাধারণপ্রণয়" শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। ভাগবতে মুখ্যত সাধারণ প্রণয়েরই বিস্তার, প্রধানা গোপীর অসাধারণ-প্রণয় বা বিশেষ-প্রণয় সেখানে আভাসিত মাত্র। পক্ষান্তরে গীতগোবিন্দ বিশেষ-প্রণয়েরই কাব্য। দ্বাদশ সর্গাত্মক এ 'মহাকাব্যে'র নায়িকা-রাধিকা নায়ক-কৃষ্ণের পরম জীবাতু।

বলা বাহুল্য, সেই 'পরম জীবাতু' রাধা মানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করায় কৃষ্ণের "শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং"—সর্বজগৎ শূন্য হয়ে যায়। তৃতীয় সর্গে মুগ্ধ-মধুসূদনের উক্তিতে এর সমর্থন আছে: "কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ"[১]—তাৎপর্য, (তাঁর অভাবে) আমার ধনে জনে জীবনে প্রয়োজন কি, গৃহেই বা প্রয়োজন কোথায়!

অতঃপর দেখি, বিরহখিন্না মানময়ী রাধা এবং বিরহী ও অপরাধভীত মধুসূদনের দৌত্যভার গ্রহণ করেছেন সখী। রাধাবিরহে কাতর কৃষ্ণের কাছে এসে তিনি নিবেদন করলেন, "সা বিরহে তব দীনা"। আবার রাধাকে জানালেন, "সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী"। তদুপরি অভিসারে তাঁকে অনুপ্রাণিতও করতে চাইলেন, "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।" কেননা, সংকেতকুঞ্জের দ্বারে প্রতীক্ষারত মরমী মাধব এতক্ষণে "পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।" তাই, "চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্"। অথচ কুঞ্জে প্রবেশ করে রাধা হতাশ হন, "কথিত সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্"। অবশেষে কুঞ্জদ্বারে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে প্রতিনায়িকা-সম্ভোগের স্মারকলিপি। খণ্ডিতা রাধিকা ক্রোধভরে বলেন, "হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্"। সখী রাধাকে অনুনয় করেন, "মাধবে মা কুরু মানিনী মানময়ে।" স্বয়ং মুগ্ধমাধব একান্ত দীন প্রেমিকের আর্তিতে বলেন, "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।" এরপর মানভঙ্গে কলহান্তরিতা রাধার সঙ্গে সানন্দ-গোবিন্দের চিরবাঞ্ছিত মিলন। সুপ্রীত পীতাম্বরের পরমপ্রাপ্তিলাভের পটভূমিকায় গীতগোবিন্দের বাসন্তরাসের শুভযবনিকাপাত।

বস্তুত, ভাগবতীয় শারদরাস ও জয়দেবীয় বাসন্তরাস উভয়ের মধ্যে আপাত বৈসাদৃশ্য প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে। বৃন্দাবনের শরৎঋতু ও

১ গী° ৩।৭।৪

বৃন্দাবনের বসন্তঋতু তাদের নিজস্ব স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই যথাক্রমে ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত। বর্ষার পরে ঋতুচক্রের আবর্তনে যে-শরতের আবির্ভাব তার মন থেকে মেঘমেদুর জলদসম্ভারের স্মৃতি একেবারে মুছে যায়, এ কথা সত্য নয়। বিশেষত, ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসপঞ্চাধ্যায়ের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ষা-বর্ণনা অতিশয় গুরুগম্ভীর। এ বর্ষা যেন প্রাকৃত বর্ষা নয়, যোগদর্শনের নানা রূপক-ব্যবহারের ফলে অপ্রাকৃত মানস-বর্ষার মত ঘনায়িত হয়ে উঠেছে। এর পরেই যে-শরতের আবির্ভাব, তা 'উৎফুল্ল' হয়েও তাই উচ্ছ্বসিত নয়। লক্ষণীয়, শারদোৎফুল্লমল্লিকা রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়েও ভাগবতীয় রাস "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"—সেখানে রাসশেখর কৃষ্ণ যোগেশ্বর এবং ব্রজবধূরা অপ্রগল্ভা ও তত্ত্বজ্ঞা। ভাগবতের পরিবেশ ও প্রধান চরিত্র সবই গাম্ভীর্যপূর্ণ।

পক্ষান্তরে জয়দেব-ভারতী নৃত্যপরা ;—সমগ্র কাব্যখানিই অবিচ্ছিন্ন নৃত্য-প্রবাহে ভাসমান। এর ভিতরে বাহিরে উপচীয়মান উল্লাস বসন্তসখাকে আশ্রয় করে প্রতিবেশ থেকে মুখ্য চরিত্র পর্যন্ত সমস্তই অবিরল নৃত্য স্রোতে ভাসিয়েছে। এমন কি পাঠকেরও পরিত্রাণ নেই: "শ্রীজয়দেবভণিতমিদ-মধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্"—মনকে নাচাতে চান যদি, তবে জয়দেব-ভণিত কাব্য বারবার পাঠ করুন। সংগত কারণেই মনে হবে, বুঝি ভাগবতীয় শারদরাসের বিপরীত কোটিতে এর অবস্থান। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের অন্তরালেও এক পরম-সংগতি উক্ত কাব্য-পুরাণ দুটিকে অদ্বয়সূত্রে বিধৃত করেছে। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের অন্তিম বন্দনাবাক্যেই শারদ ও বাসন্তরাসের সেই সেতুবন্ধ প্রথম রচিত :

> "রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্
> অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
> সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
> ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥"[১]

অর্থাৎ, রাসোল্লাসভরে বিহ্বলা গোপিকাদের সম্মুখেই প্রেমান্ধা রাধা সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে "তোমার মুখমণ্ডল কত সুন্দর সুধাময়!" এরূপ স্তুতিচ্ছলে যাঁর মুখচুম্বন করেছিলেন, মধুরহাস্যে নিখিল-চিত্তহারী সেই হরি আপনাদের রক্ষা করুন।

---

১ গী° ১।৪৯

শ্লোকার্থ ব্যাখ্যায় পূজারী গোস্বামী বলেন :

"অথ কবিরপি বসন্তরাসমনুবর্ণয়ন্ শারদীয়রাসকৃত-রাধাশ্রীকৃষ্ণবিলাস-মনুস্মরন্ তদ্বর্ণনরূপমাশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে রাসেতি"।

বাসন্তরাস বর্ণনা করতে করতে অকস্মাৎ শারদীয় রাসে কৃত রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমবিলাসের অনুস্মরণ ভাগবত ও গীতগোবিন্দের অন্তর্লীন যোগ-সাধনের ইংগিত বলেও মনে করতে পারেন কেউ কেউ। বিশেষত দ্বিতীয় সর্গে অক্লেশ-কেশব চরিতগানেও রাধার বেদনাবিক্ষুব্ধ মুহূর্তে ভাগবতীয় শারদরাসের স্মৃতিই সমুদিত :

"স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্" [১]

পূজারী গোস্বামীর ব্যাখ্যায় 'কৃতপরিহাস' তাই :

"রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তং"।

কিন্তু শুধু শারদরাসের ইংগিতেই তো গীতগোবিন্দ কাব্যে ভাগবতীয় প্রভাবের প্রসঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা, পদ্মপুরাণে উভয়ত শারদ ও বাসন্তরাস বর্ণিত। গর্গসংহিতাতেও তাই। আবার হরিবংশে-বিষ্ণুপুরাণে বাসন্তরাস না থাকলেও শারদরাস রয়েছে। গীতগোবিন্দের কবি হিসাবে জয়দেব উল্লিখিত বাসুদেব-লীলাকথাময় পুরাণাদির সঙ্গে পরিচিত থাকতেই পারেন। সেক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠ তাঁর পক্ষে আবশ্যক না হতেও পারে। কিন্তু গীতগোবিন্দে এমন কয়েকটি সূক্ষ্ম ভাগবত-পরিচয়ের ব্যঞ্জনা আছে, যা 'দৈবাৎ সাদৃশ্যমূলক' বলে অগ্রাহ্য করা কঠিন। কুপিতা রাধার প্রস্থানে অপরাধভীত কৃষ্ণ যে জগৎ শূন্য ও জীবন অর্থহীন জ্ঞান করে ভেবেছিলেন :

"তামহং হৃদি সংগতামনিশং ভৃশং রময়ামি" [২]

তাঁর সঙ্গেই তো হৃদিসংগতা-হেতু অনুক্ষণ আমি মিলিত হয়ে আছি : রসিকপাঠকের চিত্তে তা মুহূর্তে ভাগবতীয় রাসদৃশ্যে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব-ক্ষণে ব্রজসুন্দরীদের কাছে নিবেদিত তাঁর অমূল্য ভাষণের অতুলনীয় অংশটি স্পন্দিত করে তুলবে,

"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং" [৩]

আমি তো অগোচরে থেকে তোমাদেরই প্রেমসেবা করেছি।

---

১ গী° ২।১২

২ গী° ৩।৬

৩ ভা° ১০।৩২।২১

তবে লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য। উপরন্তু সকল গোপীর প্রতিই এটি তাঁর একটি সাধারণ উক্তি। কিন্তু গীতগোবিন্দে গোবিন্দকেও অতিক্রম করে গেছেন গোবিন্দমোহিনী রাধা। তাঁর প্রতি প্রযুক্ত কোনো উক্তিও দ্বিতীয়া কোন গোপী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। এ কাব্যের আদিশ্লোকে নন্দ রাধাকে কিশোরকৃষ্ণের পথনির্দেশের অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন :

"ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়"[১]

—রাধা, একে নিয়ে তুমি গৃহে যাও—

বস্তুত, সমগ্র গীতগোবিন্দও তাই—প্রেমের সংকেত-কুঞ্জে রাধা-কর্তৃক কৃষ্ণের পথনির্দেশ। জয়দেব হলেন রাধাপ্রেমের একজন পথিকৃৎ সংহিতাকার। গীতগোবিন্দের ক্রমোন্নীত স্তরপরম্পরায় সে-প্রেমেরই প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত। রাধাপ্রেমের এই বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ষষ্ঠ সর্গ 'ধৃষ্ট-বৈকুণ্ঠ' থেকে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার অনুভাবগুলি সজ্জিত করা হলো :

১. "পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্"[২]
—দিকে দিকে রাধা তোমাকেই দেখছেন।

২. "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥"[৩]
—রাধা তোমার অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে অনুক্ষণ তাই দেখছেন, আর ভাবছেন, 'আমিই কৃষ্ণ'।

৩. "শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগতইতি তিমিরমনল্পম্ ॥"[৪]
—'হরি এসেছেন' বলে তিনি জলধর-সদৃশ গাঢ় অন্ধকারকেই আলিঙ্গন ও চুম্বন করছেন।

"রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী"-রাধার উপরি-উক্ত দশাত্রয় কোনো কোনো স্থলে ভাগবতকে স্মরণ করায়। যেমন "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা" শ্লোকটি। এটি ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের একাধিক শ্লোকে

---

১ গী° ১।১

২ গী° ৬।২

৩ গী° ৬।৫

৪ গী° ৬।৭

বর্ণিত ব্রজবধূবর্গের বিলাসবৈবর্ত-লীলার অনুরূপ। সেখানে দেখি, জয়দেবের কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার মতোই কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কাতরা ব্রজগোপীরাও নিজেদের কৃষ্ণজ্ঞান করে কৃষ্ণেরই বিবিধ বাল্যলীলানুকরণ করেছিলেন। গীত-গোবিন্দের সপ্তম সর্গে রাধা-কর্তৃক কৃষ্ণের অন্যনারী-সম্ভোগের যে-কল্পনা পাই, তাও অসূয়াখিন্না ভাগবতীয় ব্রজবধূ কর্তৃক প্রতিনায়িকার সৌভাগ্য-ভাবনারই সহোদরা। অষ্টম সর্গের অন্তিম শ্লোকে নিবদ্ধ বংশীমহিমাও ভাগবতের অনুরূপ মহিমাসূচক "কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত"[১] শ্লোকটি মনে করাবে। তবে যেক্ষেত্রে ভাগবতীয় শ্লোকে বংশীমাহাত্ম্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ্ব রূপশ্রীর যাদুপ্রভাবও যুক্ত হয়েছে, জয়দেবে সেখানে বিশুদ্ধ মুরলী মহিমাই কীর্তিত :

> "অন্তর্মোহন-মৌলিঘূর্ণন-চলন্মন্দার-বিস্রংসন-
> স্তব্ধাকর্ষণ-দৃষ্টিহর্ষণ-মহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্।
> দৃপ্যদ্দানব দূয়মানদিবিষদ্দুর্বার দুঃখাপদাং
> ভ্রংশঃ কংসরিপোর্বাপোহয়তু বঃ শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ॥"[২]

তাৎপর্য, কংসারির যে বংশীরব গীতিমুগ্ধা মৃগনয়নাদের মনোমোহনে ও শিরোঘূর্ণনে, এলায়িত কবরী থেকে মন্দারমাল্যের বিস্রংসনে এবং তাদের স্তম্ভন আকর্ষণ বশীকরণেও মহামন্ত্রস্বরূপ, তদুপরি দানব-উপদ্রুত দেবগণের দুর্বার দুঃখরাশি নিবারণে নিপুণ, সেই বংশীরব আপনাদের কল্যাণ বিধান করুক।

শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা-সিঞ্চিত এই 'অন্তর্মোহন' মুরলীর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় ভাগবত ও গীতগোবিন্দের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। ভাগবতের "সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজ হৃচ্ছয়াগ্নিং"[৩] এবং গীতগোবিন্দের "সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি-মুখরিত-মোহনবংশম্"[৪] পাশাপাশি স্থাপন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

আমরা জানি, গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে জয়দেব রাধাকৃষ্ণকে 'দম্পতি'

১ ভা° ১০।২৯।৪০
২ গী° ৮।১১
৩ ভা° ১০।২৯।৩৯
৪ গী° ১।২

রূপে অভিহিত করেছেন।[১] দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণকে রাধার 'পতি'ও বলেছেন।[২] কোনো কোনো সমালোচক জয়দেবকাব্যে রাধাকৃষ্ণের এই দাম্পত্য-ভাবনার উৎসরূপে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উল্লেখ করে থাকেন। উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক রাধাকৃষ্ণের বিবাহদানের প্রসঙ্গ আছে। উল্লেখযোগ্য, গর্গসংহিতাতেও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষাৎ লাভ করি। গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-যজ্ঞে দেখি পুরোহিত স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। শুধু তাই নয়, গর্গসংহিতার আদি শ্লোকেই কৃষ্ণ 'রাধাপতি' রূপে বন্দিত।[৩] বোধ করি বল্লভাচার্যের কাল[৪] পর্যন্ত ব্যাপক পরিমাণে প্রক্ষেপ চলে এসেছে বলেই রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় গর্গসংহিতার এত আগ্রহ। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের দাম্পত্যকল্পনা শুধু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও গর্গসংহিতারই বৈশিষ্ট্য নয়, বৈষ্ণবশাস্ত্র ভাগবতও কৃষ্ণ-গোপীর অনুরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটির অংশ-বিশেষ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করা চলে: "স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো"। এ শ্লোকে ব্রজবধূরা 'কৃষ্ণবধূ' রূপে উল্লিখিতা। আবার ত্রিংশ অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ ও ঊনচত্বারিংশ শ্লোক দুটিতে প্রধানা গোপী অন্যান্যা গোপী-কর্তৃক কৃষ্ণের বধূরূপে স্বীকৃতা। উদাহরণ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্‌" এবং "কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত"। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকে গোপী 'আর্যপুত্র' সম্ভাষণ করেছিলেন ভ্রমরগীতায়, "অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে"[৫] ইত্যাদি জিজ্ঞাসায়।

মনে রাখা প্রয়োজন, জয়দেব হলেন কবি। তাঁর কাব্য সকলোপজীবী হয়েই ভুবনোপজীব্য। সকলোপজীব্য রূপে গীতগোবিন্দের একটি প্রধান উপাদান যে ভাগবত তা অনুমান করা যেতে পারে। ভাগবতে যেমন হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের বহু চিত্র ও ধ্বনির প্রতিরূপ পাওয়া যায়, গীত-

১ "দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ" গী° ৫।১৯

২ "কামশরৈস্তদদ্ভুতমভূৎ প র্মনঃ কীলিতম্‌" গী° ১২।১৪

৩ "চলদ্দ্যুতিপদদ্বয়ং হৃদি দধামি রাধাপতেঃ" গোলোকখণ্ডম্‌ ১।১

৪ গর্গসংহিতার অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে আছে: "অব্দাশ্চতুঃ সহস্রাণি কলৌ পঞ্চশতানি চ। গতে গিরিবরে হি শ্রীনাথঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥ তং পূজয়িষ্যতি ব্রজে বিষ্ণুস্বামী রবেস্তনুঃ। বল্লভাদ্যাশ্চ তচ্ছিষ্যাশ্চান্যে গোকুলস্বামিনঃ॥ ২৯-৩০॥"

ভা° ১০।৩৭।২১

গোবিন্দেও তেমনি ভাগবতের অনুরূপ চিত্র ও ধ্বনির সমাবেশ লক্ষণীয়। ইতোমধ্যেই আমরা তারই কিছু কিছু তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এখানে আরও কিছু তুলে ধরার অবকাশ আছে।

ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণের কথামৃত সম্বন্ধে বলেছেন :

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"[১]

আর জয়দেব বলছেন :

"শ্রীজয়দেবকবেরিদং। কুরুতে মুদং। মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি॥"[২]

পুনরপি,

"ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে॥"[৩]

ভাগবতের "কল্মষাপহং" "শ্রবণমঙ্গলং" কথামৃত জয়দেবে "কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং" "মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি" হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত গীতগোবিন্দের সুবিখ্যাত দশাবতার-বন্দনার পদটিও মনে পড়তে পারে। এ পদের অন্তিমে অবতারী-শ্রীকৃষ্ণপদে প্রণতি জানিয়ে কবি বলছেন :

"দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ"।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের দাবী, তাঁরাই সর্বপ্রথম দশাবতার বন্দনার সূত্রপাত করেছিলেন। শুধু তা নয়, কৃষ্ণকে অবতারী-রূপে একমাত্র তাঁরাই মেনেছেন। আধুনিক কালে কোনো কোনো গবেষক নিম্বার্ককে আচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করতে চেয়ে মূলত নিম্বার্ক-মতকেই জয়দেবীয় দশাবতার-বন্দনার উৎস বলে প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। এঁদের অবগতির জন্য জানানো যায়, দশাবতারের উল্লেখ না থাকলেও ভাগবতেই প্রথম অবতারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করি। আর নিম্বার্ক-শিষ্য ঔদুম্বর আচার্যের 'নিম্বার্ক-বিক্রান্তি' গ্রন্থেরও পূর্বে ভাগবতেই কৃষ্ণ সর্বপ্রথম অবতারী-রূপে বন্দিত, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'। শুধু ভাগবত নয়, ভাগবতানুগামী গর্গসংহিতাতেও কৃষ্ণকে অবতারী ভগবান্

১ ভা° ১০।৩১।৯
২ গী° ১।২৫
৩ গী° ৭।২৯

বলার প্রবল প্রবণতা লক্ষ্য করি। এ-সংহিতা কৃষ্ণকে আবার শুধু "ভগবান্ স্বয়ম্" বলেই ক্ষান্ত হয়নি, বলেছে, "পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্"[১]। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায়েও অনুরূপ কৃষ্ণ-বন্দনার সাক্ষাৎ পাই। কৃষ্ণে এই অবতারী-ভাবনা জয়দেব তো গর্গসংহিতা বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকেও পেতে পারেন। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থেই ভাগবতের মহিমাপ্রচার এতই উচ্চকণ্ঠ যে, এই দুই গ্রন্থের পাঠকের পক্ষে ভাগবত পুরাণ সম্বন্ধে অনবহিত থাকা একরূপ অসম্ভব। জয়দেবের তুল্য সূক্ষ্ম-শ্রুতিসম্পন্ন মহাকবির পক্ষে তো আরো অসম্ভব।

ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের অপর একটি গূঢ় অন্বয়ের প্রতি এবার রসিক-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলে। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে 'শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর' বলা হয়েছে। অষ্টম সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'বিলক্ষ-লক্ষ্মীপতি'; এমনকি প্রার্থনাপদেও কবিপ্রণতি কোথাও কোথাও লক্ষ্মীকান্তেই নিবেদিত:

"শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল। ধৃতকুণ্ডল। কলিতললিতবনমাল। জয় জয় দেব হরে।"[২]

এ সর্গের ষড়্‌বিংশ শ্লোকেও বলা হয়েছে:

"পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনুপূরয়তু প্রিয়ং বঃ॥"[৩]

অর্থাৎ, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পদ্মাবক্ষের কুঙ্কুমে যাঁর বক্ষোদেশ অনুলিপ্ত হয়ে অন্তরের অনুরাগকেই বাহিরে প্রকাশ করছে, সেই মধুসূদনের মদনসন্তাপিত স্বেদধারা নিরন্তর আপনাদের আনন্দবর্ধন করুক।

যে-গীতগোবিন্দ রাধাপ্রেমের বিজয়পত্র, যার প্রথম শ্লোকের প্রথমবাক্যেই রাধামাধবের জয় ঘোষিত, সেই গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে বারংবার 'লক্ষ্মীকান্ত' বলার তাৎপর্য গভীর। যাঁরা এর অন্তরালে লক্ষ্মী ও রাধার অভিন্নত্ব লক্ষ্য করবেন তাঁরা ভ্রান্ত নলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে,

১ গোলোকখণ্ডম্, ১ম অধ্যায়, ১৮ শ্লো°
২ গী° ১।১৭
৩ গী° ১।২৬

ভাণ্ডীরবনে আকস্মিক মেঘাগমে ভীত বালককৃষ্ণকে রাধাহস্তে সমর্পণ করে নন্দ বলছেন, আমি গর্গমুখে আপনার মহিমা শুনে জেনেছি আপনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রীহরির অধিকতরা প্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী অপেক্ষা ব্রজবাসিনী রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জয়দেবেরও চরম লক্ষ্য। ভাগবতই এই পরম-তত্ত্বের সর্বাদি প্রতিষ্ঠাতা। ভাগবতে দেখি, লক্ষ্মী-মহিমারও ঊর্ধ্বে ব্রজবধূমহিমাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেখানে লক্ষ্মী-তুলসী প্রমুখা হরিবল্লভাদের বলা হয়েছে "তবপাদরজঃ প্রপন্নাঃ"[১] পক্ষান্তরে গোপীপ্রসঙ্গে উদ্গাত উদ্ধবের প্রশস্তিতে কৃষ্ণের "ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ" ব্রজবধূগণই শ্রেষ্ঠ প্রসাদপ্রাপ্তের মর্যাদাভাগী :

> "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
> স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
> রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
> লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্ ॥[২]"

অর্থাৎ, রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা লব্ধকামা ব্রজসুন্দরীরা যে-প্রসাদ লাভ করেছিলেন, পদ্মগন্ধা সুরললনাগণের অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠা সেই নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তা প্রাপ্তা হননি।

ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রধানা গোপীর প্রেমসৌরভ আবার সর্বাতিশায়ী। অন্যান্যা গোপীরা কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে বলেছেন :

> "ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
> যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে" ॥[৩]

আহা, সখীবৃন্দ, কী ধন্য গোবিন্দ-চরণপদ্মের এই রেণু! সংসৃতিজ্বালা থেকে পরিত্রাণের জন্য ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবী এই পাদরেণুই মস্তকে ধারণ করে থাকেন।

যাঁর পদধূলিই এমন অখণ্ড পুণ্যময়, স্বয়ং তাঁর ব্যবহার বিপুল চমৎকৃতির সৃষ্টি করে। মার্গানুসারিণী গোপীরা বলছেন :

> "ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূং।
> গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ॥"[৪]

১ ভা° ১০।২৯।৩৭
২ ভা° ১০।৪৭।৬০
৩ ভা° ১০।৩০।২৯
৪ ভা° ১০।৩০।৩১

সখীরা, দেখো দেখো, কামাসক্ত কৃষ্ণ তাঁর প্রেয়সীকে বহন করে নিয়ে যাওয়ায় ভারাক্রান্তিবশত এই স্থানে তাঁর পদচিহ্নগুলি ভূমিতে অধিক মগ্ন হয়েছে।

'এহোত্তম'। গীতগোবিন্দে এমনকি রাধার চরণ-সংবাহনের কথাও আছে, নূপুরানুগত হবার বাসনাও :

"করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম॥"[১]

কৃষ্ণ বলছেন, বহুদূর থেকে এসেছ, অনুমতি দাও আমার করকমলে তোমার পাদসংবাহন করি। ক্ষণকালের জন্য পাদলগ্ন নূপুরের মতো শয্যাপ্রান্তে আমাকে গ্রহণ করো।

যিনি লক্ষ্মীর বক্ষশোভা তিনিই রাধার চরণপ্রার্থী। বলাই বাহুল্য, জয়দেবের বক্তব্যে প্রকারান্তরে ভাগবতের ঐতিহ্যই রক্ষিত। ভাগবতে কৃষ্ণকে বলা হয়েছে : "পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ"—গোপীদের সেবাধিকারের বরদান করেছিলেন তিনি। জয়দেবের গীতগোবিন্দে তিনিই "সুপ্রীত-পীতাম্বরঃ"—রাধিকার প্রীতিলাভে ও প্রীতিসম্পাদনে সুপ্রীত-পীতাম্বরধর। ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্ত্বকে 'স্বীকার' করেও ভাগবত-অতিক্রমী 'অসাধারণ'-প্রণয়মহিমা গানে এই ভাবেই জয়দেব স্বীয় প্রতিভার প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কার করেছেন।

পরিশেষে, ভাগবতের সঙ্গে গীতগোবিন্দের একটি আপাত-বৈষম্যের উল্লেখ না করলে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে। উক্ত আপাত-বৈষম্যটি আর কিছু নয়, ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে 'রতিপতি মদনে'র ব্যবহার-বৈষম্য।

ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির টীকা রচনা করতে গিয়ে বন্দনাবাক্যে শ্রীধরস্বামী বলেছেন :

"ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥"

ব্রহ্মাদি দেবতাকে জয় করে দর্পিত হয়ে উঠেছিল মদন। সেই স্বর্গজয়ী কন্দর্পেরই দর্পচূর্ণ করলেন রাসমণ্ডলস্থিত গোপীমধ্যমণি গোবিন্দ। স্পষ্টতই ভাগবতীয় রাস উক্ত বিশিষ্ট টীকাকারের ব্যাখ্যায় হয়ে উঠেছে কন্দর্পবিজয় কাব্য : "তস্মাদ্রাস ক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েতি তত্ত্বম।" এই

১ গী° ১২।৩

কন্দর্পবিজয়তত্ত্ব যে শ্রীধরস্বামীর স্বকপোলকল্পিত নয়, তারই অনুকূলে ভাগবতের পদচতুষ্টয় উল্লিখিত হতে পারে। ভাগবতে রাসেশ্বর কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" "সাক্ষান্মথমন্মথঃ" এবং "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"।

পক্ষান্তরে মনে হবে, গীতগোবিন্দ মদনদীপক কাব্য। এ কাব্যে মদনের প্রবল প্রতাপ দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। গীতগোবিন্দের বাসন্ত-পটভূমি "উন্মদমদনমনোরথপথিক-বধূজনজনিতবিলাপে" মুখরিত। কিংশুক "যুবজনহৃদয়বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি"। কেশর কুসুমের বিকাশ "মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচি"। এই মদনমথিত পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত মদনমহোৎসবও "অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্"। এ লীলানাট্যের নায়িকা রাধিকাও অনুক্ষণ প্রবল কন্দর্পজ্বরে কাতরা ও চিন্তাকুলা হয়ে, "অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিত-চিন্তাকুলতয়া" বহুবিহিত কৃষ্ণানুসরণ করেন। "কন্দর্পদর্পহা" শ্রীপতিও এখানে মন্মথ-পর্যুদস্ত। মুগ্ধ মধুসূদনের মদনার্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ :

> "হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
> কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
> মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
> প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥"[১]

অর্থাৎ হৃদয়ে আমার মৃণালের হার, বাসুকী নয়। কণ্ঠে নীলোৎপলমালা, গরলদ্যুতি নয়। অঙ্গে শ্বেতচন্দনরেণু, ভস্ম নয়। পার্শ্বে প্রিয়াও উপস্থিত নেই। তবে কেন হে অনঙ্গ, প্রহারের জন্য ছুটে আসছো?

ভারতীয় কাব্যপুরাণের প্রচলিত ধারায় রতিপতি মদনই মূর্তিমান শৃঙ্গার রূপে স্বীকৃত। তবে ভাগবতে কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস-মূর্তিধর। কংসের মল্লভূমিতে তাঁকে সর্বরসের আলম্বনস্বরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে শুকদেব বলছেন : "স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্"[২] নারীদের কাছে তিনিই মূর্তিমান কন্দর্প।

অন্যান্য বৈষ্ণব-শাস্ত্রেও তিনি শৃঙ্গাররসের সাক্ষাৎ দেবতারূপে বন্দিত। গর্গসংহিতায় বলা হয়েছে :

---

১ গী° ৩।১১

২ ভা° ১০।৪৩।১৭,

"শ্যামং তু শৃঙ্গাররসস্য রূপং
শ্রীকৃষ্ণদেবং কথিতং মুনীন্দ্রৈঃ"[১]

অর্থাৎ, মুনীন্দ্রবর্গ বলেছেন, শৃঙ্গাররসের রূপ শ্যাম এবং শ্রীকৃষ্ণই তার দেবতা।

উপরি-উক্ত উভয় ধারাই গীতগোবিন্দে মিলিত হয়েছে। রাসক্রীড়ারত কৃষ্ণ সম্বন্ধে সখীকে তাই বলতে শুনি :

"শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ
মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥"[২]

রাধার দৃষ্টিতে এই 'মূর্তিমান শৃঙ্গার রসস্বরূপ' শ্রীকৃষ্ণ এ কাব্যেরই অন্যত্র অনঙ্গমূর্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। বিরহিনী রাধা সম্বন্ধে সখী কৃষ্ণকে জানাচ্ছেন :

"বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥"[৩]

অর্থাৎ, রাধা নির্জনে বসে মৃগমদের দ্বারা সাক্ষাৎ কন্দর্পবোধে তোমারই মূর্তি অংকন করছেন। চিত্রখানির নিম্নে মকর এঁকে এবং হস্তে শায়কস্বরূপ রসালমুকুল অর্পণ করে প্রণাম করছেন।

প্রণাম করছেন, আর বলছেন, হে মাধব, এই তোমার চরণে পড়ে রইলাম। তুমি বিমুখ হলে সুধানিধি চন্দ্রও আমাকে এখনি দগ্ধ করবে।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, গীতগোবিন্দের কৃষ্ণ ভাগবতীয় কৃষ্ণের মতো "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ" নন। তিনি শুধুই মন্মথ। এর মূলে বোধকরি পুরাণ ও কাব্যের দৃষ্টিভঙ্গিগত সনাতন পার্থক্যই ধরা পড়েছে। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। বৈষম্যের মধ্যে একটি সাধারণ ঐক্যসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।

গীতগোবিন্দের মতো ভাগবতীয় রাসেও 'অনঙ্গ' তথা 'কাম'-মূলক শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করি। যথা, "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং"[৪] বা "কামাদ্

---

১ গর্গ সং অশ্বমেধখণ্ডম্, একষষ্টি অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক,

২ গী° ১।৪৮

৩ গী° ৪।৬-৭

৪ এখানে উল্লেখযোগ্য, "গীতং তদনঙ্গবর্ধনং"—ভাগবতের এই "অনঙ্গবর্ধন" শব্দটির কেউ কেউ ভিন্নতর ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। "বর্ধন" শব্দটিকে তাঁরা ছেদনার্থক ধাতুনিষ্পন্ন মনে করেন। ফলত,

গোপ্যঃ” প্রভৃতি। লক্ষণীয়, উভয়ত ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে কোথাও “অনঙ্গজনন” শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ, কৃষ্ণানুরাগবতী গোপীর চিত্তে কামপ্রবাহকে নিত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। গোপীদের এই নিত্যপ্রেমই নানা শাস্ত্রে ‘কাম’ রূপে অভিহিত হয়েছে বলে বিদগ্ধজন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। প্রমাণস্বরূপ গৌতমীয়তন্ত্রের উক্তি উদ্ধার করা চলে: “প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথাং”। বস্তুত, গোপরমণীর ‘কাম’ যদি পরমপ্রেমই না হত, তাহলে তা কি কদাপি উদ্ধব-প্রমুখ ভাগবতগোষ্ঠীর সাধ্য হয়ে উঠতে পারত? বৃন্দাবনগোপীর অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমরসসীমার তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মুগ্ধবিস্মিত উদ্ধব জন্মান্তরে তাঁদের চরণরেণুস্পৃষ্ট গুল্ম-লতাদি হতে চেয়েছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

“এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ[১]।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য[২]”।

এতদর্থে “তদনঙ্গবর্ধন” হয়ে ওঠে “তদনঙ্গছেদন”। “বর্ধনে”র এরূপ একটি প্রসিদ্ধ ব্যবহার আমরা ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক থেকে উদ্ধার করলাম;

“মাং গোবর্ধনধারিণং ন ধরণৌ কো বেত্তি তং
বর্ধনং হিংসা হে বৃষহন্ বিভর্ষি তদযদ্বারৈব গোবর্ধনং॥” ৩।৭৬

চৈতন্য কর্তৃক অভিনীত ‘দানলীলা’ নাটকের উপরি-উক্ত অংশের রামনারায়ণ তর্করত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হল:

“শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দরি! তুই আমাকে গোবর্ধনধারী বলিয়া ভূমণ্ডলে কে না জানে?

ললিতা। হে বৃষঘাতিন্! গাবীগণের বর্দ্ধন অর্থাৎ হিংসা করিয়াছ, সেই দোষে জগতে গোহত্যাকারী নাম ধারণ করিতেছ॥ ৩।৭৬॥”

বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন, অনঙ্গবর্ধনকে অনঙ্গ-ছেদন বা-হিংসন রূপে গ্রহণ না করলে রাসলীলার সূচনাপত্রে প্রযুক্ত শ্রীধরস্বামীর “দর্পকন্দর্পদর্পহা” শব্দটির তাৎপর্য সর্বাংশে রক্ষিত হয় না।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণও তাঁর ‘বাংলার বৈষ্ণব দর্শন’ গ্রন্থের শ্যামের বাঁশি-প্রবন্ধে এই ‘বর্ধন’কে ছেদনার্থেই গ্রহণ করেছেন:

“প্রকৃত স্থলে এই বৃধ্ ধাতুটি ছেদনরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই কারণে অনঙ্গবর্ধন শব্দের এখানে কামবিনাশন এইরূপ অর্থ অনায়াসেই হইতে পারে।” দ্র' পৃ' ২৬৭

১ “রূঢ়ভাবাঃ”—“পরমপ্রেমবত্যঃ” শ্রীধরটীকা

২ ভা' ১০।৪৭।৫৮

অর্থাৎ, জগতে একমাত্র গোপবধূদের দেহধারণই সার্থক। কেননা, ভবভয়ে ভীত মুনি অথবা আমাদের তুল্য ভক্তজন যে-প্রেম লাভ করার জন্য নিরন্তর লালায়িত, গোপরমণারা অখিলাত্মা গোবিন্দের সঙ্গে সেই পরম-প্রেমসম্বন্ধে অনুক্ষণ পরিপূর্ণা। ভগবৎ-কথায় অনুরাগী জনের ব্রহ্মজন্মের প্রয়োজন কি ?

উদ্ধবের শ্রদ্ধাপ্লুত মন্তব্যে গোপীর কাম পরমপ্রেমেরই নিঃসংশয় অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বিশেষত, ব্রহ্মসংহিতাতেও কামমূলক 'স্মর' শব্দের বিপুল অর্থবিস্তৃতি ঘটতে দেখি। যথা,

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি[১]" ॥

যে আনন্দচিন্ময় পুরুষ রসাত্মতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে কন্দর্পস্বরূপে প্রতিফলিত হয়ে লীলার দ্বারা বিশ্ববিজয় করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি—উক্তিটি গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই মনে রাখতে হবে। গীতগোবিন্দেও সেই আনন্দচিন্ময় "রসো বৈ সঃ" গোবিন্দেরই ভজনা। তিনিই নিখিল প্রাণে সাক্ষাৎ 'স্মর'। অর্থাৎ, গীতগোবিন্দে গোবিন্দই আলম্বন বিভাব, মদন-গীত উদ্দীপক মাত্র।

পরবর্তী বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে ব্রহ্মসংহিতাসহ ভাগবত-গীতগোবিন্দের এই গভীর স্মর-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই। 'বৃহৎক্রমসন্দর্ভ' টীকায় জীব গোস্বামী তাই "অনঙ্গদীপনে"র অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যা করতে পারেন এইভাবে :

"অনঙ্গদীপনং ন অঙ্গোঽনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তস্য দীপনম্।"
কামকলারূপ অঙ্গের নয়, কিন্তু অঙ্গী যে-প্রেম, তারই উদ্দীপন—অনঙ্গদীপন।

বস্তুতপক্ষে, ভাগবত ও গীতগোবিন্দ—কেশবকেলিরহস্যপূর্ণ এই দুই পুরাণ ও কাব্যের কেন্দ্রস্থ রাসলীলার লক্ষ্য "অঙ্গ"-কামের প্রসাধনকলা নয়, "অঙ্গী"-প্রেমেরই সাধনবেগ। গীতগোবিন্দকে সম্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করে পরবর্তী কালে যে-বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠলো, সেখানে 'অঙ্গী'-প্রেমের ভাগবতানুগত ঐতিহ্য কতটা রক্ষিত, তা কৌতূহলের সঙ্গেই লক্ষণীয় ॥

১ ব্রহ্ম সং ৩২

ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণের রাসক্রীড়া সমাপনান্তে শুকদেব বলছেন :

"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥"[১]

অর্থাৎ, এইরূপে সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামজেতারূপে অনুরাগিনী ব্রজ-বধূদের সঙ্গে কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃঙ্গার-রস-কেলিতে চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করেছিলেন।

এই সুবিখ্যাত শ্লোকে ব্যবহৃত 'নিশা'-শব্দে বহুবচনের প্রয়োগ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাসপঞ্চাধ্যায়ের উপক্রম শ্লোকেও দেখেছি : "ভগবানপি তা রাত্রীঃ"। 'রাত্রি'-শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। উপসংহৃতিতেও দেখছি : "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ"। 'নিশা'-শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত। মীমাংসাশাস্ত্রে বলা হয়েছে, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পুনরাবৃত্তি), অপূর্বতা (নূতনত্ব), অর্থবাদ (প্রশংসা) এবং উপপত্তি (বোধ)—এই ছয়টি লক্ষণ বিচার করলেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া সম্ভব। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের উপক্রম, উপসংহৃতি, অভ্যাসাদি বিচার করলেও মনে হবে, একাধিক রাত্রির রাসক্রীড়াই বক্তা শুকদেব-বিবক্ষিত। বহুবচনের প্রয়োগে তিনি নিত্যপূর্ণিমায় নিত্যরাসের প্রতি গূঢ় ইংগিত করেছেন বলেও ভক্তদৃষ্টিতে প্রতিভাত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে "শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ" শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ। 'শরৎ'-এর দুটি অর্থ ;—একটি ঋতুবিশেষ, অন্যটি সমগ্র বৎসর[২]। অতএব শুধু শরৎকালে না হয়ে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে যে-সকল শৃঙ্গার কাব্যকথারসের সৃষ্টি হয়, ভাগবতীয় রাসে তারই আস্বাদন থাকতে পারে। টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন : "শৃঙ্গাররসাশ্রয়া শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেব ইতি।" "সিষেব"—অর্থাৎ, "অসেবত"। ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক, গোবর্ধনাচার্য প্রমুখ কবিগণ আপনাপন কাব্যে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুকালের উপযোগী রাধাকৃষ্ণের যে-শৃঙ্গাররসলীলা পরিবেষণ করেছেন, রাসলীলার রজনীসমূহে তাই সম্যক্‌রূপে সেবিত বা আস্বাদিত হয়েছিল। লঘুতোষণী

---

১ ভা° ১০।৩৩।২৬

২ 'বর্ষ' অর্থে 'শরৎ' শব্দের প্রাচীনতম প্রয়োগ লক্ষ্য করি ঋগ্বেদে। দ্র° ঋ° ৭।৬৬।১১।

টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, "শরৎকাব্যকথাশ্চ সর্বা সিষেবে। তত্র কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধা স্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-বর্ণিত-দানখণ্ডনৌকাখণ্ড-প্রকারাশ্চজ্ঞেয়াঃ।"—অর্থাৎ, কৃষ্ণের রাসলীলায় সকল শরৎকাব্যকথারস আস্বাদিত হয়েছিল। কাব্য শব্দের প্রয়োগে সে-সকল লীলার পরমবৈচিত্রীও সূচিত হয়েছে এবং তা গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে 'প্রসিদ্ধ', এবং চণ্ডীদাস প্রমুখ কবির দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি বিভিন্ন 'প্রকারে' বর্ণিত।—জীব গোস্বামীর এই বক্তব্য অবশ্য তাঁর জ্যেষ্ঠতাত সনাতন গোস্বামীরই পদানুসরণ মাত্র। বৃহৎ-তোষণী টীকায় সনাতন বলেছেন: "কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত-গোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" বৃহৎ-তোষণী টীকার এই "শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ" কেউ কেউ প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমান করে এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেছেন। আবার, টীকাংশটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করলেও এই চণ্ডীদাসই যে বড়ু চণ্ডীদাস এবং দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড যে বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেরই লীলাবিবরণ সে সম্পর্কে অনেকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। উপরি-উক্ত টীকাংশ যখন সনাতনের মূলগ্রন্থসহ জীবের লঘুতোষণীতেও পাওয়া যাচ্ছে, তখন একে প্রক্ষিপ্ত বলা সমীচীন হবে না। কিন্তু 'এহোবাহ্য'। বিসংবাদ বিশেষ করে সৃষ্টি হয়েছে "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি" কাব্যরচয়িতা "চণ্ডীদাসাদি"কে নিয়ে। সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এখানে কোন চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছে? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এখানে যে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি কাব্যের 'প্রকারে'র কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কোন্ ভাষায় লেখা? সংস্কৃতে না সংস্কৃতেতর কোনো ভাষায়? চণ্ডীদাসের লেখা কোনো সংস্কৃত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড আজো অনাবিষ্কৃত। তাহলে, হয় চণ্ডীদাস সংস্কৃতে লিখেছিলেন কিন্তু পরে তা কালকবলিত হয়েছে, নয়তো চণ্ডীদাস সংস্কৃতেতর কোনো ভাষাতেই লিখেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার একাধিকবার বলেছেন, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত ও গীতগোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করতেন।[৬] সংগত কারণেই বলা যায় যে, চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজে উল্লিখিত কবিগণের কাব্য বিশেষ সমাদৃত ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি লুপ্ত হবার কথা নয়। হয়ও নি। কাজেই চণ্ডীদাস যদি

সংস্কৃতে দানখণ্ডাদি লিখতেন তাহলে সেগুলি সযত্নেই রক্ষিত হত। কিন্তু চণ্ডীদাসের এ শ্রেণীর কাব্য না পাওয়ায় বলতে হয় তিনি সংস্কৃতেতর ভাষাতেই লিখেছিলেন। বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতেতর ভাষাতেই রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদন করেছিলেন। কাজেই চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রেও তা হতে কোনো বাধা ছিল না। বলা বাহুল্য, চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃতেতর বলতে কেবল বাঙ্‌লাই বোঝাবে। কেননা, চণ্ডীদাস প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে কোনো কাব্য লিখেছিলেন বলে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তাছাড়া সনাতন এবং জীব উভয়েই একনিঃশ্বাসে জয়দেব ও চণ্ডীদাসের নাম উচ্চারণ করেননি। তাঁদের বাগ্‌ভঙ্গিটি লক্ষ্য করবার মতো। তাঁরা গীতগোবিন্দের ক্ষেত্রে বলেছেন 'প্রসিদ্ধ,' এবং দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের ক্ষেত্রে 'প্রকার'। "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ"।

কিন্তু তাহলেও এই দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড, তা বিচারসম্মত নূতন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাসই চরিতামৃত-কথিত চণ্ডীদাস, এ অনুমান যুক্তিসম্মত হবেনা। তবু এই বিতর্কব্যূহে প্রবেশের চেষ্টা না করে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ভাগবতীয় উজ্জ্বলরস কতটা আস্বাদিত হয়েছে, অথবা আদৌ আস্বাদিত হয়েছে কি না, তাই হবে আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন জয়দেবের সাক্ষাৎ কবিশিষ্য এবং বিদ্যাপতির সমসাময়িক (কেউ কেউ মনে করেন, কিছু পরবর্তী)। জয়দেব ভাগবতের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না বলেই মনে হয়। বিদ্যাপতি ভাগবতের পুঁথি নকল করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র ভূমিকাংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করতে পারি: "...১৪২৮ খৃষ্টাব্দে...রাজবনৌলিতেই বিদ্যাপতি কর্তৃক ভাগবতের অনুলিপি সমাপ্ত"[১]। পুনরপি, "...অন্ততঃ দশ বৎসর কাল (লিখনাবলীর রচনা ২৯৯ ল. স. হইতে ভাগবতের লিপিকাল ৩০৯ ল. স) রাজবনৌলিতে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ও বিপদের মধ্যে বাস ও স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিলিপি প্রস্তুত করার সময় তাঁহার মনের মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন

---

১ বিদ্যাপতির পদাবলী।

আসিয়াছিল যাহার ফলে তাঁহার পদের ভাব ও ভাষা অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল"[১]।

এখানে "মনের পরিবর্তন" আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বিদ্যাপতির ভাগবত-চর্চার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিই বিবেচ্য। বস্তুত, বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ববর্তী, এই কবি মিথিলায় বসে ভাগবতচর্চা করছেন, অথচ বড়ু চণ্ডীদাস ভাগবতের সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত, একথা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলেই আমাদের ধারণা। বিশেষ করে, মধ্যযুগের ইতিহাসে বংঙ্‌লা ও মিথিলার ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রবাদতুল্য হয়ে আছে। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের কবিকল্পনার সাদৃশ্য ও উক্তি যোগকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে। অতএব বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাগবতের ভূমিকা সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠা নিতান্ত স্বাভাবিক।

সঞ্চয়ন, স্বীকরণ ও প্রকাশন—এই ত্রয়ী কবিবৃত্তির সার্থক সমন্বয়ে বড়ু চণ্ডীদাস মহাকবিনামা। অনিঃশেষ সঞ্চয়তৃষ্ণায় এই কবিভৃঙ্গটি ভারতবর্ষের ধ্রুপদী কাব্যসাহিত্য-পুরাণের পদ্মবনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে ফিরেছেন। বলা বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণলীলাব কথাকোবিদ্‌রূপেই তাঁর বাণীকুঞ্জে নানা পুরাণের সমাবেশ লক্ষ্য করি। স্বভাবতই কৌতূহল জাগে, রাধাকৃষ্ণলীলার মধুকর হিসাবে তাঁর মধুভাণ্ডটি কচিৎ "শরৎকাব্যকথাবসাশ্রয়া"ও হয়ে উঠেছে কিনা। প্রকৃতপ্রস্তাবে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এর প্রতিকূলে ও অনুকূলে উভয়তই বহুযুক্তির সন্নিবেশ করা যায়। আমরা একে একে উভয় শিবিবের যুক্তিশৃঙ্খলা সজ্জিত করলাম।

জন্মখণ্ডের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের ভাগবত-বহির্ভূত বিষ্ণু-পুরাণাশ্রিত চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। পৃথুভারব্যথাতুর পৃথ্বীর ভার মোচনের জন্য ব্রহ্মাকে নারায়ণ "ধল কাল দুই কেশ" দিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে এই কেশ 'চুল' অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রচলিত বিশ্বাস: "উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনেঃ"। মহাভারতের বৈবাহিক পর্ব্যাধ্যায়েও বলা হয়েছে: "স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্"। হরিবংশেও অনুরূপ ঘটনাবিবরণ স্থান লাভ করেছে। ভাগবতে সংগত কারণেই এই "কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ" হয়েছে 'কেশ'স্বরূপ। "কেশ", অর্থাৎ তেজ বা শক্তি। প্রসঙ্গত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের মধ্যলীলার অন্তর্গত

---

১ তত্রৈব, ৭।৶।

'প্রয়োজন-প্রেম-বিচার' শীর্ষক ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদটি স্মরণীয়। উক্ত পরিচ্ছেদে সনাতন-শিক্ষার অন্তে আছে :

"তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবতসিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥"[১]

এখানে মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে ভাগবত-সিদ্ধান্তের গুরুতর পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে 'কেশাবতার'কে'ও স্মরণ করা হয়েছে : "কেশবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥" সর্বাবতারের মূলীভূত কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি বা তাঁর অংশস্বরূপ বলরাম কখনো কারো মাথার কেশের অবতার হতে পারেন না। বিশেষত, বিধাতা জরারহিত, অব্যয় অক্ষয় যৌবনারূঢ়। কাজেই বিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত তাঁর শুক্লকেশ-কল্পনা অসম্ভব। এটিই ভাগবতাশ্রয়ী সাধারণ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার ভাগবতকে অঙ্গীকার না করে বিষ্ণুপুরাণকেই স্বীকার করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস তাই তাঁর কাব্যের জন্মখণ্ডে কৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলেননি, অবতার বলেছেন। বিষ্ণুর কৃষ্ণকেশে তাঁর জন্ম।

কবির এই ভাগবত-বৈষম্য ধীরে ধীরে আরো প্রকট হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের নারদচরিত্র পরিকল্পনা যে-কোনো ভাগবত-রসিকের চিত্তে আঘাত হানবে। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এক্ষেত্রে কবির ওপর হরিবংশের প্রভাবকেই জয়ী হতে দেখেছেন। অনুরূপ ভাবেই কৃষ্ণের অসুরাদিবধের ক্রমটিও ভাগবতক্রমের অনুসরণে রচিত নয়। বিশেষত নারদের শাপে বৃক্ষে পরিণত দুই কুবেরকিঙ্কর যমল ও অর্জুনকে তিনি কংসপ্রেরিত অসুর ভেবেছেন।[২] লক্ষ্মী ও রাধার অভিন্নতা সম্পাদনেও তিনি ভাগবতেতর কৃষ্ণকথা-কাব্যকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে স্মরণীয়.

১ চৈ. চ. মধ্য। ২৩, ৫৭-৫৯

২ দ্র° জন্মখণ্ড : "তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্নু তাহাক ভাঙ্গীল॥" পৃ° ৩
ভারখণ্ডের বিবরণ অবশ্য যথাযথ : "জমল আর্জুন তরু উপাড়িল আহ্নে॥"

ভাগবতে প্রধানা গোপীর নাম অনুচ্চারিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি জয়দেবের কাছ থেকে রাধা-নাম লাভ করে থাকতে পারেন। কিন্তু ভাগবতের প্রধানা গোপী বা জয়দেবের রাধা কুত্রাপি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্না নন। এক্ষেত্রে বড় চণ্ডীদাস তাই অংশত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অনুসারী। "অংশত", কেননা, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই কোথাও কোথাও রাধা ও লক্ষ্মী ভিন্নাও বটেন। অবশ্য এই পুরাণ থেকেই তিনি রাধা ও চন্দ্রাবলীর অভেদ কল্পনা প্রাপ্ত হয়েছেন; আবার রাধিকার মায়াপতি (রায়াণ>) আয়ানকেও পেয়েছেন একই পুরাণের খনিগর্ভে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ায়ি চরিত্রটিকে কেউ কেউ ভাগবতীয় যোগমায়ারূপে কল্পনা করেছেন। কিন্তু স্বয়ং কবি কোথাও এরূপ ইংগিত করেননি। ভাগবতের মিলনসাধিকা যোগমায়ার প্রভাবে শরৎকালেও 'মল্লিকা' পুষ্প বিকশিত হয়েছিল। বড়ায়ির এরূপ কোনো যোগপ্রভাবই দৃষ্ট হয় না। একবার মাত্র 'বংশীখণ্ডে' "নিন্দাউলী" মন্ত্র পড়ে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়াবার প্রসঙ্গ আছে।[১] কিন্তু তাও কোনো উচ্চাঙ্গের যোগপ্রভাব-জাত মনে করবার কারণ নেই। বস্তুত বড়ায়ির একান্ত মানবীমূর্তিই রক্তমাংসের সংবেদনে, স্নেহের উত্তাপে অভিমানের দাহে আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে যায়। প্রসঙ্গত 'জন্মখণ্ডে'র শেষাংশে পরিবেষিত বড়ায়ি-রাধা-সংবাদ উল্লেখযোগ্য। সেখানে বড়ায়ি বলেছে, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিমন্যুজননী আমাকে নিযুক্ত করেছেন। উত্তরে রাধার বক্তব্য:

> "ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা
> তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২ ॥"

অর্থাৎ, জরতি, ভাগ্যক্রমেই তুমি আমার রক্ষাকার্যে নিয়োজিতা হয়েছ। ওগো, মধুরব্যবহারনিপুণিকা, তাহলে চল মথুরায় যাই।

উদ্ধৃতিতে "মধুরাচারকোবিদে" সম্বোধনটি লক্ষণীয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমসংঘটনে মধুরাচারকোবিদা-ই বড়ায়ির শেষ পরিচয়।

জন্মখণ্ডের পরবর্তী তাম্বুল-দান-নৌকাখণ্ডাদির মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবন-খণ্ড এবং যমুনাখণ্ডের অন্তর্গত কালিয়দমন ও বস্ত্রহরণ ভিন্ন আর সমস্ত রাধাকৃষ্ণলীলাই ভাগবত-বহির্ভূত কবিকল্পনা। এই খণ্ডগুলির আকর-

---

১ "নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইবু আহ্মি।"
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৭ম সং পৃ° ১২২

গ্রন্থরূপে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় রাধাপ্রেমামৃত বা গোপালচরিত, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, গর্গসংহিতা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

শুধু বহিরঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্যেই নয়, অন্তরঙ্গ লীলাকীর্তনেও বড়ু চণ্ডীদাসের স্বাতন্ত্র্য স্মরণীয়। ভাগবতে কৃষ্ণের রাসলীলার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাকারগণও একে "সর্বমুকুটায়মানা" "সর্বোত্তমলীলা" রূপেই পরিকীর্তন করেছেন। কিন্তু গোপীদের জন্য তাঁর আবির্ভাব, এরূপ উক্তি মূল ভাগবতে কোথাও মেলে না। বরং বিষ্ণুপুরাণে এই "অন্তরঙ্গ" হেতুর ক্ষীণ আভাস আছে। কালিয়দমনলীলায় মহানাগ-কবলিত কৃষ্ণের উদ্দেশে উদ্গীত বলরামের বন্দনাবাক্যে শুনি :

> "অবতীর্য্য ভবান্ পূর্বং গোকুলেঽত্র সুরাঙ্গনাঃ।
> ক্রীড়ার্থমাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোঽসি শাশ্বতঃ॥"[১]

তাৎপর্য, লীলার্থে তুমি গোকুলে দেবাঙ্গনাগণকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং নিত্য হয়েও পশ্চাৎ অবতরণ করেছ।

এখানে "ক্রীড়ার্থং" শব্দটি কৃষ্ণাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতু-নির্দেশক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণও দেখি শুধু পৃথুভারহরণের জন্যই নন, গোপীলীলার জন্যও আবির্ভূত। প্রকৃতপক্ষে "গোপীলীলা"ও নয়, রাধাসঙ্গলাভই তাঁর অন্তরঙ্গ আবির্ভাব হেতু।[২] তাই দেখি, ভাগবতে যখন ব্রজগোপীমণ্ডলে কৃষ্ণের সাধারণপ্রণয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের তখন একমাত্র রাধাপ্রেমাশ্রয়;

১ বিষ্ণু ৫।৭।৩০

২ প্রমাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধারযোগ্য :

দানখণ্ডে— "পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার সুরতীর আশে।" দ্র° পৃ° ২৯, ব° সা° প° স°
"পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে॥" দ্র° পৃ° ৪১, ব° সা° প° স°
"অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্নু॥" দ্র° পৃ° ৫০, ব° সা° প° স°

ছত্রখণ্ডে— "অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে॥"
দ্র° পৃ° ৭৫, ব° সা° প° স°

বৃন্দাবনখণ্ডে— "শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে॥"
দ্র° পৃ° ৮২, ব° সা° প° স°

জয়দেবেও রাধার অসাধারণ-প্রণয়ের জয়গান, কিন্তু সেখানেও রাসরসে কৃষ্ণের "যুবতিজনেন সমং" বাসন্তবিলাস। আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ একমাত্র রাধাপ্রেমেরই শরণার্থী। দানখণ্ডের একটি সূত্রশ্লোকে কৃষ্ণ তাই রাধাকে "মম সুখেতরবধৈষিণি", অর্থাৎ, "আমার দুঃখনাশের অভিলাষিণী" রূপে সম্বোধন করেছেন। একই খণ্ডে তিনিই হয়েছেন "রসসন্দোহ সাধিকে", অর্থাৎ "সম্যক্ আনন্দ দোহনকারিণী"। উল্লেখযোগ্য গর্গ-সংহিতার বৃন্দাবনখণ্ডে গোবর্ধনের উক্তিতে 'দানলীলা'র আভাস পাই: "দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি" [২।৩৮]। একই খণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরোক্ষ বর্ণনায় দেখি, রাধারই প্রেমপরীক্ষার জন্য মায়া-ছদ্মবেশে কৃষ্ণ দানলীলার অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই রাধৈকসর্বস্ববাদে গর্গসংহিতাকেও অতিক্রম করে গেছে। তাই এখানে একমাত্র রাধারই জন্য কৃষ্ণের বাটদান, হাটদান, নৌকাবিলাস, ভারবহন, কালিয়দমন।[১] বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের যে রাসলীলা দেখি, তাও একমাত্র রাধারই সন্তুষ্টিবিধানে অনুষ্ঠিত। কৃষ্ণের ভাষায়:

"মন ঝুরে তোর নামে ল
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
তোর বোলেঁ গোপীগণে ল
তুষিআঁ তেজিলোঁ পরকা [রে] র॥"[২]

---

১ দ্রষ্টব্য নৌকাখণ্ডে:

"ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে।"
পৃ° ৬০, ব° সা° প° সং

"নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে।"
পৃ° ৬১, ব° সা° প° সং

ভারখণ্ডে: "যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ।
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার॥"
পৃ° ৬৬, ব° সা° প° সং

যমুনাখণ্ডে: "কালীদহে দিল আহ্মে ঝাঁপে ল।...
হরি হরি।
এত কৈল রাধার কারণে ল।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ তোষ নাহি তার মনে ল॥" পৃ° ৯৯, ব° সা° প° সং

২ দ্র° পৃ° ৮৯

বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের বহুবল্লভত্বের অপবাদ আশ্চর্যভাবে খণ্ডিত।

এ প্রসঙ্গে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর একটি গুরুতর পার্থক্যের উল্লেখ করা যায়। ভাগবতে প্রথমে কালিয়দমন, অতঃপর বস্ত্রহরণ, শেষে রাস বর্ণিত। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথমে বনবিলাস ও রাস, পরে কালিয়দমন, শেষে বস্ত্রহরণ। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিষ্ণুপুরাণে বস্ত্রহরণ অনুপস্থিত, আবার ভাগবতে বস্ত্রহরণ থাকলেও বংশীচৌর্যের কোনো প্রসঙ্গ নেই। গোপীবিরহের প্রসঙ্গ আছে, তবে তা প্রধানত উদ্ধবদূতের সকাশেই উদ্‌গীত।[১] উদাসীন মথুরারাজের কাছে দূতীর প্রস্তাব ভাগবতের নয়। এ-অংশ বরং বিদ্যাপতির পদে

"সুন সুন মাধব সুন মোরি বাণী।
তুঅ দরসনে বিনু জইসনি সয়ানী॥"

ইত্যাদি দূতীসংবাদের সঙ্গেই সাদৃশ্যমূলক হয়ে উঠেছে।

অতএব, কৃষ্ণকে অবতারী না বলে অবতার বলায়, রাধার প্রাধান্যে এবং রাধা ও লক্ষ্মীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে, তদুপরি নানা লৌকিক লীলাপরিক্রমায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতের স্থান যে ন্যূনতমও নয়, সেকথাই একাধিক সমালোচকের দ্বারা সমর্থিত।

আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই গুরু-বৈষম্যের তুলনায় সাদৃশ্য গুরুতর না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে মুদ্রিত গ্রন্থে বর্তমানে যেভাবে পাই, তাতে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস অন্যান্য বহু কাব্য পুরাণাদির সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকমন্ত্রও অনুধ্যান করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক যে এ-কাব্যে গর্গসংহিতার প্রভাব নির্দেশ করেছেন, তা যেন ভাগবতীয় প্রভাবেরই একটি পরোক্ষ প্রমাণ। গর্গসংহিতার পাঠকমাত্রেই জানেন, উক্ত সংহিতায় ভাগবতানুসরণের দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে। গর্গসংহিতার দ্বারকাখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারদের ভাগবত-প্রশস্তির মধ্যে পূর্বসূরীর ঋণ এই ভাবেই যথাযোগ্য স্বীকৃত :

"পুরাণং ন শ্রুতং যৈস্তু শ্রীমদ্ভাগবতং ক্বচিৎ।
তেষাং বৃথাজন্ম গতং নরাণাং ভুবি বাসিনাম্॥"

পৃথিবীবাসী যে-মানব ভাগবত-শ্রবণ করেনি, তার এই "বৃথাজন্ম" ঘোষণায় যে-সংহিতা এমন মুখর, সেই গর্গসংহিতার সঙ্গে পরিচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার

[১] দ্র° পৃ° ৮৯, ব° সা° প° স°

যে কৃষ্ণজীবনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থকে একেবারে অস্বীকার করবেন, তা বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু এও অনুমান সাপেক্ষ, 'পাথুরে প্রমাণে' প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ডিত পুথির সর্বাদি খণ্ডের সর্বাদি শ্লোকের সঙ্গে বিদ্বদ্বল্লভ-প্রদর্শিত ভাগবতীয় শ্লোকের সাদৃশ্যটি উদ্ধার করা চলে। জন্মখণ্ডের প্রারম্ভ শ্লোকে বড়ু চণ্ডীদাসের নিবেদন ছিল :

"পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জরান্।
ততঃ সরভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥"

অর্থাৎ, পৃথিবী তার গুরুভারজনিত বেদনার কথা দেবসমীপে নিবেদন করায় দেবতাগণ সত্বর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করলেন।—বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় টীকায় বলেন, "দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যরূপ গুরুভার। যথা ভাগবতে,—

"ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥
ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥"[১]

উপরি-উদ্ধৃত ভাগবতীয় শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ—রাজবেশধারী উন্মার্গগামী দৈত্যকুল তথা তাদের অসংখ্যাত সৈন্যভারে প্রপীড়িতা পৃথ্বী ব্রহ্মার শরণ নিলেন। তিনি শীর্ণা গাভীর রূপ ধরে অশ্রুমুখী হয়ে করুণ ক্রন্দনে আপন দুঃখবার্তা নিবেদন করলে, ব্রহ্মা ত্রিনয়ন-শম্ভুসহ অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরে উপনীত হয়ে পুরুষসূক্ত স্তোত্রে শরণাগতত্রাতা সর্বসিদ্ধি-দাতা দেবদেব জগন্নাথের একাগ্র আরাধনায় মগ্ন হন।

কিন্তু এই পৃথুভারব্যথাতুর পৃথ্বীর প্রসঙ্গ শুধু ভাগবতেই নয়, ব্রহ্মপুরাণ অথবা বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যাবে। যেমন, ব্রহ্মপুরাণের একাশীত্যধিক-শততম অধ্যায়ে কিংবা বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে

১ ভা° ১০।১।১৭-২০

"তদ্‌ভূরিভার-পীড়ার্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।" সুতরাং বসন্তরঞ্জন-প্রদত্ত প্রমাণ অমোঘ নয়। "নেতি নেতি" পদ্ধতি অনুসরণে এক্ষেত্রে গোবর্ধন-ধারণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাগবত-বিরোধী স্বভাব উদ্ধার করতে গিয়ে কোনো বিশিষ্ট সমালোচক যে এ কাব্যে গোবর্ধনধারণের মতো সুবিখ্যাত ভাগবতীয় লীলার অভাব লক্ষ্য করেছেন, তা সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুস্থলে গিরি-গোবর্ধনধারণের স্পষ্টোল্লেখ আছে। আমরা মাত্র দুটি স্থান উদ্ধার করলাম। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

"বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ"[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

১। "কোপেঁ শচীপতি যবেঁ বরিষএ বারী।
গোকুল রাখিল আহ্মে করে গিরী ধরী ॥"[২]

২। "উনঞ্চাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড়।
সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড় ॥
বরিষে মুষল ধারা পানী পাথর।
গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর ॥"[৩]

কিন্তু গোবর্ধনধারণের প্রসঙ্গটি থাকার ফলেই যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতীয় প্রভাব নিঃসংশয়ে প্রমাণীকৃত হচ্ছে, এমন নয়। কেননা ব্রহ্মপুরাণ-বিষ্ণুপুরাণ উভয়তই গোবর্ধনধারণ বর্ণিত এবং 'সপ্তরাত্রি'ও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত : "সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে"[৪]।

আসলে কৃষ্ণাবির্ভাবের পরবর্তী ঘটনাবিবরণেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভাগবত-প্রভাবিত বলে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার লিখছেন :

"বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্নু করি কোলে।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥
কাহ্নু দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥"[৫]

---

১ ভা° ১০।২৫।২২
২ দ্র° পৃ° ৩৫, ব° সা° প° স°
৩ দ্র° পৃ° ৩৮, ব° সা° প° স°
৪ ব্রহ্ম° ১৮৮।২২, বিষ্ণু° ৫।১১
৫ জন্মখণ্ড, পৃ° ২

এর সঙ্গে ভাগবতীয় বিবরণ তুলনীয় :

"তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্যান্তে যথা তমোরবেঃ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশু গর্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥
মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘ জবোর্মি ফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত-শতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃপতেঃ ॥"[১]

অর্থাৎ, বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে বহির্গমনে উদ্যত হলে, রবির উদয়ে অন্ধকার-বিমোচনের মতো সকল রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তৎকালে মেঘসমূহ মন্দ মন্দ গর্জনসহ বারিবর্ষণ করছিল, কিন্তু বসুদেবের গমনে কোনো বাধাসৃষ্টি হলো না। অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করে জল নিবারণ করতে করতে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। পর্জন্যদেব অবিরাম ধারাবর্ষণ করলেও তরঙ্গ-আকুলা প্রবলা যমুনানদী বসুদেবকে বর্ত্ম দান করলেন, যেমন সাগরাধিপতি বর্ত্মদান করেছিলেন সীতাপতি রামচন্দ্রকে।

হরিবংশে তরঙ্গ-আকুলা যমুনার প্রসঙ্গ নেই। ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। তবে শেষোক্ত দুই পুরাণে নানাবর্ত-শতাকুলা নদীর প্রসঙ্গ থাকলেও বর্ত্মদান-প্রসঙ্গ উপস্থাপিত নয়। সুতরাং "কাহ্নু দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই চরণটির উৎসরূপে ভাগবতকে মনে পড়াই স্বাভাবিক :

"...নদী মার্গং দদৌ..."।

উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম আকরগ্রন্থ-রূপে স্বীকৃত ব্রহ্মবৈবর্তেও মার্গদান অনুল্লিখিত। অবশ্য ভাগবতানুসারী গর্গসংহিতার বিবরণ অনুরূপ।

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ভাগবতের মুখ্য প্রভাব পড়েছে 'বৃন্দাবনখণ্ডে'। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে বৃন্দাবনখণ্ডের বনবিহারেই ভাগবত-পুরাণের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। স্মরণীয়, জনৈক সমালোচকের অভিমত অনুসারে এ-খণ্ড প্রক্ষিপ্ত মাত্র। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খণ্ড বড়ু চণ্ডীদাসের বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। বিশেষত, বৃন্দাবনখণ্ডের দু'একটি বিশিষ্ট ভাবকল্পনা পরবর্তী যমুনাখণ্ডান্তর্গত 'কালিয়দমনে'ও অনুসৃত হয়েছে। যেমন বৃন্দাবনে বনবিহার প্রসঙ্গে কবি বলেন :

১ ভা° ১০।৩।৫০

"একেঁ একেঁ গোপীজনে।
সঙ্কে জানিল আপণে।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে ॥"[১]

একই খণ্ডের প্রাক্‌-শেষ পদে রাধার ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধির তুঙ্গসীমায় শুনি :

"বিধি কৈল তোর মোর নেহে
একই পরাণ এক দেহে ॥"[২]

কালিয়দমন খণ্ডে রাধাবিলাপে অনুরূপ ভাবধ্বনি দ্যোতিত :

"সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা ॥"[৩]

সন্দেহ নেই, বৃন্দাবনের বনবর্ণনাসূচক -

"আল রাধে।
একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে"

পদটিতে কোনো প্রতিভাহীনের স্থূল হস্তাবলেপ পড়েছে, নতুবা এরূপ নির্বিচারে জানা-অজানা বিচিত্র বৃক্ষলতার একত্র বিষম সমাবেশ ঘটতো না। এক আম্রেরই "আম্র" এবং "আম্ব" নামে পুনরাবৃত্তিও না। কিন্তু একটি মাত্র পদের আংশিক প্রক্ষেপে সমগ্র খণ্ডটিকে অস্বীকার করা যাবে কিনা সন্দেহ।

বৃন্দাবনখণ্ডের মূল বর্ণনীয় বিষয় 'রাস'। শারদ নয়, বাসন্ত। এখানে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসন্তরাস কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অতি যত্নে ভাগবতীয় শারদ ও গীতগোবিন্দীয় বাসন্ত-রাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। লঘুতোষণী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী দেখিয়েছেন, নবম বৎসরের শরতে কৃষ্ণের রাসলীলা, শিবচতুর্দশীতে অম্বিকা বনযাত্রা, ফাল্গুনে শঙ্খচূড় বধ, দশমে স্বৈরলীলা, একাদশ বর্ষের চৈত্রপূর্ণিমায় অরিষ্টাসুরবধ এবং দ্বাদশের গৌণ ফাল্গুন দ্বাদশীতে কেশিবধ। পরদিবসই মথুরাযাত্রা এবং চতুর্দশীতে কংসবধ। কংসবিনাশের পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মথুরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত একাদশ বৎসর কয়েক মাস বৃন্দাবনে তিনি অবস্থানও করেছিলেন।

---

১ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৮৪
২ তত্রৈব ৯০
৩ তত্রৈব ৯১ ০০

তাঁর ব্যসন্তরাস এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলতে হয়। গীতগোবিন্দের পঞ্চমসর্গের সমাপ্তি শ্লোকে তিনি তাই "কংসধ্বংসন-ধূমকেতুঃ" বলে সম্বোধিত।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য-প্রদত্ত এই কাল ও লীলা-ক্রমের অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসন্তরাসের সময় নির্ধারণ অতিশয় দুরূহ, বোধ করি অসম্ভবই। গীতগোবিন্দের মতো এ-রাস কংসবধের পর কৃষ্ণের দ্বিতীয় বার বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলায় বিপদ আছে। দানখণ্ডে কৃষ্ণকে কংসবধের বাসনা প্রকাশ করতে শুনি: "তোর রাজা কংসের মো করিবোঁ নিপাত"[১]। একই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ নিজেকে কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমনকারী গোপসন্তান বলে অভিহিত করেছেন: "রাধিকেঽস্মি ননু গোপশাবকঃ কংসবংশদবদাবপাবকঃ"[২]। শেষ খণ্ডে 'রাধাবিরহ' পর্যায়েও রাধিকার প্রার্থনায় শুনি: "কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী"[৩]। অর্থাৎ এখনো কংসবধ হয়নি। সুতরাং কংসবধের পরে অনুষ্ঠিত গীতগোবিন্দীয় বাসন্তরাসের কালসীমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের বাসন্তরাস মেলানো উচিত নয়। আসলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাসন্তরাস বহিরঙ্গ প্রসাধনকলায় গীতগোবিন্দকে অনুসরণ করলেও, কালক্রমের দিক দিয়ে গর্গসংহিতা বা ব্রহ্মবৈবর্তের অনুসারী।[৪] আর তার অন্তরঙ্গ সাধনবেগ একান্তভাবেই ভাগবত অনুপ্রাণিত। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে "তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে / সকল শরীর বেশ করী মনোহরে" যেমন জয়দেবের "রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্"—এই সুপ্রসিদ্ধ

---

১ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৫০

২ তত্রৈব পৃ° ৫১

৩ তত্রৈব পৃ° ১৪০

৪ গর্গসংহিতায় দুবার রাসের বর্ণনা পাই। তার একটি আছে বৃন্দাবনখণ্ডে একোনবিংশ অধ্যায়ে, অপরটি অশ্বমেধখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে। প্রথমটি বাসন্তরাস, কালিয়দমনের পর রাধার তুলসী পূজান্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাল মধুমাস বৈশাখ। "মাধবো মাধবে মাসি মাধবাভিঃ সমাকুলে। বৃন্দাবনে সমারেভে রাসং রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ২॥ বৈশাখমাসি পঞ্চম্যাং জাতে চন্দ্রোদয়ে শুভে। যমুনোপবনে রেমে রাসেশ্বর্যা মনোহরঃ॥ ৩॥" বাসন্তরাস হলেও গর্গসংহিতার এ-রাসানুষ্ঠানে ভাগবতীয় শারদরাসের প্রভাব সর্বত্র অনুভূত হয়।

উল্লেখযোগ্য, ব্রহ্মবৈবর্তে ভাগবতের মতোই বস্ত্রহরণ ব্রত-উদ্‌যাপনের পর রাস বর্ণিত। তবে এ-রাস শারদ নয়, বাসন্ত। অধিকন্তু, এতে গর্গসংহিতার মতো পদে পদে ভাগবতানুসরণের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হবে না।

অভিসারপদের আক্ষরিক অনুবাদ, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণের বৃন্দাবন-বনবিলাস ভাগবতীয় রাসেরই মর্মানুকরণ। জয়দেবের অনুসরণে কবি ঋতুরাজ বসন্তের উদ্বোধন করেছেন, কিন্তু সেই বাসন্ত-রাসমঞ্চে অভিনীত হয়েছে যে-রাস, তা ভাগবতীয় শারদরাসেরই নামান্তর :

"অনেক হয়িআঁ তখণে।
বিলসিল গোপীগণে।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে ॥…
সব গোপীজন জানে।
মোএঁ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে ॥"[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই 'রাসপ্রকাশ' নিঃসন্দেহে ভাগবত-ভাবিত।

প্রধানা গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের অন্তর্ধানও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে স্থান লাভ করেছে। এ-অন্তর্ধান অবশ্য ভাগবতের মতো রাসোৎসবের পূর্বে ঘটেনি, পরে ঘটেছে। উপরন্তু অন্তর্ধানের কারণ গোপীদের গর্ব-মান নয়, রাধা-প্রেমের শ্রেষ্ঠতা :

"সংহরী সকল দেহে।
গোপী এড়ি কুঞ্জ গেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥"[২]

পরিত্যক্তা বৃন্দাবনবধূরা ভাগবতীয় ব্রজগোপীদের অনুরূপ আক্ষেপোক্তি করেছেন :

"কে না সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী ॥"[৩]

তুলনীয় :

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥"[৪]

কৌতূহলের বিষয়, এই গোবিন্দানুগৃহীতা কৃষ্ণ-আরাধিকা প্রধানা গোপীর অনন্য আরাধনার এক বিচিত্র টীকাভাষ্য রচনা করেছেন বাঙালী কবি। বলা বাহুল্য তা মধ্যযুগীয় বাঙালী কুলবধূর মনস্তত্ত্বসম্মতই হয়েছে। উদাহরণ সহযোগে আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত করা যায়। কৃষ্ণবঞ্চিতা গোপীরা বলছেন :

১ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৮৪,
২, ৩ তত্রৈব
৪ ভা° ১০।৩০।২৮

১. "কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুন্য সিনান॥"

২. "কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী।
কারে হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী॥"

৩. "কে না কেদারশির পরশিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী বদ্বেশ্বরে॥"

৪. "কে গাত্র তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে।
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে॥"[১]

সেই সঙ্গে ভাগবত-কথিত 'গোপীগীত'সহ পদচিহ্নানুসরণ :

"সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।
দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী॥"[২]

এ পর্যন্ত ভাগবতানুসরণের পরই খণ্ডিতা রাধার প্রসঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাস পুনরায় জয়দেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এক্ষেত্রে জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" পদটির আক্ষরিক অনুবাদ পাঠকের জন্য অপেক্ষিত। কিন্তু কবি তাও অতিক্রম করে গিয়ে বৃন্দাবনখণ্ডের উপসংহৃতি রচনা করেছেন। তাই দেখি রাধামাধবের মিলন জয়দেবানুসারী হলেও রাধার অশ্রুনিবেদিত সকরুণ প্রার্থনায় শেষ পর্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কবিবাণী 'হ্লাদৈকময়ী অনন্যপরতন্ত্রা' :

"বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে॥
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুনি আহ্মার দোষ নহে॥"[৩]

নবরসরুচির প্রশ্নে বৃন্দাবনখণ্ডের লক্ষণীয় শেষ-বৈশিষ্ট্যটি উদ্ধার না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। বৃন্দাবনখণ্ডে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের রাসলীলাবাসনার অন্তরালে বড়ু চণ্ডীদাস একটি স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে কবির বক্তব্য, গোপীসমাজে কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধাকে কলঙ্কভয়মুক্তা করবেন বলে এবং সকল গোপীকে রাধানুগতা

১ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৮৫

২ তত্রৈব

৩ তত্রৈব, পৃ° ৯০

সখী করবেন এই গূঢ়াভিলাষে, কৃষ্ণ রাধাবাক্যেরই আনুগত্যে রাসলীলায় ব্রতী হয়েছিলেন। আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্টীকৃত করার পক্ষপাতী। বৃন্দাবনখণ্ডের বিবরণে আছে, একমাত্র রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ নিভৃতে বৃন্দাবনে-বনে বিহার করতে চেয়েছিলেন :

"তোহ্মাক দেখাওঁ লঁআ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বন মাঝেঁ এ বন আহ্মার॥"[১]

বলা বাহুল্য, রাধার মনোভিলাষ স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু যুগলের বাঞ্ছিত অভিলাষসিদ্ধির বাধা যে বিস্তর! রাধার ভাষায় :

"তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেনমণে॥
যত দেখ মোর সখিগণে।
কাহারো ভাল নহে মণে॥ ল কাহ্নাঞি॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে॥"[২]

রাধার বচন মুরারির সহর্ষ সম্মতি লাভ করে :

"রাধা ল।
আপণে কহিলে মোর মনের কথা।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সহ্মার তোষিব আহ্মে মন॥
রাধা ল।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলাসিবোঁ গোপীসমাজে॥
চির সময় সঞ্চিত উভয় তোহ্ম মণে।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে॥

১ শ্রীকৃকী, পৃ: ৮২
২ তত্রৈব

এঁকে এঁকে রাধা যত গোপীগণ দেখী।
আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস॥"[১]

সকল গোপীকে রাধানুগতা সখী করার এই গূঢ়াভিলাষ ভাগবত তথা গীতগোবিন্দ-পাঠকের কাছে একটি অভিনব তথ্য, সন্দেহ নেই। রাধাবাদের এই চরম স্তরটিকে স্পর্শ করেও কবি কিভাবে রাধানাম-বর্জিত ভাগবতের রাসপরিকল্পনার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছেন বিচার করলে বলতেই হবে, বিষম ধাতুর মিলন সাধনেই কবিকল্পনা অঘটনঘটন-পটীয়সী।

"অথ রাধাবিরহঃ"। এটি একটি খণ্ডিত সর্গ—'খণ্ড' রূপে চিহ্নিতও নয়। একাধিক সমালোচক এ-সর্গটিকেও প্রক্ষিপ্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও নান্দনিক উভয়বিধ যুক্তিই তাঁরা আপনাপন সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সজ্জিত করেছেন। তথাপি তাঁদের অভিমত নির্বিচারে স্বীকার করা সম্ভব নয়। বিশেষত দানখণ্ডে বিরহখণ্ডের ইংগিত পাই। সেখানে শুনি, রাধা-প্রত্যাখ্যাত হয়ে কৃষ্ণ বলছেন, "এবেঁ তোহ্মে আকারণে। তেজ মোর বচনে। পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে॥" [২]

এ পর্বে রাধা সম্বন্ধে বলা হয়েছে "হরিণী-হারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ"। হরির এই "চির-বিরহ" তাঁর পুরাণ-প্রসিদ্ধ মথুরাযাত্রার ব্যপদেশে ঘটেছে বলেই অনুমান। অবশ্য ঘটনাবিবরণে অক্রূরের কোন উল্লেখ এতে পাই না। তবে প্রাপ্ত পুঁথির প্রাক্-শেষ দুই চরণে কংসবধের উদ্দেশ্যে মথুরায় কৃষ্ণের আগমনের স্বকথিত সংবাদ পাচ্ছি:

"মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস॥" [৩]

লক্ষণীয়, বড়ায়ি মথুরাকে কদাপি কৃষ্ণের 'নিজ থান' বলেনি, বলেছে 'মাঝ বৃন্দাবন'কে। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণের অনুসন্ধানরত বালকভক্ত ধ্রুবর প্রতি নারদের সেই অবিস্মরণীয় পথনির্দেশ উল্লেখযোগ্য:

১ তত্রৈব পৃ° ৮৩
২ তত্রৈব পৃ° ২৮
৩ তত্রৈব পৃ° ১৫৭

"তৎ তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥"[১]

তাৎপর্য, বৎস, মঙ্গল হোক তোমার। যাও, পবিত্র যমুনাতটের পুণ্যময় মধুবনে যাও—সেখানেই হরির নিত্য অবস্থান।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিবরণ থেকে আবার জানা যায়, কৃষ্ণের অবস্থানের ফলেই বৃন্দাবনের প্রখর গ্রীষ্মও মধুবসন্ত-রূপে সুখানুভূত হয়েছিল: "স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ। যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ"[২]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাও একই কথা বলেছিলেন:

"যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জানি॥"[৩]

হরির নিজস্থান এই বসন্তশোভিত 'মাঝ বৃন্দাবনে'ই বড়ায়ি কৃষ্ণসন্ধানের পথনির্দেশ প্রার্থনা করেছে। বলেছে:

"নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।"[৪]

গদাধরের এই "অশেষ মুরুতী"-ময় রূপকল্পনা ভাগবতের "বহুমূর্ত্যেক-মূর্তিকম্"[৫] কৃষ্ণরূপ-ভাবনাকেই স্মরণ করায়। গর্গাচার্যও বলেছিলেন, মহারাজ নন্দ, তোমার এই পুত্রের বহু নাম এবং বহু রূপ বর্তমান:

"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে"[৬]

আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ির কাছে যিনি 'নটক', ভাগবতীয় গোপীদের কাছে তিনিই 'কুহক'[৭]। এই 'কুহক' বা কপটশিরোমণিকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হবেন বলে বৃন্দাবনবধূরা কাত্যায়নী ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে এই কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা গোপীদের একান্তে বরপ্রার্থনা করতে শুনি:

১ ভা° ৪।৮।৪২
২ ভা° ১০।১৮।৩
৩ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ১৩৫
৪ তত্রৈব পৃ° ১৩৩
৫ ভা° ১০।৪০।৭
৬ ভা° ১০।৮।১৫
৭ ভা° ১০।৩১।১০

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।"[১]

রাধাবিরহে বিরহিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বড়ায়িকেও বলতে শোনা যায়:

"বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পুজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে॥"[২]

বিরহ-বিপ্রলম্ভে বৃন্দাবনগোপীর মতো রাধারও 'প্রাণপতি' হয়েছেন কৃষ্ণ। বড়ায়ি-সকাশে তাঁর ব্যাকুল মিনতি ভোলার নয়:

"চরণে পড়োঁ দুতী আনী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে॥"[৩]

অপর এক স্থলে কৃষ্ণ হয়েছেন রাধার "প্রাণেশ্বর"[৪]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই দাম্পত্যসূচক সম্বোধন ভাগবতীয় গোপীকর্তৃক কৃষ্ণকে "আর্যপুত্র"[৫] সম্ভাষণ স্মরণ করায়।

পুনরপি, ভাগবতে গোপীরা নিজেদের বলেছেন কৃষ্ণের "অশুল্কদাসিকা"[৬]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও নিজেকে কৃষ্ণের দাসীরূপে অঙ্গীকার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, বৃন্দাবনখণ্ডেই আমরা প্রথম আত্মনিবেদিতা রাধার দর্শন পাই। পরবর্তী খণ্ড 'কালিয়দমনে' আবার প্রেমিকা হয়েছেন "ভকতীদাসিক"[৭]। সেখানে দন্তে তৃণ ধারণ করে তিনি সেই প্রথম ঘোষণা করলেন, কৃষ্ণ তাঁর "পরাণপতী"। বংশীখণ্ডের শেষে রাধার এই ভক্তিদাস্যের পূর্ণাহুতি ঘটে: "আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী"। 'রাধাবিরহে' রাধার এ-শরণাগতি চরম স্তর স্পর্শ করেছে:

"হেন মনে পরিভাব জগত ঈশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার॥
অনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী"॥[৮]

১ ভা° ১০।২২।৪
২ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ১৩৪
৩ তত্রৈব পৃ° ১৫১
৪ তত্রৈব পৃ° ১৫৬
৫ ভা° ১০।৪৭।২১
৬ ভা° ১০ ৩১।২
৭ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৯১
৮ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ১৪৩

প্রেমের এই 'পূজার অর্ঘ বিরচনে' ভাগবতীয় গোপী ও কৃষ্ণকীর্তনের রাধা একাকার।

বস্তুত, রসিকচিত্তে 'রাধাবিরহ' স্থানে স্থানে ভাগবতের অনুরূপ ভাবানুষঙ্গ উদ্বোধিত করে তোলে। আমরা জানি, ভাগবতে কুরুক্ষেত্রমিলনে গোপীদের অধ্যাত্মশিক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ: "অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ"[১]। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যোগারূঢ় কৃষ্ণও ভাবৈকরসস্থিতা রাধাকে যোগ- শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণ-সমর্পিততনু সেই "অনুগতী ভকতী আনাথি"র চিত্তে যোগজ্ঞানের স্থান কোথায়?

"বিরহ সাগর মোর গহিন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞি কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার॥"[২]

চকিতে মনে পড়ে কৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষণের উত্তরে ভাগবতীয় গোপীদের "সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং"[৩] প্রার্থনা-শ্লোকটির আস্বাদনে শ্রীচৈতন্যের সেই অপূর্ব আত্মসাক্ষিক রসভাষ্য:

"নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী তার মধ্যে কুটিনাটি
শুনি গোপীর বাঢে আর রোষ॥
দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাহাঁ তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম- তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥"[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার উক্তি, "বিরহ সাগর মোর গহিন গম্ভীর বড়ায়ি" ইত্যাদি এবং চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত চৈতন্যদেবের উক্তি "বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে" প্রভৃতি সমার্থক। শ্রীচৈতন্য বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যই আস্বাদন করতেন কারো কারো এ-অনুমান এখানে এসে আর নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয় না।

১ ভা° ১০।৮২।৪৮ ২ তত্রৈব পৃ° ১৩৮
৩ ভা° ১০।৮২।৪৯ ৪ চৈ, চৈ, মধ্য। ১৩, ১৩৪-৩৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ভাগবতীয় প্রবণতাকে স্মরণ করায়। তা হলো ঐশ্বর্যের ঘনঘটা থেকে মধুররস নিষ্কাশনের নিরন্তর প্রবর্তনা। ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণের অবতারী-স্বরূপের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনাকে বারংবার কটাক্ষ করে অসূয়া-ভৎর্সনাবাণে তাঁকে বিদ্ধ করেছেন গোপীরা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও অনুরূপভাবে উপহাসে উন্মূলিত করে দিয়েছেন কৃষ্ণের প্রভুসম্মত উচ্চনাদী আত্মঘোষণা। উদাহরণ প্রসঙ্গে 'ভারখণ্ডে' ভারবহনে অস্বীকৃত কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত রাধার 'খর বচন'ই উদ্ধৃত করা যায়:

"সকল গোআল জাতী দধিভার বহে।
তাহাতে কাহারো লাজ কথাঁহো ত নহে॥
তোক্ষে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ তোক্ষে নহ গোআল জাতী॥"[১]

কৃষ্ণের ঈশ্বরাভিমান যখন 'ঐশ্বর্যশিথিল': "কৃষ্ণে ভার বহিলে মজিব ত্রিভুবন"[২]—তখন রাধার প্রেয়সীসুলভ প্রণয়জিদ একান্তভাবেই মধুরাশ্রিত, যুগপৎ নরলীল ও নরাভিমান:

"বহ ভার না কর তোঁ লাজ।
লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ॥
ঝাঁটি কাহ্ন লঅ দধিভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার॥"[৩]

বস্তুত, প্রেমের জগতে প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ভারবহন কলঙ্ক তো নয়ই, গৌরব। ভাগবতে কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রধানা গোপীকে স্কন্ধে বহনের উল্লেখ পাই। আর এ তো দধিদুগ্ধের পসার মাত্র। "ঝাঁট কাহ্ন লঅ দধিভার। এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার"—ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ মধুরের প্রত্যাধ্বকুঞ্জে কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই পথনির্দেশ পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাগণের সাধনায় বিফল হয়নি। ভাগবতের রাসবর্ণনাতেও অনৈকা গোপীকে পরিশ্রান্তা হয়ে আলস্যবিমণ্ডিত বাহু কৃষ্ণকণ্ঠে অনায়াসে অর্পণ করতে দেখি, রসাবেশে তাঁর বলয়মল্লিকা শিথিল হয়ে পড়ার অপূর্ব চিত্রটিও ভোলা অসম্ভব: "কাচিদ্‌ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য

১ শ্রীকৃষ্ণকী° ৬৯ ২ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ৬৮
৩ তত্রৈব পৃ° ৭৪

গদাভৃতঃ। জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্‌বলয়মল্লিকা”[১]। শ্লোকটির ব্যাখ্যায় সনাতন গোস্বামী বলেন, “এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বং মধ্যাস্থিতত্বঞ্চ দর্শিতম্। অস্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম্”[২]—স্বাধীনভর্তৃকাত্ব দেখেই এঁকে রাধা বলে নিঃসংশয়ে চিনেছেন বৈষ্ণব টীকাকার। কী স্বাধীনভর্তৃকাত্বে, কী আত্মনিবেদনে, ভাগবতীয় প্রধানা গোপীর মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাও দুর্লভ প্রেমপ্রতিমা। বড় চণ্ডীদাসের কনকপুতলী আবার ভাগবতীয় স্বর্ণপ্রতিমা অপেক্ষাও অধিকতর বৈচিত্র্যময়ী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ‘রতিরসকামদোহনী’র দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণের বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রশ্ন ছিল :

“সুন্দরি রাধা লী সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥”[৩]

মহোদধি-মথিতা লক্ষ্মীর সঙ্গে রাধার এই অভিন্নতা প্রতিপাদন ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের অন্ধ অনুকরণ মাত্র বলে মনে হয় না। এ যেন দুই পৃথক্ প্রেমধারাকে বৃহৎ ঐক্যসূত্রে গ্রন্থনের এক কঠিন-ব্রত। বড়ো বিচিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিকল্পনা। নারায়ণ-বক্ষোলগ্না লক্ষ্মী রাধারূপে ধরাবতরণ করে “দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া”’র বৈগুণ্যে কৃষ্ণকে প্রাণপতি-রূপে চিনতে পারেননি। দানখণ্ডে কৃষ্ণের বেদনার্ত হাহাকার মনে পড়ে :

“অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী”[৪]।

এ-কাব্যের প্রথমার্ধে এই আত্মবিস্মৃতা রাধার কৃষ্ণ-অস্বীকার তাই এমন প্রভূত নাট্যরসবিলসিত হয়ে উঠতে পেরেছে। দ্বিতীয়ার্ধের খণ্ডিত অংশে এইমাত্র লক্ষণীয়, রাধা আবার স্বরূপারূঢ়া হয়েছেন। প্রথমার্ধে যেমন দেখি, রাধা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যজ্ঞানকে শিথিল করে তাঁর নর-অভিমানকে পূর্ণজাগ্রত করে তুলতে চাইছেন ; দ্বিতীয়ার্ধে তেমনি, কৃষ্ণ চাইছেন রাধার যৌবনগর্বকে ভূমিসাৎ করে নিরভিমান প্রেমদৈন্যে তাঁকে “অনুগতী ভকতী আনাথি” করে তুলতে। দ্বিতীয়ার্ধে বিবাগী “প্রাণেশ্বরে”র উদ্দেশে রাধার তাই মুক্তকণ্ঠে দীন-প্রার্থনা তুলে ধরতে আর বাধা থাকে না :

“আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন।
জায়িতেঁ নে মোরে আ'াণ ভুবন॥”[৫]

---

১ ভা° ১০।৩৩।১১
২ বৈষ্ণবতোষণী ১০।৩৩।১১ টীকা
৩ শ্রীকৃষ্ণকী° পৃ° ২৭
৪ তত্রৈব পৃ° ৫১
৫ শ্রীকৃকী° পৃ° ১৪০

ভাগবতের ব্রজগোপী তথা জয়দেবের রাধিকা প্রথমাবধি একান্তভাবেই কৃষ্ণাপহৃতমানসা। এরই মধ্যে মায়াবিমোহিতা "আপন ভুবন" বিচ্যুতা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরূপা রাধা ভিন্নরসের অবতারণা করেছেন। স্বকীয়া-রূপে যিনি নিত্য-বক্ষোলগ্না, পরকীয়াবুদ্ধিতে তাঁরই প্রথমে বামাচরণ ও ক্রমে স্থায়ী প্রেমরতির অংকুরোদ্গম যেমন কাব্যরসে মনোগ্রাহী, তেমনি নাট্যগুণে চিত্তাকর্ষক। স্মরণীয়, বিদ্যাপতির পদে লক্ষ্মীরূপে রাধার দর্শন কুত্রাপি মেলে না, তবে কোনো কোনো পদে একেবারে প্রথম দিকে কৃষ্ণবিমুখা-রূপে কিশোরী রাধার দর্শনলাভ ঘটে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা নেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য, পূর্বভারতে অন্ধকার মধ্যযুগের ভগ্নমালঞ্চে কৃষ্ণকথার যে এক বিশাল সম্ভাবনা মুকুলিত হয়ে উঠেছিল, বিদ্যাপতির মতো বড়ু চণ্ডীদাসও তার প্রথমসারি পত্রপল্লবের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যাপতি-বিরচিত 'কীর্তিলতা'র ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন, "মুসলমানবিধ্বস্ত হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুসমাজের পুনঃপ্রচার" বিদ্যপতির একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিমত নেই, "তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সংগীতও তাঁহাকে সে'বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।"

অনুরূপ স্বীকৃতি অংশত বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাপ্য হলেও তাঁর পথ বিদ্যাপতির রাজপথ থেকে ভিন্ন। বস্তুত, বিদ্যাপতির মতো রাজসভা তাঁর আশ্রয় ছিল না. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের অবিকল ছাঁচেও তিনি পুরাণ নবীকরণ করতে চাননি। তাঁর আশ্রয় বাসুলীপাট, উপজীব্য লোকায়ত জীবনধারা, শ্রোতা জনসাধারণ। জন-গণ-মনোরঞ্জন করতে গিয়ে তিনি অবশ্য পুরাণ থেকে রতিশাস্ত্র, অলংকার থেকে লোকব্যবহার, কালিদাস-জয়দেব থেকে দেশজ প্রবাদ-প্রবচন কিছুকেই অবহেলা করেননি, সবই সমান আগ্রহে স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, নাট্য ও গীতের সমবায়ে যে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। ঝুমুর-নাটগীতের আদলে নিবদ্ধ করে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার উত্তুঙ্গ ভাবকল্পনাকে সাধারণ্যের সমভূমিতে প্রবাহিত করা বড়ো সহজসাধ্য নয়। হরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণসহ ভাগবতের ধ্রুপদী "শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া" লীলাকে বাঙ্‌লা-দেশের নিভৃত পল্লীকোণের অবজ্ঞাত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতের মুখের ভাষায়

অজস্রধারে প্রবাহিত করে দিয়ে তাই তিনি বঙ্গদেশে পুরাণ-নবীকরণের ইতিহাসে এক অনন্যপরতন্ত্র প্রতিভাবান পুরুষরূপে স্বীকৃত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য ॥

ভাগবত এবং মাধবেন্দ্রপুরী ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রগুরু মাধবেন্দ্রপুরী সম্বন্ধে 'বৃহৎবঙ্গ'প্রণেতা ড° দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি অবিস্মরণীয় :

"শুষ্ক জ্ঞানযুগ তখন অবসানপ্রায়, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার ন্যায় মাধবেন্দ্রপুরীর অভ্যুদয় হইল।"[১]

রাত্রির অবসানে প্রভাতের প্রথম দূত হয়ে আসে শুকতারা। বাঙ্‌লা-দেশেও এক বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয়ের শুভসূচনায় চৈতন্যাবির্ভাবের উজ্জ্বল সম্ভাবনার একজন বিশিষ্ট ইংগিতবাহী রূপে মাধবেন্দ্রপুরীর 'অভ্যুদয়'। বলা বাহুল্য, 'শুকতারা' অভিধাটি তাঁর এতদর্থেই সর্বাংশে সার্থক।

আমরা তো পূর্বেই জানিয়েছি, মাধবেন্দ্রপুরীই ভাগবতের সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম পরিচয় সাধন করিয়েছিলেন, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের এ-সিদ্ধান্তে আমাদের সমর্থন নেই। কিন্তু তাই বলে বঙ্গদেশে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচারে মাধবেন্দ্রপুরীর ভূমিকা আদৌ ন্যূন হয়ে যায় না। ভাগবত পুরাণকে আশ্রয় করে চৈতন্যের নেতৃত্বে ষোড়শ শতকের বাঙ্‌লায় যে বিপুল ভক্তি-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, বস্তুত মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন তারই অন্যতম ক্ষেত্র-প্রস্তুতকারী। একথা স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও বারংবার শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন, মাধবেন্দ্রপুরীকে যথার্থই তিনি বলেছেন 'ভক্তিরসে আদি সূত্রধার':

> "'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'।
> গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥"[২]

মাধবেন্দ্রপুরী বাঙ্‌লাদেশে প্রথম ভাগবত-প্রচারক না হয়েও কিভাবে যে চৈতন্য-'ভক্তিগগনে শুকতারা' হয়ে ওঠেন, কিংবা ভাগবত-কেন্দ্রিক চৈতন্য-রেনেসাঁসের পথ-প্রস্তুতকারী, ভাষান্তরে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিরসের 'আদি সূত্রধার', তা বিশেষ ভাবেই বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

---

১ বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড পৃ° ৬৭৭
২ চৈতন্যভাগবত, আদি। ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩০১ শ্লোক

'ভারতের সাধক' গ্রন্থ-রচয়িতা শঙ্করনাথ রায় ড° হৃষীকেশ বেদান্ত শাস্ত্রীর বিবরণ অনুসারে মাধবেন্দ্রপুরীর যে-জীবনী[১] উপস্থিত করেছেন, তা সত্য হলে বলতে হয়, পূর্বাশ্রমে মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ণিপাট গ্রামে 'হরিচরিত' প্রণেতা চতুর্ভুজের বংশে তাঁর জন্ম। আবাল্য ভক্ত এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ নাকি স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে কিশোরপুত্রকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তারপর কুলিয়া ও কুমারহট্টের মধ্যবর্তী বিষ্ণুগ্রামে চতুষ্পাঠী খুলে পাণ্ডিত্যের জন্য এমনকি নবদ্বীপ পর্যন্ত সুখ্যাত হয়ে যান। ফলে বহু তরুণ শিক্ষার্থীর ভীড় জমে যায় তাঁর চতুষ্পাঠীতে। এঁদেরই অন্যতম রূপে ঈশ্বরপুরী বর্ণিত। কমলাক্ষ বা অদ্বৈত আচার্যও নাকি তাঁর চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁরই হস্তে কিশোরপুত্র বিষ্ণুদাসের ভারার্পণ করে একদা মাধবেন্দ্র তামিল আলবারদের "প্রেমার্তি সাধনা ও সিদ্ধি"'র নিগূঢ় পরিচয় লাভের জন্য দাক্ষিণাত্যের পথে কন্থাকরঙ্গধারী হয়ে বেরিয়ে পড়েন। সেখানেই কোনো এক স্থানে পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত মহান্তের কাছে তাঁর সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, আর উদীপি মঠে লক্ষ্মীপতির কাছে মধ্বাচার্যের দ্বৈত-সাধনায় শিক্ষালাভ। পরে তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে নব নব প্রবাহ এসেও মেশে। এতদিন ভাগবতীয় প্রেমই ছিল তাঁর সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, আর সে-পথে শ্রীধর স্বামীর প্রেমরসাশ্রিত ব্যাখ্যানই ছিল পরম পাথেয়। এবার তারই সঙ্গে যুক্ত হলো গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণামৃত-প্লুত প্রেমধারা এবং আলবার সমাজের প্রেমোন্মাদ। মাধ্ব-সম্প্রদারভুক্ত হয়েও এইভাবেই মাধবেন্দ্র নানা সাধকের 'ধেয়ানের ধনে' সমৃদ্ধ এক স্বতন্ত্র নূতন পথের পথিক হয়ে যান।

এ-পর্যন্ত মাধবেন্দ্র পুরীর যে-জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তা মোটামুটি-ভাবে স্বীকার করলেও সর্বাংশে সত্য বলে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, অদ্বৈত আচার্য তাঁর তরুণ বয়সে মাধবেন্দ্রের বিষ্ণুগ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন, এ তথ্য অন্তত চৈতন্যভাগবতের বিবরণে স্বীকৃত হচ্ছে না। চৈতন্যভাগবতে দেখি, পরিণত বয়সে অদ্বৈত মাধবেন্দ্রপুরীর প্রথম সাক্ষাৎলাভ করেন শান্তিপুরে স্বগৃহে। তাঁদের সাক্ষাৎকার বিবরণে উভয়ের পূর্ব পরিচয়ের আভাসমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত চৈতন্য-জীবনসাধনাতেও দেখি বটে একাধারে গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণামৃত-ভাগবত-শ্রীধরটীকার সংশ্লেষণ, কিন্তু

---

১ দ্র° 'ভারতের সাধক', ৬ষ্ঠ খণ্ড

আলবারদের সাধনার ধারা চৈতন্য-সম্প্রদায়ে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এখনও বিচারসাপেক্ষ গবেষণার মুখাপেক্ষী। বিশেষত প্রথম অধ্যায়ে 'ভাগবত-রচনার স্থান কাল' পরিচ্ছেদে আমরা দেখিয়েছি, ভাগবতীয় ভক্তিসাধনার সঙ্গে আলবারদের ভক্তি-সাধনার মূলগত একটি প্রভেদ রয়েই গেছে। আলবারগণ সর্বোপরি বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর পার্ষদত্ব লাভই তাঁদের পরমার্থ, কৃষ্ণও তাঁদের কাছে সেই পরমার্থ-প্রদাতা বিষ্ণুরই অবতার মাত্র। পক্ষান্তরে চৈতন্য-সম্প্রদায় একান্ত ভাবেই কৃষ্ণভক্ত—ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ঘোষণাই তাঁদের কণ্ঠাভরণ—"ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে"[১] উদ্ধবের এই জন্ম-জন্মান্তরের কৃষ্ণভক্তি-কামনাই চৈতন্যে হয়েছে "জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি".[২] চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গুরু-রূপে বন্দিত মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনেও আলবারদের ঋণ কতটা, তাও তথ্যভিত্তিকভাবে কিছুই বলা যায় না। আর চৈতন্যজীবনী গ্রন্থেও তাঁকে 'ভাগবতীয়া বৈষ্ণব'[৩] বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে শঙ্করনাথ রায়ের একটি সিদ্ধান্ত সর্বাংশে স্বীকার্য :

"মাধ্ব মতবাদ ও সাধন-পন্থা হইতে সরিয়া আসিয়া মাধবেন্দ্র যে জীবনদর্শন প্রচার করেন, তাহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সাধনা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।"[৪]

বস্তুত এখানেই চৈতন্য-সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায় থেকে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী হয়ে গেছে। নতুবা গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবিকর্ণপূর চৈতন্য-সম্প্রদায়ের যে-ক্রমপঞ্জী উপস্থিত করেছেন, তাতে চৈতন্য-সম্প্রদায়কে সরাসরি মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত করেই দেখানো হয়েছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-ধৃত চৈতন্যের এই গুরুপরম্পরা স্বীকার করে নিলে বলতে হয়, গৌড়ীয়

১ ভা° ১২।১৩।২২

২ শিক্ষাষ্টক।৪

৩ চৈ. ভা.

৪ 'ভারতের সাধক', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ১২৯

বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই একটি শাখা মাত্র।[১]

১ গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ২২ শ্লোক-ধৃত ক্রমপঞ্জীটি নিম্নরূপ :

মধ্বাচার্য [বাসালব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ]
|
পদ্মনাভাচার্য
|
নরহরি
|
দ্বিজ মাধব
|
অক্ষোভ
|
জয়তীর্থ
|
জ্ঞানসিন্ধু
|
মহানিধি
|
বিদ্যানিধি
|
রাজেন্দ্র
|
জয়ধর্ম
|
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী
["যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ"]

পুরুষোত্তম
|
ব্যাসতীর্থ ["যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং"]
|
লক্ষ্মীপতি
|
মাধবেন্দ্রপুরী ["যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিতঃ"]
|
ঈশ্বরপুরী
|
গৌরাঙ্গদেব
["ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর
উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস
প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥ ২৫॥"

অবশ্য একাধিক গবেষক গৌরগণোদ্দেশদীপিকার এ-অংশটিকে প্রক্ষেপ বলে থাকেন। এ ছাড়াও নানা যুক্তির অবতারণা করে আরও অনেকেই মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির তথ্যকে অস্বীকার করেন। এঁদেরই অন্যতম হলেন বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ও চৈতন্যভক্তি আন্দোলনের আধুনিক গবেষক ড° সুশীলকুমার দে। তাঁর মতে, শঙ্করাচার্যের চরম অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় ভক্তিবাদের মিশ্রণে টীকা রচনা করে শ্রীধরস্বামী তাঁর সম্প্রদায়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ ভক্তিবাদী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মাধবেন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী এই ভক্তিবাদী সম্প্রদায়েরই উত্তরসাধক।[১] আসলে মাধবেন্দ্র মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হোন, আর নাই হোন, নিঃসন্দেহে তিনি এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কিভাবে তিনি এই অভিনব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করলেন, তা অনুধাবন করতে গেলে তাঁর নিজস্ব ভক্তিসাধনার যথার্থ স্বরূপটিরই সন্ধান করতে হবে সর্বাগ্রে।

মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন আচার্য শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। উপরন্তু দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে ছিল তাঁর দীক্ষা। স্মরণীয়, মাধবেন্দ্র-শিষ্য ঈশ্বরপুরীও গৌরাঙ্গদেবকে গয়ায় এই মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিলেন। দশাক্ষর গোপালমন্ত্র সম্বন্ধে ড° রাধাগোবিন্দ নাথ চৈতন্যভাগবতের তৎকৃত নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকায় জানান :

"ইহা হইতেছে কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্র।"[২]

পুনরপি, "দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের উপাসনায় গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-জ্ঞানের স্থান নাই।"[৩]

এই ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কান্তাভাবের উপাসনায় মাধবেন্দ্র যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁর অন্তিম মুহূর্তের কণ্ঠভূষণ শ্লোকটি। কথিত আছে, তাঁর অন্তিমকালে শিষ্য রামচন্দ্রপুরী 'মথুরানাথে'র নামোচ্চারণের

---

১ "It appears probable···that Madhavendra Puri and his disciple Isvara Puri were Samkarite Samnyasins of the same type as Sridhara Svamin, who in his great commentary on the Srimad-bhagavata attempted to combine the Advaita teachings of Samkara with the emotionalism of the Bhagavata." Eearly History of the Vaisnava Faith & Movement in Bengal, p. 17

২ চৈ. ভা. আদি। ১২, ১০৬-শ্লো° টীকা

৩ চৈ. ভা. আদি। ১২ অধ্যায়, ১১৫ শ্লো° টীকা

পরিবর্তে 'তারকব্রহ্ম' নাম জপ করতে বলায় তিনি তাঁকে তীব্র তাড়না করে বলেছিলেন :

"কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুক্তি না পাইলুঁ মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইল জ্বালা ॥"[১]

এমনকি ইষ্টদেবতার সেবাভার থেকে এ কারণে তাঁকে বঞ্চিত পর্যন্ত করেছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিক সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকেই প্রেমসম্পত্তি দিয়ে যান। রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী'র 'নিত্যলীলা' পর্যায় থেকে মাধবেন্দ্রপুরীর উক্ত সিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধার করে দেখা যাক পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্রের পক্ষে 'তারকব্রহ্ম' নামের পরিবর্তে মথুরানাথের নামোচ্চারণ অমোঘ হয়ে ওঠে কেন, কেনই-বা মথুরা বা মথুরানাথ কৃষ্ণকে না পাওয়ায় অনিবার্য হয়ে ওঠে 'তপ্ত ইক্ষুচর্বণ'। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"[২]

অর্থাৎ, হে দীনদয়ার্দ্র প্রভু, হে মথুরানাথ, কবে আমি তোমার দেখা পাব? দয়িত, কি করি আমি, তোমার অদর্শনে কাতর আমার হৃদয় যে অস্থির হয়েছে!

ভাগবত-রসিকের চিত্তে এ-শ্লোকের সম্বোধন-বৈচিত্র্য মুহূর্তে ভ্রমরগীতায় উচ্চারিত গোপীর ঈর্ষাদিগ্ধ অভিমানক্ষুব্ধ 'যদুঅধিপতি' সম্ভাষণেরই তির্যক ভঙ্গিমাকে অনুরূপ অনুষঙ্গে অভিব্যঞ্জিত করে তুলবে :

"কিমিহ বহুষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্"[৩]

ভ্রমর, তুমি বারবার কেন সেই যদুপতির পুরাণো নাম এই দুঃখিত বনচরীদের কাছে করছো?

সেই সঙ্গে উদ্ধবসন্দেশে সম্মিলিত গোপীগীতের 'দাশার্হ' সম্ভাষণে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও সাভিলাষ মনোভঙ্গির কথাও উঠবে :

"অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃততয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ ॥"[৪]

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ৮, ১২
২ 'পদ্যাবলী', 'শ্রীরাধায়া বিলাপঃ' ৩৩০, ড° সুশীলকুমার দে সম্পাদিত
৩ ভা° ১০।৪৭।১৪
৪ ভা° ১০।৪৭।৪৪

তাৎপর্য, ইন্দ্র যেমন বর্ষণে মেঘকে করেন সঞ্জীবিত, তেমনি করে স্বকৃতশোকে সন্তপ্তা এই আমাদেরও করস্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলতে 'দাশার্হ' আসবেন না বৃন্দাবনে ?

লক্ষণীয়, মাধবেন্দ্রের শ্লোকেও একদিকে 'মথুরানাথ' সম্ভাষণে অন্তর্গূঢ় অভিমান ও বিরহজনিত খেদ-অসূয়া, অন্যদিকে আবার 'দয়িত' সম্বোধনে অহৈতুকী প্রেমভক্তি, ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিঃশ্রেয়স আত্মনিবেদন একাধারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিচিত্রবিলাসী গোপীভাবেরই অনুসন্ধী হয়ে উঠেছে। শ্লোকটি সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের স্তুতি প্রণিধানযোগ্য :

"ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাঢ়ে—তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এ শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥"[১]

'চৌঠজন,' অর্থাৎ চতুর্থ জন। তাৎপর্য, শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্রপুরী এবং চৈতন্যদেব এই তিনজন ছাড়া চতুর্থ কোনো ব্যক্তি এ শ্লোকের রসাস্বাদনে সমর্থ নন। মাধবেন্দ্রপুরীর মধুরভাবে সাধনার চরমস্তরের প্রতি এটি একটি নিগূঢ় ইংগিত বলেই আমরা মনে করি। বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এটি আবার মাধবেন্দ্রপুরীর মঞ্জরীভাবে সাধনারই অভিব্যঞ্জনা, আর তা হলো চৈতন্যের স্বয়ংরাধাভাব-সিদ্ধিরই প্রাথমিক সোপান। বস্তুত, দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে মাধবেন্দ্র সিদ্ধিলাভও করেছিলেন, বৃন্দাবনে স্বপ্নদৃষ্ট গোপালমূর্তির প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই, রেমুণার গোপীনাথের ক্ষীর-চোরা নামও তাঁরই ভক্তজীবনের পুণ্যস্মৃতির সঙ্গে জড়িত, এই তথ্যগুলিই আবার ভাবসত্যে অলৌকিক রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে তাঁর 'দয়িত মথুরানাথে'র উদ্দেশে উচ্চারিত পরম শ্লোকটিতে। চৈতন্যের মতো মাধবেন্দ্রও ছিলেন কান্তাভাবে সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু এই উজ্জ্বলরস-সাধনায় চৈতন্যের মতো তাঁকেও প্রীত-প্রেয়-বৎসলতার বিচিত্র মিশ্রস্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত তাঁর বিভিন্ন শ্লোকাবলী তারই

---

১ চৈ. চ. মধ্য।৪, ১৯০-১৯৩

সাক্ষ্যবহন করছে।[১] কবিকর্ণপূর ঠিকই বলেছিলেন, প্রীত-প্রেয়-বৎসলতা-উজ্জ্বল এই চারপ্রকার ফলধারী বৃন্দাবন-কল্পতরুর সাক্ষাৎ অবতার মাধবেন্দ্র।[২] আর যেহেতু ভক্তদৃষ্টিতে চৈতন্যই হলেন সেই বৃন্দাবনীয় দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের পরিপূর্ণ-ফলধারী কল্পবৃক্ষ, সেই হেতু অতঃপর মাধবেন্দ্রও হয়ে দাঁড়ান চৈতন্য-ভক্তিকল্পতরুরই 'প্রথম অংকুর', কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় :

"জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেহোঁ প্রথম অংকুর॥"[৩]

চৈতন্যের আদি-জীবনীকার মুরারি গুপ্তও স্বীকার করে গেছেন, "আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী-প্রভুঃ"।[৪]

শুধু কৃষ্ণাশ্রিত বিভাবের অভিন্নতাতেই নয়, কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাবের দিক দিয়েও মাধবেন্দ্র চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিরসের 'আদি সূত্রধার' রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা পূর্বরাগবতী রাধাকে কৃষ্ণের বর্ণসাম্যে মেঘদর্শনে নিশ্চলদৃষ্টি হতে দেখেছি :

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা।"

মাধবেন্দ্রপুরীরও কৃষ্ণপ্রেমে অনুরূপ অনুভাব :

"মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥"[৫]

কৃষ্ণপ্রেমে এই প্রৌঢ় অনুভাব বঙ্গদেশে তখন অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। পূর্বেই তো দেখেছি, মাধবেন্দ্রপুরীর আবির্ভাব-ক্ষণটিকে ড° দীনেশচন্দ্র সেন

---

১ পদ্যাবলীতে মাধবেন্দ্রের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য :

ক. "সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু...স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে," পদ্যা°৭৯

খ. "কদা দ্রক্ষ্যামি নন্দস্য বালকং নীপমালকম্" পদ্যা°১০৪

গ. "অনঙ্গরস-চাতুরী-চপলচারু-নেত্রাঞ্চলঃ" পদ্যা°৯৬

ঘ. "অধরামৃত-মাধুরী ধুরীণো" পদ্যা°২৮৬

২ "কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ॥" গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ২২

৩ চৈ, চ, আদি। ৯, ৮

৪ মুরারি গুপ্তের কড়চা, ১।৪।৫

৫ চৈ. ভা. আদি।৬, ৩৭৬

"শুষ্ক জ্ঞানযুগ তখন অবসানপ্রায়" বলে চিহ্নিত করেছেন। এই "শুষ্ক জ্ঞানযুগ"টি যে কী, তা চৈতন্যভাগবতের বিবরণে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে :

"গীতা-ভাগবত যে যে জনে বা পঢ়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥"[১]

একদিকে পণ্ডিত সমাজে যখন চলেছে এই শুষ্ক জ্ঞানচর্বণ, অন্যদিকে আপামর জনসাধারণ তখন নিমগ্ন হয়েছে কৃষ্ণ-ভক্তিশূন্য "মহাতমোগুণে" :

"কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন॥
কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি কিবা সংকীর্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে॥"[২]

ধর্মের নামে তখন দেশে ঘোর তামসিকতা বিরাজমান :

"ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
'ধন বংশ বাঢ়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত॥"[৩]

ইষ্টদেবতার গ্রীষ্মতাপ নিবারণের জন্য প্রতিবৎসর চন্দনকাষ্ঠ আহরণের উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র যখন আসতেন বঙ্গদেশে, তখন একদিকে এই অহংসর্বস্ব শুষ্কজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে ব্যবহারসর্বস্ব 'ধর্ম কর্ম' দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে চিন্তা করতেন "বনবাস গিয়া করি।"[৪] বস্তুত শুষ্ক-জ্ঞানযুগে দেশব্যাপী ঘোর তামসিকতার বাতাবরণেও মাধবেন্দ্র ছিলেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম, সাক্ষাৎ

---

১ চৈ. ভা. আদি।২, ৬৮

২ চৈ. ভা. অন্ত্য।৪, ৪০৮,-১৪-১৫

৩ চৈ. ভা. অন্ত্য।৪, ৪০৯-১২

৪ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৪, ৪২

"ভাগবতীয়া বৈষ্ণব"। বৃন্দাবন দাসের বিবরণ অনুসারে তাঁর ভক্তলক্ষণ বড়ো বিস্ময়কর :

"প্রেমসুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায় ॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ অশ্রু কম্প।
হুঙ্কার গর্জন মহাহাস্য স্তম্ভ ঘর্ম ॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য ॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বনি ॥
কখনো বা হেন সে আনন্দমূর্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয় ॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গাধারা বহে যেন—অদ্ভুত কথন ॥
কখনো হাসেন অতি অট্ট অট্টহাস।
পরমানন্দরসে ক্ষণে হয় দিগ্‌বাস ॥
এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী।"[১]

ভাগবতোক্ত ভক্তলক্ষণের সঙ্গে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণ-প্রেমানুভাবসমূহের যে কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তা ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুটি থেকেই প্রমাণিত হবে :

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মত্তবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"[২]
"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়াক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥"[৩]

অর্থাৎ, এরূপ আচরণকারী প্রিয়নাম কীর্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত

১ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৪, ৪০০-৪০৭
২ ভা° ১১।২।৪০
৩ ভা° ১১।৩।৩২

হয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাসেন, রোদন করেন, গান করেন, কখনও আবার লোকবাহ্য হয়ে উন্মত্তের মতো নৃত্যও করে থাকেন।

অচ্যুত-চিন্তায় তাঁর কখনো ক্রন্দন, কখনো হাস্য, কখনো আনন্দ, কখনো অলৌকিক কথন, কখনো নৃত্য-গীতানুশীলন, আবার কখনো পরমানন্দ লাভে নির্বৃত হয়ে তূষ্ণীভাব।

বলা বাহুল্য, তৎকালীন আচারসর্বস্ব বঙ্গে এই প্রৌঢ় প্রেমলক্ষণ চোখে পড়ার মতোই বিশিষ্ট ও 'অদ্ভুত-কথন'ই ছিল। আর এই বৈশিষ্ট্যেই অদ্বৈত আচার্য মাধবেন্দ্রের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন :

"দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণবলক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ॥...
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥"[১]

শ্রীপর্বতে নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধবেন্দ্র-মিলনের দৃশ্যে আবার দেখি, এ 'বৈষ্ণবলক্ষণ' শুধু মাধবেন্দ্রেরই নয়, তাঁর ভক্তসম্প্রদায়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

"মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥"[২]

এই 'প্রেমময়-কলেবর' মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত 'প্রেমময়' ভক্ত-সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী-রূপে শ্রীচৈতন্যের প্রেমলক্ষণও ছিল অনুরূপ। উদাহরণত. কাশীতে প্রকাশানন্দের বেদান্তসভায় জনৈক বিপ্রের চৈতন্যদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

"মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জন॥"[৩]

উল্লেখযোগ্য, এই দুর্লভ প্রেমলক্ষণ দেখেই মথুরার সনৌড়িয়া এক ব্রাহ্মণ

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য।৪, ৪৩০-৪৩৬

২ চৈ. ভা. আদি।৬, ৩৫৬

৩ চৈ. চ. মধ্য।১৭, ১০৬-১০৮

চৈতন্যদেবকে মাধবেন্দ্রপুরীর সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নিশ্চিত অনুমান করেছিলেন :

"কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি—।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা—যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥"[১]

এই প্রত্যয় থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, মধ্বাচার্য নন, মাধবেন্দ্রপুরীই চৈতন্য-সম্প্রদায়ের আদিগুরু—'আদৌ জাতো'। আর তিনিই চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিরসের অভ্রান্ত 'সূত্রধার'। কোথায় ছিলেন তখন চৈতন্যাবতার যখন কৃষ্ণনামে মত্ত হয়ে ফিরতেন এই 'ভাগবতপ্রধান'। বৃন্দাবনদাস ঠিকই বলেছেন, "যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার" এবং যে সময়ে "বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার", তখনও মাধবেন্দ্র "প্রেমসুখসিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়"। চৈতন্য-ভক্তি-গগনে তিনি 'শুকতারা' ছাড়া আর কী! শুধু তিনি নিজেই নন, তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের মাধ্যমেও যে তিনি চৈতন্যাবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করেছিলেন, তাতেও সংশয়মাত্র নেই।

চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশে ও উৎকলে মাধবেন্দ্রপুরীর এক বিশাল শিষ্যসম্প্রদায় বর্তমান ছিলেন—যুগপৎ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়প্রকার ভক্তই ছিলেন উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। সন্ন্যাসী শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাগুরু, সে তো আমরা পূর্বেই বলেছি। কথিত আছে, তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত' কাব্যের রচয়িতা। 'রুক্মিনী-স্বয়ম্বর' নামে উল্লিখিত তাঁর অপর একটি রচনা থেকে উজ্জ্বলনীল-মণিকার দুটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন, পদ্যাবলীতেও তাঁর একাধিক শ্লোক সংকলিত। মাধবেন্দ্রপুরীর অন্য এক শিষ্য কেশব-ভারতী ছিলেন চৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু। সন্ন্যাসমন্ত্র দান করে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরাঙ্গকে গৃহছাড়া করেছিলেন বলে চৈতন্যলীলায় কেশব-ভারতী আবার 'অক্রুর' নামেও পরিচিত, মাধবেন্দ্রের গৃহী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে চৈতন্যলীলায় যাঁর ভূমিকা সর্বোপরি, তিনি অদ্বৈত আচার্য। প্রসিদ্ধি আছে, অদ্বৈতের নিরন্তর আহ্বানেই চৈতন্যাবির্ভাব[২]।

১ চৈ. চ. মধ্য। ১৭, ১৬৩-৬৪

২ "অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার ॥

মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনাতিথিতে অদ্বৈত-আয়োজিত মহোৎসবে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের সানন্দ যোগদান মুরারির কড়চায়[১] ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবতে[২] স্মরণীয় হয়ে আছে। মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য না হলেও বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যানন্দও ছিলেন চৈতন্য-ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বলেছেন চৈতন্য-ভক্তিকল্পতরুর দুই প্রধান শাখা।[৩] আর সেই ভক্তিকল্পতরুরই 'নবমূল' হলেন পরমানন্দপুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ এবং সুখানন্দ। প্রেমভক্তিগুণে এই 'নবমূল' বা 'নব যোগীন্দ্র' আবার 'নব ভাগবত' নামেও অভিহিত হয়েছেন গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়। অপরপক্ষে 'অষ্টমূল' তথা 'অষ্টসিদ্ধি' হলেন অনন্ত, সুখানন্দ, গোবিন্দ, রঘুনাথ, কৃষ্ণানন্দ, কেশব, দামোদর ও রাঘব। উপরি-উক্ত নব ভাগবত বা অষ্টসিদ্ধিগণ প্রায় সকলেই মাধবেন্দ্রপুরীর হয় সাক্ষাৎ শিষ্য, নয়তো কোনো না কোনো ভাবে কৃপাপ্রাপ্ত। এই শিষ্য বা কৃপাপ্রাপ্তদের তালিকার সঙ্গে জয়ানন্দ-উল্লিখিত অনন্তপুরী গোপালপুরী প্রমুখের নামও যোগ করা চলে। উপরন্তু 'অদ্বৈতমঙ্গলে'র অভিমত স্বীকার করলে বলতে হয় বিজয়পুরীও ছিলেন মাধবেন্দ্রেরই শিষ্য। আবার ড: সুশীলকুমার দে পদ্যাবলীর ভূমিকায় দেখিয়েছেন, শ্রীনিবাস আচার্যাদিও মাধবেন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। গৌড়-বঙ্গ ও উৎকলে চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলনের ভূমিকা-রচনায় এঁদের সম্মিলিত দান অবিস্মরণীয়। ভক্তিরত্নাকরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিরর্থক নয়:

"মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-রসময়।
যাঁর নাম স্মরণে সকল সিদ্ধি হয়॥
শ্রীঈশ্বরপুরী রঙ্গপুরী আদি যত।
মাধবেন্দ্রের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত॥

শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে॥" চৈ. ভা. আদি।২, ২৯১-৯৩

১ মুরারিগুপ্তের কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, ৪।১৫।১৮

২ চৈ. ভা. অন্ত্য।৪

৩ চৈ. চ. আদি। ৯, ১৯

গৌড়-উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ।
সবে কৃষ্ণভক্তি-প্রেমভক্তি-পরায়ণ।”[১]

এঁরাই বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণভক্তিশূন্য সংসারে ভাগবতীয় “কৃষ্ণভক্তি প্রেমভক্তি”র বীজটি গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসাদে প্রাপ্ত হয়ে স্ব স্ব সাধনায় সেটিকে অনুক্ষণ সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য তাকেই লোকোত্তর সাধনায় পরিণত-ফলে রূপদান করেন। আমরা শুধু পরিণত ফলটিরই স্বাদ গ্রহণ করবো, রসমাধুর্যে মুগ্ধ হবো, তাই নয়, যাঁরা নেপথ্যে থেকে বীজের মহীরুহ-সম্ভাবনাকে প্রতিনিয়ত স্বযত্নে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁদের কীর্তিও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করবো।

উপসংহারে ড° সুকুমার সেনের একটি অভিমত প্রসঙ্গত উল্লিখিত হতে পারে। তাঁর মতে, দু'চার বৎসর অন্তর চন্দন আহরণোদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র যখন দক্ষিণদেশে যেতেন তখন তাঁর পথে পড়তো বর্ধমানের কুলীন গ্রাম। আর সেখানেই মালাধর মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকতে পারেন[২]। বস্তুত মাধবেন্দ্র ও মালাধরের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা, আমাদের জানা নেই, তবে প্রাক্-চৈতন্যযুগের প্রস্তুতিপর্বে ভাগবতীয় ভক্তি-প্রচারে মাধবেন্দ্র ও মালাধরের নাম একই সঙ্গে উচ্চার্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যের জীবনসাধনাকে ‘অন্তরঙ্গ’ ও ‘বহিরঙ্গ’ ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন—অন্তরঙ্গ-সঙ্গে ছিল তাঁর রস-আস্বাদন, আর বহিরঙ্গ-সঙ্গে নাম-সংকীর্তন। মাধবেন্দ্রের নিগূঢ় ভাবসাধনায় চৈতন্য পেয়েছেন এই অন্তরঙ্গ রস-আস্বাদনের দীক্ষা, আর মালাধরের কাব্যে নাম-মহিমা প্রচারের শিক্ষা। তাই চৈতন্য-ভক্তিরসনাট্যে মাধবেন্দ্র যদি হন ‘সূত্রধার’, মালাধর তবে হবেন ‘পারিপার্শ্বিক’।

১ ভক্তিরত্নাকর, ৫।২২৭২-৭৩

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ° ১২৭, ৪র্থ সং

ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পঞ্চদশ শতাব্দীর 'কৃষ্ণচরিত্র'। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'কৃষ্ণচরিত্র'-পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ-সম্পৃক্তক বঙ্কিমচন্দ্র যুগ-প্রয়োজন উপলব্ধি করে লেখেন :

"ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তার সমালোচনা প্রয়োজনীয়।"[১]

কৃষ্ণচরিত্রের 'সবিস্তার সমালোচনা'র উদ্দেশ্যে তিনি মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বামন-কূর্মপুরাণাদির সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচরিত্র-প্রণেতা মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করতে বসে নান্দীবাকে বলছেন :

"সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন ॥ ৫ ॥"[২]

প্রস্তাবনার উপান্তেও নিবেদন করেছেন :

"হেনমতে অবতার অংসে অবতরি।
কৃষ্ণ রূপে পুর্ন্ন প্রভূ আপনে স্রীহরি ॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন এক মনে।
জাহা হৈতে নর্কবাস হইবে ত্যজনে ॥" [৩৭-৩৮]

উপসংহারে কবির বক্তব্য আরো বিশদাভূত :

"জত বুদ্ধি জত সাক্তি জত মোর চিত।
তাহার মত বুলিলু মুঞি স্রীকৃষ্ণ চরিত ॥
...অল্পবুদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান।
স্রীকৃষ্ণ চরিত্র কিছু করিনু বাখান ॥
অনেক আছয়ে সাস্ত্র ভারথ পুরানে।
বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে ॥
সাধারন লোক তাহা না পা. . বুঝিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলুঁ কৃষ্ণের চরিতে ॥" [৫৮৭৫-৫৮৮০]

---

১ কৃষ্ণচরিত্র, দ্র° পৃ° ৪০৮, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সা° স° স°

২ এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমুদয় উদ্ধৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়' থেকে গৃহীত।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে পুনঃপুন ব্যবহৃত "কৃষ্ণের চরিত্র" শব্দটি বিশেষভাবেই মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। বস্তুত, মালাধরের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণচরিত্র-প্রণয়ন, ভাগবতের শুধু মুক্ত-পদ্যানুবাদ নয়। কৃষ্ণচরিত্র পরিবেষণে তিনি তাই ভাগবতকে অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন, একমাত্র উপকরণ-রূপে নয়। এক্ষেত্রে ভাগবতের সঙ্গে মহাভারত-বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশাদি কৃষ্ণচরিতমুখ্য পুরাণও তাঁর আলম্বন হয়েছে। বিশেষত ভগবদ্‌গীতার দ্বারা মালাধর প্রভূত প্রভাবিত। ভগবদ্‌গীতার আধুনিক ভাষ্যকার বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এইভাবেই তাঁর একটি সূক্ষ্ম মানসনৈকট্যের কল্পনা করা চলে। তবে এ-কল্পনাও বল্গাহীনভাবে খুব বেশীদূর টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কেননা, ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষ্ণচরিত্র-শিল্পী স্পষ্টতই ঘোষণা করে গেছেন :

"কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।"[১]

"মানবচরিত্র" এবং "সমালোচনা"—মাত্র এই দুটি শব্দই আধুনিকতার অস্ত্ররূপে দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমের এই বিশুদ্ধ মানবিক দৃষ্টি, বিজ্ঞান-শাসিত যুক্তি-যোগ মধ্যযুগীয় কবি কোথা থেকে পাবেন। তাছাড়া 'চরিত্র' শব্দটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব, জীবনবাণী এবং তার আধুনিক যুগোপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতেই অখণ্ড তত্ত্বরূপে দেখেছেন। পক্ষান্তরে মালাধর 'চরিত্র' শব্দে বুঝিয়েছেন বর্ণনাত্মক জীবনী। 'চরিত্র' শব্দের ঊনবিংশ শতকীয় অর্থদ্যোতনা লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আর এইজন্যই তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে আমরা 'পঞ্চদশ শতাব্দী'র কৃষ্ণচরিত্র বলেছি। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একাধারে শিল্পী, গবেষক এবং ভক্ত। মালাধর শুধুই ভক্তশিল্পী। তদুপরি তাঁর শিল্পচৈতন্যের চেয়েও বহুব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। যুগপ্রয়োজনে কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে গিয়েও এইভাবেই তিনি মধ্যযুগের সংস্কারের কাছে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাই মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লা কৃষ্ণায়ন সাহিত্যেরই প্রতিনিধিস্থানীয়। আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের শব্দ-প্রমাণই উপস্থিত আছে। কৃষ্ণচরিত্রের অগণিত গ্রন্থমধ্যে চৈতন্যদেব যে গুটিকতক রচনার

[১] কৃষ্ণচরিত্র, দ্র° পৃ° ৪০৮, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খ., সা° সং.স°

রসাস্বাদনে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় তাদেরই অন্যতম। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের উক্তি উদ্ধৃত হল :

"গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়— ॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এইবাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ ॥
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর ॥"[১]

চৈতন্যচরিতামৃতের এই উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত হয়, মধ্যযুগে কৃষ্ণায়ন সাহিত্যের বিপুল প্রবাহের মধ্যে মালাধর বসুর কাব্য একটি বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালীর মানসপ্রস্তুতির ক্ষেত্রেও মালাধরের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

'বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত-চর্চার ইতিহাস' অধ্যায়ে আমরা বলেছি, বাঙ্‌লাদেশে কৃষ্ণায়ন সাহিত্যের দ্বিতীয় প্লাবনের পর্বে মালাধরের আবির্ভাব। প্রথম প্লাবন জয়দেব-গোষ্ঠীর সঙ্গেই সমাহিত। অতঃপর তুর্কী আক্রমণের সর্বনাশা যুগে অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে আচ্ছন্ন বাঙ্‌লাদেশ অন্ধকার হয়ে এল। কিন্তু এই তামস-তটিনীর কূলে তরঙ্গ-উত্থিত রত্নের মতই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে লাভ করা গেছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালপরিচয় সম্বন্ধে আজো নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানিকে বাদ দিলেও অপরাপর নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে, অর্থাৎ, চৈতন্যাবির্ভাবের প্রাক্‌ভূমিটিকে কৃষ্ণভক্তির দ্বিতীয় প্লাবনের পর্বরূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়।

এই দীর্ঘ কালসীমায় বাঙ্‌লাদেশের রাজনৈতিক নিয়তির নিয়ন্ত্রক ছিলেন যথাক্রমে, খিলজী আমীর ওমরাহগণ (১২০৬-১২২৭)।

দিল্লীর সুলতান (১২২৭-১৩৪১)।
ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১৩)।
গণেশ-জলালুদ্দীন (১৪১৪-১৪৪১)।
ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭)।
হাবসী খোজাগণ (১৪৮৭-১৪৯৩)।

১ চৈ. চ. মধ্য। ১৫, ১০০-১০২

অতঃপর ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যের জন্মের সাত বৎসর পর হুসেন শাহ বাঙ্‌লার সুলতান হলেন। তিনি রাজ্যশাসন করেন মোট ছাব্বিশ বৎসর (১৪৯৩-১৫১৯)। তাঁর পুত্র নসরৎ শাহও ছিলেন যোগ্য উত্তরাধিকারী। নসরৎ শাসন করেন তেরো বৎসর (১৫১৯-৩২)। সুতরাং চৈতন্যযুগের সাংস্কৃতিক বিকাশ এই পিতাপুত্রের আমলেরই অনবদ্য ইতিহাস।

কিন্তু চৈতন্যপূর্ব এবং ঈষৎ-চৈতন্যবর্তী (১২০৬-১৪৯৩) দু'শ সাতাশি বৎসরের বঙ্গীয় ইতিহাস রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ ছিল। তবু অন্ধকারে অগোচরেই বাঙালীর প্রাণের বীজ উপ্ত হয়ে চৈতন্যাবির্ভাবের সম্ভাবনার দিকে ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল! এযুগে বাঙালীর সারস্বত-সাধনা মুখ্যত বঙ্গভাষাকেই অবলম্বন করে। সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তাই বেশী নয়। বোধ হয় বহুকথিত কূর্মন্যায়ের অনুসরণেই এযুগের সংস্কৃতচর্চা ম্লেচ্ছাচারের সংস্পর্শ থেকে নিজের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে কেবলই সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। রামচন্দ্র কবিভারতীর (খ্রী°১২৪৫) 'ভক্তিশতক', 'বৃত্তমালা' এবং চতুর্ভুজের চতুর্দশ সর্গাত্মক 'হরিচরিত' (খ্রী°১৪৯৩) মাত্র এ ক'খানিই মৌলিক রচনা। প্রসঙ্গক্রমে স্মৃতি-মীমাংসা বিষয়ক কয়েকখানি টীকাগ্রন্থের নামও মনে পড়বে। রাজা গণেশ ও জলালুদ্দীনের সমসাময়িক 'রায়মুকুট' উপাধিধারী বৃহস্পতি শুধু 'স্মৃতিরত্নহার' শীর্ষক স্মৃতির টীকাই রচনা করেননি, 'শিশুপালবধের' টীকা 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি'ও প্রণয়ন করেন। পরম-বিষ্ণুভক্ত এই স্মার্ত পণ্ডিতের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে: "ভগবতী মম বিষ্ণুভক্তিঃ"। প্রসঙ্গত স্মার্ত শূলপাণির নামও-স্মরণীয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়ে শূলপাণি কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে 'একাদশী বিবেক', 'দোলযাত্রা বিবেক', 'রাসযাত্রা বিবেক' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একই সঙ্গে নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের নামও উচ্চার্য। ন্যায় ও বেদান্তে প্রগাঢ় পণ্ডিত এই 'তর্ককর্কশ' ব্রাহ্মণ তাঁর 'হেত্বাভাস-প্রকরণে'র প্রারম্ভেই নিবেদন করেছেন:

"হৃদ্ব্যোমকমলাসীনং তত্ত্বসাধকমদ্ভুতং।
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে॥"

"ঘনশ্যামমহং ভজে"—বাসুদেব সার্বভৌমের জীবনে চৈতন্যপ্রভাবের এটি বোধ করি পূর্বগামিনী ছায়া।

আমরা জানি, সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী টীকার সূচনায় শিক্ষা-গুরুর চরণবন্দনা করে বলেছেন : "বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ম্"। বস্তুত, 'ভট্টাচার্য' অর্থাৎ নৈয়ায়িক হয়েও, 'রসপ্রিয়' অর্থাৎ কাব্যরসিক ভক্তি-প্রাণ বিদ্বৎ-জন সেযুগের নব্যন্যায়-সমাজে অনেকেই ছিলেন।[১] চৈতন্যপূর্ব যুগে এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। স্বরচিত 'তত্ত্বচিন্তামণিবিবেচনে'র প্রারম্ভ শ্লোকে তিনি মনঃসমাকর্ষণের মূলমন্ত্রস্বরূপ মুরলীনিনাদের বন্দনা করেছেন এইভাবে :

"মনঃসমাকর্ষণমূলমন্ত্রঃ সিদ্ধাঞ্জনং সন্তমসপ্রচারে।
জীবাতুরাভীরকৃশোদরীণাং জীয়ান্মুরারের্মুরলীনিনাদঃ ॥"

শ্লোকে "আভীরকৃশোদরী"দের প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, এযুগে বঙ্গভাষাতেই ভক্তিচর্চার অধিক প্রসার ঘটেছিল। বাঙ্‌লাসাহিত্যের ইতিহাসে এই কালসীমাটিকে আমরা পুরাণ-অনুবাদের সুবর্ণযুগ বলতে পারি। রামভক্তির প্লাবন এনে এযুগে কৃত্তিবাসই প্রথম 'ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা' ইত্যাদি অভিশাপকে অতিক্রম করেছেন। মহাভারত অনুবাদের প্রাথমিক পর্বেরও এযুগেই সূত্রপাত। তদুপরি ব্যাপকতা লাভ করেছে ভাগবতানুশীলন।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের মতো ভাগবত-চর্চারও একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে নবদ্বীপে এই ভাগবত-চর্চারই একটি সুচারু চিত্র অঙ্কন করেছেন বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে। এক্ষেত্রে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-পাঠের কথা মনে পড়বে শ্রীবাসগৃহ ছিল ভাগবত পাঠের উল্লেখযোগ্য আসর। কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, পরে যিনি অদ্বৈত আচার্য-রূপে পরিচিত হন, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ভাগবতীয় ভক্তি-যোগের দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ভাগবতীয় নামসংকীর্তনের মূর্তবিগ্রহ হরিদাসও শ্রীচৈতন্যের বহু পূর্বে আবির্ভূত হয়ে বাঙ্‌লাদেশে ভক্তিধর্ম প্রচারের পথপ্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বরাহনগরনিবাসী রঘুনাথ পণ্ডিতের নামও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বরাহনগরে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব তাঁর সুললিত ভাগবতপাঠ-শ্রবণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেন। অনুমান করা যায়, চৈতন্যের প্রসাদলাভের বেশ কিছুকাল পূর্ব

১ দ্র° দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-প্রণীত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' ১ম ভাগ।

থেকেই রঘুনাথ ভাগবতের বিশ্বস্ত পদ্যানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র পরিকল্পনা করে আসছিলেন।

অতএব বলতে হয়, প্রাক্‌চৈতন্যযুগে কৃষ্ণভক্তির একটি ব্যাপক ধারাপথেই মালাধরের আবির্ভাব। এই ধারাটিকেই আমরা বঙ্গদেশে কৃষ্ণভক্তির দ্বিতীয় প্লাবনরূপে চিহ্নিত করেছি। এক্ষেত্রে মালাধর পথিকৃৎ নন। অথচ মহাপ্রভুর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি আকর্ষণ করেছেন। সে কি শুধুই "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথে"র মধ্যে আভাসিত রাগানুগা ভক্তির জন্যই, নাকি অপর কোনো গূঢ়তর কারণে, তা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

প্রচলিত বিশ্বাস, রুকনুদ্দীন বরবক শাহ কর্তৃক মালাধর 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৪৭৩-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য সমাপ্ত হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি, কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে মালাধর বিভিন্ন পুরাণাদির সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য ভাগবতই প্রধান। ভাগবতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ হিসাবে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বৈশিষ্ট্য সর্বাংশে স্বীকার্য। উত্তরভারতে সংস্কৃতেতর ভাষাসাহিত্যে যে-সকল কৃষ্ণচরিতকাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়কেই গবেষকগণ প্রাচীনতম আখ্যা দিয়েছেন। প্রাচীনতম ভাগবতানুবাদ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সঙ্গে পরবর্তী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর পার্থক্য বিস্তর। ভাগবতাচার্যের গ্রন্থে ভাগবতীয় স্কন্ধ,অধ্যায়,এমনকি কোথাও কোথাও শ্লোক-পরম্পরা অনুবাদের নিষ্ঠা লক্ষ্য করি। পক্ষান্তরে গুণরাজের গ্রন্থে ভাগবত কোথাও গৃহীত, কোথাও অতিক্রান্ত, আবার কোথাও-বা নবীভূত হয়েছে। অর্থাৎ, অনুবাদক অপেক্ষা স্রষ্টা-শিল্পীর ভূমিকাই এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বাঙ্‌লাদেশের সর্বপ্রাচীন পুরাণ-অনুবাদক কৃত্তিবাসের কথা স্মরণ করতে পারি। কৃত্তিবাসের মূল আলম্বন ছিল রামভক্তি—বাল্মীকি-রামায়ণের বাঙ্‌লা রূপান্তরে তারই প্রভাব স্পষ্ট। বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' কখন যে প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের অবতার হয়ে উঠেছেন বলা শক্ত। অবশ্য সেক্ষেত্রে পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ কতটা দায়ী বলা যায় না। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও কৃষ্ণভক্তিই মুখ্য উপজীব্য। তবে তা শান্ত-দাস্যেই সীমাবদ্ধ। বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা-দ্বারকারই এখানে প্রাধান্য বেশী। চৈতন্যের তদ্‌ভাবিত চিত্তে মালাধরের বিশিষ্ট চরণ যে-আলোকই বিচ্ছুরিত করুক না কেন, বস্তুনিষ্ঠ বিচারের নিরঞ্জন দৃষ্টিতে এই প্রতিপন্ন হবে, সাধন-

ভক্তির প্রতিই মালাধরের মুখ্য আকর্ষণ। ভাগবতের দশমস্কন্ধ সহ তাই তিনি প্রথম, ষষ্ঠ, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত স্কন্ধসমূহের দ্বারা তিনি কী বিপুলভাবে প্রভাবিত, তা তাঁর গ্রন্থে সহস্রাধিক হুবহু আক্ষরিক অনুবাদেই প্রমাণিত। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তারই তিন-চতুর্থাংশ উদ্ধার করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ সংগ্রহ করে পরে আমরা প্রবন্ধ মধ্যে সংযোজিত করবো। আপাতত, ভাগবতীয় তত্ত্বদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কতটা কার্যকরী হয়েছে, তাই আমাদের আলোচনার বিষয় হবে।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, অমরকোষের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে পুরাণ পঞ্চ-লক্ষণাত্মক। ভাগবত আবার মহাপুরাণের লক্ষণ দেখিয়েছে দশটি। আসলে, সর্গ-প্রতিসর্গ-বংশ-মন্বন্তর-বংশানুচরিত সম্বলিতই হোক বা সৃষ্টি-প্রতিসৃষ্টি-স্থান-পোষণ-উতি-মন্বন্তর-ঈশানুকথা-নিরোধ-মুক্তি-আশ্রয় সহিতই হোক, পুরাণ এককথায় ভারতবর্ষীয় আর্যগরিমারই কথাকাহিনী, বীরযুগের স্মারক। স্বভাবতই এরা বীররসাত্মক মহাকাব্যরূপে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। অবশ্য একমাত্র বীররসেই এদের নিঃশেষ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। এরা যুগে যুগে ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণও করে এসেছে। দেব-দেবী দ্বাদশ-মনু বা ক্ষত্রিয়-নৃপতিবর্গের বিচিত্র রসাশ্রয়ী কাহিনীগুলির সঘন পল্লবে ভারতীয় পুরাণ পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের স্ব[illegible]ক ফলকেই ধারণ করে আছে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগের পর এই পৌরাণিক যুগ-সাহিত্যই দেবভাষার অক্ষয় কীর্তিভূমি। ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাবের পটভূমিতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায়স্বরূপ পৌরাণিক-সাহিত্যের প্রয়োজন ঘটেছিল।

বাঙ্‌লাদেশেও প্রায় অনুরূপ যুগপরিবেশেই ব্যাপক পুরাণ-গ্রহণের সূত্রপাত। তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালী পৌরাণিক যুগের বীরমহিমাকে আশ্রয় করেছিল। সমাজ ও জাতির আন্তর প্রয়োজনে সেদিন অজ্ঞাতসারেই বঙ্গীয় কবিসমাজ পুরাণ-পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন। কৃত্তিবাসের রাম-চরিতের মতো মালাধরের কৃষ্ণচরিতও নির্জিত জাতির সম্মুখে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এই নব-পুরাণিক যুগে বিরচিত কাব্যগুলিকে অবশ্য কোনমতেই পুরাণ বলা চলে না। পুরাণের চেয়ে বরং

মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালির সঙ্গেই এদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অধিক। বিশেষত, প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের সকল রচনার মতো এগুলিও গায়ক-কর্তৃক গীত হত। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রত্যেক পদের শীর্ষে রাগরাগিণী উল্লেখের সার্থকতা সেখানেই। স্বয়ং মালাধর একে কোথাও কোথাও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামে অভিহিত করেছেন; এবং পাঁচালি-প্রসঙ্গেও কবির উক্তি দ্বিধাহীন:

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥ ১৫॥"

বস্তুত, মূল ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আকারগত বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। মূল ভাগবতের সুবিপুল কায়া বারোটি স্কন্ধে, তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে এবং আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ এবং সর্গ-প্রতিসর্গাদি পুরাণিক লক্ষণে যথারীতি ভূষিত। ভাগবতের মুখ্য আলম্বন কৃষ্ণের যে-নরলীলা, তাই আরম্ভ হয়েছে সুদীর্ঘ ন'টি স্কন্ধের পর দশম স্কন্ধে। অতঃপর দশম-একাদশ-দ্বাদশ এই তিনটি স্কন্ধেও কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার অবসরে অজস্র সহস্রবিধ কাহিনী-উপকাহিনীতেও অনায়াস সঞ্চরণ করে ফিরেছেন মহাকবি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়:

"গল্পের ভিতর গল্প—ভারতবর্ষের এক নূতন ব্যাপার; ঠিক যেন চীনে বাক্স—একটার ভিতর একটা, তার ভিতর একটা। আমাদের পঞ্চতন্ত্র তাই, কথাসরিৎসাগর তাই, মহাভারত তাই, পুরাণগুলিও তাই।"[১]

ভাগবত-পুরাণের আঙ্গিকে এই "গল্পের ভিতর গল্প"-রূপ পল্লবিত অপরিহার্য পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অনুসৃত নয়। সংগত কারণেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে পঞ্চ তথা দশ লক্ষণাত্মক বলা যাবে না। এ কাব্য ভাগবত-কথিত বংশানুচরিতের মাত্র বাসুদেব-লীলাকেই গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, কৃষ্ণলীলাশ্রিত দশম-একাদশ-দ্বাদশই এর মূলাশ্রয়। অন্যান্য স্কন্ধের মধ্যে একমাত্র ষষ্ঠস্কন্ধের অন্তর্গত অজামিলোপাখ্যানই স্থান লাভ করেছে। কৃষ্ণের নরলীলা-বর্ণনার ক্ষেত্রেও মালাধরের ব্যক্তিস্বভাব বিশেষিত। আমরা পূর্বেই বলেছি, গৌরাঙ্গের তদ্‌ভাবিত চিত্তে যাই প্রতিভাত হোক-না কেন, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে প্রমাণিত হবে, আসলে মালাধর শান্ত ভক্তিরসের রসিক, বড়োজোর দাস্যরতি পর্যন্ত তাঁর সীমা। প্রমাণ সহযোগে আমাদের বক্তব্যটি বিশদীভূত করা যায়।

১ দ্রঃ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত বলরাম কবিশেখরের 'কালিকামঙ্গলে'র মুখবন্ধ।

রসিকজন জানেন, ভাগবতে সখ্য বাৎসল্য ও মধুরের মহোদধি মথিত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তার কণামাত্র আস্বাদিত হয়েছে কিনা দেখা যাক। প্রসঙ্গত ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের একটি করে উদাহরণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত গোচারণলীলা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এ অংশে ভাগবতকার কবিত্বের সুবর্ণশৃঙ্গ স্পর্শ করেছেন। আমরা তারই কিছু অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিখণ্ড আহরণ করলাম।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে কৃষ্ণের বনভোজনলীলা শুকদেব কণ্ঠেই শ্রবণ করা যাক্ :

"শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥
ক্বচিদ্বনাশায় মনোদধদ্‌ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥
তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥
কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈ র্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥
ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচমুক্তামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥
মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥
যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালান্ আরোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥

সাকং ভেকৈ র্বিলঙ্ঘয়ন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।

বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্‌॥'' ১

শুক বলছেন, একদা হরি বনভোজনের মানসে প্রাতরুত্থান করেই মনোহর শৃঙ্গধ্বনির দ্বারা বয়স্য বৎসপালকদের প্রবোধিত করে তুললেন। আপন গোবৎসগুলিকে নিয়ে তিনি পুরোভাগে বহির্গত হলে তাঁর স্নেহাশ্রিত সহস্র সহস্র বালকও নিজ নিজ সহস্রাধিক বৎসের পশ্চাতে পরমানন্দে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের হাতে ছিল সুন্দর শিকা, বেত্রদণ্ড, বিষাণ ও বেণু। কৃষ্ণের অগণিত বৎসের সঙ্গে আপনাপন বৎস যূথবদ্ধভাবে চারণ করতে করতে তাঁরা স্থানে স্থানে বাল্য বিহার করে ফিরলেন। যদিও কাঁচ,মণিমুক্তা এবং স্বর্ণভূষণের দ্বারা তাঁরা ছিলেন সুসজ্জিত, তথাপি অরণ্য থেকে পুষ্পপ্রবাল,ফল-স্তবকাবলী শিখিপুচ্ছ, ধাতু ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিজের নিজের ভূষণ করলেন। কেউ কেউ আবার পরস্পরের শিকাদি অপহরণ করে জ্ঞাতবস্তুকে দূরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। যদি কৃষ্ণ কখনো বনশোভা-দর্শনের জন্য দূরে গিয়ে পড়েন, তা হলে, 'আমি আগে' 'আমি আগে' বলে সেই বালকেরা তাঁকে স্পর্শ করে ক্রীড়া করতে থাকেন। সেই বালকদের মধ্যে কেউ বেণুবাদন করলেন, কেউ শৃঙ্গধ্বনি করলেন, কেউ ভৃঙ্গের সঙ্গে গান করলেন, আবার কেউ-বা কোকিলের সঙ্গে করলেন কলকূজন। কোনো বালক বিহগছায়ার অনুসরণ করলেন, কোন বালক বকসঙ্গে উপবেশন তথা কলাপীর সঙ্গে নৃত্যরত হলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বৃক্ষশাখায় লম্বমান বানরপুচ্ছ অথবা বানর-শাবককে আকর্ষণ করলেন, কেউ কেউ তাদের সঙ্গে বৃক্ষারোহণ, দন্তপ্রদর্শন, ভ্রূবিক্ষেপ, মুখবিকৃতি তথা শাখান্তরে উল্লম্ফন করলেন। আবার কোনো কোনো বালক ভেকের সঙ্গে নির্ঝরাপ্লুত সরিৎ উল্লম্ফন তথা প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস এবং প্রতিধ্বনির শাপান্ত করতে থাকলেন।

বালগোপালের ব্রজধামে স্বয়ং বালগোপালের আচরণও তদুচিত। পুনরপি পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিবরণ লক্ষ্য করা যাক্‌:

"এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ প্রাতঃ প্রীতমনাঃ পশূন্‌।

রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥

কচিদ্গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষনুব্রতৈঃ।

উপগীয়মানচরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥

১. ভা° ১০।১২।১-১০

অনুজল্পতি জল্পন্তং কলাবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্‌॥
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্‌।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্‌ ক্বচিৎ॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্‌ পশূন্‌।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া॥
চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্ব-ভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্‌ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ॥
ক্বচিৎক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥
নৃত্যতো গায়তঃ কাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্‌ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ॥
ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্‌॥
অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ॥
এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্‌।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ॥"[১]

অর্থাৎ, [শুকদেব বলছেন,] শ্রীমণ্ডিত বৃন্দাবনে প্রীতমনা শ্রীকৃষ্ণ পর্বতের সানুদেশে নদীতটে পশুচারণ করতে করতে অনুচরদের সঙ্গে সহর্ষে ক্রীড়ারম্ভ করলেন। কোথাও মদমত্ত অলিবৃন্দের গুঞ্জনের সঙ্গে পথিমধ্যে বলদেবসহ গান করে উঠলেন, শুকপক্ষির কলবাক্যের সঙ্গে জল্পনা শুরু করলেন, কোথাও কোকিলালাপের অনুকূজন করতে থাকলেন। কলহংসের কাকলিতে সাড়া দিলেন, বয়স্যদের হাসিয়ে নৃত্যপর ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করলেন, আবার কোথাও-বা গো এবং গোপালদের মনোজ্ঞ মেঘগম্ভীর স্বরে দূরগামী পশুকে সস্নেহে আহ্বান করে প্রত্যানয়ন করলেন। তিনি চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রবাক-ময়ূরের অনুকরণে তদনুরূপ ধ্বনি করছিলেন। কোথাও আবার শ্বাপদদের

১. ভা° ১০।১৫।৯-২০

মধ্যে পড়ে ব্যাঘ্র-সিংহাদির ভয়ভীত পলায়মান প্রাণীর সঙ্গে নিজেও পলায়নপর হচ্ছিলেন। কোনোস্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হলে গোপবালকের ক্রোড়দেশে তাঁকে শয়ন করিয়ে দিয়ে নিজেই পাদসংবাহনাদি দ্বারা তাঁর শ্রম অপনোদন করতে থাকেন। কোথাও দুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্তধারণ করে সহাস্য নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন করেন আবার মল্লযোদ্ধা গোপালদের প্রশংসাও করে ফেরেন। কোনোস্থলে বাহুযুদ্ধে পরিশ্রম-হেতু দুর্বলের মতো হয়ে বৃক্ষমূলে গোপবালকের উৎসঙ্গে মাথা রেখে পল্লবশয্যায় শয়ন করেন। কৃষ্ণ এইভাবে শয়ন করলে কতিপয় গোপালক তাঁর পাদসংবাহন, পুণ্যশালী কতিপয় আবার ব্যজন দ্বারা বায়ুবীজন করতে থাকেন, কেউ-বা তাঁর মনোরঞ্জক স্বরে স্নেহার্দ্র পরবশ হয়ে ধীরে ধীরে গানও করেন।—শুকদেব আরও বললেন, রাজন্! লক্ষ্মীদেবী যাঁর পাদপদ্ম লালন করে থাকেন সেই হরি আপন মায়ায় এইভাবে গোপাত্মজের স্বভাব প্রকাশ করে প্রাকৃত সহচরদের সঙ্গে প্রাকৃতের মতোই ক্রীড়া করতেন।

এরপরই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। সূক্ষ্ম তাৎপর্য বোধকরি এই, পরমপুরুষের ঐশ্বর্যলীলা তাঁর ব্রজলীলার নিঃশ্রেয়স মধুরের পাদপীঠতলে নিত্য-লুণ্ঠিতমস্তক। বস্তুত, কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপবালকবৃন্দের পরস্পর সখ্যপ্রেম ভাগবতকারের যুগপৎ প্রেমভক্তি ও কবিত্বরসে আপ্লুত। অপরপক্ষে মালাধরের বর্ণনা ভাগবতানুসারী হয়েও মাধুর্যশূন্য। সারেঙ্গ রাগে গেয় একটি গীতে মালাধর রাম-কৃষ্ণের ভাগবতোক্ত মনোরম গোচারণ লীলাকে এইভাবে উপস্থাপিত করছেন :

"রজনি প্রভাত হৈল রাম দামোদর।
বাছুর রাখিব বলি হইলা সত্বর॥
বাছুর রাখিতে গেলা জমুনার কুলে।
উদিত হইলা ভানু জেন প্রাতকালে॥
প্রভাতে ভোজন করি সিঙ্গা বাজাইয়া।
পশ্চাৎ চলিলা সিসু বাছুর লইয়া॥
একত্র হইয়া সভে জমুনার তিরে।
নানা বিধি ক্রিড়াকরি জায় ধিরে ধিরে॥
কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে পুরে।
তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে॥

কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে।
তার সঙ্গে লাফ দেই সিস্থগণ সঙ্গে ॥
কোথাহ মউর পক্ষ নানা নৃত্য করে।
সেইরূপে নাচে তথা দেব দামোদরে ॥
কোথাহ পক্ষগণ আকাশে উড়ি জায়।
তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায় ॥
কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয়া মুরারি।
কথো কানে কথো হৃদে নানা বর্ন্নে পরি ॥
হেন মতে বৃন্দাবনে খেলেন গোপাল।
বড় খুধা হইল সব বলএ ছাওল।
[৫৬৫-৫৭৪]

এখানে মালাধরের বর্ণনা ভাগবতের সারানুবাদ মাত্র। শুধু সংক্ষিপ্তই নয়, বস্তুসর্বস্ব তথ্যপরিবেষণও বটে। এ তাই শুধুই বাল্যক্রীড়া, বাল্যলীলা নয়।

এবার দ্বিতীয় উদাহরণ। বাৎসল্যের একটি অপূর্ব রসাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের রজ্জুবন্ধনলীলা। ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়টি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। "একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী। কর্মান্তর-নিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি"—একদা গৃহদাসীবৃন্দ কর্মান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগৃহিনী যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত সম্পর্কিত গানগুলি গাইছিলেন। যশোদার বিশাল কটিতটে কাঞ্চীদাম নিবদ্ধ ছিল ক্ষৌম বসন। পুত্রস্নেহে তাঁর সুধাভাণ্ড অবিরত প্রস্নুত হচ্ছিলো—বারংবার রজ্জু-আকর্ষণের ফলে শ্রান্ত বাহু থেকে কঙ্কণ চলিত, কর্ণকুণ্ডল কম্পিত এবং কবরী থেকে পুষ্পদাম স্খলিত হয়ে পড়ছিল। শ্রমবশত তাঁর মুখমণ্ডল স্বেদবিন্দুতে শোভিত হয়ে বিরাজ করছিল। এমন সময় স্তনপানে পিপাসু হরি এসে উপস্থিত হয়ে কর্মরত জননীর প্রীতি উৎপাদন করে হাত ধরে মন্থনদণ্ড নিবারণ করলেন :

"তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নতীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥"[১]

মাতা তাঁকে স্নেহভরে ক্রোড়ে স্থাপন করে যথারীতি সুধারস পান করাতে লাগলেন। এদিকে চুল্লীতাপে আরূঢ় দুগ্ধভাণ্ড থেকে দুগ্ধ উথলিত হয়ে

১ ভা° ১০।৯।২

ওঠায় স্তন্যপানে অপরিতৃপ্ত শিশুকে পরিত্যাগ করেই যশোদা পাকচুল্লীর দিকে ধাবিত হলেন। অপরিতৃপ্ত শিশু-কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি দশনের দ্বারা কম্পিত অধর দংশন করতে করতে একটি শিলাপুত্রের সাহায্যে নবনীতের পাত্র চূর্ণ করে ফেললেন এবং গৃহের একান্তে নবনীত ভক্ষণ করতে লাগলেন। যশোদা চুল্লী থেকে উত্তপ্ত দুগ্ধ নামিয়ে পুনরায় দধিমন্থন স্থানে এসে দেখেন পাত্র চূর্ণ। বুঝলেন, এ তাঁর সেই পুত্রেরই কর্ম। কিন্তু তাঁকে সেখানে দেখতে না পেয়ে যশোদা আপনমনে হাসতে লাগলেন। অতঃপর গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করতেই দেখেন, বালক বিপর্যস্ত উদূখলের ওপর উপবিষ্ট হয়ে শিক্যস্থ সদ্যোজাত নবনীত গ্রহণ করছেন এবং যথেচ্ছ বানরদের ভোজন করাচ্ছেন। উপরন্তু চৌর্যহেতু তাঁর দুই চক্ষু অতিশয় চঞ্চল। এই দেখে যশোদা ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন :

"উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচিস্থিতং।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥"[১]

পিছন ফিরতেই বালগোপাল দেখেন, যষ্টিহস্তে জননী! তৎক্ষণাৎ উদূখল থেকে তিনি অবরোহণ করে ভীতবৎ পলায়ন করলেন। যশোদাও তখন তাঁর পশ্চাতে ধাবমানা হলেন। কিন্তু যোগীদের একাগ্রতা-প্রযুক্ত স্থিরচিত্তও যাঁকে লাভ করতে অক্ষম, তিনি কি সহজেই ধৃত হন?

"গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥"[২]

ধাবমানা যশোদার কেশবন্ধ বিস্রংসিত হলো, তাঁর কেশকুসুমসমূহ বিগলিত হয়ে পড়ল। জননীর দুর্গতি দেখে গোপালের মন করুণার্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি ধরা দেন। এইভাবে অবশেষে গোপালকে ধরতে সমর্থা হলেন যশোদা। গোপালের হাত সবলে ধারণ করে তাঁকে তিনি কঠোর ভর্ৎসনাও করলেন। ভগবান্ অপরাধ করেছিলেন, অতএব কেবল রোদন করতে থাকেন। অশ্রুধারায় তাঁর লোচনযুগলের কজ্জল চতুর্দিকে প্রসৃত হতে লাগলো, বিশেষত দুই হাতে তিনি দুই চক্ষু মর্দন করছিলেন। কিন্তু পুত্রকে ভয়বিহ্বল

১ ভা° ১০।৯।৮
২ ভা° ১০।৯।৯

দেখেই পুত্রবৎসলা জননী অবিলম্বে যষ্টি পরিত্যাগ করলেন। কৃতাপরাধের জন্য বালককে রজ্জুবন্ধনের দ্বারা দণ্ডদানই স্থিরীকৃত হল। এদিকে যশোদা যেই রজ্জুবন্ধন করতে যান, দেখেন, প্রতিবারই রজ্জু দুই আঙুল প্রমাণ ন্যূন। যশোদা আপন গৃহের তথা সকল ব্রজগোপীর সকল রজ্জু সংগ্রহ করেও কৃতকার্যা হলেন না। স্বভাবতই তিনি অতিশয় বিস্মিতা হন। এ ঘটনায় শুকদেব যশোদাকে বলেছেন 'অকোবিদা'—অর্থাৎ অনভিজ্ঞা। কেননা যাঁর অন্তরও নেই বাহিরও নেই, পূর্বও নেই পরও নেই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব-পর অন্তর-বাহির, জগতের স্বরূপ, শুকদেবের ভাষায়,

"ন চান্তর্ন বহি র্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরং।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্ত র্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥"[১]

সেই পরমেশ্বরকে যশোদা প্রাকৃতজ্ঞানে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আখ্যানের শেষাংশে দেখি, এই অনভিজ্ঞা যশোদারই ক্লেশ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই প্রাকৃতজনের মতো বন্ধন স্বীকার করে নিচ্ছেন। শুকদেব এর নাম দিয়েছেন, "ভক্তবশ্যতা"—

"এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥"[২]

বিশ্ব যাঁর বশবর্তী সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবশ্যতা হেতু বন্ধন স্বীকার করেছিলেন। শুকদেবের মতে কৃষ্ণের এই প্রসাদ ব্রহ্মা ভব এমনকি অঙ্গাশ্রিত লক্ষ্মীও লাভ করেননি:

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥"[৩]

ভাগবতের এই "কমলা-শিব-বিহি দুলহ প্রেমধন" পরিবেষণই কৃষ্ণের রজ্জুবন্ধনলীলার সার। তাঁর দামোদর নামকরণের মাধুর্যসম্মত দিকের আভাসও এরই মধ্যে নিহিত। 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু, নিগূঢ়ার্থে জাগতিক সকল প্রকার বন্ধন, আর যিনি সেই সমূহ বন্ধনকে আপন উদরে আত্মসাৎ করেন তিনিই 'দামোদর'। আবার 'অকোবিদা' যশোদা সেই সর্ববন্ধনবিহীনকেই একমাত্র স্নেহবন্ধনেই

---

১ ভা: ১০।৯।১১
২ ভা: ১০।৯।১৯
৩ ভা: ১০।৯।২০

বেঁধেছিলেন, দামোদরের বাৎসল্যলীলার এই তাই শেষ সীমা। ভাগবত-পাঠক মাত্রেই জানেন, দামোদরলীলায় কৃষ্ণ পুনঃপুন পরব্রহ্মরূপে উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাল্যচাপল্যের মাধুর্যই শেষ পর্যন্ত পাঠকচিত্তে সুমুদ্রিত হয়ে থাকে। আসলে ঘনঘটায়িত ঐশ্বর্যলীলা নয়, এক্ষেত্রে দামোদর কৃষ্ণের একটি অতি মনোগ্রাহী বাল্যলীলাই আমাদের জন্য অপেক্ষিত। শিশুস্বভাবের এবং মাতৃমঙ্গলসুধার এমন রেখায় রেখায় স্বাভাবিক অথচ কবিত্বপূর্ণ সুললিত সুষমাঙ্কন সুদুর্লভ।

তুলনায় মালাধরের বর্ণনা কত নীরস ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে তা উদ্ধৃতির সাহায্যেই স্পষ্ট হবে :

> "একদিন গোকুলে নন্দের ঘরনি।
> গৃহ কর্ম্মে দাসিগন ডাক দিয়া আনি॥
> আপনি মথএ দধি করি উচাস্বরে।
> গিত রূপে গাত্র রানি কৃষ্ণ যত করে॥"

[৩৫৫—৩৫৬]

এদিকে শিশু-কৃষ্ণ সুযোগ পেয়ে

> "দধির মথন দণ্ড চাপিয়া সে ধরি।
> জত নুনি তাহা সব খায় একুবেরি॥
> তবেত জসোদা ক্রোধে তার হাথে ধরি।
> চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিতে করি।
> দধি দুগ্ধ জত সব সিকাএ তুলিয়া
> কেমনে খাইবে পুত্র খায় না আসিয়া॥"

[৩৫৯—৩৬১]

এ কোন্ যশোদা? এ-কৃষ্ণও কি ভাগবতের বালগোপাল? ভাগবতীয় যশোদার মমকারসর্বস্ব মাতৃত্বের অপরিমেয় স্নেহ ও শঙ্কা, আপাত-শাস্তির ছদ্ম-আবরণে নিগূঢ় বাৎসল্যের নিত্যপ্রবাহিত ফল্গুধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লালিত্যশূন্য কঠোর মাতৃচরিত্রের ধাতুবৈষম্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এ অংশে বালগোপালের চরিত্রও মালাধরের লেখনীতে এসে মনস্তত্ত্ব-মণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। ফলত মালাধরের কাব্যে দামোদরলীলা ভাগবতীয় ঘটনাধারার নীরস বিবরণ মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে :

'হাথে বাড়ি জসোদা জায় ধাওাধাই।
হাথে হাথে কৃষ্ণ পালাইয়া জাই॥
ধাইয়া জসোদা জায়ে আউদড় চুলে।
ঘর্ম্মে তোল রোল হৈল সকল সরিরে॥
দেখিয়া মাএর দুঃখ সদয় হৃদয়ে।
মাএ ধরা দিল কৃষ্ণ কান্দে উভরাএ॥"

[৩৬৫—৩৬৭]

অতঃপর রজ্জুবন্ধন। এ অংশ মালাধরে বোধ করি আরো অসার্থক :

"ঘরে আনি জসোদা উপায় স্রীজিয়া।
জগতের নাথ বাঁধে উদুখল দিয়া॥
তখনেত স্রীহরি করিল কপটে।
জত দড়ি আনে জসোদা বান্ধিতে না আঁটে॥
আনিল ঘরের দড়ি জতেক আছিল।
তবুত ছাওাল কৃষ্ণে বাঁধিতে নারিল॥
ঘরে ঘরে আনে দড়ি বান্ধে তার পেটে।
জত দড়ি আনে অঙ্গুলি দুই নাঞি আঁটে॥
আসিয়া যাইয়া জসোদার ঘর্ম্ম নিকলিল।
সদয় হৃদয় কৃষ্ণ বান্ধন মানিল॥
বান্ধিয়া জসোদা বলে সুন গোবিন্দাই।
কেমনে খাইবে আসি মোর ঘোল দই॥
বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে।
গৃহকর্ম্ম করিয়া সিমুকাব তোমারে॥"

[৩৭১—৩৭৭]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের রজ্জুবন্ধনলীলার ওপর এখানেই এইভাবে আকস্মিক যবনিকাপাত হয়েছে। ভাগবতে এই লীলাকে অবলম্বন করে অতিশয় মনোরম শিশু-স্বভাব পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে যে অপার্থিব আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও অনুসৃত হয়েছে, মালাধরে তার চিহ্নমাত্রও পাইনা। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এক্ষেত্রে মানবিক স্বভাবমাধুর্যও অস্ফুট, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ।

অতঃপর তৃতীয় উদাহরণ। সখ্য, বাৎসল্যাদি মাধুর্যলীলার মধ্যে মধুরৈক-সর্বস্ব গোপীলীলাই আবার ভাগবতের পরমতম সম্পদ। গোপীরত্নধনই ভাগবতের সিন্ধু-মথিত শ্রেষ্ঠ ধন। গোপীপ্রেমের 'অকথ্যকথন'-মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে ভাগবতকার উচ্ছ্বসিত পুলকাশ্রুধারায় শ্লোকের পর শ্লোক নিবেদন করেছেন। ভাগবতে গোপীর মুরলী-শ্রবণাদিজা পূর্বরাগ বা কৃষ্ণ-গোপীর শারদরাস, ভ্রমরগীতা বা প্রভাসতীর্থে পুনর্মিলন প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটি লীলাপর্যায় ছাড়াও একাধিক স্কন্ধের একাধিক অধ্যায়ের একাধিক শ্লোকে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে অসংখ্যবার অসংখ্য উদ্দেশ্যে ব্রজবধূর প্রেমরস-সীমা পর্যালোচিত।[১] মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতকারের এই কোমল মধুর প্রবণতাটির যৎসামান্য মর্যাদাই রক্ষিত। ভাগবতের নিষ্ঠাবান অনুবাদক হিসাবে বরং 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য গোপীদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করেছেন। কিন্তু মালাধর বসু যে-উৎসাহে কুব্জাকেলির বর্ণনা করেন, তার চেয়ে অধিক উৎসাহে গোপীপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। ভাগবতে কুব্জাকে "দুর্ভগা" রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুকদেবের ভাষায়:

"সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বর।ম্
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥"[২]

কুব্জার এই "দুর্ভাগ্য" শ্রীধরটীকায় ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে:

"কামমেব প্রাকৃতদৃষ্ট্যা অযাচত। ন চ গোপ্য
ইব সা তন্নিষ্ঠেতি দুর্ভগেত্যুক্তং"[৩]

অর্থাৎ, সেই কুব্জা কৈবল্যনাথ দুষ্প্রাপ্য পরমেশ্বরকে অঙ্গরার্পণের দ্বারা প্রাপ্ত

১ ভাগবতে কতবার গোপীপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, এখানে তার একটি তালিকা উদ্ধার করা চলে: ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতিতে ১।৯।৪০, কুরুনারীর পরস্পরালাপে ১।১০।২৮, ব্রহ্মার নারদের প্রতি উপদেশে ২।৭।৩৩, বিদুর-উদ্ধব সংবাদে ৩।২।১৪, নারদের উপদেশে ৭।১।৩০।

দশম স্কন্ধে গোপী-প্রসঙ্গ প্রথম উঠেছে কালিয়দমনের পূর্বে উত্তর গোষ্ঠের বিবরণে। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য ১০।১৫।৪২-৪৩, তারপর বৃন্দাবনে শরৎবর্ণনায় ১০।২০।৪৫, বংশীশ্রবণে পূর্বরাগে ১০।২১, বস্ত্রহরণলীলায় ১০।২২, গোবর্ধনধারণের পর ১০।২৫।৩৩, রাসে ১০।২৯-৩৩, অম্বিকাবনযাত্রায় ১০।৩৪, কৃষ্ণ দূর গোষ্ঠে গমন করলে গীতে ১০।৩৫, বিরহে ১০।৩৯, মথুরাবাসীদের উক্তিতে ১০।৪২।২৮, মথুরানাগরীদের উক্তিতে ১০।৪৪।১৩-১৪, উদ্ধবদূতে ১০।৪৬।২-৬, ভ্রমরগীতায় ১০।৪৭।১২-২১, উদ্ধবের গোপীবন্দনায় ১০।৪৭।৫৮-৬৩, কুরুক্ষেত্রমিলনে ১০।৮২, শেষবার উদ্ধবগীতায় ১১।১২।৮-১৩।

২ ভা° ১০।৪৮।৮

৩ ভাবার্থদীপিকা, ১০।৪৮।৮-টীকা

হয়ে প্রাকৃতদৃষ্টিতে কামই যাচ্ঞা করল, পরন্তু গোপাঙ্গনাদের মতো তন্নিষ্ঠা হলো না। অতএব সে একপ্রকার দুর্ভগাই বটে।

মালাধরের গ্রন্থে এই "তন্নিষ্ঠা" গোপাঙ্গনাদের পরমসৌভাগ্যসূচক পরম-প্রেমের সূক্ষ্ম মূল্যায়নের অভাব সহজেই রসিকজনের দৃষ্টিগোচর হয়। যে-কোনো কারণেই হোক ভাগবতে রাধানাম অনুচ্চারিত। 'ভাগবতাচার্য' নিবেদন করেছিলেন, তিনি ভাগবতশাস্ত্র-বহির্ভূত কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন না। স্বাভাবিক কারণেই তিনি তাঁর গ্রন্থে রাধা সম্পর্কে প্রায় নীরব। কিন্তু এক্ষেত্রে 'গুণরাজ খানে'র নীরবতা বিস্ময়কর।[১] বিশেষত মালাধর তো ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদ করতে বসেননি, বসেছেন নানা কবির 'চিত্তফুলবনমধু' আহরণ করে স্বাধীনভাবে কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়ন করতে। স্বভাবতই তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবত-বহির্ভূত নানা উপাখ্যান পরিবেষিত। অথচ আদর্শ-পুঁথিতে রাধানামের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র প্রবণতা লক্ষ্য করি না। জয়দেব-পরবর্তী বাঙালী কবির পক্ষে এ একপ্রকার অসম্ভবই বটে। আমাদের বিশ্বাস, পরকীয়াবুদ্ধির প্রতি অপক্ষপাতই মালাধরকে বাঙালী কবির প্রচলিত পথ পরিহার করিয়েছে। এরই প্রমাণস্বরূপ বিপ্রনারী-সংবাদ স্মরণ করা যায়।

একদা বুভুক্ষিত গোপবালকগণ কৃষ্ণের কাছে অন্ন-প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ আঙ্গিরস-যজ্ঞরত ব্রাহ্মণদের কাছে তাঁদের প্রেরণ করলেন। কিন্তু স্বর্গাদিতে আসক্তচিত্ত সেই বিপ্রবর্গ দেশ-কাল-চরু-পুরোডাশ-দ্রব্য-মন্ত্র-যাগ-ঋত্বিক-অগ্নি-দেবতা-যজমান-যজ্ঞ প্রভৃতি যাঁর স্বরূপ সেই স্বয়ংবিষ্ণু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে না পেরে তাঁর প্রেরিত ব্রজবালকদের অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করে পুনরায় সেই গোপশিশুদেরই প্রেরণ করলেন; অবশ্য এবার বিপ্রপত্নীদের কাছে। "মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্। দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধাঃ ময্যুষিতা ধিয়া"[২]—বলভদ্র সহ কৃষ্ণ এসেছেন, একথা শুনলেই তাঁরা বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন দেবেন,—শ্রীকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হলো। কৃষ্ণ যথার্থই বলেছিলেন, তাঁরা কেবল দেহ-দ্বারাই গৃহে বাস করেন, বস্তুত মনে তাঁরা আমাতেই সর্বদা অবস্থান করছেন।

১ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোনো কোনো পুঁথিতে রাধানামের যে বাহুল্য দেখি, গবেষকগণের মতে তা লিপিকারের দাক্ষিণ্যেই ঘটেছে।

২ ভা° ১০।২৩।১৪

ভাগবতকারও বলেন, বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন স্বর্ণপাত্রে গ্রহণ করে তাঁরা চললেন প্রিয়দর্শনে—"অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ"—নদী যেমন বেগে সিন্ধুর উদ্দেশে চলে, তেমনি তাঁরাও চললেন।—পিতাপতি-ভ্রাতাসুহৃদাদির নিষেধ তাঁরা মানলেন না। অশোকের নবপল্লবে শোভিত যমুনার উপবনে কৃষ্ণের নয়নসুভগ দর্শন লাভ করে তাঁরা ধন্যা। হিরণ্যপরিধি শ্যামের প্রিয়-দর্শনে সমাগতা বিপ্রপত্নীদের একযোগে সকল সন্তাপ চিরতরে দূরীভূত হয়। শুকদেব বলছেন :

"প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ-
র্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ॥
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥"[১]

অর্থাৎ, বিপ্রবধূবর্গ নিরন্তর যে-প্রিয়তমের উৎকর্ষ-কথাকেই কর্ণাভরণ করে-ছিলেন এবং যাঁতে তাঁরা অনুক্ষণ নিমগ্নচিত্ত ছিলেন, এবার সাক্ষাৎদর্শন লাভে তাঁকেই তাঁরা দৃষ্টিপথে হৃদয়ে এনে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। যোগী যেমন সুষুপ্তির সাক্ষী প্রাজ্ঞচৈতন্যকে আলিঙ্গন করে মনস্তাপ দূর করেন, তাঁরাও তেমনি দয়িতকে আলিঙ্গন করে ত্যাগ করলেন বিরহ-সন্তাপ।

বিপ্রনারীর এই যোগিবাঞ্ছিত 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা' স্বয়ং কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রশংসিত হলে বিপ্রনারীকুল অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন :

"গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরো সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥"[২]

অর্থাৎ, আমাদের পিতামাতা পতিপুত্র বন্ধুভ্রাতা কেউই আমাদের আর গ্রহণ করবেন না। হে অরিন্দম, অতএব আপনার চরণাগ্রে পতিত হলাম। আমাদের অন্য গতি নেই, সুতরাং আপনার দাস্যই বিধান করুন।

ভাগবতীয় বিপ্রনারীর এই বিশুদ্ধা প্রেমভক্তি মালাধরে এসে অবিমিশ্র ঐশ্বর্যলীলার সাধ্বসপূর্ণ কাকুতিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কাব্যে বিপ্রনারীর প্রার্থনা নিম্নরূপ :

১ ভা° ১০৷২৩৷২৩
২ ভা° তত্রৈব। ৩০

"কী করিব ঘরদ্বার সব মায়াবন্ধ ।
তুমি সবে সত্য আর মিথ্যা সব ধন্ধ ॥
তোমাকে জানে হেন কে আছে সংসারে ।
মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥
সিব সুখ নারদ প্রসাদ দৈত্য সিসু ।
তোমার মহিমা তারা গাএ কীছু কীছু ॥
ব্রহ্মা সনকাদি তারা অন্ত নাহি পাএ ।
উদ্দেসে তোমার গুন ভক্ত সব গাএ ॥
হেন নারায়ন তুমি নররূপ ধরি ।
বৃন্দাবনে ব্রজসিসু লৈয়া কৃড়াকরি ॥
হেন মতে তোমা চিন্তি দেখি হেন মনে ।
কৃপা করি অন্ন মাগিলে নারায়নে ॥
তেঞি সে দেখিল প্রভু তোমার চরন ।
সফল হইল আজি আমার জনম ॥"

[৮৪১-৮৪৭]

ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণ-তন্ময় বিপ্রবধূকে মধুর বাক্যে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ বলছেন :

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥"[১]

অর্থাৎ, শ্রবণ দর্শন অথবা অনুকীর্তনের দ্বারা আমার প্রতি যেরূপ ভাবাবেশ জন্মলাভ করে, সন্নিকর্ষের দ্বারা সেরূপ হয় না । অতএব তোমরা স্ব স্ব ভবনাভিমুখী হও ।

এখানে উল্লেখযোগ্য, এই একই উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদেরও প্রদান করেছিলেন । উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন :

"তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥
চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে ।

১ ত্রিপুরা দ্রঃ দ্রঃ

পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥"[১]

অর্থাৎ, হে বরদেশ্বর, প্রসন্ন হোন। হে অরবিন্দনেত্র, চিরকাল যে আশা-লতাকে ধারণ করে আছি, তাকে ছেদন করবেন না। প্রভু, আমাদের গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হতে বললেন, কিন্তু আমরা অশক্ত। কেননা, আমাদের যে-চিত্ত এতকাল গৃহসংসারে সুখরত ছিল আপনিই তা হরণ করেছেন। যে দুই কর গৃহকর্মে ব্যাপৃত ছিল, তাও অপহৃত। আর আমাদের পদদ্বয় আপনার পদমূল থেকে একপদও অগ্রসর হতে পারছে না। কি করে আমরা ব্রজে যাই, গিয়ে করবোই-বা কী।

বিপ্রপত্নীগণ কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনই করেছিলেন। অর্থাৎ, তাঁদের যেখানে শেষ সীমা, ব্রজবধূদের সেখানেই সোপানারম্ভ। মালাধর বিপ্রবধূর মধুর-রসপরিক্রমাই অনুধাবন করতে পারেন নি, ব্রজবধূর প্রেম-রসসীমা তো বহুদূরের কথা। অথচ ভাগবতেরই ব্রজলীলার অন্তর্গত একাধিক অসুরবধের ঐশ্বর্যলীলা তাঁর লেখনী-মুখে অতিশয় জীবন্ত ও যথার্থ হয়ে অনর্গল উচ্ছ্বসিত হয়েছে। মথুরা-দ্বারকার পটে একাধিক সংগ্রামদৃশ্যও সুচিত্রিত। এ-পর্বে বিলসিত উদ্ধব-অক্রূরাশ্রিত দাস্যভক্তিও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এমনকি রুক্মিণীর বিবাহচিত্রে মথুরাপর্বের স্বকীয় মধুরেরও পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভব। শিশুপাল-হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করতে চাইলে রুক্মিণী ভ্রাতার অগোচরে কৃষ্ণের শরণাগতা হয়ে গোপনে পত্র প্রেরণ করেন। বিবাহদিবসের প্রাতঃকালে তখনো কৃষ্ণের কোনো সংবাদ না পেয়ে শোকাকুলা রুক্মিণী বলছেন :

> "প্রণমোহ নারায়ন করি জোড়হাত।
> বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ॥
> হা হা বিধি কত মোর লিখিলে কপালে।
> কড়ছের রত্ন মুঞি হারাহুঁ (ই) গোপালে॥
> ...হরি হরি প্রান মোর সরিয়ে আছএ।
> সিংহের বনিতা আমি শ্রীগালে হরি লএ॥"
>
> [২০২০—২১,২৭]

মথুরা-দ্বারকালীলা প্রসঙ্গে মালাধরের লেখনী এই ভাবেই সহজাত কবিত্ব

১ ভা ১০।২৯।৩৩—৩৪

শক্তির পরিচয় দিয়েছে। আসলে মালাধর স্বকীয়া-প্রেমবুদ্ধিরই বোদ্ধা, পরকীয়াভাবের ভাবুক নন। বিশুদ্ধ মাধুর্যলীলা পরিবেষণে তাঁর লেখনী যে-রসাভাস ঘটিয়েছে, ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনায় তাঁর বাক্‌সিদ্ধি ঠিক তারই প্রতিপক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, ঐশ্বর্য-লীলার প্রাধান্যই যদি ঘটে থাকে, তাহলে মাধুর্যভাবাশ্রিত চৈতন্যযুগের সাধনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের স্থান কোথায়। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিজয় "ভগবান্ স্বয়ম্" শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা। তদুপরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সর্বমান্য শব্দপ্রমাণ ভাগবতের পদ্যানুবাদ-রূপেই এর খ্যাতি। অতএব উক্ত সম্প্রদায়ে এর স্থান শ্রদ্ধার হওয়াই স্বাভাবিক। মালাধর নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর কুলীনগ্রাম বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির তীর্থস্থান-স্বরূপ। মালাধরের বংশধরগণ বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজে তথা শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ সম্মানিত জন। যুগপৎ বঙ্গে ও উড়িষ্যায় মালাধর ও তদীয় স্বজনকুলের এই প্রভাব যে মূলত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের জন্যই, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু যে 'ভাগবত-শাস্ত্রে'র অনুবাদ বলেই এর খ্যাতি, এরূপ মনে হয় না। বস্তুত, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলনতত্ত্ব এ কাব্যে নিষেবিত। তারই অন্যতম নামতত্ত্ব। "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি স্তত্রার্পিতা"—এই নামচিন্তামণি-তত্ত্বের অদ্বিতীয় সিদ্ধপুরুষ শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বঙ্গভাষায় যাঁরা ভগবন্নাম-কীর্তনের মহিমাগান করেছিলেন, মালাধর তাঁদেরই অন্যতম। ভাগবতে কলি-যুগবন্দনায় বলা হয়েছে :

> "কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
> দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"[১]

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর যজ্ঞ-সম্পাদনে, দ্বাপরে বিষ্ণু-পরিচর্যায়, কলিকালে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই সেই ফললাভ সম্ভব।

আর মালাধর তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলছেন :

> "সত্যে ধ্যান তৃতাএ জজ্ঞ দ্বাপরে আছএ।
> তত পুন্য কলিকালে হরি নামে হএ॥"

[৫৮২৭]

ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিখ্যাত অজামিল-উপাখ্যানে দেখি,

---

১ ভা° ১২।৩।৫২

এমনকি নামাভাসেও আজন্ম পাপিষ্ঠের পাপমুক্তি ও গোলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সবিস্তারে এ-কাহিনী বর্ণনা-শেষে মালাধরের নিবেদন :

"চতুর্ভুজ হইয়া দ্বিজ বৈকুণ্ঠে রহিল।
নামের কারনে সব অধর্ম্ম ঘুচিল॥" [৫০৭৫]

গ্রন্থ-সমাপ্তিতেও অন্তিম প্রসাদ বিতরণ করে কবি বলছেন :

"দুস্তর সংসার সিন্ধু বড় ঘোরতর।
কলিকালে হরিনাম সভাকার পর॥
হরিনাম প্রেমরস সমন দমন।
কলিকালে সুনিবে ভাই হরিসংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন মাঝে ভাই দিহ গড়াগড়ি।
কলিকালে সংকীর্ত্তন পথে মন কর্য় দড়ি॥"

[৫৮৯৬-৫৮৯৮]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সকল পুঁথিতেই এ অংশ পাওয়া যায়নি। কোনো পুঁথিতে আবার কিছু স্বতন্ত্র পাঠও পাওয়া যায়। যেমন,

"বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে।
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে॥
তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাও।
তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি গাও॥"

কিন্তু লিপিকারের দাক্ষিণ্যে কিছু কিছু প্রক্ষেপ ঘটলেও হরিনামের মাহাত্ম্য-কীর্তন এ-কাব্যে এমন নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত যে এ-বিশেষত্ব মূল রচনারই বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করে নিতে হয়। বস্তুত, এই নামতত্ত্বেই শ্রীচৈতন্য তথা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বাঙ্‌লার বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ ও সাহিত্য কুলীন গ্রামের কুকুরটির কাছেও বিকিয়ে থাকতে পারে[১]। কৃত্তিবাসের রামনামের সঙ্গে হরিনাম বা কৃষ্ণনামকে মালাধর বাঙালীর শ্রুতিপথে চিরকালের জন্য অমৃতরূপে সিঞ্চিত করে রেখে গেছেন। সেদিক দিয়ে বাঙ্‌লার বৈষ্ণব সমাজ ও সাহিত্য তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাছে চিরঋণপাশে আবদ্ধ।

১ চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যোক্তি পুনরপি স্মরণীয় :
"তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন রহু দূর॥" মধ্য।১৫, ১০২

এতক্ষণ আমরা মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ওপর ভক্তিশাস্ত্র ভাগবতের তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাব নির্দেশ করলাম। এক্ষেত্রে ভাগবতকারের মানসপ্রবণতার সঙ্গে মালাধরের ভাবগত অনৈক্যই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বাঙ্‌লার তথা উত্তর ভারতের প্রথম পথপ্রদর্শক ভাগবত-অনুবাদক হিসাবে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ঐক্যও অনস্বীকার্য। সেক্ষেত্রে আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও ভাগবতের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করার পক্ষপাতী। নিম্নের সুদীর্ঘ তালিকাটি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনেরই অঙ্গরূপে সংযোজিত হলো। আমরা পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে এ বিষয়ে সর্বাগ্রে আলোকপাত করেছিলেন—ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাষাগত তথা ভাবগত ঐক্যের সহস্রাধিক উদাহরণ তাঁর গ্রন্থে সংকলিত। আমরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরো কিছু উদাহরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছি। এ ক্ষেত্রে তুলনা প্রসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাদৃশ্যের সঙ্গে কচিৎ দু'একটি বৈসাদৃশ্যের উদাহরণও সংগৃহীত হলে আলোচনাটি অধিকতর গভীরতা লাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়	শ্রীমদ্ভাগবত
১ "নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ ॥ ১ ॥"	"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"
২ "স্রৗষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন ॥ ২ ॥"	"জন্মাদ্যস্য" [১।১।১], শ্রীধরটীকা : "অস্য বিশ্বস্য জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গং যতো ভবতি" [ভাবার্থদীপিকা, ১।১।১]
৩ "লক্ষ্মী সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী ॥ ৬ ॥"	শ্রীধরটীকা : "বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি" [মঙ্গলাচরণ]।
"ত্রিভুবনেশ্বরি দেবি জগতজননি। প্রকৃতি স্বরূপা দেবি স্রৌষ্টির পালনি ॥ জার পদসেবি ইন্দ্র জগতের রাজা। ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে জার পূজা ॥ সুম্ভ আদি দৈত্যের সে করিয়া নিধন। দেব লোক রক্ষা কৈল চরাচর গন ॥	ভাগবতে বিষ্ণুর অনুজা 'একানংশা'। শ্রীকৃষ্ণ এঁকে সম্বোধন করেই বলেছেলেন : "অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্। ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥

তাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্বিত। মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত॥" [৭-১০]	নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানিচ নরা ভুবি। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥ কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্য-কেতি চ। মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥" [১০।২।১০-১২] একককথায়, অর্চনাকারীদের তুমি সর্বকামনার বরদাত্রী হবে। তারা তোমার পূজা করবে নানা উপহারে নানা বলি নিবেদনে। ধরাতলে মানবভক্তরা তোমার স্থান করে দেবে, আর তুমিও দুর্গা ভদ্রকালী বিজয়া বৈষ্ণবী কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকা মায়া নারায়ণী ঈশানী শারদা অম্বিকা প্রভৃতি নামে পরিচিতা হবে।
৫ "লোকহিত কারনে জতেক অবতারে॥ ১১ ॥"	"যস্যাবতারো ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ" [১।১।১৩]
৬ "সংসার সাগর জদি করিতে তারন··· ॥ ১৪ ॥"	"অতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধং সংসারিণাং করুণয়াহ" [১।২।৩]
৭ "দ্বিতিএ বরাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি ॥ ১৯ ॥"	"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধারিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥" [১।৩।৭]
৮ "তৃতিত্র নারদ মুনি বিদিত সংসারে···॥ ২০ ॥"	"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ" [১।৩।৮]
৯ চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে ॥ ২০ ॥ বদরি[কা] শ্রমে তপ করিল বিস্তর।	"তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্‌

জগতে গাইল জার মহিমা অপার ॥ ২১ ॥”	দুশ্চরং তপঃ” [১।৩।৯]
১০ “পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান …॥ ২২ ॥”	“পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্” [১।৩।১০]
১১ “দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সস্ট রূপ ধরি…॥ ২৩ ॥”	শ্রীধরটীকা : “দত্তাত্রেয়াবতারমাহ ষষ্ঠমিতি” [ভাবার্থদীপিকা, ১।৩।১১]
১২ “সপ্ত প্রথমেত (?) জজ্ঞরূপ দক্ষিণা সহচরি…॥ ২৪ ॥	“ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত” [১।৩।১২]

[অষ্টমে ভাগবতে ঋষভাবতার : “অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ” [১।৩।১৩]। মালাধরে অষ্টমে ঋষভ নন, ঋষভের পুত্র ভরত-অবতার : “অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি ॥ ২৪ ॥”]

১৩ “নবমেত পৃথুরূপে মহিমা আপার। পৃথুবি দুহিয়া কৈল জীবের নিস্তার ॥ ২৫ ॥”	“ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ” [১।৩।১৪] শ্রীধরটীকা : “পৃথ্ববতারমাহ— ঋষিভিরিতি [ভা° দী° ১।৩।১৪]
১৪ “দসমেত মিনরূপে বৈদ উদ্ধারিল…॥ ২৬ ॥”	“রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্‌- বৈবস্বতং মনুম্” [১।৩।১৫]
১৫ “একাদসে কুর্ম্মরূপে অবতার কৈল ॥ ২৬ ॥ জলমন্ধার পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল।”	“সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠ- রূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ” [১।৩।১৬]
১৬ “দ্বাদসে ধন্নন্তরি অমৃত মথিল ॥ ২৭ ॥”	“ধান্বন্তরং দ্বাদশমং” [১।৩।১৭]

১৭ "ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে।"	"সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া" [১।৩।১৭]
১৮ "চতুর্দ্দসে নরসিংহ"	"চতুর্দশং নারসিংহং" [১।৩।১৮]
১৯ "পঞ্চদসে বামনরূপে অবতার করি। ছলিয়াত বলে নিল রসাতল পুরি ॥ ৩০ ॥"	"পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পাদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্" [১।৩।১৯]
২০ "পরুসরাম রূপে সোড়স অবতার। নিঃক্ষেত্রি প্রথুবি কৈল তিন সাতবার ॥ ৩১ ॥"	"অবতারে ষোডশমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্" [১।৩।২০]
২১ "সপ্তদসে ব্যাসরূপে বেদ সাখা করি। ধর্ম্ম বুঝাইয়া লোকে নিস্তার সে করি ॥ ৩২ ॥"	"ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ।" [১।৩।২১]
২২ 'অষ্টাদসে শ্রীরাম রূপে দসরথের ঘরে। একা প্রভু চারিঅংসে অবতার করে ॥ ৩৩ ॥ সমুদ্র বাঁধিয়া কৈল সিতার উদ্ধার। সবংসে রাবণ রাজায় করিল সংহার ॥ ৩৪ ॥"	শ্রীধরটীকা : "রামাবতারমাহ" [১।৩।২২]
২৩ "উনবিংসে হলধর রূপে অবতার। বিংসতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদিত্ত সংসার ॥ ৩৫ ॥"	"একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য নামনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্" [১।৩।২৩]
২৪ "একবিংসে বৈদ্ধ রূপে জগৎ মোহন।"	"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরাদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি" [১।৩।২৪]

২৫ "দ্বাবিংসে কল্কিরূপে ম্লেচ্ছের নিধন ॥ ৩৬ ॥"	"অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ" [১।৩।২৫]
২৬ পৃথুবি রোদন "কংশাদি মহীসুরে পিথুবির গুরুভারে কম্পমান দেবি বষুমতি। সঁহিতে নারিব বল জাব আমি রসাতল সুন সুন দেব প্রজাপতি ॥"	"ভূমি দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীক-শতাযুতৈঃ। আক্রান্তা ভুরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ" [১০।১।১৭]
২৭ "চল শভে যাই তথা দেব হরি আছে যথা খিরোদ শমুদ্রের তিরে।"	"জগাম স-ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ" [১০।১।১৯]
২৮ "জত সর্গ বিদ্যাধনি তিলোত্তমা আদি করি জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে।"	"জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু-সুরস্ত্রিয়ঃ" [১০।১।২৩]
২৯ বিষ্ণুকর্তৃক যোগমায়া-সম্ভাষণ : দেবকীর গর্ভপাত ও যশোদাগর্ভে জন্মের উপদেশ (১০৫-১০৯)।	১০।২।৬-৯
৩০ "দৈবকী উদরে তোরি অষ্টম গর্ব্ভে ঘোর মৃর্ত্ত রূপ উপজিব তোথা ॥১১৩॥ভ সুনি কংস বিমন ভগিনি বধিবার মন এমন চেষ্টা হইল তাহার।"	১০।১।৩৪, ৩৫
৩১ "ইহার উদরে জবে জন্মিব সিসু তবে দিব তোরে না করিব আন।"	১০।১।৫৪
৩২ "কলিকাল সর্ব্ব তন্ত্র আর নাহি কোন মন্ত্র	তু° বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ

হরি হরি করহ স্মরনে ॥ ১১৭ — নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥" স্মরণীয় ভা° "কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ" [১২।৩।৫২]

৩৩ "তাহা না মারিল রাজা কংস নরপতি···॥" ১০।১।৫৯-৬০

[ভাগবতে আছে, প্রথমেই কংস বসুদেব-দেবকীর প্রথম সন্তান বধ করেননি। কিন্তু এই সময় নারদ এসে তাঁকে দেবকুলের বৈরিতা ও পৃথুভার-হরণ হেতু কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা জানান। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মালাধর তাঁর কাব্যে দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ছয় সন্তানের জন্মের অব্যবহিত কাল পরে। তারপর কংস-কর্তৃক একসঙ্গে দেবকীর ছয়পুত্র হনন : "দৈবকীর ছয়পুত্র মারিল একুবারে ॥ ১৩৪ ॥"]

৩৪ "বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের অনুমান ॥ ১৩১ ॥"

"এতৎ কংসায় ভগবান্
শশংসাভ্যেত্য নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং
দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্" [১০।১।৬৪]

৩৫ "বসুদেব দৈবকী আনিঞা কারাগারে।
লোহপাস নিগড় দিয়া বান্ধিল তাহারে ॥ ১৩৫ ॥"

"দেবকীং বসুদেবঞ্চ
নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে"
[১০।১।৬৬]

৩৬ "গোব্রাহ্মণ দেব করএ হিংসন ॥ ১৩৬ ॥"

"তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্
ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্
গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ" [১০।৪।৪০]
ভাগবতে এই গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা কৃষ্ণজন্মের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা।

৩৭ "দৈবকীর গর্ভপাত" [১৩৮-১৪০]

"অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ" [১০।২।১৫]

৩৮ দেবকীগর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাব [১৪৭-১৪৯]: অতিশয় লৌকিক বর্ণনা।	ভাগবতে অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক। যথা, ১. "আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ" [১০।২।১৬] ২. "স বিভ্রৎ পৌরুষং 'ধাম'" [১০।২।১৭] ৩. "অচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী" [১০।২।১৮] শ্রীধরটীকা: "মনসৈব দধার"।
৩৯ "জগত মোহিনিরূপ…॥ ১৪৯ ॥"	"ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব" [১০।২।১৯]
৪০ ব্রহ্মার স্তব [১৬২-১৬৮]	১০।২।২৬-৪১
৪১ "সুভক্ষণ সুভযোগ রোহিনি নিসাপতি ॥ ১৭০ ॥"	"যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্" [১০।৩।১]
৪২ "প্রসন্নত নদনদি…॥ ১৭৪ ॥"	"নদ্যঃ প্রসন্নসলিলাঃ" [১০।৩।৩]
৪৩ "প্রসন্নত দসদিগ…॥ ১৭৫ ॥"	"দিশঃ প্রসেদুর্গগনং" [১০।৩।২]
৪৪ কৃষ্ণজন্ম মামুলী-ভঙ্গিতে বর্ণিত: "হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল। সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥ ১৭৬ ॥"	কৃষ্ণজন্ম-বর্ণনা ভাগবতে 'ভাবে সপ্তমী' যোগে বিস্ময়কর ব্যঞ্জনাবাহী: "নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে-জনার্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃসর্বগুহাশয়ঃ। আবীরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ" [১০।৩।৮]
৪৫ "পাএতে নূপুর বাজে সীবৎসাদি পতি…॥ ১৮০ ॥"	"শ্রীবৎসলক্ষ্মং" [১০।৩।৯]
৪৬ বসুদেবের কৃষ্ণ-বন্দনা একটি মাত্র শ্লোকে নিবদ্ধ [১৮৩]	ভাগবতে বসুদেবের কৃষ্ণ-বন্দনা দীর্ঘ [১০।৩।১৩-২২]
৪৭ দেবকীর কৃষ্ণবন্দনা [১৮৪-১৮৭]	দেবকীর কৃষ্ণ-বন্দনা [১০।৩।২৪-৩১]।

৪৮ কৃষ্ণের উক্তি [১৮৯-২০৩]	১০।৩।৩২-৪৫
৪৯ "আমা লৈয়া যাহ···॥ ২০২ ॥"	১০।৩।৪৭
৫০ "মোহিয়া বাপমাএ সিসুরূপ ধরি ॥ ২০৪ ॥"	"পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" [১০।৩।৪৬]
৫১ "সকল দ্বার মুক্ত হৈল···॥ ২০৬ ॥"	"দ্বারস্তু সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎ-কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ" [১০।৩।৪৮]
৫২ "ফণাছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছু জাএ ॥ ২০৭ ॥"	"শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ" [১০।৩।৪৯]
৫৩ "উঙা চুঙা করিয়া কান্দএ কন্যা-খানি। চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন সুনি ॥ ২১৩ ॥"	"ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ" [১০।৪।১]
৫৪ "আউদড চুলে··· ॥ ২১৫ ॥"	"প্রস্খলন্মুক্তমূর্ধজঃ" [১০।৪।৩]
৫৫ "এখনে ত কন্যা হৈল তোমার সত্রু নএ। না মারিহ এই কন্যা সুন কংসরাএ ॥ ২২১ ॥"	ভাগবতে আছে, "এটি তোমার স্নুষা, অর্থাৎ তোমার পুত্রবধূ হবে—" [দ্রষ্টব্য ১০।৪।৪]। বঙ্গসমাজ বহির্ভূত এই লোকবিধি মালাধর বর্জন করেছেন।
৫৬ "সত্বরে লইয়া গেল সিলার উপরে···॥ ২২৪ ॥"	"অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ" [১০।৪।৮]
৫৭ "হাতে হৈতে খসি গেলা আকাস উপরে···॥ ২২৫ ॥"	"সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেবাম্বরং গতা" [১০।৪।৯]
৫৮ "অষ্টভুজা রূপধরি···॥ ২২৫ ॥"	"সায়ুধাষ্টমহাভুজা" [১০।৪।৯]
৫৯ সমাগমোৎসব [২৪৭-২৫০]	১০।৫।১-১৭

[মালাধরে সমাগমোৎসবে গোপীদের উল্লেখ নেই। ভাগবতে এ-উপলক্ষ্যে যশোদা-সহচরী গোপাঙ্গনাদের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, দ্র° ১০।৫।৯-১২]

৬০	"সর্ব্বধনে সম্পূর্ণ হৈল নন্দের নগরি ॥ ২৫০ ॥"	"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব সমৃদ্ধিমান্" [১০।৫।১৮]
৬১	"কর লৈয়া জাব কালি রাজার দুয়ারে ॥ ২৫১ ॥"	"নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরুদ্বহ" [১০।৫।১৯]
৬২	"বৃর্দ্ধকালে তোমার পুত্র হইল···॥ ২৫৫ ॥"	"দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে" [১০।৫।২৩]
৬৩	"···পালন করিছ তাহারে ॥ ২৫৬ ॥"	"ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ" [১০।৫।২৭]
৬৪	"বড় বিঘ্ন হব তোমার পুত্র আছে যথা ॥ ২৫৭ ॥"	"নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে" [১০।৫।৩১]
৬৫	পুতনা-পতন [২৭৭-২৮২]	১০।৬।৩৩-৩৪
৬৬	"বিসস্তন দিয়া পুতুনা মাতৃ পদ পাএ। স্তনামৃত দিয়া যসোদা কোন পদে জাএ ॥ ২৮৫ ॥"	"যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননী-গতিম্। কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ" [১০।৬।৩৮]
৬৭	যশোদা ও রোহিণী-কর্তৃক কৃষ্ণের রক্ষাদি কার্য-সম্পাদন [২৮৯-২৯২]	১০।৬।১৯-২৯
৬৮	শকটাসুর-ভঞ্জন। মালাধরে এ লীলা ঘটেছিল "পুত্রের জনম দিনে" [২৯৪]	ভাগবতেও তাই—'কদাচিৎ' নন্দনন্দনের জন্মনক্ষত্রের সংযোগদিবসে তথা "ঔত্থানিক-কৌতুকাপ্লবে" [১০।৭।৪]
৬৯	"বাউরূপ ধরি যায় গোকুল নগরে ॥ ৩০২ ॥"	"চক্রবাত স্বরূপেণ" [১০।৭।২০]
৭০	"ধুলায় পুরিল সব গোকুল নগর ॥ ৩০৩ ॥"	"গোকুলং সর্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ" [১০।৭।২১]
৭১	"এড়িলেন জসোদা পাইয়া মহাভরে ॥ ৩০৬ ॥"	"ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা" [১০।৭।১৯]

৭২ "তথাই ত শ্রীহরি গলা চাপি ধরি। আকাস হৈতে পাড়িয়া তার প্রাণ হরি ॥ ৩০৮ ॥"	"গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গত-লোচনঃ অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহ-বালো ব্যসুর্ব্রজে" [১০।৭।২৮]
৭৩ "দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভু কন্যা নহে···॥ ৩২৪ ॥"	"দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতু-মর্হতি" [১০।৮।৮]
৭৪ "হের জে তোমার পুত্র বড় সুলক্ষণ। অভিনব অবতার জেন নারায়ণ ॥ ৩৩৫ ॥"	"তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণ-সমো গুণৈঃ" [১০।৮।১৯]
৭৫ "অনেক নাম ঘুসিব সংসার ॥ ৩৩৬ ॥"	"বহূনি সন্তি নামানি" [১০।৮।১৫]

[ভাগবতে কৃষ্ণ-বলরামের জাতকর্মে গর্গসংবাদে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটি হলো : "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০।৮।১৩ ॥" কৃষ্ণের ভগবত্তা-বাচী এই শ্লোকটি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে অশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। চৈতন্য-প্রভাবিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতেও এর যথাযথ স্থান নিরূপিত। পক্ষান্তরে মালাধরের নীরবতা বিস্ময়কর।]

৭৬ "এতবলি নিজস্থানে গেলা গর্গমুনি।" মালাধরের বর্ণনায় গর্গ-সমাচার সংক্ষিপ্ত	"গর্গেচ স্বগৃহং গতে" [১০।৮।২০] ভাগবতে গর্গ-সংবাদ বিস্তৃত

[ভাগবতে এরপর রাম ও কৃষ্ণের অপূর্ব বাৎসল্য-রসাক্রান্ত জানুকর্ষণ, পদচারণ ও গোকুলের গৃহেগৃহে মধুর মাখনচৌর্যলীলার অবতারণা। মালাধরে তা অনুপস্থিত।]

৭৭ "আপনি মথএ দধি করি উচ্চস্বরে। গিত রূপে গাএ রানি কৃষ্ণ জত করে ॥ ৩৫৬ ॥"	"যানি যানীহ গীতানি তদ্বাল-চরিতানিচ। দধি-নির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত" [১০।৯।২]

৭৮ "জগতের নাথ বাঁধে উতুখল দিয়া ॥ ৩৭১ ॥"	"তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা" [১০।৯।১৪]
৭৯ "তথা হৈতে শ্রীহরি দুই বৃক্ষ দেখে ॥ ৩৭৮ ॥"	"অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ" [১০।৯।২২]
৮০ "অন্ন খাব জমুনার কূলে ॥ ৪৮৭ ॥"	প্রাতরাশের ইচ্ছা [১০।১২।১]
৮১ "সকল দ্বারে তার বাউ বন্দি হৈল ॥ ৫০২ ॥ বাউ নাহি বাহিরাএ ফুটএ সরির। মাথা ফুটি ত্রাব করি ভইলা বাহির ॥ ৫০৩ ॥"	"পূর্ণোহন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ" [১০।১২।৩১]।
৮২ "তবে সব চতুর্ভুজ দেখে প্রজাপতি··· ॥ ৫৩২ ॥"	ভাগবতে এ দৃষ্টি বলরামেরও। [দ্রষ্টব্য ১০।১৩।৩৫]
৮৩ "কোটি কোটি ব্রহ্মা জার লোমকূপে বসে ॥ ৫৪৫ ॥"	"কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্" [১০।১৪।১১]
৮৪ গোচারণলীলা ৫৬৫—৫৭৩	ভাগবতে এ লীলা ১৪ শ ও ১৫ শ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। মালাধরে তারই সারাৎসার সংগৃহীত।
৮৫ "নানা বিধি কৃডাকরি জায় ধিরে ধিরে ॥ ৫৬৮ ॥"	১০।১৫।৯
৮৬ "কোথাহ কোকিল পক্ষ সুনাদ সে পুরে। তার সঙ্গে রা কাড়ে দেব দামোদরে ॥ ৫৬৯ ॥"	"কচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্" [১০।১৫।১১] "কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে" [১০।১২।৭]
৮৭ "কোথাহ মর্কট সিসু লাফ দেই রঙ্গে। তার সঙ্গে লাফ দেই সিসুগণ সঙ্গে ॥ ৫৭০ ॥"	"বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্। বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু" [১০।১২।৯]

৮৮ "কোথাহ মউর পক্ষ নানা নৃত্য করে। সেইরূপ নাচে তথা দেব দামোদরে ॥ ৫৭১ ॥ কোথাহ পক্ষগণ আকাসে উড়ি জায়। তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায় ॥ ৫৭২ ॥"	"বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো" এবং "নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ" [১০।১২।৮] "অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং" [১০।১৫।১২]
৮৯ "ফুল তুলিয়া মুরারি···॥ ৫৭৩ ॥"	১০।১২।৩
৯০ "সুন রাম সুন কৃষ্ণ দেব বনমালি ···॥ ৫৭৫॥"	"রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ" [১০।১৫।২২]
৯১ "তালের বোন নিকটে দেখি" ···॥৫৭৬॥	"ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালি-সঙ্কুলম্" [১০।১৫।২২]
৯২ "সত্বরেত বলরাম তাল লড়া দিল ···॥৫৭৯॥"	"বলঃ প্রবিশ্য • বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্" [১০।১৫।২৯]
৯৩ "গাছের মড়মড়ি···॥ ৫৮০ ॥"	১০।১৫।৩০
৯৪ "বলদেবের ঘাএ···॥ ৫৮৪ ॥"	১০ ১৫।৩২-৩৩
৯৫ "তৃসাএ আকুল হৈয়া পিল তার পানি··· ॥৫৯১॥"	"দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তা বিষ-দূষিতম্" [১০।১৫।৪৯]
৯৬ যশোদা বিলাপ [৬১৮-৬২৯] "ধাইয়া জসোদা জায়···"	ভাগবতে আছে, অপত্যকে সর্পগ্রস্ত দেখে যশোদা হ্রদে প্রবিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। "কৃষ্ণমাতরমপত্যমনু-প্রবিষ্টাং" [১০।১৬।২১] যশোদাকে নিবৃত্ত করেছিল গোপীরা। আর হ্রদে প্রবেশোদ্যত নন্দাদি গোপদের নিবৃত্ত করেন বলরাম [১০।১৬।২২]। বস্তুত ভাগবতে এদৃশ্যে নন্দ-যশোদাসহ সকল গোপ-গোপী, এমনকি বৃক্ষলতা-গাভী সমুদয় স্থাবর জঙ্গমকে শোকমূঢ় দেখি।

৯৭ "নাহি কান্দে বলমত্ত··· ॥ ৬৩৩ ॥"	"প্রত্যাযেবং স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ" [১০।১৬।২২]
৯৮ "কালির স্ত্রী আইল···॥ ৬৩৭ ॥" শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কালিয়-নাগের পত্নীর কৃষ্ণপাদ-বন্দনা ভাগবতের মতো দীর্ঘ ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ নয়।	ভাগবতে বহুস্ত্রীর উল্লেখ: "পত্ন্যঃ আর্তাঃ" [১০।১৬।৩১]। তাঁরা নিজেরা এসেছিলেন এবং কৃষ্ণের আশু করুণা লাভের আশায় শিশু সন্তানগুলিকে সঙ্গে এনেছিলেন।
৯৯ "ব্রত উপবাসে কালি ··॥ ৬৪৩ ॥"	"তপঃ সুতপ্তং" [১০।১৬।৩৫]
১০০ "কালির মাথার পাদপদ্ম ঘুচাইল ॥ ৬৪৮ ॥"	"মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ" [১০।১৬।৫৪]
১০১ কালিয়ের স্তব [৬৪৯-৬৭২]	১০।১৬।৫৬-৫৯
১০২ "স্বরূপে মানুস নহে··· ॥ ৬৮৩ ॥"	ভাগবতে প্রলম্বাসুর বধের পরই বলা হয়েছে: "মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ" [১০।২০।২]—, কালিয়দমনের পরে নয়।
১০৩ "অহে রাম অহে কৃষ্ণ·· ॥ ৬৯৫ ॥"	"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম। এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান গ্রসতে হি নঃ" [১০।১৭।২৩]
১০৪ "বড খরা লাগে গাএ যৌষ্টের তপনে ॥ ৭১০ ॥"	ভাগবতে কিন্তু বলা হয়েছে, বৃন্দাবনের গুণে গ্রীষ্মও "বসন্ত ইব লক্ষিতঃ" [১০।১৮।৩]
১০৫ "ভাণ্ডির নিকটে ॥ ৭১৩ ॥"	"ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ" [১০।১৮।২২]
১০৬ "কানাঞি বলেন বলাই ···॥ ৭২৬ ॥"	ভাগবতে নেই
১০৭ "কৃষ্ণ পিলেন আগুনি ॥৭৪৩॥"	"পীত্বা মুখেন তান" [১০।১৯।১২]
১০৮ বর্ষাবর্ণনা [৭৪৬-৭৫১]	বৃন্দাবনের বর্ষাবর্ণনা ভাগবতে বহুবিস্তৃত [১০।২০।৩-২৪]
১০৯ "মিষ্টান্ন দধি লৈয়া··· ॥ ৭৫২	"দধ্যোদনমুপানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে" [১০।২০।২৯]

১১০	শরৎ-বর্ণনা [৭৫৩-৭৫৮]	শরৎ-বর্ণনা [১০।২০।৩২-৪৯]। ভাগবতে এ বর্ণনা একাধারে প্রাকৃতিক, কাব্যরসাক্রান্ত আধ্যাত্মিক।
১১১	"সব তাপ সিত চন্দ্রমা হরিল …॥ ৭৫৭ ॥"	"শরদার্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানা-মুড়ুপোঽহরৎ" [৫০।২০।৪২]
১১২	"সরতে পুষ্প ফুটি সুগন্ধি বাত বহে …॥ ৭৫৮ ॥"	"পদ্মাকরসুগন্ধিনা ন্যবিশদ্বায়ুনা বাতং" [১০।২১।১]
১১৩	"প্রান স্থির নত্র ॥ ৭৬১ ॥"	"বিক্ষিপ্তমনসো" [১০।২১।৪]
১১৪	"সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে। বৃজকন্যা সব ব্রত কবিতে চলত্র ॥ ৭৬৩ ॥"	"হেমন্তে প্রথমে মা'সি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্" [১০।২২।১]
১১৫	"স্মামি কবি দেহ মোরে নন্দের কুমারে ॥ ৭৬৬ ॥'	"ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ" [১০ ২২।৫]
১১৬	"উঠিলা কদম্ব গাছে… ৭৬৯ ॥"	'নীপমারুহ্য" [১০,২২।৯]
১১৭	"সিতে বড কষ্ট পাই। দেহ বস্ত্র…॥ ৭৭৬ ॥"	"দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ" [১০।২২।১৪]
১১৮	"খুধা বড পাইলেক ‥॥৮০২॥"	১০।২৩।১
১১৯	"অঙ্গিরস নামে মুনি ‥ ॥ ৮০৪ ॥"	"সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া" [১০।২৩।৩]
১২০	"আমার নাম করিয়া অন্ন আনহ মাগিয়া…॥ ৮০৭ ॥"	ভাগবতে, বলভদ্র ও কৃষ্ণ, উভয়ের নাম করে, যথা, "কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্যস্য মম চাভিধাং" [১০।২৩।৪]
১২১	"নন্দের নন্দন…তোমার ঠাঞি ॥ ৮১১ ॥"	১০।২৩।৬
১২২	"দুই ভাই…দুহাঁর সরিরে ॥ ৮১২ ॥"	১০।২৩।৭
১২৩	"সুনিঞা হাসিলা তবে… ॥ ৮১৭ ॥"	"তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ" [১০।২৩।১৩]

১২৪ "বিবিধ প্রকারে অন্ন বেঞ্জন লইল···॥ ৮২৯ ॥"	"চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ" [১০।২৩।১৯]
১২৫ "না লিবেক তোমারে জ্ঞাতি বন্ধু জন" ॥ ৮৩৮ ॥	ভাগবতে বিপ্রনারীর উক্তি : "গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা ন ভ্রাতৃবন্ধু-সুহৃদঃ কুত এব চান্যে" [১০।২৩।৩০]
১২৬ "ইন্দ্র জজ্ঞ···॥ ৮৬৩ ॥"	"গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ [১০।২৪।১]
১২৭ "আমারে করিল হেলা নন্দের কুমার ॥ ৯০২ ॥"	ভাগবতে ঈষৎ অন্যরূপ। ইন্দ্র বলছেন, গোপবৃন্দ "কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্" [১০।২৫।৩]
১২৮ "আবর্ত্ত সামর্ত্ত মেঘ দ্রোন পুস্কর। চৌসষ্টি মেঘ লৈয়া লড়হ সত্বর ॥ ৯০৭ ॥"	"গণং সম্বর্তকং নাম মেঘানাঞ্চান্তকারিণাম্" [১০।২৫।২]
১২৯ "নিজস্থানে তনমতে রাখিল গিরিবর ॥ ৯৪২ ॥"	"ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ" [১০।২৫।২৮]
১৩০ "সাতবৎরের সিসু···॥৯৪৪॥"	"সপ্তহায়নো বালঃ" [১০।২৬।৩]
১৩১ "সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিল ॥ ৯৫২ ॥"	"চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ১০।২৭।১২]
১৩২ "বারেক ক্ষেমহ দোস পড়হুঁ চরণে··· ॥ ৯৫৩ ॥"	"ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্" [১০ ২৭।৯] স্মরণীয় বৈষ্ণবতোষণী : "অতঃক্ষন্তুমর্হস্যেবেতি ভাবঃ" [১০।২৭।৯-টীকা]
১৩৩ বরুণ কাহিনী [৯৬২-১০০০] শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বরুণ-কাহিনী বহুবিস্তৃত। এক্ষেত্রে ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনা স্থানলাভ করে মূল কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছে।	ভাগবতে বরুণ কাহিনী সংক্ষিপ্ত [দ্র° ১০।২৮।১-১০]
১৩৪ "দ্বাদসিতে নন্দঘোস জমুনা প্রেবেসে ॥ ৯৬২ ॥"	"কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ" [১০।২৮।১].

১৩৫ “ধরিয়া বরুন দুত নন্দ লৈয়া জাই ॥ ৯৬৩ ॥”	“তৎ গৃহীত্বানয়ত্তৃত্যো বরুণস্য” [১০।২৮।২]
১৩৬ “মানুস রূপে তোমার ঘরে জন্মিলা চক্রপানি ॥ ৯৯২ ॥”	“গোপাস্তমীশ্বরম্” [১০।২৮।১১]
১৩৭ “হেনকালে হৈল কৃষ্ণ দ্বাদস বৎসর ...॥১০০৩॥”	ভাগবতে “কৈশোর” মাত্র উল্লিখিত। এই কৈশোর বয়সের বিভিন্ন হিসাব দিয়েছেন বিভিন্ন টীকাকারগণ। জীব গোস্বামীর মতে, নবম বৎসরের শরতে কৃষ্ণের রাসলীলা। পক্ষান্তরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন: “অষ্টবর্ষবয়স্তে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ” [সারার্থদর্শিনী]
১৩৮ “হেন মতে গোবিন্দে চিন্তে গোপিগন। অন্তরজামিনি গোসাঞি জানিলা তখন ॥ ১০১৬ ॥”	ভাগবতে অন্যরূপ। “ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ” কাত্যায়নী ব্রতে কৃষ্ণের এই আশ্বাস-বাণীর সত্যরক্ষায় শারদ-পূর্ণিমায় রাসলীলা অনুষ্ঠিত।
১৩৯ বৃক্ষ-সম্ভাষণ ১০২০-১০২৪	১০।৩০।৫-৯
১৪০ “চলি গেলা গোপনারি আপনার মনে ॥ ১০৩০ ॥”	“আজগ্মুরন্যোন্যলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো” [১০.২৯।৪]
১৪১ “সিসু স্তন পিএ”	“পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ” বৈষ্ণবতোষণী টীকাকার বলেন, রাসে সন্তানবতী গোপীর স্থান থাকা অসম্ভব। শ্লোকস্থ শিশু আত্মীয়-সন্তান। যথা, “বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভগিনীভ্রাতৃপুত্রাদীন্ হিত্বাঽন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ” [১০।২৯।৬]
১৪২ “কেনে আইলা গোপি··· ॥১০৪৫॥”	“কচ্চিদ্‌বাগমনকারণম্” [১০।২৯।১৮]
১৪৩ “রাতৃকালে ঘোরতর··· ॥১০৪৬ ॥”	“রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্ব-নিষেবিতা” [১০।২৯।১৯]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়	ভাগবত
১৪৪ "ঘরে ঘরে চাহিয়া বোলে তোমার বন্ধুজন ॥ ১০৪৮ ॥"	"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং" [১০।২৯।১৯]
১৪৫ স্বামিসেবার উপদেশ [১০৫০-১০৫১]	১০।২৯।২৪-২৬
১৪৬ "স্তন বাহিয়া আখির জল··· ॥১০৫৫॥"	"অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি" [১০।২৯।২৯]
১৪৭ "কেন নির্দ্দয় হৈয়া বল অবেভার ॥ ১০৫৮ ॥"	"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং" [১০।২৯।৩১]
১৪৮ "ছাড়িয়াত স্বামি পুত্র··· ॥ ১০৫৯ ॥"	"সংত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং" [১০।২৯।৩১]
১৪৯ "জত আশা করি··· ॥১০৬৬॥"	"আশাং ধৃতা ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র" [১০।২৯।৩৩]

[শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ১০৮১-১১১৭ পদ (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে নেই। এ অংশ প্রক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। ভাগবত-বহির্ভূত গোপী-নাম ইত্যাদি এতে স্থান লাভ করেছে। রাধার নামও পাওয়া যাচ্ছে—"রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন" (১০৮৯)। জনৈক 'স্যামদাসে'র ভণিতা লক্ষণীয়।]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়	ভাগবত
১৫০ "পূর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা ॥ ১০৮১ ॥"	ভাগবতে ভিন্ন, যথা "এণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ" [১০।২৯।৪৩]
১৫১ "·····গলে বনমালা। মধুলোভে মধুকর করে নানা খেলা ॥ ১০৮২ ॥"	"গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুতঃ" [১০।৩৩।২৩]
১৫২ "করেতে ধরিয়া কার দেই তাম্বুল চর্ব্বন ॥ ১০৯৫ ॥"	"কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎতন্বী তাম্বূল-চর্বিতং" [১০।৩২।৫]
১৫৩ "আচম্বিতে গোপীমদ্ধে নাহি নারায়ন। এক নারি লৈয়া কৃষ্ণ করিল গমন ॥ ১১১৮ ॥"	ভাগবতে প্রথমে অন্তর্ধান পরে রাস। অন্তর্ধানের পূর্বে লীলাবিলাস। রাসবিলাসান্তে জলক্রীড়া। সর্বশেষে শুক-পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রথমে রাস, পরে অন্তর্ধান, শেষে পুনরপি-রাস ও	

জলক্রীড়ান্তে চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়। বস্তুত, রাসবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সর্বাধিক প্রক্ষেপ স্থান লাভ করেছে বলে মনে হয়। নতুবা এত শিথিলবন্ধ হতো না।

১৫৪ "এক নারি লৈয়া কৃষ্ণ··· ॥ ১১১৮॥"

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ" [১০।৩০।২৮]—প্রথমত ভাগবতে এই নারী এসেছেন পরোক্ষে, ব্রজগোপীবর্গের বর্ণনায়। পরে এঁকে বিলাপপরায়ণারূপে প্রত্যক্ষ করেছি।

১৫৫ সুগন্ধি কুসুম তুলি বুলে ধিরে ধিরে ॥ ১১১৯॥"

"অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা" [১০।৩০।৩৩]

১৫৬ "বাম হাত তার কান্দে দিয়াত কানাঞি···॥ ১১২০॥"

"অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ" [১০।৩০।২৭]

১৫৭ "চলিতে না পারি কৃষ্ণ··· ॥ ১১২১॥"

"ন পারয়েঽহং চলিতুং" [১০।৩০।৩৮]

১৫৮ "হীনমতি পাগলি গোপি আন নাহি মনে। কৃষ্ণ চাহিয়া বুলে সব বৃন্দাবনে ॥ ১১৩৪॥"

"ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ" [১০।৩০।১৪]

১৫৯ "গাছে গাছে চাহে গোপী··· তরুলতাগণে॥" ১১৩৫-১১৫৫

১০।৩০।৪-৬,৯,১২

বৃক্ষ লতাদির নিকট কৃষ্ণান্বেষণে বহু ভাগবতবহির্ভূত উপাদান শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রবেশলাভ করেছে। যেমন কদম্ব ও নিশাপতি চন্দ্রের নিকট কৃষ্ণপ্রার্থনা। এরূপ আর একটি বিষয় হলো তারাদের কাছে বিরহবার্তা নিবেদন। এগুলিকে প্রক্ষেপ অথবা মালাধর বসুর মৌলিক কবিত্বকল্পনা বলতে হবে।

১৬০ কৃষ্ণের বিরহে গোপি হইলা আবেস। কৃষ্ণলিলা রচে গোপি ধরিয়া তার বেস ॥ ১১৬১ ॥" গোপীর বিরহাবেশ সম্বন্ধে কোকিল ও চাতকের ডাকের উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয় এই অংশ [১১৫৭-১১৬০] খ ও ঘ পুঁথিতে নেই।	"লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ [১০।৩০।১৪]
১৬১ "কেহত পুতুনা. রাখিব সভাবে ॥ ১১৬২-১১৭৫ ॥"	১০।৩০।১৫-২৩
১৬২ "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ··॥ ১১৭৮ ॥"	"হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ" [১০।৩০।৪০]
১৬৩ '[illegible] চরিত্র জ[illegible] করন্তি বাখানে ॥ ১১৮৫ ॥"	"তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো" [১০।৩০।৪৪]
১৬৪ গোপীগীত [১১৮৬-১[illegible]	ভাগবতের বিখ্যাত গোপীগীত ১০।৩১।১-২২, [সমগ্র একত্রিংশ অধ্যায়]
১৬৫ "জত পক্ষগন থাকে···॥ ১১৯৪ ॥"	"যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্" [১০।২৯।৪০]
কৃষ্ণের বংশীমহিমা	
১৬৬ "মনুস্য নহেন গোসাঞি··· ॥ ১১৯৭	১০।৩১।৪
১৬৭ "চন্দ্র বেড়িয়া জেন সোভে তারাগণ ॥ ১২১০ ॥"	"এণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ" [১০।২৯।৪৩]
১৬৮ "আলিঙ্গন···॥ ১২১৩ ॥"	১০।২৯।৪৬
১৬৯ "তবে জলক্রীড়া ক[illegible] ॥ ১২১৪ ॥"	১০।৩৩।১৩-২৬
১৭০ "কেহো নাহি জানে কৃষ্ণ কৃড়া করে রঙ্গে। পৃতিদিনে বৃন্দাবনে ব্রজবধূ সঙ্গে ॥ ১২১৬ ॥" [নিত্যলীলার ইংগিত]	"এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ" [১০।৩৩।২৬]

১৭১ "পাপ পুন্য জত·…॥ ১২১৮ ॥"	১০।৩৩।৩৪
১৭২ কাত্যয়নী মহোৎসব [১২২৬-১২২৯]	পশুপতি ও অম্বিকা অর্চনা [১০।৩৪।২]
১৭৩ "আচম্বিতে লৈয়া জায় গোপি একজনে…॥ ১২৪৬ ॥"	"প্রমদাগণম্" [১০।৩৪।২৬]
১৭৪ "দুই হাথে দুই স্রাঙ্গ" ॥১২৭৪॥	"গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং" [১০।৩৬।১১]
১৭৫ "ক্রোধে সিংহ উপাড়িয়া সিংহের বাড়ি মারি…॥ ১২৭৬ ॥"	"নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ ··বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ" [১০।৩৬।১৩]
১৭৬ কংস-সমীপে নারদের আগমন। [১২৮৩-১২৯৩]	[১০।৩৬ ১৬]
১৭৭ "কুবলয় হস্তি রাখ ··॥ ১৩০৬ ॥"	১০।৩৬।২৫
১৭৮ "··দসন বিকটে ॥ ১৩১৩ ॥"	"মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষিতঃ" [১০।৩৭।৪]
১৭৯ কৃষ্ণ-সমাপে নারদস্তুতি [১৩৪১—১৩৪৫]	১০ ৩৭।১০-২৪
১৮০ "ভাল হৈল কংস বৈল কৃষ্ণ আনিবারে। তেঞি সে দেখিব প্রভু দেব দামোদরে ॥ ১৩৫৩ ॥"	"কংসো বতাদ্যাকৃতমেঽত্যনুগ্রহং দ্রক্ষেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ" [১০।৩৮।৭]
১৮১ অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এ অংশ অতিশয় সংক্ষিপ্ত [১৩৫০-১৩৫৫]। (খ) ও (ঘ) পুঁথিতে তৎসহ আর মাত্র দুটি অতিরিক্ত শ্লোকের পাঠ আছে।	ভাগবতে অক্রূর পরমভাগবত। তাঁর কৃষ্ণচিন্তা গভীরতম ধ্যানের পর্যায়ে পড়ে [দ্রষ্টব্য, ১০।৩৮।৩-২২]।
১৮২ "দেখিলত রামকৃষ্ণ বাছুরের সঙ্গে···॥১৩৫৭॥"	"দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং-গতৌ" [১০।৩৮।২৮]
১৮৩ "দধি দুগ্ধ কয় লেহ সকট পুরিয়া ···॥ ১৩৭০ ॥"	"···গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ···যুজ্যন্তাং শকটানি চ" [১০।৩৯।১১]

১৮৪ "লাজ ভয় দূর করি জুড়িল ক্রন্দন ॥ ১৩৭৪ ॥" — "বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ [১০।৩৯।৩১]

[কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোপীবিলাপ ভাগবতে বিস্তৃত স্থান অধিকার করে আছে। দ্র° ১০।৩৯।১৪-৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।]

১৮৫ নন্দসহ অক্রূরের গমন [১৩১৮-১৩৮৩] — ১০।৩৯।৩৩

১৮৬ অক্রূরের বিস্ময় [১৩৯৪-১৩৯৫] — ১০।৩৯।৪২

১৮৭ অক্রূরের কৃষ্ণস্তব খুবই সংক্ষিপ্ত। — ভাগবতের দশম স্কন্ধের সমগ্র চত্বারিংশ অধ্যায়টিই অক্রূরের কৃষ্ণ-স্তবগান। একচত্বারিংশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকদুটিও স্তুতিমূলক।

১৮৮ "নন্দ আদি গোপ জত মথুরা নিকটে। বিলম্ব করিয়া আছে রহায়া সকটে ॥ ১৩৯৯ ॥" — ১০।৪১।৮

১৮৯ "গোয়া নারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে ॥ ১৪৫৬ ॥" — "সবৃন্ত-রম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ স্বলংকৃতদ্বারগৃহাং" [১০।৪১।২৩]

১৯০ "প্রান লৈয়া পালাইল আর মল্লগন ॥ ১৫৫২ ॥" — "শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্বে প্রাণ-পরীপ্সবঃ [১০।৪৪।২৮]

১৯১ কংসের আদেশ : ১৫৫৪-১৫৫৮ — ১০।৪৪।৩১

১৯২ "খাণ্ডা বাহু রনে জায়··· ॥ ১৫৬২ ॥" — "তং খড়্গপাণিং" [১০।৪৪।৩৬]

১৯৩ "হাহাকার হৈল তবে ॥ ১৫৬৬ ॥" — "হাহেতি শব্দঃ" [১০।৪৪।৩৮]

১৯৪ নিহত অসুরাদির পত্নীদের আগমন ও বিলাপ [১৫৭২-১৫৭৯] — ১০।৪৪।৪৩-৪৮

১৯৫ "সিসুকালে মা বাপ না কৈল পালনে ॥ ১৫৯৬ ॥" — ১০।৪৫।৪

১৯৬ ডাক দিয়া আনি পুরোহিত···॥" ১৬০১-১৬০৩ — ১০।৪৫।২৬-২৯

১৯৭	"সাগরের জলে মৈল আমার কুমার···॥ ১৬১৫ ॥"	"মহার্ণবে মৃতং বালং" [১০।৪৫।৩৭]
১৯৮	গুরুর মৃতপুত্র আনয়নের আদেশে যমের ত্রাস ও কৃষ্ণ-সমীপে নিবেদন [২৬৩২-৩৪]	ভাগবতে নেই। তবে "গুরুপুত্র-মিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনং" [১০,৪৫।৪৫] উক্তিতে তার আভাস আছে।
১৯৯	"হাতে ধরি উদ্ধবেরে··· ॥ ১৬৪৪ ॥"	"গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং" [১০।৪৬।২]
২০০	"দিন অবসানে···॥ ১৬৫১ ॥"	"নিম্লোচতি বিভাবসৌ" [১০।৪৬।৮]
২০১	"তোমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে······তাহাতে তোমাব এত মজিয়াছে মন ॥" [১৬৫৭-১৬৫৮]	"যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ লোকে দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী" [১০।৪৬।৩০]
২০২	"প্রাতক্রিয়া করি ··॥ ১৬৬৫।"	"কৃতাহ্নিকঃ" [১০।৪৬।৪৯]
২০৩	"চরনে আসিয়া কেন পড়হ আমারে ॥ ১৬৭৩ ॥"	"মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং" [১০।৪৭ ১২]
২০৪	"সিতা লাগি সুপ্রনখার নাক কান কাটে ॥ ১৬৭৬ ॥"	"স্ত্রিয়মকৃতবিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাং" [১০।৪৭।১৭]
২০৫	বালীবধের উল্লেখ [১৬৭৮]	"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধেলুব্ধধর্মা" [১০।৪৭।১৭]
২০৬	ব্রজবধূপদে উদ্ধবের নতি [১৬৮৭-৯৪]	১০।৪৭।৫৮-৬১
২০৭	"বড় দুঃখ পায় কুন্তি কহিল বিদিত ॥ ১৭২৩ ॥"	ভাগবতে কুন্তী-বার্তা বিস্তারিত। [১০।৪৯।৭-১৪]
২০৮	"পালাহ ছাওাল··· ॥ ১৭৫৫ ॥"	"বালকেনৈব লজ্জয়া" [১০।৫০।১৭]
২০৯	বিজয়োৎসব [১৭৭২-১৭৭৬]	১০।৫০।৩৬-৪০
২১০	"তিন কোটি ম্লেচ্ছ···॥ ১৭৮৯ ॥"	"তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ [১০।৫০।৪৪]

[সমুদ্রসমীপে দুর্গগৃহ দ্বারকাপুরী নির্মাণ প্রসঙ্গে মালাধর সমুদ্রকে আহ্বান ইত্যাদি যে অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তা ভাগবতে অনুপস্থিত।]

২১১ "জন্মে জন্মে তোমার চরণ চিন্তিব ॥ ১৯০৪ ॥"
"ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো" [১০ ৫১।৫৬]

২১২ "জবনের ধন জন ॥ ১৯১০ ॥"
"নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুত-চোদিতৈঃ" [১০ ৫২ ৬]

২১৩ "অগ্নি দিয়া পোড়ায় গিরি… ॥ ১৮২৭ ॥"
"দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্" [১০ ৫২।১১]

২১৪ "সিংহের বনিতা আমি স্রগালে হবি লঞ ॥ ২০২৭ ॥"
"মা বীরভাগমভিমর্ষতু চৈদ্য আরাদ্গোমায়ুবন্মৃগপতে বলীমম্বুজাক্ষ" [১০।৫২।৩৯]

[ভাগবতীয় উপমা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কিছুটা পরিবর্তিত]
অর্থাৎ, সিংহের ভোগ্য যেন শৃগালে অপহরণ না করে [রুক্মিনীর পত্রে]।

২১৫ "স্বামি করি দেহ মোরে কমললোচনে ॥ ২০৬৩ ॥"
"ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাং" [১০।৫৩।৪৬]

২১৬ "বাম উরু নেত্র বাহু করিল স্ফন্দন… ॥ ২০৬৭ ॥"
"বাম উরু র্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্" [১০।৫৩।২৭]

২১৭ "পদে পদে ধ্বনি জেন রাজহংসি চলে ॥ ২০৭৫ ॥"
"পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং" [১০।৫৩।৫২]

২১৮ "প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ… ॥ ২১১১ ॥"
"হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ" [১০।৫৪।৩৩]

২১৯ "কাহার সকতি… দৈবের করণ। ॥ ২১১৭ ॥"
১০।৫৪।৩৮

২২০ "দ্বারে দ্বারে কলা… ॥ ২১২৩ ॥"
"রম্ভাপুগোপশোভিতা" [১০।৫৪ ৫৭]

২২১ "সূর্য হেন তেজ …কৃষ্ণের চরনে ॥ ২২৩৫ ॥"
১০ ৫৫।৪

২২২ প্রসেনের মৃত্যুতে কৃষ্ণের

মিথ্যা অপবাদ ও লোকগঞ্জনা নিবারণের উপায়নির্ধারণ। ২২৫৯-২২৮৬ — ১০।৫৬।১৬

২২৩ "দ্বাদস দিবস হৈল··· ॥ ২২৯৬ ॥" — ভাগবতে যুদ্ধদিবসের হিসাব বারো নয়, আটাশ, "আসীত্তদষ্টবিংশাহমিতরেতর মুষ্টিভিঃ" [১০।৫৬।২৪] তবে অনুচরবর্গ অপেক্ষা করেছিলেন বারোদিনই : "প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ" [১০।৫৬।৩৩]

[কৃষ্ণকে দ্বাদশ দিবসেও প্রত্যাবর্তন করতে না দেখে অনুচরবর্গের দ্বারকা প্রত্যাগমন ভাগবতে আছে। কিন্তু তাঁকে মৃত ভেবে দ্বারকাবাসী পিণ্ডদান করলো, এটি একান্তভাবেই ভাগবত-বহির্ভূত, মালাধরের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী।]

২২৪ "নাহি মরে পাণ্ডব ·· ॥ ২৩২০ ॥" — "বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্" [১০।৫৭।১]

২২৫ কৃষ্ণের কপট শোক। ২৩৯৯-২৪০১ — ১০।৫৭।২

২২৬ "সুনিঞা উদ্‌যোগ সতধন্না··· ॥ ২৪২১ ॥" — "সোঽপি কৃষ্ণোদ্যমং শ্রুত্বা" [১০।৫৭।১১]

২২৭ (ঘ) পুঁথির পাঠান্তর : "কৃষ্ণ দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর ॥" — "বিসৃজ্য পতিতং হয়ং পদ্ভ্যামধাবৎ" [১০।৫৭।২০]

২২৮ "স্ত্রি লাগিয়া···॥ ২৪৩৯ ॥" — ভাগবতে নেই। তবে একটি ক্ষীণ ইংগিত আছে :

[শ্রীকৃষ্ণবিজয় এ স্থলে উগ্র প্রাকৃত] — "মামগ্রজঃ সমাঙ্‌ন প্রত্যেতি" [১০।৫৭।৩৮]

২২৯ "এক গোটা পুষ্পমাত্র··· ॥ ২৭৭৪ ॥" পারিজাত-হরণ — শ্রীধরটীকা : "নারদানীত পারিজাতৈক কুসুমে রুক্মিণ্যৈ দত্তে সতি কুপিতাং সত্যভামাং সান্ত্বয়তা তুভ্যং পারিজাতমেব দাস্যামীতি শ্রীকৃষ্ণেন প্রতিশ্রুতমিতি হরিবংশে প্রসিদ্ধং।"

২৩০ "উত্তম অধমে নয় বিভার মিলন। আমি সে অধম তুমি উত্তম জন ॥ ২৮৪৩ ॥"	"ওয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ' [১০।৬০।১৫]
২৩১ "লক্ষ্মি বস্যে··· ॥ ২৮৬১ ॥"	"লক্ষ্ম্যালয়ং" [১০।৬০।৪২]
২৩২ "পস্থ হেন দেখিলাঙ্‌ সব রাজাগনে ॥ ২৮৬৫ ॥"	"খর-গো-শ্ব-বিডাল-ভৃত্যাঃ" [১০ ৬০।৪৪]
২৩৩ "সার্ত্তকীর সনে ··কার্ত্তিক সেনাপতি ॥ ৩০৮৭ ।"	১০।৬৩ ৬
২৩৪ "সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়এর তুমি সর্বেশ্বর ॥ ৩২৫৭ ॥"	"স্থিত্যুৎপত্ত্যপায়ানাং ত্বমেকো হেতু নিরাশ্রয়ঃ" ১০,৬৮।৪৫
২৩৫ বলরামের রাসলীলা ও দ্বিবিদ বানর বধ [৩২৭১-৩২৮৭]	ভাগবতে বলরামের রাসলীলা পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে এবং দ্বিবিদ বধ সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে বর্ণিত।

[মালাধর সুকৌশলে দুই পৃথক্‌ অধ্যায়ের বিস্তৃত বিষয়বস্তু একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত পয়ার গানে পরিবেষণ করেছেন]

২৩৬ "উঠন্তি পুরুসবর অগ্নির ভিতরে ॥ ৩৩১৭ ॥"	১০।৬৬ ৩২

[মালাধর ভাগবতের ষট্‌ষষ্টিতম ও অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় দুই একটি মাত্র পয়ার গানে পরিবেষণ করেছেন।]

২৩৭ "সঙ্গতি করিয়া নিল অষ্ট রমনি ॥ ৩৩৯১ ॥"	১০।৭১ ১৪
২৩৮ "নানা রার্য্য নানা নদি এড়িয়া গদাধর···॥ ৩৩৯৪ ॥"	"গিরিনদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্‌" [১০,৭১।২২]
২৩৯ "প্রতি ঘরে ···॥ ৩৩৯৬ ॥"	১০।৭১ ৩৪
২৪০ "ভ্রাত্রি পুত্র দেখি কুন্তি আনন্দিত মনে··· ॥৩৪০৩ ॥"	"পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্‌। প্রীতাত্মোত্থায় পর্য্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে" [১০,৭১,৪০]
২৪১ "···ধরিল দুইপায় ॥ ৩৫২৮ ॥	'একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ" [১০।৭২।৪৪]

২৪২ "সহদেবে গদাধর···দেহত মেলানি ॥" [৩৫৪৭] ১০।৭৩।৩১

২৪৩ "রথ দিয়া··· ॥ ৩৫৪৯ ॥" "রথান্ সদশ্বানারোপ্য" [১০।৭৩।২৮]

২৪৪ "জাতোর নির্ণয় নাহি··· ॥ ৩৬০১ ॥" "বর্ণাশ্রমকলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ" [১০।৭৪।৩৫]

[ভাগবতে সভামধ্যে শিশুপাল কৃষ্ণের পরদার-গমনের অপবাদ তোলেননি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কিন্তু তুলতে দেখি: "সিসুকাল হইতে হরে বান্ধবের নারি ॥ ৩৬০৩ ॥"]

২৪৫ কর্মার্পণ-প্রসঙ্গ [৩৫৭৮-৭৯] ১০।৭৫।৩-৭

[সাল্ববধের বিবরণ ভাগবতে অতিশয় বিস্তৃত, তুলনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বজ্রনাভ-বধ ভাগবত-বহির্ভূত। এ প্রসঙ্গে মালাধর কৌশলে রামায়ণ-কথা পরিবেষণের প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারেননি। রামচরিতের প্রতি তাঁর সানুরাগ আকর্ষণ বিশেষ লক্ষণীয়]

২৪৬ "বিভা করিয়াহ যারে সে নারি কেমন··· ॥ ৪৪৭৯ ॥" "সমারব্ধেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোঢ়া সদৃশী ন বা" [১০।৮০।২৮]

২৪৭ "কৃষ্ণ হাথে ধরি খুদ পেলিল ঝাড়িয়া··· ॥ ৪৪৯০ ॥" ১০।৮১।৮

২৪৮ "নন্দ ঘোস আদি জত বৈসে বৃন্দাবনে।
আইলাত সেই ঠাঞি গোপগোপিগনে ॥ ৪৫২৭ ॥" "নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্" [১০।৮২।১৪]

২৪৯ গোপাপ্রসঙ্গ ৪৫৪৪-৪৭ ১০।৮২।৪০-৪৯

২৫০ "···ক্ষমহ আমারে ॥ ৪৭৩৪ ॥" "অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো" [১০।৮৯।৯]

২৫১ "দ্বারে মরা পুত্র পেলি জাএ দ্বিজবর·· ॥ ৪৮০৪ ॥" "বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ" [১০।৮৯।২৩]

২৫২ "ধিক ধিক উগ্রসেন··· অনাচারে ॥ ৪৮৩৭ ॥" "ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ। ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ" [১০।৮৯।২৪]

[শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার বিপ্রের মৃতপুত্র আনয়ন প্রসঙ্গে দেবকীর মৃতপুত্র আনয়নের প্রসঙ্গ সুকৌশলে যুক্ত করেছেন। ভাগবতের ১০।৮৬ ও ১০।৮৯ অধ্যায় দুটি তিনি কৌশলে একত্র পরিবেষণ করেছেন]

২৫৩ "হেনকালে মুনিগণ…

॥ ৫১০৩ ॥"

২৫৪ "কুমার কুমারি কীবা ‥ ॥ ৫১১৪ ॥" তু' শ্রীধরটীকা : "কিং জনয়িষ্যতি কন্যাং বা পুত্রং বা" [১১।১।১৫]

২৫৫ "সমুদ্রে পেলিল ॥ ৫১৩১ ॥" "সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যা-বশেষিতম্" [১১।১।২১]

২৫৬ "মৎসেত গিলিল ‥ ॥ ৫১৩৩ ॥" "কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ" [১১।১।২২]

২৫৭ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ [৫১৪২-৫১৪৮] ১১।৭।১-১২

২৫৮ "তোমার মায়াএ ‥॥ ৫১৫৭ ॥" "সর্বে বিমোহিতধিয় স্তবমায়য়েমে" [১১.৭.১৭]

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতানুসরণের আরো বহু দৃষ্টান্ত থাকতে পারে। আমরা যৎসামান্য উদাহরণ উদ্ধার করে আমাদের বক্তব্যকে বিশদীভূত করেছি মাত্র।

মূলত ভাগবতানুসারী হয়েও মালাধর যে অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণাদির দ্বারা, বিশেষত ভগবদ্‌গীতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তারই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধবের বিশ্বরূপ-দর্শন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের "বিরাট্ রূপে"র বন্দনায় বিশ্বরূপ-দর্শন স্থান লাভ করেছে বহুস্থলেই। এমনকি ব্রজলীলায় বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের পরিক্রমাতেও যশোদা কর্তৃক শিশু-কৃষ্ণের বিজৃম্ভিত মুখগহ্বরে বিশ্বরূপদর্শনের বিস্ময় অপেক্ষিত। মালাধর ভাগবতের এইসব প্রাসঙ্গিক স্থলগুলি ছাড়াও যে ভগবদ্‌গীতার দশম অধ্যায়েরও ঋণ স্বীকার করেছেন, তারই প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে আর একটি তালিকা উদ্ধার করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। প্রসঙ্গত ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতও উদ্ধৃত হলো এই উদ্দেশ্যে যে গীতা-ভাগবত শাস্ত্রের কাছে মালাধরের ঋণ স্বীকারের আপেক্ষিক গুরুত্বটি সহজেই উপলব্ধ হবে :

ভগবদ্‌গীতা

১ কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১০।১৭ ॥

ভাগবত

১ যেষু যেষু চ ভূতেসু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ১১.১৬ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১ উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি।
কেমতে জানিব তোমা কহ শ্রীয়পতি ॥ ৫৩৪৩॥

[ভগবদ্গীতায় অর্জুন প্রশ্নকর্তা। ভাগবতে ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উদ্ধব। ভাগবতে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ ভাগবত-রূপে কথিত, যথা, "ত্বন্তু ভাগবতেষহং", ১১।১৬।২৯]

২ অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ১০।২০ ॥

২ অহমাত্মোদ্ধবামাষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥ ১১ ১৬।৯ ॥

২ আদি অন্ত মধ্য আমি মধ্যভাগ ॥ ৫৩৫৩ ॥

৩ "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ",
"জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌"
"মরীচির্মরুতামস্মি"
"নক্ষত্রাণামহং শশী", ১০।২১

৩ "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' ১১।১৬ ৩
"তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং"১১।১৬।১৭
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং" ১১।১৬।১৬

৩ ক. সর্বেশ্বরে বিষ্ণু
খ. তেজেস্মোত জন্মি আমি আদি
দণ্ডে কার ॥ ৫৩৫০ ॥
I (ভিন্ন পাঠ) তেজে যোর্দ্ধপতি
আমি আদিত্য আকার।

II তেজোরিতে আমি অক্ষরে
আকার।
"মরুতে পবন" ॥ ৫৩৫১ ॥
"তারাগনে চন্দ্র আমি" ॥ ৫৩৫৫ ॥

৪ বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ১০।২২ ॥

৪ "হিরণ্যগর্ভো বেদানাং" "ইন্দ্রোঽহং সর্বদেবানাং"
১১।১৬।১২ ১১।১৬।১৩

×

৪ "বেদ মাঝে সাম বেদ" ॥ ৫৩৫০ ॥
"দেব পুরন্দর" ॥ ৫৩৪৮ ॥
"ভূতগণ অহঙ্কার ইন্দ্রিএত মনে" ॥ ৫৩৪৭ ॥

৫ রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরু শিখরিণামহম্ ॥ ১০।২৩ ॥

"রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ" "ধনেশং যক্ষরক্ষসাং"
১১।১৬।১৩ ১১।১৬।১৬

"বসূনামস্মি হব্যবাট্" ১১।১৬।১৩ "ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ" ১১।১৬।২১

৫ "রুদ্রেতে সঙ্কর" ॥ ৫৩৪৮ ॥
(অন্য পুঁথির অতিরিক্ত পাঠে)
"যক্ষ রক্ষগণ আমি কুবের ধনেশ্বর"
"মেরু গিরিরাজে" ॥ ৫৩৪৯ ॥

৬ পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০।২৪ ॥

"পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যাম্" ১১।১৬।২২ "সমুদ্রঃ সরসামহং" ১১।১৬।২০

৬ "বুদ্ধে বৃহস্পতি" ॥ ৫৩৫৭ ॥

৭ মহর্ষীণাং ভৃগুরহংগিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥১০।২৫॥

৭ "মহর্ষীণাং ভৃগুরহং" ১১।১৬।১৪ "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" ১১।১৬।১২
"যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং" ১১।১৬।২৩

৭ "ঋসিমদ্ধে ভৃগু আমি" ॥৫৩৪৯ ॥

×

×

৮ অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ১০।২৬॥

৮ "বনস্পতীনামশ্বত্থঃ" ১১।১৬।২১ "দেবর্ষীণাং নারদোঽহং" ১১।১৬।১৪
"সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ" ১১।১৬।১৫

৮ "তরুতে অস্বত" ॥ ৫৩৫২ ॥
"দেবঋষি নারদ আমি" ॥ ৫৩৪৯ ॥

×

৯ উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥১০।২৭॥

৯ "উচ্চৈঃ শ্রবাস্তুরঙ্গাণাং" ১১।১৬।১৮ "ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং" ১১।১৬ ১৭
"মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং" ১১।১৬।১৭

৯ "অশ্বে উচ্চস্রবা আমি গজে ঐরাবতা" ॥ ৫৩৫২ ॥
"নরে নরেস্বর" ॥ ৫৩৫৪ ॥

১০ আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১০।২৮ ॥

১০ "আয়ুধানাং ধনুরহং" ১১।১৬।২০ "হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু" ১১।১৬।১৪
"সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ" ১১।১৬।১৮

১০ ×
"বাসুকীতে নাগ" ॥ ৫৩৫৩ ॥

১১ অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ১০।২৯ ॥

১১ "নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং" ১১।১৬।১৯ "পিতৄণামহমর্য্যমা" ১১।১৬।১৫
"যাদসাং বরুণং প্রভুং" ১১।১৬।১৭ "যমঃ সংযমতাঞ্চাহং" ১১।১৬।১৮

১১ "সর্পেতে অনন্ত" ॥ ৫৩৫৫ ॥

×

"পিতৃগনে অর্য্য আমি" ॥ ৫৩৫১ ॥

১২ প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ১০।৩০ ॥

১২ "দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্" "মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং"
১১।১৬।১৬ ১১।১৬।১৯

কালঃ কলয়তামহং" ১১।১৬।১০ "সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাং" ১১।১৬।১৫

১২ "প্রহ্লাদ দৈত্য মাঝে" ॥ ৫৩৪৯ ॥

"পশুমদ্ধে সিংহ আমি" ॥ ৫৩৪৮ ॥

"পক্ষেতে গরুড় আমি" ॥ ৫৩৫৩ ॥

১৩ পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ১০।৩১ ॥

১৩ ×

"তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা" ১১।১৬।২০

১৩ "রাম ধনুদ্ধর" ॥ ৫৩৫৪ ॥ "নদি মদ্ধে গঙ্গা আমি মৎসেতে মগর"
॥ ৫৩৫৪ ॥

১৪ সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ১০।৩২ ॥

১৪ ×

"বিদ্যামধ্যে বিদ্যা আমি" ॥ ৫৩৫২ ॥

১৫ বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ। ১০।৩৫।

১৫ "পদানি চ্ছন্দসামহং" ১১।১৬।১২ "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং"
১১।১৬।২৭

[পদানি ত্রিপদা গায়ত্র্যাত্যর্থঃ— 'ঋতূনাং মধুমাধবৌ' ১১।১৬।২৭
শ্রীধরটীকা]

১৫ ×

"রিতুতে বসন্ত" ॥ ৫৩৫৫ ॥

১৬ দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ১০।৩৬ ॥

১৬ "কিতবানাং ছলগ্রহঃ" ১১।১৬।৩১
"ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ" ১১।১৬।৩১
"ওজঃসহোবলবতাং" ১১।১৬।৩২ "সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং" ১৬।১৬।৩

১৬ ×

১৭ বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ১০।৩৭ ॥

১৭ "বাসুদেবো ভগবতাং" ১১।১৬।২৯ "কবীনাং কাব্য আত্মবান্" ১১।১৬।২৮
"বীরাণামহমর্জুনঃ" ১১।১৬।৩৫ [কবীনাং বিদুষাং কাব্যঃ
"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং ১১।১৬।২৮ শুক্রঃ—শ্রীধরটীকা]

১৭ ×

১৮ দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥১০।৩৮॥

১৮ "মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্" ১১।১৬।২৪
[মন্ত্রো নীতিঃ—শ্রীধরটীকা]
"গুহ্যানাং সূনৃতং মৌনং" ১১।১৬।২৬

১৮ ×

১৯ যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ১০।৩৯ ॥

১৯ "ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ" ॥ ১১।১৬ ৩৮ ॥

১৯ "আমা বিনু কিছু নাহি আমা হৈতে সব" ॥ ৫৩৫৬ ॥

২০ নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ১০।৪০ ॥

২০ "এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ" ১১।১৬।৪১

২০ "সংক্ষেপে কহিল আমি বিভূতি বিস্তার" ॥ ৫৩৪৬ ॥

২১ যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥ ১০।৪১ ॥

২১ "তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র সমেঽংশকঃ" ১১।১৬।৪১

২১ ×

২২ "কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা" ১০।৩৪

২২ ×

২২ "জসকীর্ত্তি বানি আমি লক্ষ্মি নারি মাঝে" ॥ ৫৩৫৮ ॥

একদিকে ভক্তিশাস্ত্ররূপে গীতা-ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তুলনা-প্রসঙ্গ যেমন অনিবার্য, অপরদিকে কাব্যহিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের সঙ্গে এর সাধর্ম্যের বিষয়টিও তেমনি অপরিহার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কালগত ব্যবধান সামান্য নয়। তথাপি কাব্য দুখানির কিছু কিছু আন্তর সাদৃশ্য কাব রসিক পাঠককে চমৎকৃত করবে। উভয় কাব্যের এই নিগূঢ় অন্বয়ের প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্য' প্রথমখণ্ডে যা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য :

"শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দুইই শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের রচনা। এইজন্য ইহাদের মধ্যে ভাবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যময়, দেবতাদিগের অধিপতি ত্রিদশ অধিকারী 'দেবরাজ'। তবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শুদ্ধ ভক্তিভাবের প্রাবল্য লক্ষণীয়। চণ্ডীদাস ছিলেন মূলতঃ কবিমাত্র, আর মালাধর বসু প্রকৃত পক্ষে ছিলেন ভক্ত, তাঁহার কবিত্ব আনুষঙ্গিক মাত্র।"[১]

"ভাবগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য" ছাড়াও উভয়কাব্যের ভাষাগত, বাক্যপ্রয়োগ-ও উপমা-ব্যবহারগত গভীর অন্বয়ও যে আছে, তার প্রতি সর্বপ্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুঁথির আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের পরিশিষ্টে। ডঃ সুকুমার সেনও পূর্বোক্ত গ্রন্থে দুটি কাব্যের বাক্য, বাক্যাংশ এবং শব্দ ও ধাতুর ঘনিষ্ঠ যোগটিকে উদ্ধার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তুলনাত্মক ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের ভাগবত-স্বীকারের বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারি। এক্ষেত্রে ডঃ সেনের সাবধান-বাণীটি স্মরণ রাখতে হবে—বড়ু চণ্ডীদাস মূলত কবি, মালাধর প্রকৃতপক্ষে ভক্ত। ভাগবত পুরাণ থেকে উভয়ের উপাদান সংগ্রহের মধ্যেও তাঁদের এই কবি ও ভক্তসত্তা সুচিহ্নিত হয়ে আছে। ভাগবতের ব্রজলীলা-মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলার ত্রিবেণীসংগমে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য সংস্থাপিত। পক্ষান্তরে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শুধুই ব্রজলীলার পরিক্রমা। ব্রজলীলার ক্ষেত্রেও ভাগবতের একমাত্র কালিয়দমনই সর্বাংশে এবং বস্ত্রহরণ-রাসলীলা-রাধাবিরহ অংশত গ্রহণ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। অন্যান্য লীলার মধ্যে শকটভঙ্গ পুতনাবধ রজ্জুবন্ধনলীলা গিরিগোবর্ধনধারণ, অসুরাদি বধ স্থানে স্থানে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে মাত্র।

---

১ 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩, ১ম সং

উপরন্তু দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভাগবত-বহির্ভূত রাধাকৃষ্ণ লীলাপর্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রায় সবটুকু পরিসর অধিকার করে আছে। তবে বিশুদ্ধ কাব্য বলেই বোধকরি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রজগোপীদের প্রতি ভাগবতীয় মধুর-কোমল প্রবণতা শুধু রক্ষিতই নয়, বহুগুণ বর্ধিত। ভাগবতে প্রধানা গোপী রাধা-নামে স্পষ্টত চিহ্নিতা নন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার রাধা-নাম পেয়েছেন জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য থেকে। তদুপরি ব্রহ্মবৈবর্তের অনুসরণে তিনি রাধাকে আবার লক্ষ্মীস্বরূপা তথা কৃষ্ণের স্বকীয়াও করেছেন। অপরদিকে মালাধরের কাব্যে জয়দেবের প্রভাব কোথাও নেই। আর ভাগবতই তাঁর শেষ অধিষ্ঠানভূমি। মহাভারত থেকে সুভদ্রাহরণ, বিষ্ণুপুরাণ থেকে বজ্রনাভ কাহিনী, হরিবংশ থেকে পারিজাত-হরণ এবং ভগবদ্গীতা থেকে বিশ্বরূপ-দর্শনের উপাদান সংগ্রহ করে তিনিও অবশ্য কিছুটা কবিভৃঙ্গের সঞ্চয়ন-স্বীকরণ প্রতিভার সর্তপূরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের ভিত্তিমূল থেকে সৌধচূড়া পর্যন্ত একান্তভাবেই ভাগবতীয় ভাবনা-ধৃত। এক্ষেত্রে ভাগবতের মতো তিনিও রাধানাম সম্বন্ধে নীরব, আবার ভাগবতের মতোই কৃষ্ণ-পরতত্ত্ববাদের প্রবল প্রতিষ্ঠাতা। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ভাগবতের এই কৃষ্ণ-ভগবত্তা ঘোষণা গীতগোবিন্দের "দশাকৃতিকৃতে তুভ্যং নমঃ" বন্দনাবাক্যে অকুণ্ঠস্বীকৃত হয়েও বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে কখনো অংশ, কখনো পূর্ণাবতার-বোধের সংশয়ে দোলায়িত। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সেই দোলাচলবৃত্তিকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে বাঙালী বৈষ্ণব-ভক্ত মাতৃভাষায় এই প্রথম দ্বিধাহীন উচ্চকণ্ঠে বললেন: "কৃষ্ণ রূপে পুর্ন্ন প্রভু আপনে শ্রীহরি ॥৩৭॥"

বড়ু চণ্ডীদাসের জয়দেব-ভাবিত রাধাবাদের সঙ্গে মালাধরের ভাগবত-ভাবিত এই কৃষ্ণতত্ত্ব যুক্ত হয়ে চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের সম্মুখে একটি পূর্ণতার আদর্শ স্থাপন করেছে। বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে এই পূর্ণতারই বিগ্রহ 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভাগবতীয়-জয়দেবীয় সকল মধুরলীলার তাঁতেই পর্যবসান, বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাবিরহ কিংবা মালাধরের 'পূর্ণভগবান্' কৃষ্ণের চরিতামৃত তাঁতেই আস্বাদিত, মাধবেন্দ্রপুরীর "মেঘদরশন মাত্রে অচেতন" হওয়ার সকল প্রৌঢ় কৃষ্ণ-প্রেমানুভাবও সেই মূল ভক্তিকল্পতরু-উদ্গমেরই প্রথম অংকুর। অর্থাৎ এককথায়, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের সমূহ সাধনা শুধু চৈতন্যাবির্ভাবেরই মহতী প্রস্তুতি ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য

ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য

চৈতন্যাবতার ভাগবতানুমোদিত বলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন নির্বিশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে বোধ করি 'শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী'র রঘুনাথ ভাগবতাচার্যই পথিকৃৎ প্রবক্তা। তিনিই সর্বপ্রথম ভাগবত থেকে চৈতন্যাবির্ভাবের প্রমাণ উদ্ধার করেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যুগাবতার-কথন-প্রস্তাবে করভাজন ঋষি কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"[১]

ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামী এ-শ্লোকের সাধারণ তাৎপর্যই উদ্ধার করেছেন। তাঁর টীকানুসারে শ্লোকার্থ এইমাত্র,—কলিযুগে বিবেকী ব্যক্তিগণ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট এবং কৌস্তুভাদি আভরণ, সুদর্শনাদি অস্ত্র শস্ত্র ও সুনন্দাদি পার্ষদগণে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন। এই আরাধনার প্রধান অঙ্গই সংকীর্তন।

উল্লেখযোগ্য, 'ত্বিষাকৃষ্ণ' শব্দের তিনি দ্বিবিধ অর্থ করেছেন। প্রথমত, সন্ধিবদ্ধভাবে : ত্বিষা + অকৃষ্ণ, এতদর্থে 'ত্বিষা' বা কান্তিতে 'অকৃষ্ণ'। 'অকৃষ্ণ' কেমন? "অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্"। ইন্দ্রনীলমণি-বর্ণ নয়, ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল বর্ণ। "যদ্বা" অথবা বলে তিনি "ত্বিষাকৃষ্ণ" কে সন্ধিহীনভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন : ত্বিষা + কৃষ্ণ, এতদর্থে কান্তিতে "কৃষ্ণ"। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা কলিযুগাবতারের বর্ণ সম্বন্ধে শ্রীধরের দ্বিধাহীন স্পষ্টোক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তাঁর পরবর্তী মন্তব্য গূঢ়বহ, "অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি"। অর্থাৎ, এর দ্বারা কলিতে কৃষ্ণাবতারের প্রাধান্যই প্রদর্শিত।

লক্ষণীয়, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকার্থ বিশ্লেষণে শ্রীধরস্বামীর ভূমিকা মুখ্যত টীকাকারেরই। পক্ষান্তরে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতারই ভূমিকা গ্রহণ করে বলছেন :

১ ভা° ১১।৫।৩২

"'কৃষ্ণ'-পদে—'কৃষ্ণ' বলি, 'বর্ণ'-পদে—নাম।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম—জানিব বিধান ॥
'ত্বিষাকৃষ্ণ'—অকৃষ্ণ 'গৌরাঙ্গ' নিজ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র পারিষদ-সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্তন রঙ্গে ॥
যুগধর্ম সংকীর্তন-যজ্ঞ লক্ষ্য করি।
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজএ শ্রীহরি ॥
কৃষ্ণ অবতার যদি বলি কলিযুগে।
তবে পূবাপর-গ্রন্থে বিরোধ না ভাঙ্গে ॥
তে-কারণে বুধজনে মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্বাপর করিয়া বিচার ॥"[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, চৈতন্যের কৃষ্ণাবতারত্ব এখানেই প্রত্যয়ের প্রাথমিক ভিত্তিভূমি লাভ করেছে বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামীর মনীষায় এ-প্রত্যয়ই দৃঢ়তর শাস্ত্র-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত!

শ্রীচৈতন্যকে কলিযুগের পরমোপাস্যরূপে নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীজীব ভাগবতের অবতার-কথন-প্রস্তাব সম্বন্ধীয় দুটি শ্লোকের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। একটি গর্গকথিত "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য"[২], অন্যটি করভাজন-উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"[৩]। প্রথমটিতে পীতবর্ণ অবতার ব্যঞ্জনায় কলিযুগাবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন বলে শ্রীজীবের বিশ্বাস, আর দ্বিতীয়টিতে সেই উপাস্যেরই লক্ষণাদি তথা উপাসনাবিধি নির্দেশিত বলে তাঁর সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় শ্লোকের বিভিন্ন পদের শ্লিষ্টার্থ বিশ্লেষণে শ্রীজীব গোস্বামীর রসজ্ঞতা ও মনীষার মণিকাঞ্চন যোগ লক্ষ্য করি। মোটামুটিভাবে তাঁর মতে, "কৃষ্ণবর্ণং" শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে যাঁর পূর্ণ নামটির মধ্যে "কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় আছে, সেই কৃষ্ণবর্ণ-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অপরার্থে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করেন এবং সকল জীবের প্রতি কৃপাবশত কৃষ্ণবিষয়ক উপদেশ দেন, তিনিও সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই![৪]

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ১১।৫।৭১-৭৬
২ ভা° ১০।৮।১৩
৩ ভা° ১১।৫।৩২
৪ " 'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র, যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবনাম্নি শ্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি

"ত্বিষাকৃষ্ণ" পদের অর্থও একাধিক ব্যাখ্যায় বিশদীভূত। যিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ', অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ ক'রে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন এবং যাঁকে দর্শন করলে অন্তরে কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, অথবা যিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'অকৃষ্ণ', অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত, কিন্তু ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে প্রতীত—সমূহ অর্থেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ।[১]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তার অন্যতম প্রমাণরূপে শ্রীজীব "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্" পদেরও গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে গৌড়-বরেন্দ্র-সুহ্ম-বঙ্গ-উৎকলাদি দেশীয় মহাপ্রসিদ্ধ চৈতন্যপারিষদ-বর্গই এখানে উদ্দিষ্ট। তাঁদের 'যজ্ঞ' সংকীর্তন, 'যাজন' কৃষ্ণনামগানের সুখাস্বাদন।[২]

লক্ষ্য করার বিষয়, রঘুনাথ যখন চৈতন্যকে মাত্র কৃষ্ণাবতার বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন, শ্রীজীব তখন চৈতন্যের স্বয়ং-ভগবত্তাই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সর্বসংবাদিনী টীকার প্রারম্ভ প্রস্তাবেই তাই তাঁর নিবেদন,

বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা কোটি কোটি মহাভাগবত যাঁর ভগবত্তা বিনিশ্চয় করেছেন এবং ভগবত্তাই যাঁর নিজস্বরূপ, যাঁর পাদপদ্মের আশ্রয়ে নিজাবতার প্রকটনে দুর্লভ প্রেমামৃতময় সহস্র জাহ্নবীধারা প্রবাহিত হয়েছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধেয় শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবের উপাস্য বলে নির্ণয় করছেন।[৩]

বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীতার্থ ...যদ্বা কৃষ্ণং বর্ণযতি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি : পরম-কারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্।" সর্বসংবাদিনী, তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা।

১ "স্বয়মকৃষ্ণং 'গৌরং' ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব 'কৃষ্ণবর্ণং' কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা,—সর্বলোক-দৃষ্ট্যাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্ট্যা 'ত্বিষা' প্রকাশ-বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তস্মিন্ সবর্ণা স্বরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইতি ভাবঃ।" তত্রৈব

২ "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং"—বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথাদৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গ-সুহ্মোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ...'সংকীর্তনং' বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ" ইত্যাদি, সর্বসংবাদিনী, তত্ত্ব

৩ "মহাভাগবত-কোটি-বহিরন্তর্দৃষ্টি-নিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-দুর্লভ-প্রেম-পীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্বসংপ্রদায়সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

শ্রীজীবের মতে, "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর"ই তাঁর স্বরূপ। এ বিষয়ে তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে উদ্‌গীত নমস্কারবাক্যটি মনে পড়বে :

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

তাৎপর্য, অন্তরে যিনি কৃষ্ণ বাহিরে গৌর, আর স্বীয় 'অঙ্গ' বা পার্ষদাদির বৈভব যিনি জনসমাজে প্রকটিত করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সংকীর্তনেই আরাধনা করি।

এ-শ্লোকে কলির পরমোপাস্যবন্দনায় রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-বিগ্রহের যে-প্রচ্ছন্ন ইংগিত আছে, বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে তাও ভাগবতানুমোদিত। ভাগবতে প্রহ্লাদ ইষ্টদেব-স্তুতিতে বলেছিলেন : "ছন্নঃ কলৌ যদ্‌ভবস্ত্রি-যুগোঽথ স ত্বাম্"[১]। অর্থাৎ, হে প্রভু, কলিযুগে আপনি "ছন্ন" অবতার বলে আপনাকে "ত্রিযুগ" বলা হয়।

"ছন্ন" শব্দের সাধারণ অর্থ আচ্ছন্ন। চৈতন্যাবতার-পক্ষে এই ছন্নত্ব আর কিছুই নয়, "কাঞ্চন-পঞ্চালিকা"য় ঢাকা "শ্যাম-গোপরূপ"। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে চৈতন্য তাই 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'। ভাষান্তরে, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"। কৃষ্ণস্বরূপে তিনি নরবপুধারী, নরলীল, নরাভিমান পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্। রাধাস্বরূপে পরমাপ্রকৃতি মাদনাখ্য-মহাভাববতী স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী। দ্বাপরে অনাস্বাদিত অতৃপ্ত রাধাপ্রেম-বাসনারই তিনটি লোভবশত কলিতে তিনি "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ" সেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত-বিগ্রহে "নটবর গৌরকিশোর" রূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত, "সুরধুনী-তীরে উজোর"।

স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে কৃষ্ণের উল্লিখিত তিনটি লোভ হলো যথাক্রমে স্বমাধুর্য আস্বাদন, কৃষ্ণের স্বমাধুর্য আস্বাদনে রাধার যে-সুখ তারই অনুভব এবং "রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা" উপলব্ধি।[২] গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, এই তিনটি হেতু পড়ছে চৈতন্যাবির্ভাবের অন্তরঙ্গপক্ষে।

দেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থ-বিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তৌতি" সর্বসংবাদিনী, তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

১ ভা° ৭।৯।৩৮

২ "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

ভাষান্তরে এরা চৈতন্যের আবির্ভাবের আন্তসম্বন্ধি কারণও বটে। এখন দেখা যাক, এই আন্তসম্বন্ধি কারণের কোনো ভাগবতানুমোদিত ভিত্তি পাওয়া যায় কিনা। সর্বাগ্রে প্রথম লোভটির প্রসঙ্গই উত্থাপিত হতে পারে। কৃষ্ণের স্বমাধুর্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিস্ময়ের দৃষ্টান্ত তো ভাগবতেই মেলে। উদ্ধবের সেই অনিন্দ্য ভাষণ মনে পড়ছে :

"যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥"[১]

অর্থাৎ, মর্ত্যলীলার উপযোগী, এমনকি নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদনকারী, সৌন্দর্য-সম্পদের পরমাশ্রয়-স্বরূপ সেই যে তাঁর দেহ যে-দেহে অলংকার অঙ্গের নয়, অঙ্গই অলংকারের ভূষণ, সেই অপরূপ দেহ তাঁর যোগমায়ার পূর্ণক্ষমতা প্রদর্শনের জন্যই পরিগৃহীত।

বলা বাহুল্য, "বিস্মাপনং স্বস্য চ" অংশটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ-অংশের বড়ো সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ :

"আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন ॥"[২]

বস্তুত, নিজেরও বিস্ময়জনক নিজের সেই অতুল রূপমাধুরী আস্বাদানের জন্য কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের নিতান্ত কল্পনাবিলাস মাত্র মনে করার কারণ আর থাকে না। "বিস্মাপনং স্বস্য চ" বলে ভাগবতেই তার সূক্ষ্ম ইংগিত রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণের স্বমাধুর্য আস্বাদনে রাধার যে-সুখ তারই অনুভব। এর বীজও বোধকরি ভাগবতে একেবারে পাওয়া যাবে না, এমন নয়। তবে ভাগবতে কোথাও রাধানাম উচ্চারিত নয়। রসিকজন সেখানে প্রধানা

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

তাৎপর্য, শ্রীরাধার প্রেমমাহাত্ম্য কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ এবং আমার সেই মাধুর্য আস্বাদনে রাধার সুখই বা কিরূপ, এই লোভে রাধাভাবাঢ্য কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন।

১ ভা° ৩।২।১২

২ চৈ. চ. মধ্য। ৮. ১১৪

গোপীকেই রাধারূপে চিহ্নিতা করেছেন। তারই আলোকে স্বরূপ দামোদর কথিত কৃষ্ণের দ্বিতীয় লোভটির ভাগবত-সম্মত ভিত্তি অনুসন্ধান করতে হবে।

উদ্ধব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণদর্শনে ত্রিভুবনবাসীর অপূর্ব মুগ্ধতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছিলেন, যজ্ঞস্থ ত্রিলোকবাসীর মনে হলো, মনুষ্যসৃষ্টি বিষয়ে বিধাতার সমুদয় কলাকৌশল সম্প্রতি এই কৃষ্ণকলেবরেই সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়ে গেছে: "কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতুরর্বাক্ সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত"[১]। 'এহো বাহ্য।' কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনে গোপীর সুখসীমা সর্বাতিশয়া। পরিশেষে উদ্ধব তাই তাঁর পরমবন্দিতা গোপীদের কৃষ্ণদর্শন সুখের সর্বোত্তম অমৃত বিতরণ করে বলছেন:

> "যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
> ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥"[২]

অর্থাৎ কৃষ্ণেরই সানুরাগ হাস্য এবং বিলাসপূর্ণ কটাক্ষে প্রতিলব্ধমানা গোপীরা নিজ নিজ দৃষ্টিপথে একমাত্র তারই অনুগমন করতেন, অসমাপ্ত কর্তব্য তাঁদের পড়েই থাকতো।

কৃষ্ণ-মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ-আস্বাদিকা এই ব্রজগোপীকূলেও আবার সর্বোপরি ছিলেন প্রধানা গোপী। রাসে তাঁর প্রেম-দৌরাত্ম্যে যেমন বিস্মিতা অন্যান্যা গোপীরা, বিরহে তেমান তাঁর উৎকণ্ঠা-অসূয়া-আত্মনিবেদনের গভীরতা ও ঐকান্তিকতায় বিস্মিত উদ্ধব। ভ্রমরগীতার সারিকা নিঃসন্দেহে কৃষ্ণমাধুর্যের সর্বোত্তমা স্বাদিকা। স্বাধীনভর্তৃকা রূপেও যেমন, প্রোষিতভর্তৃকা রূপেও দয়িতের দেওয়া দুঃখের অভিমর্ষণেও তেমনি তিনি তুলনারহিতা। কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনে তাঁর যে কী সুখ, তা অনুভবের বাসনা এমনকি রসিকোত্তম কৃষ্ণের পক্ষেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর প্রধানা গোপীর কৃষ্ণমাধুর্য-আস্বাদনের যে অনুভব রসজ্ঞেরা তাকে অনির্বচনীয়ই বলে থাকেন। তা অবিমিশ্র সুখ বা নিছক দুঃখেও নয়—"বিষামৃতে একত্র মিলন" বলে হয়তো সেই প্রেমরসসীমাকে খানিকটা বিশদীভূত

১ ভা° ৩।২।১৩
২ ভা° ৩।২।১৪

করা যায়। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় উল্লিখিত এই চরমতম লোভটির বশে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমের "তপ্ত-ইক্ষুচর্বণে"র অনুভবসীমা রাধারূপে উপলব্ধির জন্য ত্বিষাকৃষ্ণের অকৃষ্ণরূপে গৌরবিগ্রহে আবির্ভাব যদি যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে কবিকল্পনা মাত্র বলেও প্রতিভাত হয়, তবে তার মূল ভিত্তি যে ভাগবত, তা তাঁকে স্বীকার করতেই হবে। বিরহের পদে বিদ্যাপতিও বলেছিলেন :

"কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥" [১]

চৈতন্যাবতার যেন এই অপূর্ব কবিবাসনারই জীবন্ত ভাষ্য। আমরা তো জানি, তত্ত্বসমূহের পরস্পর অনুপ্রবেশ ভাগবত-স্বীকৃত। "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ"[২] শ্লোকে তারই সমর্থন আছে। তত্ত্বের এই পরস্পরানুপ্রবেশকে বিষ্ণুপুরাণে আবার "অনন্ত অচিন্ত্য" বলে অভিহিত করা হয়েছে। "তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্ত" গৌরাবতারে রাধাকৃষ্ণের ঐক্যপ্রাপ্তি তত্ত্বসমূহের এই অনন্ত অচিন্ত্য পরস্পরানুপ্রবেশকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—শ্রুতি-সুখ্যাত এই রূপকল্পে দেখি পিপ্পল বৃক্ষে দুই পক্ষীর বাস, একজন স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করছে অন্যজন তাই দর্শন করছে। এখানে জীব-ব্রহ্মের দ্বৈতলীলা। আর রাধাকৃষ্ণ-পক্ষে উভয়ত অসীমের কোটিতে দাঁড়িয়ে একই গৌরাঙ্গ দেহে পরমপুরুষ ও তাঁর পরমাপ্রকৃতি হ্লাদিনীর যেন সেই একই লীলাবিলাস। কৃষ্ণপ্রেমের "তপ্তইক্ষুচর্বণ" করে রাধার "রহত কি যাত পরাণ", ভাগবতের ভাষায় "ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন"—আর অপরপক্ষে "কৈছে হৃদয় করি" তাই দেখছেন কৃষ্ণ। একই লীলাতনুকে আশ্রয় করে চলেছে এই স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ ও দর্শনের নিত্য দ্বৈতলীলা। এখানে বলা দরকার, আমাদের ব্যবহৃত রূপকল্পে রাধাকৃষ্ণের যেটুকু বহিরঙ্গভেদ আছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের ধারণায় সেটুকুও অপসৃত। তাই দেখি, রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে স্থায়িভাব-প্রকরণে "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী"[৩] ইত্যাদি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের যুগল-চিত্তকে দুইখণ্ড লাক্ষার সঙ্গে তুলনা করে

১ মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী', পৃ° ৪৬৫
২ ভা° ১১।২২।৭
৩ উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণ, ১১০

বলেছেন, লাক্ষা খণ্ড দুটিকে যেমন আগুনে গালিয়ে এমনভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায় যে, তারা পূর্বে যে দুই খণ্ড ছিল, তা বোঝাই যায় না, সাত্ত্বিক-ভাবে পরমপ্রেমে রাধাকৃষ্ণের চিত্তও এমনভাবে একীভূত হয়ে ওঠে যে তার পৃথক্ অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

বস্তুত, রায় রামানন্দের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" গীতটির "পেষল" ক্রিয়াপদের যথার্থ তাৎপর্যও এই "চিত্তজতুনী"র আলোকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"

গীতের এ-অংশ শ্রবণে চৈতন্যের কী অপূর্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে বলা হয়েছে "প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাপধত্ত।"[১] অর্থাৎ, প্রভুও করপদ্মে রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করলেন। চৈতন্যের এই অভাবনীয় ব্যবহারের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্বভৌম বলেছিলেন, নিরুপাধি প্রেম কথঞ্চিৎ উপাধিও সহ্য করে না।[২] এক কথায় "সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়"। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিভাষায় প্রেমের এই শেষ-সীমারই নাম 'বিলাসবৈবর্ত'। ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি, কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীরা নিজেদের কৃষ্ণ মনে করে তাঁর গোবর্ধনলীলাদির অনুকরণ করেছিলেন। জয়দেবেও কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ পরিধান করে নিজেকে কৃষ্ণ ভাবছিলেন, "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা"। বিদ্যাপতির রাধাও তাই, "অনুখন মাধব মাধব সোঙরই সুন্দরী ভেলি মধাই"। কিন্তু এই সকলস্থলেই বিলাসবৈবর্ত নায়িকার মনে কচিৎ কচিৎ উদ্দীপিত ভাবমাত্র। আর চৈতন্যাবতারে বিলাসবৈবর্তই মুখ্যস্বরূপ। এখানেই চৈতন্যাবতারের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য নিহিত। রসিকচিত্তের অনুক্ষণ অন্বেষণে গৌরাঙ্গাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতুর কিছুটা ভাগবতানুমোদিত ভিত্তি অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু স্বয়ং চৈতন্যাবতারের এই মূলীভূত-স্বরূপ তথা তাঁর বিলাসবৈবর্ত-রূপ ভাগবতেও দুর্লভ। পদকর্তা গোবিন্দদাস "নটবর গৌর কিশোর"কে বলেছিলেন "অভিনব হেম কল্পতরু"। এখানে "হেম কল্পতরু"র ইংগিত তো স্পষ্ট। কিন্তু "গৌর কিশোর" কেন যে "অভিনব"

---

১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৭।১৬

২ "নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহত ইতি" তত্রৈব

তার সার্থক ব্যাখ্যা মেলে চৈতন্যের উক্ত ভাগবত-দুর্লভ মূলীভূত স্বরূপে, তাঁর বিলাসবৈবর্ত রূপ-পরিগ্রহে।

চৈতন্যের অন্তরঙ্গ আবির্ভাব হেতুর মতো তাঁর বহিরঙ্গ আবির্ভাব হেতু বা জগৎসম্বন্ধি কারণটিও মূলত ভাগবতানুমোদিত হয়েও শেষ পর্যন্ত অভিনবত্বে ভাগবতাতিশায়ী হয়ে উঠেছে। আমরা তো পূর্বেই দেখেছি, ভাগবত অনুসারে, কলির যিনি উপাস্য, তিনি সংকীর্তন-রূপ যজ্ঞ প্রচার করবেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে এই ঋষিবাক্য যে সার্থকতম অভিব্যক্তি লাভ করেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বাসু ঘোষের ভাষায়:

"কলিযুগে কীর্তন করিলা সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরাগুণে মাতিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ এ বেদ বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥"[১]

কলিযুগে কীর্তনই ভবাম্বুধি পারের সেতুবন্ধ। পদকর্তার মতে, কলিযুগাবতার চৈতন্যের গুণে সে-সেতুপথেই সুখে পার হয়ে গেছে নারী-পুরুষ পঙ্গু-জড়-অন্ধ। কিন্তু সংকীর্তন তো যুগধর্ম মাত্র। আর "যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে"। শ্রীচৈতন্য যদি কৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণাবতার হন, তবে তাঁর দ্বারা সংকীর্তন যজ্ঞরূপ একমাত্র যুগধর্মই প্রবর্তিত হবে কি করে। অতএব বলতে হয়, তাঁর আবির্ভাবের বহিরঙ্গ হেতুটিরও নিশ্চয়ই গূঢ়তর তাৎপর্য আছে। সেই তাৎপর্যটিই রূপ গোস্বামীর একটি বিখ্যাত চৈতন্য-বন্দনাবাক্যে সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। শ্লোকটি নিম্নরূপ:

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"[২]

অর্থাৎ, চির-অনর্পিত উন্নত-উজ্জ্বল রসময় নিজ ভক্তিসম্পদ সমর্পণের জন্য

১ দ্র° মালবিকা চাকী সম্পাদিত ব° সা° প° প্রকাশিত 'বাসু ঘোষের পদাবলী', পদ ১৫৭
২ বিদগ্ধমাধব, দ্বিতীয় নান্দীবাক্য

যিনি কৃপাবশত কলিতে অবতীর্ণ, সেই কাঞ্চনকান্তি শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোন।

প্রশ্ন উঠবে, "স্বভক্তিশ্রী"কে এখানে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" বলা হলো কেন? "চিরাৎ" বলতে সুদীর্ঘকালও বোঝায়। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে, দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণ নিজভক্তি-সম্পদ দানের পর সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে কলিতে চৈতন্য আবার এতদিন অনর্পিত সেই স্বভক্তিশ্রী বিতরণের জন্য আবির্ভূত। "চিরাৎ" পদের নিত্যকালার্থেও ব্যবহার হতে পারে। সেক্ষেত্রে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ইত্যাদি অংশের অর্থ হবে, কোনোদিনই কোনো অবতারে যা অর্পিত হয়নি, সেই স্বভক্তিশ্রী প্রদানের জন্যই শচীনন্দনের আবির্ভাব। তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণাবির্ভাবের জগৎসম্বন্ধি কারণ সম্বন্ধেও যে অনুরূপ প্রেমভক্তি প্রচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়,[১] তার সমাধান কি? সমাধান "উন্নতোজ্জ্বলরসাং" পদটির মধ্যে আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত 'উজ্জ্বল রস' শব্দ-প্রয়োগই এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। এর দ্বারা রূপ গোস্বামী বোধ করি এই বোঝাতে চেয়েছেন, দ্বাপরে কৃষ্ণাবির্ভাবে যা ছিল 'প্রেমভক্তি', কলিতে চৈতন্যাবির্ভাবে তাই হয়েছে 'উন্নত উজ্জ্বল রস'। অর্থাৎ, ভাগবতের 'কৃষ্ণরতি'ই চৈতন্যলীলায় হয়েছে 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' রস, তবে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণাস্বাদ স্বরূপ উজ্জ্বল রস। প্রেমের এই সাধারণীকৃতিই চৈতন্যাবতারের জগৎসম্বন্ধি কারণের শেষ কথা। প্রবোধানন্দের ভাষায়: "গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ"[২]। কৃষ্ণ-প্রেমকে ভক্তিরসরূপে নিজে আস্বাদন করে জনে জনে বিতরণ শচীনন্দনের অসাধারণ অনর্পিত-চরিত, সন্দেহ নেই। "করুণয়াবতীর্ণঃ" এই চৈতন্যা-বতারের জগৎসম্বন্ধি কারণের পূর্ণ-তাৎপর্য উপলব্ধিতে শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনদাসের চতুষ্কই স্মরণযোগ্য:

১ "যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু দুই ইচ্ছার উদ্গম॥"

চৈ. চ. আদি। ১৪, ১৩-১৫

২ চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০। ১১৬

"এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি।
কীর্তন করিয়া সর্বশক্তি পরচারি।
সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি-পরচার॥"[১]

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত "ভাগবত-রূপ" শব্দটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। চৈতন্যজীবনীকার যখন বলেন, "গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার"[২] তখন ভাগবতই হয়ে দাঁড়ায় স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ, কোথাও-বা কৃষ্ণের প্রতিনিধি-স্থানীয়। আবার যখন শুনি, "আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র"[৩] তখন ভক্তই ধরেন ভাগবত-রূপ। এই উভয়বিধ অর্থেই ভাগবত-রূপ চৈতন্যের প্রকটলীলায় কতটা আভাসিত হয়েছে, যুগপৎ ঈশরূপে এবং ভক্ত-রূপে বিলসিত চৈতন্যলীলায় ভাগবতের সিদ্ধি ও সাধনাই-বা হয়েছে কতটা প্রতিফলিত, এখানে তা বিচার করে দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক হবেনা।

ঈশরূপে শ্রীচৈতন্য স্ব-সম্প্রদায়ে স্বয়ং ভাগবতপুরুষ। ভাগবত যেমন কৃষ্ণকে 'সূর্যাত্মা হরি' বলেছে আবার বলেছে ইন্দ্রারি-দমনকারী তথা 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'ভগবান্', তেমনি সনাতন গোস্বামীও চৈতন্যকে বলেছেন যতিবেশধারী হরি[৪], রূপ গোস্বামী বলেছেন ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা তথা উপনিষদের লক্ষ্যস্বরূপ[৫]। জীব গোস্বামীর বক্তব্য তো পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সর্বাদি-চৈতন্যজীবনীকার মুরারির বক্তব্য উপস্থিত করার অবকাশ আছে। মুরারি তাঁর কড়চায় শ্রীচৈতন্যকে "অজ পুরাতনং চতুর্ভুজং"[৬] শ্লোকে হরিরূপে প্রণতি জানিয়েছেন। চৈতন্যকে এই ভাগবত-পুরুষ রূপে অনুধ্যানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ স্পষ্টত দুটি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি বৈষ্ণব সাহিত্যে। একটি হলো, ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যের পরিকল্পনা; অপরটি রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর মতোই গৌর-পদাবলীর বিপুল প্রবাহ সৃষ্টি।

কৃষ্ণলীলার অনুষঙ্গে চৈতন্যলীলা বর্ণনার আগ্রহ মুরারি গুপ্তেই সর্বাগ্রে

১ চৈ. ভা. আদি। ২, ১৭৪-৭৫
২ চৈ. ভা. মধ্য। ২১, ১৪
৩ চৈ. চ. আদি। ১, ৫৭
৪ "হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ", বৃহদ্ভাগবতামৃত, ১।১।৩
৫ "সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং", স্তবমালা, প্রথমাষ্টক, ২
৬ কড়চা, ১।১।১৪

লক্ষ্য করি। মথুরার কংসকারাগারে দেবগণ-কর্তৃক দেবকীর গর্ভবন্দনা থেকে শুরু করে বংশীবাদনাদি কৃষ্ণের বহুতর লীলার অনুসরণে তিনি গৌরাঙ্গের প্রকটলীলা গান করেছেন। 'ভাগবত ও চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য' অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে এ-বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করবো। আপাতত এইমাত্র বলে রাখা প্রয়োজন, কৃষ্ণলীলা-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে মুরারি চৈতন্যলীলা বর্ণনার যে-ধারা সৃষ্টি করে গেলেন, পরবর্তী চৈতন্যচরিতসাহিত্যে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

শ্রীচৈতন্য "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" এ-তথ্য তত্ত্বরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে লিপিবদ্ধ হওয়ার বহুপূর্ব থেকেই তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে নবদ্বীপ-নীলাচলের পরিকর মধ্যে স্বীকৃত হয়ে আসছিলেন। এরই প্রমাণ মেলে নবদ্বীপ ও নীলাচললীলার সাক্ষী কবি-পারিষদদের পদাবলী-প্রবাহে। বলে রাখা ভালো, গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সমুদয় পদাবলীকেই আমরা 'গৌরপদাবলী' নামে অভিহিত করতে চাই। এ-শ্রেণীর পদাবলীর একদিকে রয়েছে তাঁর ঈশভাবে এবং ভক্তভাবে লীলা, অন্যদিকে রয়েছে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপে তাঁর 'অপূর্ব অদ্ভুত' ক্রীড়া। এই শেষোক্ত গোত্রের পদাবলীই যথার্থত রাধাকৃষ্ণ লীলানাটের নান্দী। এরাই "মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী"র "প্রবেশ-চাতুরী-সার' রূপে 'গৌরচন্দ্রিকা' আখ্যায় ভূষিত। গৌরাঙ্গের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয় ভাবসাধনারই নিগূঢ় পরিচয় লাভে উক্ত দুই শ্রেণীর গৌর-পদাবলীই আস্বাদ্য। আর সেক্ষেত্রে আস্বাদনের অবকাশে চৈতন্যের 'ভাগবত-রূপ'ও সচেতন পাঠককে অবহিত না করে পারে না। প্রমাণস্বরূপ ঈশ-ভাবাক্রান্ত গৌরপদাবলীই প্রথমে আলোচিত হতে পারে।

লৌকিক পরিচয়ে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, শচীর দুলাল। ভক্তের দৃষ্টিতে আবার শচীই দ্বাপরের মা যশোদা, আর দ্বাপরে নন্দের গৃহে জন্মগ্রহণের পর এবার কলিতে মিশ্রগৃহে শচীগর্ভে এসেছেন হরি "কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে"। বাসু ঘোষের ভাষায়:

"দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে[১] জন্ম বিদিত সংসার॥

১ পদে ব্যবহৃত "যশোদা উদরে" অংশটি মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণের জন্ম তো যশোদা-গর্ভে নয়, দেবকী-গর্ভে। অবশ্য ব্রজবাসী তাঁকে যশোদা-নন্দন বলেই জানতেন। পদে সেই ব্রজভাবই রক্ষিত। আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, যশোদাই দ্বিভুজ মুরলীধরকে জন্মদান করেন। দেবকীর চতুর্ভুজ সন্তান তাঁতেই আকর্ষিত হয়ে যান পরে।

শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥"[১]

গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে অদ্বৈতের আনন্দবিহ্বলতা অবিস্মরণীয়। চৈতন্যের 'গণে' তিনি কোথাও 'মহাবিষ্ণুর অবতার' আবার কোথাও-বা 'সদাশিব' বলে কীর্তিত হলেও, ব্যাপক অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, চৈতন্যলীলায় তাঁর ভূমিকা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মার। ভাগবতে উদ্ধবগীতায় কৃষ্ণ নিজের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলেছিলেন: "অবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ"[২], অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা-প্রার্থিত হয়েই অংশসহ অবতীর্ণ হয়েছি। 'চৈতন্য-ভাগবত'-কার বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থেও দেখি, "নাড়ার হুঙ্কারে"ই চৈতন্যের ধরাবতরণ। গৌরাঙ্গলীলায় গর্গমুনির ভূমিকা আবার নীলাম্বর চক্রবর্তীর, তিনিই গণনা করে শিশু-গৌরের মহাপুরুষ-লক্ষণ উদ্ধার করেছিলেন। আর এই শিশু-গৌরের বিচিত্র শৈশবলীলাও পদকর্তার ভক্তিরঞ্জিত চিত্তে একান্তভাবেই শিশু কৃষ্ণের অনুরূপ বলে প্রতিভাত হয়েছে। নরহরির বর্ণনায় শিশু নিমাইয়ের নবনীভক্ষণ, সর্পশিরে শয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গত মনে পড়বে। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা যে কিভাবে পদকর্তাকে প্রভাবিত করেছে, তারই একটি চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে নরহরির লেখনীকেই স্মরণ করা যায়। ব্রজে যেমন বাৎসল্য বা ব্রজরমণীদের 'যশোদাদুলাল' কৃষ্ণেই সর্বোত্তম স্নেহানুভব ছিল, নবদ্বীপেও তেমনি শচীনন্দনেই নদীয়া-মাতৃকুলের সর্বস্নেহোৎকর্ষ:

"কেহ বলে ওগো আর শুনে কিছু না বুঝি মনের গতি।
নিজ সুত হৈতে শতগুণ স্নেহ উপজে ইহার প্রতি ॥"[৩]

মুহূর্তে মনে পড়ে ভাগবতে ব্রহ্ম-মোহনলীলায় গোপবালকরূপী কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর পুত্রাধিক স্নেহের কারণ-বিশ্লেষণে শুকদেবের সুভাষণ:

"তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্"[৪]

এককথায়, আত্মাই সবজীবের প্রিয়তম। আর তিনিই সেই আত্মা। তাই তাঁতেই সর্বজনের প্রীতি।

---

১ গৌ° প° ত°, পৃ° ৫১

২ ভা° ১১।৭।২

৩ গৌ° প° ত°, পৃ° ৭১

৪ ভা° ১০।১৪।৫৪

গয়া থেকে প্রত্যাবৃত্ত ভাবাবিষ্ট গৌরচন্দ্রও সর্বভক্তের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম কৃষ্ণরূপেই তাঁদের নন্দিত দৃষ্টির সম্মুখে লীলাপর হয়েছিলেন। কৃষ্ণের নটবরবেশ-ধারণ করে তিনি যখন আবার সুরধুনীতীরে বেণুবাদন করতেন, তখন তো যমুনাস্বপ্ন-সম্পাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতো। নিত্যানন্দ-সঙ্গে তাঁর গোষ্ঠলীলাও বাসুঘোষ ভাষায় ধরে রেখেছেন :

"শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনি ॥"[১]

শিবানন্দ সেনের একটি পদে কৃষ্ণরূপে চৈতন্যের ভাবস্ফূর্তি মনোজ্ঞ :

"নিকুঞ্জ মন্দিরে পহুঁ কয়ল বিথার।
ভুমে পড়ি কহে কাঁহা মুরলী হামার ॥
কাঁহা গোবর্ধন যমুনাক কুল।
কাঁহা মালতী যুথী চম্পক ফুল ॥"[২]

"কাঁহা গোবর্ধন" প্রসঙ্গে চৈতন্যদাসের একটি অনুপম সাঙ্গ-রূপক পদের কথা মনে পড়বে। সেখানে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অনুষঙ্গে চৈতন্যের "ভক্তি-গিরি" ধারণ পদকর্তার স্মরণীয় কবিত্বকলায় মণ্ডিত :

"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ বিলাস।
পুন গিরিধারণ পূরব লীলাক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ ॥"[৩]

এই "নব গিরিধারণ" লীলায় "শ্রবণাদি নব অঙ্গ"সহ "পঞ্চরস ফলে" তথা "নিজেন্দ্রিয় উপচারে" শ্রীগৌরাঙ্গ "শুদ্ধভক্তি"-রূপ গোবর্ধনের পূজাই প্রচার করেছেন বলে পদকর্তার অভিমত। আর এক্ষেত্রে "কলিযুগ-সুরপতি" "কামমেঘ-বরিষণে"ও কিছু করতে পারেননি বলেও জানান তিনি :

"জানিয়া জীবের দায় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিল মনে মনে।
ভক্ত ভাব সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার
ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে ॥"

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভক্তদৃষ্টিতে কৃষ্ণলীলায় যেমন রাসবিলাস, গৌরাঙ্গ-

---

১ ভক্তিরত্নাকর, পৃ° ৯৩৫

২ ভক্তিরত্নাকর, পৃ° ৯৪৪

৩ গৌ° প° ত°, পৃ° ২৬

লীলায় তেমনি কীর্তনবিলাস। নয়নানন্দের প্রাসঙ্গিক পদটি আমাদের বক্তব্য সমর্থনে উপস্থিত আছে :

"দেখ দেখ গোরা-নটরঙ্গ।
কীর্তন মঙ্গল মহারাসমণ্ডল উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ॥
নাচে পহুঁ নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর প্রেমসিন্ধু আনন্দলহরী॥
ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে বায় নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি থৈয়া তাথৈয়া তাথৈয়া থৈয়া বাজত মোহন মৃদঙ্গে॥
যত যত অবতার সুখময় সুখসারে এই মোর নবদ্বীপনাথে।
যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ সব নয়নানন্দের বহুচিতে॥"[১]

পদটির বিশেষ লক্ষণীয় অংশ "নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে"। আসলে কৃষ্ণপরিকর-মধ্যে যেমন রাধাকে, গৌরাঙ্গ-গণে তেমনি গদাধরকে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর শুধু গদাধর কেন, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, রূপ-সনাতনাদি সকল চৈতন্য-পরিকরেরই কৃষ্ণলীলার অনুষঙ্গে এক একটি "পূরুব" পরিচয় উল্লিখিত হয়ে থাকে। যেমন, রায় রামানন্দ কোথাও কোথাও সুবল-সখা-রূপে, স্বরূপ দামোদর কোথাও কোথাও ললিতা সখীরূপে উল্লিখিত। মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকার অনুরূপ এই গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ভক্তমানসে কৃষ্ণ-গৌরেরই অভিন্নতা প্রতিপাদক। "যার যেই নিজ ভাব" সেই ভাব-অনুসারে কৃষ্ণ-উপাসনার বিধি শাস্ত্রানুমোদিত, আর সেই ভাব-অনুসারে গৌর-আরাধনার অভিপ্রায় থেকেই গৌরনাগরী পদের উদ্ভব। সন্দেহ নেই, গৌরনাগরী-ভাবের পদে প্রায়শই যে-রুচিবিকার ঘটেছে, তা বৈষ্ণব রসিক ও পণ্ডিতসমাজের সূক্ষ্ম রসানুগ্রাহিতার আদৌ অনুকূল নয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এ-ভাবের পদগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার না করে উপায় নেই। নবদ্বীপের একশ্রেণীর ভক্তসমাজে চৈতন্যের 'কৃষ্ণস্বরূপ' ভাগবতীয় কৈশোরলীলার আলোকে যে কী নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছিল, গৌরনাগরী ভাবের পদ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। উদাহরণ হিসাবে বাসু ঘোষের একটি 'দর্শনাদিজা' পূর্বরাগের পদাংশ স্মরণ করা যায় :

"সজনী ঐ দেখ শচীর নন্দন।
যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন॥

[১] গৌ° প° ত°, পৃ° ২৫৮

অসীম গুণের নিধি অপার মহিমা।
এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা॥
খগ মৃগ তরুলতা গুণ শুনি কাঁদে।
রূপ দেখি কুলবতী বুক নাহি বাঁধে॥"[১]

"খগ মৃগ তরুলতা গুণ শুনি কাঁদে" স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণানুরাগবতী ভাগবতীয় গোপললনাদের "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদাযত"[২] শ্লোকের "নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্' অংশের রূপানুরাগের সঙ্গে অভিন্ন প্রতীত হয়ে যায়।

বস্তুত, গৌরনাগরীভাবই হোক অথবা গৌরগদাধরতত্ত্বই হোক, এ-সবেরই মূল উদ্দেশ্য হলো গৌরচন্দ্রকে স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ বলে অনুধ্যান করা। এ বিষয়ে পরিকরে-পরিকরে পথের বিভিন্নতা থাকতে পারে, মতের নয়। তাই নবদ্বীপ-নীলাচল-বৃন্দাবন নির্বিশেষে চৈতন্যের সমূহ ভক্তগোষ্ঠী কৃষ্ণ-লীলার মতোই তাঁর লীলাকেও নিত্য বলে ঘোষণা করেছেন,

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কেহ কেহ ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এঁদের মতে ব্রজ যেমন কৃষ্ণের, নবদ্বীপ তেমনি গৌরাঙ্গের নিত্যলীলাস্থলী। শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্তনে এবং পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের 'সতত আবির্ভাব'[৩], আর শিবানন্দাদি মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের গৃহে সাময়িক আবির্ভাব।

শুধু কি তাই, ভাগবতে কৃষ্ণ-অন্তর্ধানের মতো ভক্তদৃষ্টিতে গৌরাঙ্গ-অন্তর্ধাপনও অলৌকিক। আবার ভাগবতে যেমন দেখি, লীলাসংহারের কাল সমাগত হলে ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদবন্দনা করে "যানি তে চরিতানীশ"[৪] শ্লোকে বলছেন, যে-সাধু মানবগণ আপনার চরিতকথা শ্রবণ ও কীর্তন করবেন, তাঁরা এই দুস্তর তমঃ অনায়াসেই পার হয়ে যাবেন। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে চৈতন্যপদে অদ্বৈতের প্রার্থনাতেও 'চরিত' স্মরণের অনুরূপ প্রসঙ্গ আছে :

১ গৌ° প° ত°, পৃ° ১১৭
২ ভা° ১০।২৯।৪০
৩ চৈ. চ ৩।২।৩৩-৩৪
৪ ভা° ১১।৬।২৪

"তবৈতদাশ্চর্য-চরিত্রমেব জাতিস্মরা এব চিরং স্মরামঃ"[১]

তাৎপর্য, আমরা জাতিস্মর হয়ে চিরকাল আপনার আশ্চর্য চরিত্র স্মরণ করব।

এ থেকেই বলতে হয়, ভক্তসাধারণের চিত্তে কৃষ্ণগৌর এমনই অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আবির্ভাবের ফলশ্রুতিও পৃথক্ থাকেনি, হয়ে উঠেছে তমোপারাপারের অদ্বয় পাথেয়। ভাগবতের ভাষায়, 'কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঙ্গসান্নু কৌ তমোঽনয় তরিষ্যন্তি"[২]।

ভক্তচিত্তে চৈতন্য যখন স্বয়ং ভাগবতপুরুষ, তিনি ছাড়া এ-বিশ্বপ্রকৃতিতে পুরুষ আর কেউ নেই, তখন চৈতন্যের মনোগতি বড়ো বিচিত্র। তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তারই এক প্রত্যক্ষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন বাসু ঘোষ:

"কৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকৃতি
কৃষ্ণ হন কালের কারণ।
এত কহি গৌরহরি চলেন নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঁদে বাসু ধরিয়া চরণ।"[৩]

নবদ্বীপে চৈতন্যের ভাগবত পুরুষ-ভাবই ছিল প্রধান কিন্তু এই সন্ন্যাসই তাঁর ভাবজীবনকে আর এক "রসজলধির তীরে" নিয়ে গেছে। সেখানে গোপীভাবে বিভাবিত চৈতন্যের নিরন্তর আকুতি শুনি: "পাইয়া হারালুঁ জীবননাথে"! প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের সন্ন্যাস যে মায়াবাদীর সন্ন্যাস নয়, প্রেমেরই সন্ন্যাস, তা তাঁর নিজ বক্তব্যেই সুস্পষ্ট:

"করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে গেলে পাই ব্রজনাথে॥"[৪]

চৈতন্যের প্রকটলীলায় নীলাচলই হয়েছিল 'ব্রজ'। সেখানেই তিনি বিরহের পুটপাকে দগ্ধ হয়ে ব্রজনাথকে পাবার বহু বৎসরব্যাপী দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এ-তপস্যায় তিনি ভাগবতীয় গোপীর সঙ্গেই একাত্ম হয়ে উঠেছেন।

গৌরাঙ্গের গোপীভাবে বিভাবিত্ব বলতে রাধাভাব, সখীভাব। গোপীর ভাব

১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১০।৭৪

২ ভা° ১১।১।৭

৩ বাসু ঘোষের পদাবলী, চাকী সং, পদ ১০৮

৪ গৌ° প° ত°, পৃ° ৩৭০

এবং সেবাপরা মঞ্জরীর ভাব, এই তিন প্রকারে তাঁর বিলাসকেই বোঝায়। একদিকে রাধাভাবে তাঁর বিহার যেমন রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর মুখবন্ধ-স্বরূপ গৌরচন্দ্রিকা, অন্যদিকে সখীরূপা গোপার ভাবে তথা সেবাপরা মঞ্জরীর ভাবে বিহার রাগানুগা সাধনার অনুসরণীয় পরমাদর্শ।

আমরা তো পূর্বেই বলেছি, ভাগবতীয় প্রধানা গোপীই বৈষ্ণব ভক্তের নিকট রাধা। চৈতন্যের রাধাভাবে বিহারকালে তাই দেখি ভ্রমরগীতা তাঁর আত্ম-সাক্ষিক অনুভবের আলোকে পরম রসবেদ্য হয়ে উঠেছে। ভাগবতে 'সখী'র প্রসঙ্গও একেবারে নেই তা নয়। গোপীগীতের প্রস্তাবনায় দেখি, দূর গোষ্ঠে কৃষ্ণের স্মরোদ্দীপক মুরলীধ্বনি শুনে "কাশ্চিৎ" অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভাবরতী ব্রজরমণীরা পরোক্ষে, অর্থাৎ আত্মভাব গোপনে অবহিত্থায় "স্বসখীভ্যোঽন্ব-বর্ণয়ন্", স্ব স্ব সখীর কাছে অনুবর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন[১]। সুতরাং গৌরাঙ্গের সখীভাবে বিহারও ভাগবত-বহির্ভূত প্রেমসাধনা নয়। এমনকি রসিক বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তাঁর মঞ্জরীভাবের সেবনও একান্ত ভাবেই ভাগবতানু-মোদিত। এঁদের মতে, ভাগবতের শ্রুত্যভিমানিনী দেবীদের বক্তব্যে মঞ্জরী-ভাবে কৃষ্ণসেবনের ইংগিত বর্তমান। শ্রুত্যভিমানিনীরা বলেছিলেন, মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে যোগীরা যে পরমতত্ত্ব লাভ করেন তা একমাত্র স্মরণেই প্রাপ্ত হন কৃষ্ণের অরিবৃন্দ, আবার কৃষ্ণের অনন্তনাগের তুল্য ভুজযুগলে প্রতিবদ্ধচিত্তা গোপীরা তাঁর চরণকমলের সুধা সাক্ষাৎ বক্ষে ধারণ করে যে-আনন্দ লাভ করে থাকেন, একমাত্র গোপী-আনুগত্যেই শ্রুত্যভিমানিনীরা সেই একই কৃপাপ্রাপ্ত হন। আলোচ্য শ্লোকের "বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ"[২] অংশটির চৈতন্যচরিতামৃতে ধৃত রায় রামানন্দের ব্যাখ্যা মনে পড়তে পারে[৩]। আসলে গৌড়ীয় মতে, মঞ্জরীভাবের মর্ম অতিশয় নিগূঢ়—সখীর মতো সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছায় দেহদান চলে না, শুধুই আস্বাদিত হয় রাধাকৃষ্ণ-যুগলসেবন। চৈতন্যের মঞ্জরীভাবে

১ ভা° ১০।২১।৩

২ ভা°. ১০।৮৭।২৩

"'সমাদৃশ' শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
'সমা' শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাই ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥" চৈ. চ. মধ্য। ৮, ১৮১-৮২

বিহারও এ-ভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধির স্মারক। আর এই 'ক্ষুরস্য ধারা'য় তাঁর যাত্রা ভাগবতীয় শ্রুত্যভিমানিনীদের গোপী-অনুগতি থেকে শুরু হয়েও যে শেষ পর্যন্ত সর্বশাস্ত্রাতীত অনির্বচনীয় রসলোকে উন্নীত হয়েছে, তাতেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দ্বিমত নেই। মঞ্জরীভাব, সখীভাব, এমনকি রাধাভাবের ক্ষেত্রেও চৈতন্যের যুগপৎ এই ভাগবত-ভাব-সিদ্ধি এবং ভাগবতাতিক্রম অদাক্ষিত সম্প্রদায়েরও সমর্থন লাভ করবে।

উদাহরণত, চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে চৈতন্য-কর্তৃক কৃষ্ণের জলকেলি-আস্বাদনের প্রসঙ্গটিই প্রথমে উল্লেখিত হতে পারে। একদা নীলাচলে শারদোৎফুল্ল রজনীতে সমুদ্রোপকূলবর্তী উদ্যানে "নিজগণ" সহ চৈতন্য "রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে' পরিভ্রমণ করছিলেন। রাসান্তে জলক্রীড়ার শ্লোকে আসতেই অকস্মাৎ তাঁর ভাবরঞ্জিত চিত্ত চন্দ্রালোকিত সমুদ্রকে যমুনাভ্রম করে বসে। তারপর ভাবোন্মাদনায় কিভাবে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং ধীবরজালে কিভাবেই-বা তাঁর দেহ-রক্ষা হয়, তা তো চৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, তিনি নিজে বাস্তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে আকণ্ঠ পান করছিলেন "গোপীগণ করিণীর সঙ্গে" "কৃষ্ণ মত্ত করিবরে"র জল-কেলিরঙ্গ। এ-লীলায় তাঁর ভূমিকা যে বিশুদ্ধ মঞ্জরীর, তা তাঁর স্বগতোক্তিতেই স্পষ্ট: "তারে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে"। মঞ্জরী-রূপে তিনি রাধাকৃষ্ণের নিভৃততম কেলিবিলাস উপভোগের অখণ্ড পুণ্য থেকেও বঞ্চিত হননি। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে তিনি ভাগবতীয় শ্রুত্যভিমানিনীদের মতো কৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিমা বর্ণনা করেননি, কিন্তু তার চেয়েও অধিক, অনন্তনাগের তুল্য কৃষ্ণ-ভুজযুগলে প্রতিবদ্ধচিত্তা গোপীদের আশ্লেষের অমৃত-আস্বাদ গোপী-আনুগত্যে নিজে পান করে ভক্তবৃন্দকেও পান করিয়েছেন। এ-ভাবে তাঁর দেহের 'বিকার'ও বড়ো চমৎকার। যমুনা-জলকেলি দর্শনে তাঁর দেহের দীর্ঘতাপ্রাপ্তি[১] কিংবা রাসে বেণুমোহিত গোপীবৃন্দের অনুগমনের ভাবাবেশে তৈলঙ্গদেশীয় গাভীমধ্যে পতনে কূর্মাকার ধারণ[২] অথবা চটকপর্বত দর্শনে গোবর্ধন ভ্রমে 'সুদ্দীপ্ত স্তম্ভে'র ফলে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের চূড়ান্ত বিকাশ[৩]

---

১ "অস্থি-সন্ধি ছাড়ে—হয় অতি দীর্ঘাকার" চৈ. চ, অন্ত্য। ১৮, ৬৬

২ "তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব", রঘুনাথ দাস কৃত স্তবকল্পবৃক্ষ

৩ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৪, ৮৬-৮৯

তারই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করা যায়। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রগুলিতে চৈতন্যের অলৌকিক ভাববিকার-সমূহ যেন শুকদেবেরই বর্ণনীয় বিষয়ের অলিখিতপূর্ব পাদপূরণ।

আর তিনি তো শুধু মঞ্জরীভাবেরই 'জীবন্ত রসভাষ্য' নন, 'গোপীভাবে'রও 'মূর্ত বিগ্রহ'। এ-সম্বন্ধে মুরারির সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়: "রোদিতি ব্রজতি ক্বাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতৌ গোপীভাবৈঃ"[১]। চৈতন্যের তদ্‌ভাবিত চিত্তে গোপীবাণীর যে কী বিচিত্র নবনব ভাবস্ফূর্তি ঘটা সম্ভব, তারই সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত আছে কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে গোপীদের বন-পরিক্রমার ভাবোদয়ে "অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈঃ"[২] শ্লোকটির চৈতন্যকৃত আস্বাদন[৩]। যমুনাভ্রমে সমুদ্রতীরে তাঁর সেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারও কি ভোলবার? সেখানে দেখি, "পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" কৃষ্ণের বহুবাঞ্ছিত দর্শনলাভে আনন্দবিহ্বল চৈতন্য মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। উল্লেখ করা যায়, ভাগবতেও অনুরূপ দর্শনাবেশে জনৈকা গোপী একই দশাপ্রাপ্তা হয়েছিলেন[৪]। বৈষ্ণবতোষণী মতে, ইনি রাধার 'গণ' ভুক্তা সখী 'বিশাখা'। সুতরাং বিশিষ্ট মতানুসারে, চৈতন্যকে আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশাখা-বিভাবিত বলা চলে। বিশেষত, চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুযায়ী তিনি নিজেও এস্থলে নিজেকে রাধিকার 'প্রিয়সখী' বলে অভিহিত করেছেন: "রাধার প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ"[৫]। সাক্ষাৎ গোপীরূপে এই যে রাসাবেশে কৃষ্ণানুভব, তা ভাগবতীয় গোপীভাবের অভিনব তাৎপর্য উদ্ধার ছাড়া আর কী। প্রবোধানন্দ সরস্বতী যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, দুরবগাহ্যতার জন্য এমন কি শুকদেবও ভাগবতের রাস-প্রসঙ্গের যে-নিগূঢ় তাৎপর্য আভাসিতই করেছেন মাত্র, বিস্তৃত বর্ণনা করেননি, তাই প্রকট করার জন্য, সর্বোপরি, কৃষ্ণের রাসাদি লীলামাধুরীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধার রতিকেলি-মহিমা প্রচারণের জন্য গৌরকলেবরে হরি ধরাবতীর্ণ[৬]।

---

১ কড়চা, ৩।৩।১৭ ২ ভা° ১০।৩০।১১
৩ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৫ ৪ ভা° ১০।৩২।৮
৫ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৫, ৪০
৬ "শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধারতিকেলি-নাগররসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তুপ্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥"
চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ১০ম বিভাগ, ১২২

বস্তুত গোপীর ভাবকুঞ্জে বিহারও নয়, রাধার রতিকেলিরহস্যে অবগাহনই চৈতন্যাবতারের সর্বোত্তম লীলা। এই অন্তরঙ্গতম লীলাতেই তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের শেষ সীমা নির্দেশ করে গেছেন। এ-লীলার আদি সূত্রকার স্বরূপ দামোদর আর বৃত্তিকার রঘুনাথ দাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এঁদেরই চরণ শরণ করে "কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা" গৌরচন্দ্রের "মনসা" "বপুষা" এবং "ধিয়া" এককথায় কায়মনোবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে যে লীলার বিশেষ উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পূর্বরাগবতী গোপীর ভাবে কৃষ্ণের পঞ্চগুণের প্রতি এককালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণবোধ। এই পঞ্চগুণ যথাক্রমে "কৃষ্ণ-রূপ--শব্দ,-স্পর্শ,-সৌরভ্য,-অধররস"। কৃষ্ণের রূপাদি পঞ্চগুণে এককালে আকৃষ্ট রাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেই চৈতন্য-সাক্ষিক মর্মবেদনা বিস্ময়াবহ :

"না সহি কি করিতে পারি তাতে রহি মৌন ধরি
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই॥"[১]

আমরা জানি, "রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদং"[২] শ্লোকে ভাগবতীয় গোপীরা কৃষ্ণের পঞ্চগুণে নিজেদের সমাকৃষ্ট চিত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেখানে পঞ্চগুণের উপরি-উক্ত প্রকারভেদ ছিল না এবং এককালে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণের এরূপ মর্মান্তিক হৃদয়চ্ছেদা অনুভবও নয়।

জগন্নাথের প্রথম দর্শনলাভে তাঁর সেই "কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার"ও ভক্তিশাস্ত্র-দুর্লভ। সার্বভৌম এই বিকারকে "সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়" বলে চিনতে পেরেছিলেন। এখানে 'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক', আর দীর্ঘকাল পরে অন্ত্যলীলায় আরও অলৌকিক ভাবচেষ্টা। যেমন, অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদে গীতগোবিন্দের পদগায়িকার প্রতি ধাবিত হয়ে যাওয়া কিংবা উড়িষ্যাবাসিনী এক স্ত্রীলোক জগন্নাথদর্শনের আবেশে তাঁর স্কন্ধে পদস্থাপন করলেও বাহ্যরহিত হয়ে থাকা ইত্যাদি। তাঁর "শাস্ত্রলোকাতীত" ভাববিকারের আর এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণের মথুরাগমনের ভাবাবেশে তাঁর মর্মস্পর্শী বিরহোন্মাদে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখঘর্ষণ করে গভীর ক্ষতসৃষ্টিতে। জগন্নাথের রথাগ্রে কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্যকালে তাঁর "অষ্টসাত্ত্বিক ভাবোদয়" সমান বিস্ময়কর। সন্দেহ

১ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৫

২ ভা' ১০।৩১।১৭

কি, "শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে" অথবা "মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে" একমাত্র চৈতন্যেরই জীবনভাষ্যে পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব। আসলে চৈতন্য ছিলেন একাধারে বিরহ ও বিপ্রলম্ভের প্রতিমূর্তি। তাই চিত্রজল্পেও যেমন, মহিষীগীতেও তেমনি তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। আর উদ্ধবদর্শনে প্রধানা গোপীর "ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ" তো তাঁর অন্ত্যলীলায় কচিৎ কচিৎ স্ফুরিত ভাব ছিল না, ছিল দিবারাত্রের নিত্যদশা। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তিই তার অনুকূলে উপস্থিত আছে :

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ॥"[১]

এই বিরহ-উন্মাদনায় চৈতন্য জগমোহনদর্শনের কাতর অনুনয়ে জগন্নাথ-সেবক দলুইয়ের হাত ধরেছিলেন :

"......কাহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত॥"[২]

কৃষ্ণবিরহে এই "রাই প্রেমে ভোরা" গৌরচন্দ্রের "তন্তুক দোসর ভেল দেহ",[৩] অর্থাৎ তন্তুমাত্র সার হয়ে গেছে দেহ, অদর্শনে মর্মাহত হয়ে গম্ভীরায় করছেন তিনি কোজাগর নিশিযাপন, তবু সেই নিষ্ঠুর কৃষ্ণ তাঁর 'প্রাণনাথ'ই, আর কিছু নন, "প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"। নরহরির অনবদ্য গৌরচন্দ্রিকার পদটি মনে পড়ছে :

"গম্ভীরা ভিতরে গোরারায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ। খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘষে। কোন নাহি রহু পহুঁ পাশে॥
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত। কোথায় আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা। রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥"[৪]

---

১ চৈ. চ. মধ্য। ২, ২-৪
২ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৬, ৭৫
৩ গৌ॰ প॰ ত॰, পৃ॰ ৩১৮
৪ গৌ॰ প॰ ত॰, পৃ॰ ৩১৪

আমরা জানি. কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা হয়েও ভাগবতীয় গোপী উদ্ধবসকাশে কৃষ্ণকে বলেছিলেন 'আর্যপুত্র'—কবে তিনি এসে তাঁর অগুরুসুগন্ধ ভুজ গোপীদের মস্তকে স্থাপন করবেন তাই ছিল কৃষ্ণবিরহিণীর অন্তিম জিজ্ঞাসা। চৈতন্যেরও অনুরূপ দশায় অনুক্ষণ অনুসন্ধান : "কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"! বিরহে মহাভাববতী গোপীর সঙ্গে এইভাবেই চৈতন্য অভিন্ন হয়ে গেছেন।

এখন প্রশ্ন, চৈতন্যের ভাবোপলব্ধিতে প্রেমবৈচিত্ত্য আস্বাদিত হয়েছে কিনা। ভাগবত-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, দশম স্কন্ধের সর্বশেষ অধ্যায়ে স্থানপ্রাপ্ত মহিষীগীতে কৃষ্ণপ্রেমে "উন্মত্তবজ্জডম্", বা উন্মাদিনীর মতো অব্যবস্থিতচিত্তা হয়ে মহিষীরা কুররী, সমুদ্র, মলয়পবন প্রভৃতি কয়েকটি চেতনাচেতন প্রাণী ও বস্তুকে সম্বোধন করে দশটি শ্লোকে[১] অভিনব প্রেমানুভব ব্যক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণের কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িণী হয়েও নিত্যমিলনের মধ্যেও এই দিব্যবিরহের বিভ্রমই প্রেমবৈচিত্ত্য। সহৃদয়ের নিকট বলা বাহুল্য, মহিষীগীতে প্রেমের এক নূতন স্তর রচিত হয়েছে। অনুভূতির এই নূতন স্তর শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করেছিলেন বললে বস্তুত কিছুই বলা হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমোৎকর্ষ-বশত প্রেমবৈচিত্ত্য তাঁতেই চরমরূপ প্রাপ্ত হয়েছে বললেই যথাসত্য বলা হবে। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহ গৌরাঙ্গের অভিন্ন তত্ত্বরসের তীরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ যেমন একান্তভাবে রাধালিঙ্গিততনু হয়েও বিরহবিভ্রমে রাধাপ্রেমোৎকণ্ঠ. রাধাও আবার তেমনি কৃষ্ণকণ্ঠাশ্লিষ্টা হয়েও কৃষ্ণবিরহবিভ্রান্তা—এইভাবেই গৌরাঙ্গের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপে নিত্যজাগ্রত বিশ্লেষধিয়ার্তি, "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" এই মাদনাখ্য মহাভাব। ভাগবতে তার প্রাথমিক স্তরই আভাসিত মাত্র চৈতন্যে তারই শেষ সীমা প্রকটিত। সর্বোপরি "অদ্‌ভুত দয়ালু দাতা অদ্‌ভুত বদান্য" রূপে সেই চূড়ান্ত প্রেমসীমার মাধুর্য নিখিলজীবের আস্বাদনের জন্য তিনি রসরূপে তাকে জনে জনে বিতরণও করে গেছেন। গৌরাঙ্গের স্বমাধুর্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে তাঁর যুগপৎ ভাগবতানুভব এবং ভাগবতাতিক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি। এবারে এই রস-প্রচারণের ক্ষেত্রে ভক্তরূপে তাঁর ভাগবতানু-শীলন আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে।

ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্যে সকল মহাভাগবত-লক্ষণই প্রকটিত হতে দেখেছিলেন

১ ভা° ১০।৯০।১৫-২৪

কাশীর জনৈক ব্রাহ্মণ।[১] মহাভাগবতের লক্ষণরূপে তিনি তাঁর নিরন্তর কৃষ্ণনামকীর্তন, অশ্রুধার, কচিৎ নৃত্য কচিৎ গীত কচিৎ ক্রন্দন তথা হুঙ্কারের উল্লেখও করেছিলেন। ভাগবতে পরমভাগবতের লক্ষণরূপে এ-ছাড়াও সর্বভূতে সমদর্শন, ভগবৎপদারবিন্দ ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ না করা ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে।[২] চৈতন্য যে সমুদয় ভক্তস্বভাবেরই সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন তারই প্রমাণরূপে বসু রামানন্দের একটি পদের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য :

"নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামনি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া ক্ষণে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক ঊর্ধ্ব বাহু কর। পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ।"[৩]

ভাগবতের বিবরণ অনুসারে "বিরল-লক্ষণ"-ভক্তমধ্যেও অম্বরীষ ছিলেন আবার কৃষ্ণে সর্বার্পণের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তিনি চিত্তকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে তাঁর গুণকীর্তনে, করকে হরিমন্দির মার্জনায়, শ্রবণকে ভগবদ্-বিষয়িণী সৎকথা-প্রসঙ্গে, নেত্রকে শ্রীবিগ্রহের অধিষ্ঠানক্ষেত্র-দর্শনে, আলিঙ্গন ক্রিয়াকে ভগবদ্ভক্তের অঙ্গসঙ্গে, নাসিকাকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের তুলসীসৌরভ আঘ্রাণে, রসনাকে তাঁর প্রসাদান্ন আস্বাদনে, পদযুগলকে হরিক্ষেত্র-পরিক্রমায়, মস্তককে তাঁর পাদপদ্মের প্রণতিতে এবং কামকে কামনায় নয়, ভক্তাশ্রয়ী 'রতি'তেই নিবেদন করেছিলেন. "কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃ-শ্লোক-জনাশ্রয়ারতিঃ"[৪]।

ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্যও এই সর্বাপর্ণের আর এক দৃষ্টান্তস্থল। গয়ায় বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শনেই ভক্তরূপে তাঁর প্রথম অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ। এর পর থেকে উচ্চারিত তাঁর সকল বাণীরই ধ্রুবপদ হয়ে উঠেছিল : "হরের্নামৈব কেবলম্"। নীলাচলে গুণ্ডিচাগৃহ-মার্জনাদিতে তাঁর করপল্লব থাকতো ব্যাপৃত। ভগবদ্-বিষয়িণী সৎকথা-প্রসঙ্গের সহচরদ্বয় স্বরূপ দামোদর ও রায়রামানন্দের সঙ্গে

১ "মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে॥" চৈ. চ. মধ্য। ১৭ ১০৬

২ ভা° ১১।২।৪৮-৫৫

৩ গৌ° প° ত°, পৃ° ২৭১

৪ ভা° ৯।৪।২০

নিরন্তর কৃষ্ণকথামৃতে তিনি থাকতেন নিমগ্ন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয় ভারতের বিভিন্ন বৈষ্ণবতীর্থ দর্শনে। একদা সনাতন দুরারোগ্য চর্মরোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভক্তোত্তম জেনেই তাঁর অঙ্গস্পর্শকে তিনি চন্দনাধিক সুবাসে সুরভিত ও পরমপবিত্র জ্ঞান করেছিলেন। ভাগবতবাণী উদ্ধার করে মহারাষ্ট্রী বিপ্রকেও তিনি একদা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কৃষ্ণপাদপদ্মস্থ তুলসীর ঘ্রাণে আত্মারামেরও মন মুগ্ধ হয়। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ তথা গোপালভোগকে তিনি বলতেন "সুকৃতিলভ্য ফেলালব"—তাই একটু একটু আস্বাদন করতেন, আর পরম পুলকাবিষ্ট হয়ে উঠতো তাঁর সর্বাঙ্গ। বৈষ্ণবতীর্থ নীলাচল ছিল তাঁর নিত্যবিহারভূমি, আর কৃষ্ণচরণেই সতত শরণাগতের দীনার্তি "ময়ি তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়"। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ভক্তরূপে তাঁর শেষসমর্পণ—কামকে কামনায় নয়, ভক্তাশ্রয়ী বৃত্তিতে নিবেদন. এরই অন্য নাম রাগানুগা সাধন। রাগাত্মিকা নয় বটেই, রাগানুগা সাধনেও চৈতন্যই প্রেমভক্তির শেষ সীমা নির্দেশ করে গেছেন। বস্তুত চৈতন্য এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের আদেশ অনুসারে, সাধারণ জীবের পক্ষে কৃষ্ণরতি লাভের একমাত্র উপায় গোপী-অনুগতি :

"গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।"[1]

চৈতন্য-প্রচারিত ধর্মে রাগানুগা-মার্গের ভজনাই তাই ভক্ত-সাধারণের মুখ্য সাধন। "রম্যা কাচিৎ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা' বলে তাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন চৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকাকার শ্রীনাথ। "ব্রজবধূ-কল্পিতা' এই "রম্যা" রাগানুগা ভজনার বিধিদানে চৈতন্য। আবার "বর্ণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন" কারো কোনো দোষই মানেননি "কমলা-শিব-বিধি দুর্লভ প্রেমধন", ভাষান্তরে "প্রেমা পুমর্থো মহান্" বিতরণ করেছিলেন জনে জনে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ একে বলেছেন "ভাগবত-তত্ত্বরসের প্রচার" :

"ভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার॥"[2]

একদিকে 'ভাগবত-তত্ত্বরসের প্রচার', অন্যদিকে 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' বলে

১ চৈ. চ. মধ্য। ৮, ১৮৫

২ চৈ. চ. মধ্য। ২৫, ২১৮

ঘোষণা—ভক্তরূপে চৈতন্যের এই দ্বিবিধ কৃত্য ষোড়শ শতকের বঙ্গদেশে যে কী বিপুল ভাবান্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তার স্বরূপ সন্ধান করলেই তাঁর ভাগবত-রূপের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্পূর্ণ হবে।

"নামে রুচি, জীবে দয়া, ভক্তি ভগবানে"—চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের এই তিনটি মূল কথাই তো তাঁর ভাগবত-ভাবনার অনিবার্য ফল। আনুষঙ্গিক চর্যা সাধুসঙ্গাদিও ভাগবত-নির্দেশিত। চৈতন্য তাঁর জীবনসাধনায় তত্ত্বগুলিকেই করে তুলেছেন ঐকান্তিক সত্য, আদর্শকেই বাস্তবায়িত এবং চর্যাকেই আচরিত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ভাগবতে বারংবার বলা হয়েছে, যার জিহ্বাগ্রে হরিনাম, সে চণ্ডাল হলেও পরমপূজ্য[১]। তত্ত্বরূপে কথাটি অপরাপর ভক্তিশাস্ত্রেও স্থান পেয়ে থাকে, কিন্তু প্রতিদিনের আচরিত ধর্মের মধ্যে যখন এ-তত্ত্ব জীবনসত্য রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে তখন তার যে কী মহিমা ও মাধুর্য, তা অন্বেষণ করতে গিয়ে চৈতন্য-সমসাময়িক ভাবান্দোলিত বঙ্গসমাজের একটি অভিনব চিত্র মানসপটে ভেসে উঠছে। পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির উপস্থাপক প্রেমানন্দ। আমরা খণ্ডাংশ মাত্র স্মরণ করলাম :

"হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"[২]

ভাগবতও বলেছে বটে, ভগবদ্‌বিমুখতাবশত দ্বাদশ-গুণান্বিত ব্রাহ্মণও ভক্ত চণ্ডাল অপেক্ষা অধম,[৩] কিন্তু যখন তার অন্তর্লীন সত্যতা চৈতন্য জীবন-সাধনায় প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠলো তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকলো না। বলরাম দাসের পদাংশ মনে পড়ছে :

"সর্বলোক ছাড়ে যারে অপরস বলি।
দেবগণ মাগে আগে তার পদধূলি॥"[৪]

"অপরস", অর্থাৎ অস্পৃশ্য। 'অস্পৃশ্য' জ্ঞানে একদা অবহেলিত জনও আজ দেববন্দনীয় হয়ে উঠছেন ভক্তিগুণে। এই একই গুণে বিদুরাদি 'অতীর্থ' শূদ্রভক্তজনকে কৃষ্ণ করেছিলেন তীর্থীভূত। বস্তুত কৃষ্ণজীবনবাণীর তথা ভাগবতধর্মের প্রেরণা অলৌকিকভাবে চৈতন্যজীবনবাণী ও তৎ-প্রচারিত

---

১ "অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্ণাম গৃণন্তি যে তে॥" ভা° ৩।৩৩।৭

২ গৌ: প° ত°, পৃ° ২৮

৩ "বিপ্রদ্দ্বিষড়্‌ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্" ॥ ভা° ৭।৯।১০

৪ গৌ° প° ত°, পৃ° ৩৮

ধর্মাদর্শকে করেছে অনুপ্রাণিত। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে-জীবনাট্যলীলার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাই, তাতে তাঁকে ভারতবর্ষের প্রথম 'আধ্যাত্মিক সাম্যাবতার' বলা চলে। শুধু শিশুপালাদি বিরুদ্ধবাদীর দৃষ্টিতেই নয়, সাধারণ্যের বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিতেও তিনি বর্ণাশ্রম-অতিশায়ী এক নবধর্মের প্রবর্তক রূপেই প্রতিভাত হবেন। যযাতিনিন্দিত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে, তথাকথিত নীচ গোপজাতিতে লালিত-পালিত হয়ে, ব্রহ্মর্ষি-অসেবিত দ্বারকার সমুদ্রদুর্গে বসতি স্থাপন করে, বেদবিহিত পশুবধ-যজ্ঞকর্ম পরিহারে অহিংস ভক্তিধর্ম প্রচারে, শূদ্রভক্তদেরও যথোচিত মর্যাদাদানে, সর্বোপরি, অবজ্ঞাতা বনৌকসা ব্রজললনাদের সর্বলোকমান্যাকরণে তিনি ব্রাহ্মণ্য-বিধি-কঠোর ভারতবর্ষে এক নবযুগের ঐতিহ্য রচনা করে গিয়েছিলেন।

চৈতন্যের ক্ষেত্রেও অনেকটাই তাই। তিনিও জন্মেছেন পাণ্ডববর্জিত বঙ্গদেশে, এমন ভক্তদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যাঁদের অনেকেই গঙ্গাবর্জিত পুরাণনিন্দিত দেশের মানুষ, অনেকে আবার তথাকথিত হীন-কুলজাতকও বটেন। বৃন্দাবনদাসের হরিদাস-বন্দনা স্মরণীয়:

> "জাতি-কুল সর্ব নিরর্থক দেখাইতে।
> জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥"[১]

এইভাবেই গৌরাঙ্গ 'ভাগবত-তত্ত্বরস' আচণ্ডালে করেছিলেন সঞ্চার। অদ্বৈত আচার্যের প্রতি তাঁর নির্দেশই ছিল :

> "আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান"[২]

আর সর্বপারিষদের প্রতি আজ্ঞা :

> "... আমি আজ্ঞা দিল সভাকারে
> যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥"[৩]

"যাঁহা তাঁহা" বিতরিত এই প্রেমফলের তথা ভাগবতরসেরই অমৃতাস্বাদে একযোগে গান গেয়ে ওঠে সহস্র কবিবিহঙ্গ। শুষ্ক প্রাণের শাখায় শাখায় জাগে 'সৃষ্টিসুখের উল্লাস'। অঙ্কুরিত হয় নবধর্ম, নব্যদর্শন, নবীন রসশাস্ত্র। বিকশিত হয়ে ওঠে পদাবলী, চরিতকাব্য। আনন্দসৌরভ

১ চৈ. ভা. আদি। ১১, ২৩৪
২ চৈ. চ. মধ্য। ১৫, ৪২
৩ চৈ. চ. আদি। ৯, ৩৪

নিষ্ণাত হয় রসকীর্তন, পল্লবিত ভাগবতানুবাদ সাহিত্য। এককথায়, চৈতন্য-ভাববিপ্লবকে ভাগবত-ভাবান্দোলন বললে অতিশয়োক্তি হয় না। মূলত একটি পুরাণকে অবলম্বন করে এক বিরাট জাতির এমন সার্বিক আত্ম-উদ্বোধন পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। ষোড়শ শতকে চৈতন্যযুগে ভাগবত-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সেই বিরলদৃষ্ট নবজাগরণই ঘটেছিল। সূতপাঠক ভাগবতকে বলেছিলেন, 'কৃষ্ণের প্রতিনিধি'—পরমপুরুষের প্রকটলীলা সংবরণকালে এই ভাগবতই 'পুরাণার্ক' তা। যুগসূর্যরূপে আবির্ভূত হয়ে কালান্তরের সংকটপুঞ্জ থেকে নিখিল মানবকে রক্ষা করার ব্রত নিয়েছিল। আর শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিতে ভাগবত কৃষ্ণ-প্রতিনিধি মাত্র নয়, স্বয়ং 'কৃষ্ণতুল্য'। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি তো আগেই উদ্ধৃত হয়েছে : " 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার '। এই 'কৃষ্ণতুল্য' প্রেমময়-কলেবর ভাগবতের আজীবন সেবা করে ও সেবা করার নির্দেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য বাঙালীর ভাবজীবনের সংকটমোচনই শুধু করেননি, স্বর্ণযুগেরও সৃষ্টি করেছিলেন। জনে জনে ভাগবতের মূলমন্ত্র বিতরণের তাঁর সেই আগ্রহ ভোলার নয়। প্রসঙ্গত নিত্যানন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিও চৈতন্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। কৃষ্ণদাসের ভাষায় :

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥"[১]

যুগ ও জাতির তমোনাশে ভক্তরূপে ভাগবতশাস্ত্রের প্রচারের ক্ষেত্রে সনাতনাদি চৈতন্যপরিকরবৃন্দের নামও একনিঃশ্বাসে উচ্চার্য। তাঁদের উদ্দেশে চৈতন্যের ভাগবত-শিক্ষাদান ব্যর্থ হয়নি। যেমন সার্থক হয়েছে দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত-ব্যাখ্যার মূলসূত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, কিংবা ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদক রঘুনাথকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি-দানে উৎসাহিত করা। অথবা দাস রঘুনাথাদির প্রতি আজ্ঞা প্রদান : "ভাগবত পড় গিঞা বৈষ্ণবের কাছে'। কেননা চৈতন্যের তদ্‌ভাবিত চিত্তে এই প্রতিপন্ন হয়েছে :

"সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণভক্তি কয়।
বিশেষত ভাগবত—ভক্তিরসময়॥"[২]

চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তি-আন্দোলনে ভাগবতের স্থান তাই সর্বোপরি 'শাস্ত্রের'

---

১ চৈ. চ. আদি। ১, ৫৬

২ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৩, ৫১২

'অমল প্রমাণের': "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং"। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কোষগ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভ তত্ত্ব-গ্রন্থে শ্রীজীব তাই চৈতন্যপদানুধ্যানেই ভাগবতকে 'সর্বপ্রমাণের চক্রবর্তিভূত' বলে মেনেছেন। সেখানে শাস্ত্ররূপে ভাগবতের প্রামাণিকতাকে উদ্ধার করেছে বাঙালীর মনীষা। কিন্তু ভক্তরূপে "ভক্তিরসময়" ভাগবতের আস্বাদন যদি কোথাও শেষ-শিখর স্পর্শ করে থাকে, তবে তা শ্রীচৈতন্যেরই শ্লোকাষ্টকে বা শিক্ষাষ্টকে। ভাগবতের গোমুখীগুহায় শিক্ষাষ্টকের জাহ্নবীধারা নির্বারিত বললে অত্যুক্তি হয় না। ভাগবতধর্ম ও চৈতন্য-রসোপলব্ধির মহাসংগমও এই শিক্ষাষ্টক। সেক্ষেত্রে শিক্ষাষ্টকের আলোচনাই হবে চৈতন্যজীবনবাণীর অপরিহার্য অধ্যায়।

ভাগবত ও শিক্ষাষ্টক

শ্রীচৈতন্য ছিলেন লোকোত্তর রসিক ভাবুক। তাঁরই ঐকান্তিক ভাগবত-আস্বাদনের তথা ভাগবত-ভাবনার অপূর্ব ফলশ্রুতি তাঁর 'শিক্ষাষ্টক'। প্রগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধশ্লোক 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের যেরূপ, শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে আমাদের সেরূপই সাধুবাদ:

> "ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
> গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
> রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
> রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥"[১]

"ঘষিতে-ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার" এই অষ্টশ্লোকের বিচারেও "গন্ধ বাঢ়ে তৈছে"। তদুপরি, "রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি। রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি"। "এই শ্লোক" এখানে শ্লোকাষ্টক। আমরা জানি, শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করে যাননি। তাঁর রচনা বলে সুপ্রসিদ্ধ এবং ভাবশাবল্যে সমাকর্ষী এই আটটি শ্লোকের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে তথা ভক্তিশাস্ত্রে এই অষ্টশ্লোকের ভূমিকা কি সে বিষয়ে আলোকপাত করাও আমাদের বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। তারই প্রাথমিক পর্বরূপে চৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-কৃত বলে বহুমানিত রসভাষ্যসহ মূল শ্লোকাষ্টক নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

১ চৈ. চ. মধ্য।৪, ১৯০-৯১

১. মূল শ্লোক : চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

[অস্যার্থ, চিত্তদর্পণের পরিমার্জক, সংসার-তাপানলের নির্বাপক, মঙ্গলরূপ কৌমুদী পক্ষে কৃষ্ণোন্মুখতারূপ জ্যোৎস্না বিতরণকারী, পরাবিদ্যা ভক্তিবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্ধনকারী, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদনদাতা তথা সর্বাত্মস্নাপক শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন পরম জয়যুক্ত ।]

রসভাষ্য : সংকীর্তন-হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত- আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥

[অন্ত্য । ২০, ১০-১১]

২. মূল শ্লোক : নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

[অস্যার্থ, হে ভগবান্, বহুপ্রকারে নিজনাম প্রচার করেছো তুমি, সেই নামে স্বীয় সর্বশক্তি সমর্পণও করেছো, তোমার নাম স্মরণে কালসম্বন্ধীয় কোনো নিয়মও নেই—তবু তোমার এতাদৃশ করুণা সত্ত্বেও নামে আমার অনুরাগ উপজাত হলো না ।]

রসভাষ্য : অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥
খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয় ।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয় ॥
সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥

[তত্রৈব, ১৩-১৫]

মূলশ্লোক : তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

[অস্যার্থ, তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরুর তুল্য সহিষ্ণু হয়ে এবং নিজে অমানী হয়ে অন্যকে মানদান করে সর্বদা হরিসংকীর্তনই বিধেয়'।]

রসভাষ্য : উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥
[তত্রৈব, ১৭-২১]

৪. মূলশ্লোক : ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

[অস্যার্থ, হে জগদীশ্বর, আমি ধন জন সুন্দরী কবিতা কিছুই চাইনা— আমার জন্ম-জন্মান্তরে শুধু তোমার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে।]

রসভাষ্য : ধন জন নাহি মাগোঁ—কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
[তত্রৈব, ২৪]

৫. মূলশ্লোক : অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

[অস্যার্থ, হে নন্দনন্দন, আমি তোমার দাস, ভীষণ ভবার্ণবে পতিত হয়েছি। কৃপা করে তুমি আমাকে তোমার পাদপঙ্কজের রজ-জ্ঞান কর।]

রসভাষ্য : তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥
[তত্রৈব, ২৬-২৭]

৬. মূলশ্লোক : নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

[অস্যার্থ, হে প্রভু, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন বিগলিত অশ্রুধারায় আপ্লুত হবে, কণ্ঠ গদ্গদবাক্যে রুদ্ধ হবে এবং সর্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠবে ?]

রসভাষ্য : প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
[তত্রৈব, ২৯]

৭. মূলশ্লোক : যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

[অস্যার্থ, গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষ যুগ হয়েছে, দুই চক্ষু হয়েছে বর্ষণঘন, আর সর্বজগৎ শূন্য।]

রসভাষ্য : উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
[তত্রৈব, ৩১-৩২]

৮. মূলশ্লোক : আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

[অস্যার্থ, তিনি তাঁর পদদাসী আমাকে আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্টাই করুন অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, যত্র তত্র বিহারই করুন না কেন, তিনি

আমার প্রাণনাথই, অন্য কিছু নন।[১]]

রসভাষ্য[২] :

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো রসসুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনুমন
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় ॥
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥...
না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য ॥...
সেই নারী জীয়ে কেনে কৃষ্ণের মর্ম্ম না জানে
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ়-রোষ।
নিজ সুখে মানে কাজ পড়ু তার শিরে বাজ
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥...
কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়ে-উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখি করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥
মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি কহে তুমি প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী-অভিমান ॥

[তত্রৈব ৩৯. ৪০, ৪৩, ৪৬. ৪৯, ৫০]

চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুসারে উপরি-উক্ত শ্লোকাষ্টক শ্রীগৌরাঙ্গ

১ "দাসীং মাম্ আশ্লিষ্য আলিঙ্গনং কৃত্বা পিনষ্টু, আত্মসাৎ করোতু।...অপরঃ অন্যোদেহগেহাদি ন ইত্যর্থঃ" রাধিকানাথ গোস্বামী-নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মচারী-কৃত টীকা]

২ অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত হলো।

লোকশিক্ষার্থে পূর্বেই রচনা করেছিলেন। তবে অন্ত্যলীলায় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তত্তৎ ভাবাবিষ্ট প্রলাপসহ এদের রসাস্বাদনেও তাঁর আগ্রহ ছিল। মূল শ্লোকের সঙ্গে রসভাষ্য নিবেদনান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানাচ্ছেন :

"পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।
সেই অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল"[১]

অন্ত্যলীলায় বর্ণিত বিষয়ের পুনরুল্লেখে কবিরাজ গোস্বামী পুনরপি বলেছেন :

"ভক্তে শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুন আস্বাদিল॥"[২]

প্রথমে বলা হয়েছে "লোকে শিক্ষা দিল", শেষে এসে বলা হলো, "ভক্তে শিখাইতে ক্রমে যে অষ্টক কৈল"। 'লোক' বলতে 'বহিরঙ্গ' জন বা অনাদিবহির্মুখ জীবসাধারণকেই বোঝায়, আর 'ভক্ত' বলতে 'অন্তরঙ্গ' জন বা অনাদি-ভগবদুন্মুখ জীবকে। আমাদের বিশ্বাস, এই উভয়মুখী জীবেরই মানসরসায়ন-রূপে 'পূর্বে' কোনো এক সময়ে, বা দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্য এই শ্লোকাষ্টক রচনা করেছিলেন। এগুলি গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে আগমনের পূর্বে নবদ্বীপে রচিত হতে পারে। যখনই রচিত হয়ে থাকুক, রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' সংকলনের পরে নয়। কেননা পদ্যাবলীতে এই শ্লোকাষ্টক "শ্রীভগবতঃ" নামাঙ্কিত হয়ে যথাক্রমে 'নামমাহাত্ম্যম্' [শিক্ষা° ১ম ও ২য় শ্লো°], 'নামকীর্তনম্' [ঐ ৩য়], 'তেষাং দৈন্যোক্তিঃ' [ঐ ৫ম], 'তেষামেব সৌৎসুক্যপ্রার্থনা' [ঐ, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ], এবং 'শ্রীরাধায়া বিলাপঃ' [ঐ ৭ম ও ৮ম] শীর্ষক বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে। ড° সুশীলকুমার দে 'পদ্যাবলী' সম্পাদনায় সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু পদ্যাবলীতে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে চৈতন্যের কোনো নমস্ক্রিয়া নেই, সেইজন্যই অনুমান করা যায়, রামকেলি পরিত্যাগের পূর্বেই রূপ এ-গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ না করলেও নবদ্বীপচন্দ্রের ভগবত্তায় ইতোমধ্যেই তাঁর আস্থা জন্মেছিল। 'শ্রীভগবতঃ' নামাঙ্কনে তাঁর প্রণিপাত-পূর্বক শ্রদ্ধানিবেদন স্পষ্ট। বিশেষত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকেও দেখি, প্রয়াগে চৈতন্যদেবের আলিঙ্গনের সৌভাগ্য বা কৃপালাভের পূর্ব থেকেই তিনি সেই

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ২০, ৫৫

২ তত্রৈব ১২৯-১৩০

প্রিয়ের গুণসমূহে গাঢ়বদ্ধ, তথা গৃহের ছলনা থেকে মুক্ত ছিলেন[১]। আর 'পদ্যাবলী'র পরবর্তী সংস্কারে এই শ্লোকাষ্টকের তথা 'শ্রীভগবতঃ' নাম-চিহ্নীকরণের প্রবেশ ঘটেছে বলাও খুব যুক্তিসংগত হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে চৈতন্যের নমস্ক্রিয়ারও প্রবেশ ঘটা স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং ড° দে-র সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, শিক্ষাষ্টক নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের তরুণবয়সের রচনা।[২]

বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রামাণিক চৈতন্যচরিতগুলির মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থেই শ্লোকাষ্টকের বিশেষ উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা আছে। সাম্প্রতিককালে যাঁরা শ্লোকাষ্টক বিষয়ে নব-আলোকপাত করেছেন, তাঁদের মধ্যে ড° রাধাগোবিন্দ নাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ড° নাথ তাঁর 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' গ্রন্থে শ্লোকাষ্টকের যে-মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা করেছেন, তা আলোচ্য অষ্টকের দুরবগাহ রস-রহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথনির্দেশিকা হয়ে উঠেছে বললে বোধ করি ভুল হয়না। তবু তাঁর 'রসবৈদগধি'র প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়েও সবিনয়ে আমাদের কতিপয় সংশয়ের প্রসঙ্গও তুলে ধরা প্রয়োজন। ড° নাথের অভিমত অনুসারে :

"শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু স্বায় অন্তরঙ্গ পার্ষদ-বন্ধু স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে এই শ্লোকগুলির আস্বাদন করিতেন"[৩]।

নীলাচলে "রজনী দিবস কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে" শ্রীচৈতন্য যে "স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জনার সনে" নানাভাবে রাত্রিজাগরণে ভাগবত-গীতগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শ্লোকাষ্টকেরও রসাস্বাদন করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষোক্তের সব ক'টি শ্লোকই তিনি "শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট" হয়ে আস্বাদন করতেন, এ সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য বলা কঠিন। বিশেষত, চৈতন্যচরিতামৃতের যুগল-সম্পাদক রাধিকানাথ গোস্বামী ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্কৃত-টীকা আমাদের অভিমতের অনুকূলেই উপস্থিত আছে। শ্লোকাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটির ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেছেন : "ভক্তভাবাঙ্গীকারত্বেনাত্মনতি-নিকৃষ্টতয়া মননে চ" অর্থাৎ ভক্তভাব অঙ্গীকারে তথা নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করে লিখিত। এ-ভক্তভাব যে রাধাভাব এবং এ-দৈন্য যে কান্তাভাবাশ্রিত, তা তাঁরা বলেননি কোথাও। আমরা পূর্বেই বলেছি, উভয়ত অনাদি বহির্মুখ জীব ও অনাদি

১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৯।৪২

২ "...Caitanya probably composed in his younger days at Navadvipa...."
[The Padyavali, Notes on Authors, P. 214]

৩ 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ', পৃ° ১২৩০, মার্চ ১৯৬৩ সনের সং।

ভগবতুন্মুখ ভক্তের মানসরসায়নরূপে শিক্ষাষ্টক রচিত। আস্বাদনের কালেও যুগপৎ জীবঅভিমান ও ভক্ত-অভিমান তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছিল বলেই আমাদেব বিশ্বাস। বিশেষত চৈতন্যচরিতামৃতের বক্তব্যও অনুরূপ বলে মনে হবে। এমনকি স্বয়ং ড° নাথও কোনো কোনো শ্লোকের আলোচনাকালে আবাব "সংসারী জীব-অভিমানে" প্রভু এ-কথা বলেছেন, বলেও মন্তব্য করেছেন। পূর্বাপর তাঁর বক্তব্য বিচাব করে কেউ কেউ একে স্ববিরোধী উক্তি বলে মনে করতে পারেন। আবার কেউ বা মনে করতে পারেন, বচনাকালে জীব-অভিমান থাকলেও, আস্বাদনকালে প্রভু মহাভাবারূঢ়ই ছিলেন, ড° নাথের বক্তব্যের এই হলো মূল তাৎপর্য। উল্লিখিত এই উভয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই পরে যথাস্থানে আমরা আমাদের বিনীত বক্তব্য তুলে ধরবো। ড° নাথের অপর যে-উক্তিটির সঙ্গে একমত হওয়া গেল না, তাও নিম্নোদ্ধৃত হলো:

"শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের প্রথম ছয়টি-শ্লোকে শুদ্ধপ্রেম (অর্থাৎ ব্রজপ্রেম)-লাভের কথা বলা হইয়াছে।"[১]

উপরি-উক্ত বিষয়ে আমাদের সংশয় কোথায়, তাও আমরা ক্রমাভিব্যক্ত করার চেষ্টা করব। কিন্তু সর্বোপরি শ্লোকাষ্টকের ওপব ভাগবতের প্রভাব-নির্দেশের এতাবৎকাল অনালোচিত বিষয়টিই আমাদের মুখ্য মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের দুই পক্ষ। এক পক্ষে আছে প্রথম চারটি শ্লোক নিয়ে প্রথম শ্লোক-চতুষ্ক, অপর-পক্ষে আছে পরের চারটি শ্লোক নিয়ে শেষ শ্লোক-চতুষ্ক। প্রথম চতুষ্কে শ্রীচৈতন্য জাব-অভিমানে "আপনি আচরি ধর্ম" পরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আর শেষ চতুষ্কে করেছেন "স্বভক্তিশ্রী" ব্রজের মহিমা প্রেমরসসীমা আস্বাদন। মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে বহিরঙ্গপক্ষে রসাস্বাদনের জন্যই 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে'র আবির্ভাব। স্বভাবতই শ্রীচৈতন্যের দুরবগাহ প্রেমরহস্য-মথিত শ্লোকাষ্টকে তাঁর অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ উভয়পক্ষেরই প্রকাশ প্রত্যাশা করব। সেক্ষেত্রে তাঁর শ্লোকাষ্টকের প্রথম চতুষ্ক যদি সাধনভক্তির সোপান নির্দেশ করে, তবে শেষ চতুষ্ক হবে সিদ্ধাভক্তির নির্যাস। শেষোক্ত ভক্তির চরমসীমা আবার ভাগবতে নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাং প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে বলেছিলেন, ভাগবতের তাৎপর্য বিস্তারের জন্যই শ্রীচৈতন্যের অবতরণ, তা তাঁর

১ 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ', পৃ° ১২৩৯

শ্লোকাষ্টকের সাহায্যেও প্রমাণিত হতে পারে। এ বিষয়ে আমরা তো পূর্বেই বলেছি, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রগাঢ় ভাগবত-ভাবনার গোমুখী-উৎসে শ্লোকাষ্টক-বাহিত সিদ্ধা-সাধনভক্তির যুগলধারা উচ্ছ্বসিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকাষ্টকের উভয় চতুষ্ক বিশ্লেষণ করে এখানে আমরা আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণ করতে পারি।

শ্লোকাষ্টকের প্রথম শ্লোক ভক্তিমার্গের একেবারে নবীন সাধকের জন্য। চিত্ত যার বিষয়কলুষে আচ্ছন্ন, সংসারজ্বালায় যে নিত্য দগ্ধ, শ্রেয়-প্রেয়ের দ্বন্দ্বে যে-অবোধ অসহায়, অবিদ্যার অলাতচক্রে ঘূর্ণমান সেই কোটি কোটি জীবের কানে কালঃ পচতীতি বার্তার পরিবর্তে প্রথম আশার বাণী গুঞ্জরণই "চেতোদর্পণমার্জনং"। যাতে প্রেমাংকুর প্রতিভাত হতে পারে তার জন্য হরিনাম চিত্তদর্পণ মার্জন করে, ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করে এবং পরমশ্রেয়ের সন্ধান দেয়। ভক্তিবিভবের দৃষ্টিতে, জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম হলো কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভজনা। তাই তার পরমশ্রেয়। পদ্মের পক্ষে যেমন চন্দ্রকিরণ, জীবের স্বরূপ বিকাশের পক্ষেও তেমনি শুদ্ধরতি, নামান্তরে পরাবিদ্যা বা পরাভক্তি। নামকীর্তনে প্রেম উপজাত হয় বলেই কীর্তন হলো পরাভক্তির প্রাণ। কিন্তু এই পরাভক্তি-রূপ সাধ্য লাভের পক্ষে শুধু সংসারজ্বালা নিবারণ করলেই হয় না। কেননা জীব চায় সুখ, সর্বোত্তম সুখ, শ্রুতির ভাষায়, 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্'। কিন্তু দুঃখনিবারণ তো সুখলাভের অর্ধপথ মাত্র, পূর্ণ লক্ষ্যসিদ্ধি নয়। আসলে কীর্তন কেবল দুঃখনিবারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। অর্থাৎ শুধু নঞর্থক ক্রিয়াতেই এর শেষ নয়, সদর্থক ক্রিয়ারূপে অপরিমেয় সুখবর্ধনও এর অন্তিম সিদ্ধি। এ সুখও আবার অল্প-সুখোচ্ছ্বাস মাত্র নয়, শিক্ষাষ্টকের ভাষায় একেবারে আনন্দাম্বুধিবর্ধন। বলা বাহুল্য, আনন্দের সাগরজাত অমৃতও তখন আর দূরে থাকে না অর্থাৎ, নামে সিদ্ধি হলে, তখন নামী ভগবানের সাক্ষাৎলাভের অমূল্য সৌভাগ্যও ঘটে—আবার অমৃতসিন্ধুতে শুধু এক অঞ্জলি সুধাস্বাদনের মধ্যেই সে-সৌভাগ্য সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন ঘটে 'সর্বাত্মস্নপন', অর্থাৎ, দেহ-মন-আত্মায় অবগাহনের সর্বচৈতন্যব্যাপী আনন্দাস্বাদন। কৃষ্ণদাস-ধৃত চৈতন্য-রসভাষ্য অনুসারে তারই নাম, "কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন"।

নামকীর্তনে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ঘটে, একথা ভাগবতেরও অভিপ্রেত। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হরিকথাশ্রবণে রুচি

থেকেই হৃদয়ের সকল পাপ বিদূরিত হয়। ফলত ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মায়। ভাগবতের ভাষায়: "ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী"[১] তখন চিত্ত রজস্তমোমুক্ত হয়ে "স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি"[২] সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসন্ন হয়। এই অবস্থাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের, অর্থাৎ, "ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানে"র যথোপযুক্ত চিত্তাবস্থা[৩]। বস্তুত, ভগবৎ-প্রেমলাভের পূর্বাবস্থা চেতোদর্পণ-মার্জনের তাৎপর্যই হল চিত্তশুদ্ধি। ভাগবতে বারংবার বলা হয়েছে, অপর কোনো প্রায়শ্চিত্তই নয়, একমাত্র হরিনামকীর্তনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধির উপায়, "হরেগুর্ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ"[৪]। শিক্ষাষ্টকে এই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনকে বলা হয়েছে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং", আর ভাগবতে "শোকার্ণবশোষণং"[৫]। কিন্তু "নির্বাপণ" শব্দে যে শান্তির আভাস আছে, "শোষণে" তা নেই। তাই ভাগবতের অপর একটি শ্লোক থেকে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের এই শোক-শান্তির স্বভাব উদ্ধার করা চলে:

"ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতে সংসৃতিঃ॥"[৬]

অর্থাৎ কর্মবশত এ সংসারে ভ্রাম্যমান জীবের পক্ষে নামকীর্তন ছাড়া পরমলাভ আর কিছুই নেই, কেননা এতেই জীবের সংসারসৃতির বা সংসারে আসা-যাওয়ার বিলয়ে শান্তিলাভ ঘটে।

হরিনামসংকীর্তনকে 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং' বলাও অভিনব নয়, বরং ভাগবতানুমোদিতই। ভাগবতে হরিকথারসকে "পরমমঙ্গলায়নগুণ-কথনোঽসি"[৭] বলা হয়েছে। অন্যত্র শুকদেবও বলেছেন, "সংকীর্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্ মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতিম্"[৮]। এককথায় বিষ্ণুর নামকীর্তন জগতের মঙ্গলজনক এবং পাপনাশক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। সুতরাং হরির কীর্তন-স্মরণাদি ভিন্ন শ্রেয়োপথ আর নেই—"নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা"[৯]। কিন্তু শ্রেয় তো শুধু পাপনাশনেই নেই, মূলত আছে ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি-অঙ্কুরের উদ্গমেই। আমরা পূর্বেই ভাগবত থেকে উদ্ধার করে দেখিয়েছি, নামকীর্তনে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে বাসুদেবে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মায়। আসলে নামকীর্তনকে বিদ্যাবধূ বা 'কৃষ্ণরতির

১ ভা° ১০।২।১৭ ২ ভা° ১।২।১৯ ৩ ভা° ১।২।২০
৪ ভা° ৬।২।১২ ৫ ভা° ১২।১২।৪৯ ৬ ভা° ১১।৫।৩৭
৭ ভা° ৫।৩।১১ ৮ ভা° ৬।৩।৩১ ৯ ভা° ২।২।৩৩

প্রাণস্বরূপ' বলার তাৎপর্যও এখানেই নিহিত। ভাগবতের ভাষায়: "ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ"[১]—ভগবানের নামগ্রহণাদি-জাত ভক্তিযোগই ইহলোকে এ-পর্যন্ত মানবের পরমধর্মরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। এতদর্থেই নববধূরূপ পরমগোপ্য ভক্তিযোগের জীবনস্বরূপ হয়ে উঠেছে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন।

"শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং" বিশেষণে ব্যবহৃত "চন্দ্রিকা" বা জ্যোৎস্না এ-শ্লোকে দ্বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একদিকে তা সাধকের চিত্ত-শতদল বিকাশের সহায়তা করেছে, অন্যদিকে প্রেমাংকুর উদ্গমে সাধকচিত্তের আনন্দ-পারাবারও করেছে উদ্বেল। ফলত, ভক্ত পেয়েছেন পূর্ণামৃতের স্বাদ। শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন তাই 'পূর্ণামৃতাস্বাদনং'। ভাগবতেও তা 'শীধু' বা অমৃত: "মুকুন্দচরিতাগ্রশীধুনা"[২]। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যের রসভাষ্যে "কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন"।

আমরা বলেছি, শ্রীচৈতন্য শ্লোকাষ্টকের এই প্রথম শ্লোকটি জীব-অভিমানে রচনা করেছিলেন এবং জীব-অভিমানেই আস্বাদন করেছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, "রাধাভাবে আবিষ্ট" হয়ে এ-শ্লোক আস্বাদনের বাধা কোথায়? বিশেষত, প্রায়-সমভাবাপন্ন একটি ভাগবতীয় শ্লোকে রাসে সমাগতা গোপীদের কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে উদ্গাত সংগীতে কৃষ্ণ-কথামৃতের অনুরূপ অভিধাপ্রয়োগ লক্ষ্য করি। শ্লোকটি নিম্নরূপ:

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"[৩]

গোপীরা কৃষ্ণকে বলছেন, তোমার কথামৃত তাপদগ্ধের জীবনপ্রদ, কবিজন-সংস্তুত, পাপহারী শ্রবণমঙ্গল, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বত্র পরিগীত। সুতরাং তোমার নামকীর্তন করে যে, জগতে তার তুল্য সর্বার্থপ্রদাতা আর নেই।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, 'চেতোদর্পণমার্জনং' শ্লোকের সঙ্গে এ শ্লোকের তো পদে পদে অন্বয়! বিশেষত, "তপ্তজীবনং" সহজেই হয়ে উঠতে পারে "ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং", আবার "কল্মষাপহং শ্রবণমঙ্গলং" হয়ে উঠতে পারে, "শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং"। সেক্ষেত্রে গোপীগীতের তুল্য শিক্ষাষ্টকের

---

১ ভা° ৬।৩।২২

২ ভা° ৪।২২।২৪.

৩ ভা° ১০।৩১।৯

আদি শ্লোকও চৈতন্য কর্তৃক "রাধাভাবে আবিষ্ট" হয়ে আস্বাদন করার বাধা কোথায়?

বাধা আছে, দুস্তর বাধা। 'চেতোদর্পণ'-শ্লোকের শেষার্ধে বাধা নেই, কেননা কৃষ্ণনামের আস্বাদনে সর্বাত্মস্নপনের আনন্দাম্বুধি উচ্ছলিত হয়, এ সত্য প্রৌঢ়াপারাবতী রাধা ভিন্ন অপর আর কে অধিকতর অনুভব করবেন! আসলে বাধা শ্লোকের প্রথমার্ধেই। কৃষ্ণৈকরসে রাধার মন স্থির হয়ে আছে। তাঁর চিত্তে অবিদ্যার স্থান কোথায় যে তাঁর চিত্তমল বা অবিদ্যা দূর হয়ে চেতোদর্পণ মার্জিত হবে বা চিত্তশুদ্ধি ঘটবে? আর কোন্ ভক্তিশাস্ত্রে রাধার "ভবমহাদাবাগ্নি"-জ্বালার উল্লেখ আছে? রাধার একমাত্র জ্বালা "তদ্বিরহতাপ"—কৃষ্ণের বিরহতাপ। তাকে "সংসার-তাপ" বলে ভুল করা অপরাধ। গৌড়ীয় মতে, রাধা হলেন কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, তাঁর শ্রেয়-প্রেয়ের দ্বন্দ্ব বা ভবমহাদাবাগ্নিজ্বালার প্রসঙ্গ বৈষ্ণব শাস্ত্রবিরোধী। শুধু তাই নয়, তা ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে অনুসৃত রাধা-ভাবকল্পনারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে যে ভাগবতায় গোপীরা কৃষ্ণকথামৃতকে "তপ্তজীবনং" "কল্মষাপহং" বলেছেন? সে ক্ষেত্রেও তো সমস্যা একই থাকছে।

বিরুদ্ধবাদীর অবগতির জন্য এখানে বলা প্রয়োজন, ভাগবতীয় শ্লোকটি তখনই সমস্যা সৃষ্টি করবে যখন এটি মূল ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা হবে। এ শ্লোকের একমাত্র বাচ্যার্থের ওপর নির্ভর করাও বিভ্রান্তিজনক। বস্তুত, "তব কথামৃতং" শ্লোকটি ব্যাজস্তুতির একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। এর বাচ্যার্থে স্তুতি থাকলেও ব্যঞ্জনায় আছে শ্লেষ-অসূয়া-নিন্দন-ভর্ৎসন। কেননা বংশীধ্বনিতে বিমোহিত করে ব্রজবধূদের নিশীথে ঘোর বনে এনে কৃষ্ণ তাঁদের প্রথমত পরস্ত্রী-রূপে উপেক্ষা করেছেন, সতীত্ব সম্বন্ধে নানা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ উপদেশও দান করেছেন, তারপর আবার ব্রজবধূদের আর্তিতে সদয় হয়ে ক্ষণমাত্র ক্রীড়া করে পরমনির্দয়তায় তাঁদের ত্যাগ করে অন্তর্ধানও করেছেন। কৃষ্ণান্বেষণে ব্যাপৃত বন-পরিভ্রমণশীলা গোপীদের এস্থলে কিরূপ মানসবিক্ষোভ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, সহজেই অনুমেয়। আলোচ্য শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে "রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি"[১] উক্তিতে ব্যবহৃত "কুহক" বা কপটশিরোমণি সম্ভাষণেই সমগ্র গোপীগীতটির ব্যঙ্গ্যার্থ স্পষ্টোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুধু গোপীগীত কেন,

১ ভা° ১০।৩১।১০

সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপীরা কৃষ্ণকে যেখানে যেখানে ভগবৎবাচী শব্দে সম্ভাষণ করেছেন, সেখানেও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁদের পরিহাসবিজল্পিত অভিমান-অসূয়া। বিষয়টি বৈষ্ণবতোষণীব টীকাকাব সনাতন গোস্বামীর অতুলনীয় রসবৈদগ্ধ্যে প্রথম গোচরীভূত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ রাধাবিনোদ গোস্বামী-কৃত ভাগবতামৃতবর্ষিণীব ভাষ্যসহ সনাতন গোস্বামীব "তব কথামৃতং" শ্লোক-টীকা অংশত উদ্ধার করা চলে :

""তব কথৈব মৃতং মৃতিঃ কথৈব মারণর্তাত্যর্থ।''

তোমার কথাই মরণ।...তোমার কথা যে কেবলমাত্র মরণের সহায় তাহা নহে। তোমার কথা "তপ্তজীবনং" —"তপ্তেষু তৈলাদিষু জীবনং জলমিব" তপ্তৈতেলাদিতে জল প্রক্ষেপ করিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বিরহতপ্তহৃদয়ে তোমার কথা শ্রবণমাত্রেই শত শত গুণে বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।..."কিংবা কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহমিতী- ডিতং'' তোমার স্তাবকগণই তোমার কথা সবকল্মষহারক বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। তোমার কথা "শ্রবণমঙ্গলং''—মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে ন ত্বনুভূযতে। লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে—তোমার কথা শ্রবণে মঙ্গল হয়, কিন্তু আমরা কদাপি তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।...আমাদের মনে হয় যে—সাক্ষাৎ মরণপ্রদ এবং তপ্তৈতেলে জল প্রক্ষেপণের ন্যায় তাপবর্ধক তোমার কথা যাহারা কীর্তনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের মত প্রাণঘাতক আর জগতে কেহই নাই। (দো অবখণ্ডনে ইতিধাতোঃ ভূবি যথা স্যাৎ তথা দ্যতি প্রাণান্ খণ্ডয়তীতি তথা।)''[১]

স্বভাবতই বক্রোক্তিজীবিত এই গোপীবাণীর সঙ্গে শ্লোকাষ্টকের বাচ্যার্থ-প্রধান সরল প্রথম শ্লোকটির তুলনাই চলে না। বস্তুত, সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মহাভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য "তব কথামৃতং'' শ্লোকটি সহজেই আস্বাদন করতে পারেন, কিন্তু অনুরূপভাবে শিক্ষাষ্টকের চিত্তশুদ্ধি-ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণ সূচক প্রথম শ্লোকটি নৈব নৈব চ। কোনো সন্দেহ নেই, আলোচ্য প্রথম শ্লোকটি তিনি অনাদি-বহির্মুখ জীব-অভিমানেই আস্বাদন করেছিলেন, রাধাভাবে নয়।

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে সাধক আর নবীন নন, তিনি সাধনার পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন। কেননা পরম শুভলক্ষণরূপে তাঁর চিত্তে

১ 'শ্রীশ্রীরাসলীলা', পৃ ২২১১, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ স'

এখন 'নামে রুচি' উপজাত হয়েছে। ভগবানের নামে তাঁর অনুরাগ জন্মালো না, এই "ঐশ্বরিক অতৃপ্তিই"ই তাঁর নামে রুচির অন্ত্যর্থক অভিজ্ঞান। এ শ্লোকে সাধক আরো উপলব্ধি করেছেন, নামে ভগবানের শক্তি সমর্পিত, চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-ভাষ্যে "সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ"। অর্থাৎ, নাম ও নামী ভগবান্ এখানে ভক্তের অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে এক হয়ে যাচ্ছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত পদ্মপুরাণের উদ্ধৃতিতেও নামী শ্রীকৃষ্ণের মতো তাঁর নামকেও চিন্তামণিতুল্য, সর্বাভীষ্ট-প্রদ তথা চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ-শুদ্ধ নিত্যমুক্ত রূপে পাই। ভাগবতে আবার কৃষ্ণ সম্বন্ধে গর্গমুনি জানিয়েছেন, তোমার পুত্রের বহু নাম,—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে"[১]। আর এই নামের কীর্তনে যে কোনো বিধিবিধানের প্রয়োজন নেই, সে বিষয়েও ভাগবতের নির্দেশ স্পষ্ট। অজামিল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংকেতে পরিহাসে গীতালাপ-পূরণে, এমনকি হেলা করেও যদি ভগবন্নাম উচ্চারিত হয়, তবে তাতেও সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। কলিকে এইজন্যই গুণজ্ঞ সার-গ্রাহীরা প্রশংসা করে থাকেন। অন্যান্য যুগে যজ্ঞ-তপস্যাদিতে যে ফল, কলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসংকার্তনেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ সংসারাসক্তের মুক্তি হয়। 'এহো বাহ্য'। নামকীর্তনে অনুরাগ উপজাত হয়। অর্থাৎ, নামে রুচি থেকেই প্রেমোদয়: "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ"[২]। এখানে "জাতানুরাগ" শব্দটির ব্যাখ্যা করে শ্রীধরস্বামী বলেছেন, "জাতোঽনুরাগঃ প্রেম যস্য সঃ"। চৈতন্যচরিতামৃতে মায়াদেবীও বলেছিলেন:

"মুক্তিহেতুক 'তারক' হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম 'পারক' হয়ে—করে প্রেমদান॥"[৩]

শ্রীচৈতন্যের ভাষায় কৃষ্ণনামে তাই "সর্বসিদ্ধি হয়":

"খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥"[৪]

আর ভাগবতের ভাষায় সংকীর্তনে হয় সর্বস্বার্থলাভ: "সংকীর্তনেনৈব সর্ব-স্বার্থোঽভিলভ্যতে"[৫]। এখন প্রশ্ন, শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোককে যদি নামে

---

১ ভা° ১০।৮।১৫
২ ভা° ১১।২।৪০
৩ চৈ. চ. অন্ত্য।৩, ২৪৪
৪ চৈ. চ. অন্ত্য। ২০, ১৪
৫ ভা° ১১।৫।৩৬

রুচি উপজাত হওয়ার শ্লোক বলি, তাহলে তৃতীয় শ্লোক "তৃণাদপি সুনীচেন"কে কি বলবো, সাধনভক্তি উদ্গমের প্রাক্‌চর্যা, অথবা সাধনভক্তির অনুভাব? চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যপর্বে শিক্ষাষ্টকের বিশ্লেষণে শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন:

> "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
> তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥"[১]

অর্থাৎ, তৃণের চেয়ে দৈন্য তরুর তুল্য সহিষ্ণুতা অবলম্বনে অমানী হয়ে অন্যকে মানদানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা হরিকীর্তন করলে তবেই অভীষ্ট ভক্তিলাভ সম্ভব। এস্থলে "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রেম-উদ্গমের প্রাক্‌চর্যা। ভাগবতেও দেখি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ত্রিশটি লক্ষণযুক্ত ধর্মের অনুশীলনে হরি সন্তুষ্ট হন[২]। সেই ত্রিশটি লক্ষণের অন্যতম তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা; কীর্তনও অপর এক বিশিষ্ট লক্ষণ। আবার ভাগবতেই উদ্ধবগীতায় ভক্তসত্তমের লক্ষণে কৃপালু অকৃতদ্রোহ এবং তিতিক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে নিজে অমানী হয়ে অন্যকে মানদানেরও উল্লেখ পাই। স্মরণীয়, "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্" তথা "অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ"[৩]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভক্তিশাস্ত্রে দৈন্যাদি যেমন ভক্তিলাভের প্রাকচর্য-রূপে, তেমনি আবার ভক্তের অনুভাব-রূপেও স্বীকৃত। কিন্তু শিক্ষাষ্টকের শ্লোকে দ্বৈধ কেন? আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, নামে রুচি থেকে ঈশ্বরে অনুরাগ হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত অথচ এখানে দেখছি দ্বিতীয় শ্লোকে নামে রুচি উপজাত হওয়া সত্ত্বেও হরিনাম এখনও "কীর্তনীয়" বা কীর্তন করা উচিত, এই প্রাক্‌চর্যার আভাস রয়েছে। বোধকরি তাৎপর্য এই, নামে রুচি জন্মালেও সাধকচিত্তে ভক্তির আবির্ভাব এখনও ঘটেনি। সুতরাং 'নামে রুচি' ও 'ভক্তি ভগবানে'র মধ্যে আর একটি স্তর স্বীকার্য, চৈতন্য-নির্দেশের মধ্যে তারই উল্লেখ আছে, 'জীবে দয়া' রূপে। শুধু দয়া নয়, কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জেনে জীবে সম্মানদানও: "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"[৪]। ভাগবতেও দেখি নারদ-নির্দেশিত ত্রিংশ লক্ষণেরও অন্যতম "দয়া" "অহিংসা" এবং জীবে "দেবতাবুদ্ধি"[৫]। এখানে উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যের তুল্য সিদ্ধভক্তের চেতোদর্পণে কিন্তু প্রথমে আবির্ভূত

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ২০, ১৬
২ ভা° ৭।১১।১২
৩ ভা° ১১।১১।২৯, ৩১
৪ চৈ. চ. অন্ত্য। ২০,২১
৫ ভা° ৭।১১। ৮, ১০

হয়েছে প্রেমভক্তি, পরে অনুভাবরূপে দৈন্য-তিতিক্ষা। তাই গয়ায় প্রথমে দেখি "দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির বিজয়"[১], পরে নবদ্বীপে দীনতাপ্রকাশ, বৈষ্ণবসেবা ইত্যাদি :

"... তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি কারে পায়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধূতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে ॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥[২]

আর "সবে পভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়"। মনে হয়, 'তৃণাদপি সুনীচেন...কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' শ্লোক-কথিত বৈষ্ণব-আচার তথা ভক্তিলক্ষণ চৈতন্যশিক্ষায় এবং চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। তাই প্রবোধানন্দের 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যে চৈতন্যভক্তবৃন্দ সম্বন্ধে বর্ণনা শুনি : "তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ"[৩]।

শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক সাধনভক্তির শেষ সীমা। অর্থাৎ, এখানে এসেই সাধকের চেতোদর্পণে 'প্রেমাংকুর' উদ্গত হয়েছে। এরই অপর নাম 'অহৈতুকী ভক্তি'। ভাগবতকে এই অহৈতুকী ভক্তির উপনিষৎ বলা যায়। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন এ কথা ভাগবতেরই[৪]। ভাগবতেই দেখি, সাংখ্যকার কপিল মাতা দেবহূতির নিকট বলছেন, অহৈতুকী ভক্তিই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণস্বরূপ[৫]। শিক্ষাষ্টকে চৈতন্যের প্রার্থনা ছিল : "ধন জন নাহি মাগোঁ—কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥" এই "শুদ্ধভক্তি" প্রার্থনায় ভাগবতে বৃত্রাসুরকেও বলতে শুনি :

"ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জসত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥"[৬]

১ চৈ. ভা. আদি। ১২, ১১২
২ চৈ. ভা. আদি। ২, ৪৩-৪৫
৩ চৈতন্যচন্দ্রামৃত, ৪র্থ বিভাগ, ২৪
৪ ভা° ১।৭।১০
৫ ভা° ৩।২৯।১১-১২
৬ ভা° ৬।১১।২৫

অর্থাৎ, আপনাকে ত্যাগ করে আমি স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, সার্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, এমন কি মুক্তিপদও চাই না।

লক্ষণীয়, চৈতন্যের শ্লোকাষ্টকে পুরুষার্থরূপে ধন-জন-কবিতা ও সুন্দরী বারিত হয়েছে, কিন্তু 'অপুনর্ভব' বা মুক্তিপদের প্রসঙ্গমাত্র নেই। বোধকরি তাঁর দৃষ্টিতে "মুক্তিবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান" বলেই তার উল্লেখ পর্যন্ত অনুপস্থিত। বস্তুত, ভাগবতের "ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে"[১]—জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মেই আমার ভক্তি জাত হোক, এই অন্তিম প্রার্থনার মতোই চৈতন্য-শিক্ষাষ্টকেও জন্মজন্মান্তরে ভক্তি কাঙ্ক্ষিত. "মম জন্মনি-জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি"। প্রসঙ্গত বলা দরকার, এ-শ্লোকের "সুন্দরীং কবিতাং বা" অংশের কেউ অর্থ করেন 'সুন্দরী কবিতা', ভাষান্তরে "সালঙ্কারাং কবিতাং" কেউ-বা 'সুন্দরী' ও 'কবিতা'। যে-অর্থেই গ্রহণ করা হোক না কেন শ্লোকে অপ্রার্থেয় পুরুষার্থ-রূপে কবিতার কথা আদৌ উঠলো কেন, কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। বোধকরি ইতোমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী-ঈশ্বরপুরীর গোত্রভুক্ত গৌরাঙ্গও সুকবিত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন। এক শিক্ষাষ্টকই তো তাঁর কবিত্বশক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ। ফলত ভক্তের দৃষ্টিতে কবিত্বশক্তির পরমার্থতা বিষয়ে সন্দিহান হওয়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। ভাগবতেও ভক্তিহীন সুকবিত্বের 'নৈষ্ফল্য' বর্ণনায় স্পষ্টীকৃত হয়েছে। ভাগবতের একস্থলে বলা হয়েছে, যে-জিহ্বা হরিনাম-গান করে না, তা ভেক-রসনার তুল্য. "জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব"[২]। অন্যত্র, ভগবানের হরিকথাশূন্য "বচশ্চিত্রপদং" চারুপদযুক্ত সুভাষিতকেও বলা হয়েছে 'কাকসেবিত-তীর্থ'[৩]। আসলে ভাগবতে হরিনামকীর্তন এবং ভগবানের পাদপদ্মবন্দনের চেয়ে প্রার্থিতব্য অপবর্গ আর কিছুই নেই। মুচুকুন্দ-স্তবে তাই বলা হয়েছে হে পরমেশ, হে হরি, অকিঞ্চনের প্রার্থিতম আপনার ওই পাদপদ্মের সেবা ছাড়া আমি আর কিছুই প্রার্থনা করব না কেননা, সর্ব অপবর্গদাতাকে আরাধনায় পরিতুষ্ট করলে কোন্ বিবেকবান পুরুষ আবার নিজের বন্ধনের কারণরূপে বর প্রার্থনা করবে? ভাগবতের ভাষায় :

> "ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনাদকিঞ্চন-
> প্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো।
> আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
> বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্॥"[৪]

---

১ ভা° ১২।১৩।২২ ২ ভা° ২।৩।২০ ৩ ভা° ১২।১২।৫০ ৪ ভা° ১০।৫১।৫৬

"ন কাময়েঽন্যং" এই ভাগবতীয় অপবর্গ-প্রার্থনার সঙ্গে অভিন্ন সুরে বাঁধা পড়েছে "ন ধনং ন জনং।" শেষোক্তে কথিত অহৈতুকী ভক্তিরই নামান্তর ভগবানের পাদসেবনাধিকার। "তব পাদসেবনাদকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো"। জীব হলো কৃষ্ণের পাদসেবক বা নিত্যদাস—গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই জীবতত্ত্ব এখানে ভাগবতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি লাভ করেছে বলেও মনে হতে পারে। জন্ম-জন্মান্তরে অহৈতুকী ভক্তিই আবার সে-জীবের সাধ্য বা পরম-পুরুষার্থ। সাধনভক্তির শেষসীমা নির্দেশে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাশ্লোকাষ্টকের প্রথম চতুষ্ক এইভাবেই সর্বার্থসাধক।

অপরপক্ষে শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকচতুষ্ক সিদ্ধাভক্তি ব্রজপ্রেমের পূর্ণামৃতাস্বাদ। এর ভিত্তি যদি হয় দাস্য, তবে সৌধশিখর মধুরাখ্য মহাভাব। শ্রীচৈতন্য আপন জীবনসাধনায় "আপনি আস্বাদি" সোপানপরম্পরা সেই "নিগূঢ় প্রেমে"রই শিখরসীমা নির্দেশ করে গেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে এখানেই সবাবতার-মধ্যে চৈতন্যাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন, রামাদি অবতারে রাক্ষস ও দৈত্যকুল বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল, সে আর কী গুরুতর কার্য? কপিলাদি দেবগণের দ্বারা যোগমার্গ প্রকটিত হয়েছিল, সে আর কী মহৎ ক্রিয়া? ব্রহ্মাদির দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় অনুষ্ঠিত হয়, সেই-বা এমন কী শ্রেষ্ঠ? বরাহ-আদি অবতারে মেদিনী-উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই-বা কী বরণীয়? শেষ পর্যন্ত আমরা তাই ভগবানের প্রেমোজ্জ্বলা পরমাভক্তির পথপ্রদর্শক সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যরূপকেই স্তুতি করি: "প্রেমোজ্জ্বলায়া মহাভক্তের্বর্ত্মকরীং পরং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্তিং স্তুমঃ।"[১] শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোক-চতুষ্কে প্রবোধানন্দ-বন্দিত এই "প্রেমোজ্জ্বল মহাভক্তির বর্ত্মকরী" চৈতন্যমূর্তিরই সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব। উক্ত প্রেমোজ্জ্বল পথে তাঁর ক্বচিৎ দাসভাব, ক্বচিৎ গোপীভাব। কিন্তু "গোপীভাবৈর্দাসভাবৈঃ", গোপী বা দাস যে-ভাবেই বিহার করুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বজন-শিক্ষা। সেদিক দিয়ে শ্লোকাষ্টকের আস্বাদন-মুখ্য শেষ-চতুষ্কও শিক্ষাষ্টকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।

শেষ চতুষ্কের প্রথম শ্লোক "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং" দাস্যভক্তিমূলক। এই দাস্য ব্রজ-মথুরা-দ্বারকা নির্বিশেষে সকল নিত্যপরিকরেই বিরাজিত। বিশেষত মাধুর্যলীলার সর্বোৎকর্ষবশে ব্রজপ্রেমেই দাস্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ। তাই ভাগবতে দেখানো হয়েছে, উদ্ধবাদি চরণশরণাগতের বা রুক্মিণ্যাদি

১ চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৫।৭

দ্বারকামহিষীর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদামাদির তুল্য সখ্যরসের পরিকর, নন্দযশোদার তুল্য বাৎসল্যরসের পরিকর এবং ব্রজগোপীদের তুল্য মধুররসের পরিকরবৃন্দের প্রগাঢ় প্রেমভক্তিও দাস্যরসে পরিপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়:

"কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥"[১]

উদাহরণস্বরূপ 'লঘু' পরিকরের পর্যায়ভুক্ত উদ্ধবের প্রার্থনাই সর্বাগ্রে মনে পড়তে পারে। "কো ন্বাশ তে পাদসরোজভাজাং"[২] শ্লোকে তিনি কৃষ্ণপদে নিবেদন করেছিলেন, হে বিরাটপুরুষ, আপনার পাদপদ্মের সেবকগণের পক্ষে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের কোনটিই-বা দুর্লভ? তবু আমি তার কোনো একটিও প্রার্থনা করি না। কেননা আমি-যে একমাত্র আপনার পাদপদ্মেরই অভিলাষী।

অনুরূপভাবেই দ্বারকার রুক্মিণ্যাদি "যতেক মহিষী"—"তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী"। তাই দেখি, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণনিকেতনে চিরপূজারিণীর সৌভাগ্যলাভ-প্রার্থনা রুক্মিণীর: "তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চনায়"[৩]। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শলাভের আশায় তপস্বিনী হয়েছিলেন যিনি, সেই কালিন্দীর অভিমান কৃষ্ণের গৃহমার্জনাকারিণী দাসীর: "সাহং তদ্গৃহমার্জনী"[৪]। আর সকল সপত্নীসহ নিজেকে "আত্মারাম" কৃষ্ণের গৃহদাসী-রূপে ঘোষণা লক্ষ্মণার: "আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ"[৫]।

ব্রজের সম-পরিকরগণ, যাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ "ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন—কেবল সখ্যময়" তাঁরাও "দাস্যভাবে করে চরণসেবন"। প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের "পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ"[৬] শ্লোকটিতে বর্ণিত সখাবৃন্দের কৃষ্ণ-পাদসংবাহনেরই উল্লেখ করা যায়।

"এহো হয়"। গুরুপরিকর-মধ্যে স্বয়ং নন্দ, কৃষ্ণে যাঁর "শুদ্ধবাৎসল্য", "তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে"। উদাহরণত, "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ"[৭] ও তৎ-পরবর্তী শ্লোকদ্বয়ই স্মরণ করা যেতে পারে। উক্ত দুটি শ্লোকে তিনি মথুরা থেকে আগত উদ্ধবদূতের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে-

১ চৈ, চ, আদি। ৬, ৪৯
২ ভা° ৩।৪।১৫
৩ ভা° ১০।৮৩।৮
৪ ভা° ১০।৮৩।১১
৫ ভা° ১০।৮৩।৩৯
৬ ভা° ১০।১৫।১৭
৭ ভা° ১০।৪৭।৬৬

ছিলেন, তাঁর মনের বৃত্তিসমূহ যেন কৃষ্ণের পাদাম্বুজাশ্রয় করে, তাঁর বাক্যসমূহ কৃষ্ণের নামে হয় অনুক্ষণ কীর্তনরত, তাঁর শরীর কৃষ্ণ-প্রণতিতে নিয়োজিত। এককথায়, প্রারব্ধ কর্মফলবশত যে-লোকেই ভ্রমণশীল হোন না কেন, কৃষ্ণেই থাকুক তাঁর অচলা রতি।

"এহোত্তম"। লঘু-পরিকরমধ্যে কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজরমণীদেরও সেই এক দাসী-অভিমান। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় বলতে গেলে, "যাঁ-সভা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। তাঁরা আপনাকে করে দাসী-অভিমান"[১]। প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের "ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং'[২] শ্লোকটিরই উল্লেখ করা যায়। শারদীয় রাসে অন্তর্হিত দয়িতের উদ্দেশে এ-শ্লোকে বনপরিভ্রমণশীলা ব্রজবধূদের বলতে শুনি, হে ব্রজজন-দুঃখনিবারী বীর, হে স্মিতহাস্যে স্বজনের গর্বহারী সখা, আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদের মনোরথ পূর্ণ কর, তোমার মনোহর কমলমুখ দেখাও। "ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয়"— শ্লোক-শেষাংশের এই "ভবৎকিঙ্করীঃ" দাসী-অভিমানের চূড়ান্ত স্মারক হয়ে থাকবে।

সর্বোত্তম, প্রধানা গোপী রাধাও "দাসী হৈঞা সেবেন চরণ"। তাই দেখি, কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা হয়ে রাসে তিনি "হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ" আর্তিতে দয়িতের সান্নিধ্য প্রার্থনা করেও নিজেকে তাঁর দাসী-সম্ভাষণই করেছেন: "দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্"[৩]। শুধু তাই নয়, ভ্রমরগীতায় বিরহবিজল্পে তিনিই সর্বগোপীর পক্ষ থেকে উদ্ধবদূতকে তাঁর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জানিয়েছিলেন: "ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং'[৪], কখনও কি তিনি তাঁর কিঙ্করী, এই আমাদের কথা বলেন?

উল্লেখযোগ্য, ব্রজগোপীবর্গ একাধিকবার নিজেদের কৃষ্ণপদাশ্রিতা কৃষ্ণদাসী-রূপে পরিচিতা করেছেন। রাসোৎসবে সমাগতা গোপীরা কৃষ্ণকে বলছেন, বিরহবহ্নিতে দেহ-বিসর্জন দিয়ে আমরা ধ্যানযোগে তোমার পদ লাভের পদবী-প্রাপ্ত হব, "বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে"[৫]। আরও বলছেন, আমরা তোমার পদধূলির শরণাগতা:

---

১ চৈ. চ. আদি। ৬, ৫৯ ২ ভা° ১০।৩১।৬

৩ ভা° ১০।৩০।৩৯ ৪ ভা° ১০।৪৭।২১

৫ ১০।২৯। ৫

"বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ"[১]। আবার,—পুরুষভূষণ, স্মরতাপে দগ্ধাদের দাস্য দাও, "তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্"[২]। পুনরপি বলছেন, লক্ষ্মীর রমণস্থল তোমার বক্ষ দর্শন করে আমরা দাসী হয়েছি, "বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ"[৩]। গোপীরা নিজেদের সুরতনাথ কৃষ্ণের "অশুল্কদাসিকা"[৪] অর্থাৎ বিনামাইনের দাসীও বলেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে, শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় চতুষ্কের প্রথম শ্লোকের দাস্য ব্রজবধূর দাস্যের অনুরূপ বোধ হবে। কেননা ব্রজবধূরা নিজেদের বলেছিলেন "ভবৎকিঙ্করীঃ", আর চৈতন্য, "কিঙ্কর"। গোপীরা বলেছিলেন "তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ", চৈতন্যও তাই, "তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলাসদৃশং বিচিন্তয়"। বাগ্‌ভঙ্গির সাদৃশ্য যতই থাক্ না কেন, আমরা চৈতন্য-প্রার্থিত এই দাস্যকে সিদ্ধাভক্তির প্রথম স্তর দাস্যেরই নামান্তর বলে মনে করি। একে মধুরের অশুল্ক দাস্য বলে ভুল করা অনুচিত। এখানে বলে নেওয়া ভাল, ব্রজ-মথুরা-দ্বারকা নির্বিশেষে প্রেমভক্তির সকল পরিকরেই দাস্য বর্তমান থাকলেও, সে-দাস্যের আস্বাদন-ভেদ আছে। উদ্ধবের কৃষ্ণকৈঙ্কর্যের সঙ্গে ব্রজগোপীর দাসী-অভিমানের 'বহুত অন্তর'। যে-উদ্ধবকে ভাগবতে বলা হয়েছে মুখ্যদাস "স্বভৃত্যমুখ্য"[৫] সেই উদ্ধবে দাস্যেরই পরাকাষ্ঠা, আর ব্রজগোপীতে মধুরেরই পরাকাষ্ঠা, দাস্য অন্যতম সঞ্চারী মাত্র। এখন প্রশ্ন, চৈতন্যের "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং" শ্লোকের কৃষ্ণকৈঙ্কর্যকে গোপীর দাসী-অভিমানের থেকে পৃথক্ করার যুক্তি কোথায়। অপর এক শ্লোকের আলোচনায় পূর্বেই বলেছি, কৈঙ্করসে স্থিরীকৃতমনা গোপীদের চিত্তে ভবভাবনা থাকতেই পারে না। অথচ দাস্যের শ্রেষ্ঠ পরিকর উদ্ধবের কৃষ্ণচরণে প্রার্থনায় সংসারকূপ 'দুস্তর তমে'র উল্লেখ পাই :

> "বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
> ত্বদ্‌বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥"[৬]

অর্থাৎ, হে মহাযোগী, আমরা কিন্তু সংসারের কর্মপথে ভ্রমণ করতে করতে তোমার ভক্তগণসঙ্গে তথা তোমার কথাকীর্তনে এই অপার অন্ধকার উত্তীর্ণ হব।

১ ভা° ১০।২৯।৩৭
২ ভা° ১০।২৯।৩৮
৩ ভা° ১০।২৯।৩৯
৪ ভা° ১০।৩১।২
৫ ভা° ১১।১৭।৮
৬ ভা° ১১।৬।৪৮

"তরিষ্যামঃ"—তৄ ধাতু তারণার্থে। অনুরূপ অর্থেই শঙ্করের গোবিন্দাষ্টকে গোবিন্দ হয়েছেন বহিত্র-স্বরূপ, "ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা"। চৈতন্যের শিক্ষাষ্টকে ভবাম্বুধির অনুষঙ্গে নন্দতনুজের পাদপঙ্কজও নৌকারই ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। ভাগবতে কুন্তীস্তবেও কৃষ্ণের পদাম্বুজ হয়ে উঠেছে ভবপ্রবাহের পারকারী: "ভবপ্রবাহো পরমং পদাম্বুজম্"[১]। এই "ভবপ্রবাহে"র সমার্থক "ভবাম্বুধি"র উল্লেখ থাকায় এবং 'কিঙ্কর' বা দাস-অভিমান প্রকাশের ফলেই শ্রীচৈতন্যের আলোচ্য শ্লোকটিকে আমরা বিশুদ্ধ দাস্যেরই অন্তর্ভুক্ত করেছি, গোপীদের মধুরাশ্রিত দাসী অভিমানের অন্তর্গত নয়। কিন্তু যে-শ্রেণীর দাস্যেরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, এর আস্বাদনও বড় কম চমৎকারকারী নয়। ঘোর ভবাধ্বনিতে দারুণ সংসারমার্গে উদ্ধব গোবিন্দচরণ-রূপ অমৃতবর্ষী ছত্র ভিন্ন অপর কোনো আশ্রয় দেখেননি, "পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ"[২]। ভাগবতের এই 'অমৃতাভিবর্ষণ' চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় হয়ে উঠেছে আনন্দাম্বুধিবর্ধন:

> "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
> কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥"[৩]

পরবর্তী চৈতন্যশ্লোকে কথিত অশ্রুধার-পুলকাদি এই "কৃষ্ণদাস অভিমানে" উচ্ছলিত "আনন্দসিন্ধু"রই বহির্লক্ষণ। এ সম্পর্কে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের মন্তব্য "এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমপ্রার্থনা করা হইয়াছে" কতদূর গ্রহণ-যোগ্য বলা কঠিন। কেননা ভক্ত ইতোমধ্যেই দাস্যরতি লাভ করেছেন, তাঁর কৃষ্ণদাস-অভিমান অংকুরিত হয়েছে। তবে যে "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং" শ্লোকের রসভাষ্যে শ্রীচৈতন্যকে বলতে শুনি, "প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন"? লক্ষণীয়, ভাগবতীয় শ্লোকে গোপীরা ছিলেন অশুল্কদাসিকা, শিক্ষাষ্টকের রসভাষ্যে ভক্ত কিন্তু সবেতন-দাসত্ব চান। তাঁর বেতন আর কিছুই নয়, প্রেমধন। এই প্রেমেরই লক্ষণ হবে নয়নের গলিতাশ্রু-ধারা, আবেগের রুদ্ধকণ্ঠতা, অঙ্গের পুলকাবলী ইত্যাদি। এখানে 'ভবিষ তি' ক্রিয়াপদ ভবিষ্যতেরই ইংগিতবাহী বলে মনে হতে পারে। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে প্রেমের বহির্লক্ষণগুলির অভাবে প্রেমধনের অভাবই এখানে সূচিত হচ্ছে। কিন্তু বস্তুতই কি তাই? নিজেকে

১ ভা° ১।৮।৩৫ ২ ভা° ১১।১৯।৯

৩ চৈ, চ, আদি। ৬, ৪০

কৃষ্ণের কিঙ্কর বলে জানবার পরেও কি প্রেমধন দূরে থাকে? "তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি" ভক্তের দৈন্যপ্রকাশসূচক নয় তো? বিশেষ করে ভাগবতে যখন আছে, "কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড্ ন পুনর্বিসৃষ্টমায়াগুণেষু রমতে"[১]—কৃষ্ণের পাদপদ্মের মধু একবার যিনি আস্বাদন করেছেন মায়াগুণে তিনি কি আর বিহার করেন? তখন তো তাঁর সাক্ষাৎ দাস্যভক্তি লাভ ঘটে। সেই সাক্ষাৎ দাস্যভক্তিই লক্ষণীভূত হয় "নয়নং গলদশ্রুধারয়া," অশ্রুবিগলিত নয়নে, "বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা," রুদ্ধবাক্য-বদনে, "পুলকৈর্নিচিতং" বপুতে বা পুলকাঞ্চিত শরীরে। ভাগবতেও পাই, বিনা রোমহর্ষণে, বিনা চিত্তদ্রবণে এবং বিনা আনন্দাশ্রুপ্রবাহে ভক্তি জানা যাবে কি করে? "কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ"[২]। কৃষ্ণ তাই উদ্ধবকে বলছেন, আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্য যার গদ্গদ এবং চিত্ত যার দ্রবীভূত হয়, যে পুনঃ পুনঃ রোদন করে, কচিৎ হাসে, কচিৎ লজ্জা পরিত্যাগ করে কীর্তন ও নৃত্য করতে থাকে, সেই মদ্ভক্তিযুক্তই তো ত্রিভুবন পবিত্র করতে সমর্থ: "বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ। বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি"[৩]। ভাগবতের ভক্তসত্তম প্রহ্লাদকে আমরা উল্লিখিত ভক্তলক্ষণে বিভূষিত দেখি। ভক্তলক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজেও এক স্থলে বলেছেন, ভগবানের লীলাবিগ্রহ-কৃত গুণ-কর্মাদির কথাশ্রবণে ভক্ত আনন্দাশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে গান করেন, কাঁদেন, নৃত্য-পরায়ণ হন। প্রহ্লাদ-কথিত এই "হর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি"[৪] দাস্যাভিমানী শ্রীচৈতন্যের "পুলকৈর্নিচিতং" বপুর সঙ্গে অভিন্ন। গোবিন্দদাসের বর্ণনা মনে পড়ে:

"বিপুল-পুলক-কুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥"[৫]

সর্বোপরি, কৃষ্ণকৈঙ্কর্যের এই আনন্দসিন্ধু শুধু লোকোত্তর সিদ্ধভক্ত চৈতন্য-দেহেই অশ্রুরোমাঞ্চে প্রকটিত হয়নি. তাঁর স্পর্শমণির স্পর্শে এই সাত্ত্বিক অনু-

১ ভা° ৬।৩।৩৩ ২ ভা° ১১।১৪।২৩
৩ ভা° ১১।১৪।২৪ ৪ ভা° ৭।৭।৩৪
৫ 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ' মজুমদার সং পৃ° ৬

ভাবসমূহ ঘরে ঘরে হরিনামকীর্তনের অবসরে রাগানুগা সাধকের দেহে দেহে পরিস্ফূর্তি লাভ করেছিল। প্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃতের ভাষায় "বভৌ দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুব্যতিকরঃ"[১]। প্রেমোজ্জ্বলা ভক্তি যখন এরূপ সাধারণ হয়ে পড়েছিল, তখন "দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন"-রূপ চৈতন্যোক্তি একান্তভাবেই ভক্তের দৈন্যোত্থিত বলেই প্রত্যয় হবে। সেক্ষেত্রে এ-শ্লোক সম্বন্ধে ড° নাথের মন্তব্য, "এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম প্রার্থনা করা হইয়াছে" কতদূর স্বীকার্য বলা সম্ভব নয়।

অবশ্য শিক্ষাষ্টকের এতৎ-পরবর্তী শ্লোক "যুগায়িতং নিমেষেণ" সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত অংশত গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে "শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার কি রকম অবস্থা হয়, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে"। বস্তুতই কৃষ্ণবিরহে রাধার নিমেষ যুগ হয়েছিল, নয়ন হয়েছিল বর্ষণঘন, এবং জগৎ সর্বশূন্য।

১. "রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে"[২]

২. "বিরহিন-নয়ন বিহল বিহিরে
অবিরল বরিসাত ॥"[৩]

অর্থাৎ বিরহিণীর নয়ন অবিরল বর্ষা করে গড়লেন বিধি।

৩. "সূন ভেল মন্দির সূন ভেল নগরী।
সূন ভেল দসদিস সূন ভেল সগরী ॥"[৪]

বিশিষ্ট পদকর্তাগণের এই রসবৈদগ্ধ্যপূর্ণ বর্ণনাই আমাদের উক্তির অনুকূলে উপস্থিত আছে। ভাগবতের গোপীগীতেও ব্রজবধূদের বলতে শুনি: "ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্"[৫]—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ক্ষণার্ধও যুগতুল্য হয়। কিন্তু এ তো শুধু ব্রজগোপীদেরই বিপ্রলম্ভাখ্য বিভূতি নয়। ভাগবতে আছে: "কস্তদ্বিরহং সহেত,"[৬] কে তাঁর বিরহ সহ্য করবে? এটি সাধারণভাবে ব্রজ-মথুরা-দ্বারকা নির্বিশেষে কৃষ্ণলীলার সমুদয় পরিকর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাই দেখি, কুরুক্ষেত্রের পর রাজধানীতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দ্বারকাবাসী বলেছিলেন, কৃষ্ণবিরহে তাঁদের ক্ষণ হয়েছিল কোটি-অব্দ তুল্য: "তত্রাব্দ-

১ চৈতন্যচন্দ্রামৃত ১০।১১৪ ২ শ্রীকৃষ্ণকী° রাধাবিরহ পৃ° ১৫০
৩ বিদ্যাপতির পদাবলী, মিত্র-মজুমদার স°, পৃ° ৩৪৫
৪ তত্রৈব, পৃ° ৪৫৫ ৫ ভা° ১০।৩১।১৫
৬ ভা° ৩।২।১৯

কোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো"[১]। প্রারষায়িত চক্ষু তো ভক্তমাত্রেরই বিধিলিপি। আর গোবিন্দবিরহে একমাত্র রাধারই জগৎ শূন্য হতো না। প্রসঙ্গত কালিয়বেষ্টনে আচ্ছন্নবৎ কৃষ্ণের দর্শনে গোপীদের সম্মিলিত মর্মবেদনা স্মরণীয়: "গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্"[২]। দয়িত সর্পগ্রস্ত হওয়ায় অতিশয় দুঃখসন্তপ্ত গোপীরা প্রিয়বিরহিত ত্রিলোক শূন্য দেখলেন।

তবে একথা অনস্বীকার্য, গোবিন্দবিরহে অশ্রুবর্ষণ, জগৎশূন্যতা প্রভৃতি অনুভাবসমূহ রাধার ক্ষেত্রে যে আত্যন্তিকতা লাভ করেছে, অন্য কোনো পরিকরের ক্ষেত্রে তা করেনি। বিরহিণী রাধা তাই পদাবলীর প্রাণপ্রতিমা, ভাষান্তরে ভাগবতের প্রধানা গোপী চিত্রজল্পের সারিকা। তাঁরই ভাবকান্তি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যের পক্ষে গোবিন্দবিরহে "যুগায়িতং নিমেষেণ" যুগপৎ রচনা করা ও আস্বাদন করা কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত রাধাভাবে চৈতন্যের বিরহদশাও যে সর্বাংশে অনুরূপ, তা চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার রসিক পাঠকের অজানা থাকার কথা নয়।

কিন্তু রসিকের দৃষ্টিতে বিরহে নয়, বিরহোত্তর আত্মনিবেদনেই শেষ সুধা সঞ্চিত। পদাবলী-পাঠকমাত্রেই জানেন, পূর্বরাগ-অনুরাগ-আক্ষেপানুরাগ-বিরহের পারেই অগ্নিশুদ্ধা কনকগৌরী রাধা আত্মনিবেদনের অশ্রুজলে বলেছিলেন:

> "বঁধু কি আর বলিব আমি।
> জীবনে মরণে জনমে জনমে
> প্রাণনাথ হৈও তুমি॥"[৩]

শিক্ষাষ্টকেও দেখি, "দারুণ বিরহ হুতাশ" পেরিয়ে এসেই শ্রীচৈতন্য বলছেন:

> "মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"।

এ ক্ষেত্রে ড° নাথের সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য: "এই শ্লোকে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়"। প্রকৃতপ্রস্তাবে, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়তা গোপীপ্রেমের একটি সাধারণ লক্ষণ। তাই দেখি, ভাগবতীয় গোপীবৃন্দ পাছে তাঁদের কঠিন বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোমল পদপল্লব আহত হয়, এই আশঙ্কায়

---

১ ভা° ৯।১১।৯ ২ ভা° ১০।১৬।২০

৩ বৈষ্ণব পদাবলী, ক° বি°

নিজেদের অমেয় সুখবর্ধনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কৃষ্ণচরণ স্ব স্ব বক্ষে ধারণ করতে ভীতা হতেন। বলা বাহুল্য, গোপীপ্রেমের এই সাধারণ লক্ষণ সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী রাধাপ্রেমে সর্বোৎকর্ষ লাভ করেছিল। শিক্ষাষ্টকের অন্তিম শ্লোকবাক্যের রসভাষ্যে উদ্ধৃত চৈতন্যোক্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ :

"না গণি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য ॥"

কোনো সন্দেহ সেই, চৈতন্যের 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' শ্লোকটি রাধাভাবে স্ফূর্ত এবং রাধাভাবেই আস্বাদিত। শিক্ষাষ্টক তথা সমগ্র চৈতন্য-জীবনবাণীর 'সারং সারং সমুদ্ধৃতম্' অমৃতনির্যাসই এ শ্লোকে পরিবেষিত। উপলব্ধির গভীরতায় এবং আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

আমাদের বিশ্বাস, সমগ্র বৈষ্ণব রসসাহিত্যে এ-শ্লোকের একটিই মাত্র তুলনা আছে, ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার সর্বশেষ শ্লোক : "অপিবত মধুপুর্যামার্যপুত্রঃ"। শ্লোকটির সমগ্র পটভূমিটি উদ্ধার করা যাক। "ক্রূরস্তমক্রূরসমাখ্যয়া," ক্রূর অক্রূরের সঙ্গে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। যাবার আগে সপ্রেমবাক্যে আশ্বাস দিয়ে গেছেন, "শীঘ্র আসছি"—"সপ্রেমৈর্যাস্য ইতি"[১]। এদিকে মথুরায় কংসবধাদি ঐশ্বর্যলীলার বিপুল পরিসরে ব্রজে প্রত্যাবর্তন তো দূরে থাক, বনৌকসা ব্রজললনাদের কাছে কুশলবার্তা পর্যন্ত পাঠানো হয়ে ওঠেনি। শেষে উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ও গুরুর মৃতপুত্র আনয়নের পর অবকাশমত একদিন নির্জনে তিনি উদ্ধবকে আনয়ন করে এনে সেই "বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ"[২] গোপীদের নিকট আপন দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করে তাঁকে ব্রজে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণদূত উদ্ধব ব্রজের বনসদনে আতিথ্য গ্রহণ করে নন্দযশোদাসহ সকল ব্রজবাসীর কৃষ্ণবিষয়ক বিরহসন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু ব্রজগোপীদের প্রেমরসসীমা তখনও তাঁর অজ্ঞাত। পরদিবস প্রাতে "গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ"[৩] সেই গোপীদের সাক্ষাৎ লাভ করলেন তিনি। গোবিন্দের বাল্যকৈশোর-কৃত বিচিত্র প্রিয়কর্ম "সোঙরি

---

১ ভা° ১০।৩৯।৩৫ ২ ভা° ১০।৪৬।৫

৩ ভা° ১০।৪৭।৯

সোঙরি'' তাঁদের তখন "মন ঝুর"—"কদাচিদপি স তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ"[১]। সেই ব্রজবধূদের মধ্যেও একজন আবার সে সময় আগত এক ভ্রমরকে প্রিয়প্রস্থাপিত দূত মনে করে মান-গর্ব-বিষাদ-অসূয়া-আত্মনিবেদনে যা বলেছিলেন, তাই ভ্রমরগীতা নামে প্রসিদ্ধ।

ভ্রমরগীতায় দেখছি, প্রথমত তিনি মথুরানাগরীদের কৃষ্ণ-সৌভাগ্যলাভে ঈর্ষিতা। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণের প্রলোভনময় কপটবাক্যের নিন্দাবতা। এ-নিন্দা যে নামান্তরে কপটী কৃষ্ণেরই দূষণ তা তৃতীয় শ্লোকে মথুরা-নাগরা-পরিবৃত 'যাদবাধিপতি' কৃষ্ণের প্রতি অসূয়াখিন্ন কটাক্ষেই স্পষ্ট। চতুর্থ শ্লোকে তাঁর অভিমানক্ষুব্ধ বক্তব্য, ত্রিভুবনের সমুদয় নারীই যিনি লাভ করতে সমর্থ, এমনকি লক্ষ্মীকেও যিনি কপটরুচির হাস্যে আর ভ্রূবিলাসে মোহিত করে সেবিকা করেছেন, তাঁর কাছে আমরা কে? "বয়ং কা"[২]? স্বভাবতই পঞ্চমে তিনি [illegible] হয়ে পারেন না, অকৃতজ্ঞের সঙ্গে সন্ধি করে ফল [illegible], "অকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন"[৩]। ষষ্ঠত, পুরাণের একাধিক ঘটনা উল্লেখ করে বোঝাতে চাইছেন, কী নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী নারীঘাতী ওই কৃষ্ণবর্ণের নরবিগ্রহ। ওই অসিতের সখ্যে প্রয়োজন কি তাঁদের? তবু তো দেখি সেই নিন্দিত-অসিতের প্রসঙ্গও বর্জন করতে পারছেন না তাঁরা। "অলমসিত-সখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ"[৪]। কৃষ্ণকথার এই অপরিত্যাজ্য মাধুর্যের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সপ্তম শ্লোকে তিনি তার ব্যাজস্তুতিই করছেন, বলছেন, একবার কৃষ্ণকথা শ্রবণ করলে স্বজনকে শোকসমুদ্রে ভাসিয়ে ভিক্ষুচর্যা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অষ্টমে নিজেদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলছেন, কৃষ্ণকথাশ্রবণে তাঁরা বৈরাগ্য অবলম্বন করেননি সত্য, কিন্তু তদপেক্ষাও মর্মন্তুদ ব্যাপার, ব্যাধের গীতমুগ্ধা শরাহতা হরিণী হয়েছেন: "কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ"[৫]। নবমে একাধারে গর্ব ও মান প্রকাশ করে বললেন, দূত কি তাঁদের কৃষ্ণাজ্ঞায় মথুরায় নিয়ে যেতে এসেছেন? তা কি করে হয়, কৃষ্ণ তো সেইসব মাথুর-পুরস্ত্রীর পার্শ্ব কখনো ত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না, যদিও করেন, তাতেই-বা কি যায় আসে। তাঁর বক্ষ তো কদাপি শূন্য হবার নয়, স্বয়ং লক্ষ্মীই তো তা অধিকার করে

১ ভা° ১০।৪৭।১০

২ ভা° ১০।৪৭।১৫

৩ ভা° ১০।২৭।১৬

৪ ভা° ১০।৪৭।১৭

৫ ভা° ১০।৪৭।১৯

বসে আছেন! বিরহসন্তাপের মর্মনিষ্ক্রান্ত এই শোক-গর্ব-মান-নৈরাশ্যকে অতিক্রম করে ভ্রমরগীতার সর্বশেষ শ্লোক দশমে এসে প্রধানা গোপী যা বললেন, তা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার পরাকাষ্ঠা, বিরহ-সমুদ্রপারে আত্ম-নিবেদনের স্থির সৌম্য অনন্ত পূর্ণিমা :

"অপিবত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥"[১]

হে সৌম্য, আর্যপুত্র এখন মধুপুরীতে তো? তিনি কি পিতৃগৃহ, স্বজন-বান্ধবদের কখনও স্মরণ করেন? গোপদের কথা মনে পড়ে তাঁর? আর কোনো অবসরে কি এই কিঙ্করীদের কথা বলেন তিনি? কবে তিনি তাঁর অগুরুসুগন্ধ হস্ত আমাদের মস্তকে স্থাপন করবেন?

লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী নটি শ্লোকে প্রধানা গোপী কৃষ্ণকে কখনও বলেছেন "কিতব" বা কপট, কখনও প্রলোভন-বাক্যপটু, কখনও বহুবল্লভ, কখনও কপটহাস্য- ও ভ্রূবিলাস-বিজ্ঞ, কখনও "অকৃতচেতা" বা অকৃতজ্ঞ, কখনও অন্তর-বাহিরময় কৃষ্ণবর্ণ, কখনও ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বনের কারণস্বরূপ, কখনও "কুলিক" বা ব্যাধ, কখনও আবার রমণী-পার্শ্বাচ্যুত স্ত্রৈণ। কিন্তু সকল বিক্ষোভই প্রশান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে, যেখানে পূর্ববর্তী বিরহবিদীর্ণ সকল ভর্ৎসনা-কঠিন রূঢ় সম্বোধনই পরমপ্রেমে 'আর্যপুত্র' সম্ভাষণে সমাহিত। রাসে আশ্লেষ মথুরাগমনে পাদপেষণ এবং অদর্শনে মর্মহত্যা-করণ পরে মথুরানাগরা সংগমে "যথা তথা বা" লাম্পট্য-বিহরণ যাঁর, সেই কৃষ্ণকেই প্রধানা গোপী বলেছেন "আর্যপুত্র" আর তাঁকেই চৈতন্য বলছেন "প্রাণনাথ"। মহাভাববতী প্রধানা গোপীর সঙ্গে মহাভাবারূঢ় শ্রীচৈতন্য এখানে একাকার। কিন্তু তটস্থ বিচারে ভাগবতীয় প্রধানা গোপী অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের সাধন দুরূহতর মনে হবে। ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোকে যে-বিচিত্র বিলসিত ভাব-বিভঙ্গ, শিক্ষাষ্টকের একটি মাত্র শ্লোকে তাই তরঙ্গিত। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় :

"ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।
এত ভাব একঠাঞি করিল উদয় ॥"[২]

১ ভা° ১০।৪৭।২১ ২ চৈ. চ, অন্ত্য।২০, ৩৫

বস্তুত, ঈর্ষা-উৎকণ্ঠাদি বিচিত্র স্তর অতিক্রম করে ভ্রমরগীতার শেষ শ্লোকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছার নিকষিত হেমকে প্রধানা গোপী যখন নিষ্কাশিত করছেন, শিক্ষাষ্টকের মাত্র শেষতম শ্লোকটিতেই চৈতন্য তখন তা সম্পাদন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, কৃষ্ণলীলায় প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় ছিল বিভিন্নাঙ্গ, পক্ষান্তরে চৈতন্যলীলায় “রসরাজ মহাভাব” একাঙ্গ। বোধ করি সেইজন্যই শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে প্রেমানুভূতির চরম স্তরে চৈতন্যের দুরূহতম পরাসিদ্ধি এমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। বিশেষত ভ্রমরগীতার স্তরপরম্পরা ছিল তাঁর আত্মসাক্ষিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। কবিরাজ গোস্বামী তারই বিবরণ দিয়ে বলছেন :

> ”কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হৈল।
> কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
> উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ
> ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥”[১]

কিন্তু এ তো নীলাচললীলায় শ্লোকটির আস্বাদন কালে তার রাধাভাবস্ফূর্তি। কিন্তু নবদ্বীপলীলায় এ শ্লোক “রচনা” কালে তার অনুরূপ ভাবোদয়ের প্রমাণ মেলে কি? একথা অনস্বীকার্য, নবদ্বীপলীলায় মুখ্যত তার “ঈশভাব”ই প্রকটিত, আর নীলাচলেই মুখ্যত “গোপীভাব”। কিন্তু “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ” হওয়ার জন্যই বোধ করি নবদ্বীপে ও কচিৎ গোপীভাব এবং নীলাচলেও কচিৎ ঈশভাব প্রকটিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, শ্রীমতী মালবিকা চাকী সম্পাদিত ‘বাসু ঘোষের পদাবলী’তে সংকলিত এবং নবদ্বীপলীলান্তর্গত বলে অনুমত এরূপ তিনটি [যথাক্রমে ২৫ সংখ্যক, ৪১ সং, ৫১ সং] পদের মধ্যে শেষোক্তটি গৌর-ভাবজীবনে ভ্রমরগীতার প্রভাব নির্দেশ করে :

> “নিরজনে বসি ভাবে পূরব বিচ্ছেদে।
> কোথা কৃষ্ণ বলি গোরা আঁখি মুদি কান্দে।
> ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ড়ে।
> চমকি চাহিয়ে কহে সুমধুর স্বরে॥
> হেদে রে নিলাজ অলি না পরশ মোরে।
> কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে।

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৪, ১১-১২

মথুরা-নাগরি-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত।
কৃষ্ণ অঙ্গে বনমালা অতি সুবাসিত ॥
সো রস লাগল তোহারি বদনে।
মধুপুর যাহ অলি ছোড়ি মঝু সদনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কান্দিয়ে।
মুঞি পাপী মরি গোরার বালাই লইয়ে ॥"

পদকর্তা বাসু ঘোষ ছিলেন চৈতন্য-পারিষদগণের অন্যতম, চৈতন্য-সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী কবি। উপরি-উক্ত পদে তাঁর বর্ণিত চৈতন্যলীলা কাল্পনিক তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ সত্যঘটনার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ করে, "কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে"—মর্মাহতা করে মথুরানগরে চলে গেছেন কৃষ্ণ, তবু তাঁর প্রতি এই অদ্বার্থ প্রেমসম্ভাষণ "প্রাণনাথ" চৈতন্যের বিশিষ্ট ভাবপ্রবণতাকেই স্মরণ করাবে। "মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ" ঘোষণাপত্রটি শেষ পর্যন্ত তাই ভাগবতীয় ভ্রমরগীতারই চৈতন্য-সাক্ষিক আর একটু নিবিড়, আর একটু সংহত ভাবাভিব্যক্তি হয়ে থাকবে।

চৈতন্যচরিতকার বলেছিলেন, "গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার"। উক্তিটি পরিবর্তিত করে বলা যায়, "শ্লোকরূপে শিক্ষাষ্টক গৌর অবতার"। বস্তুত, চৈতন্যের সমগ্র জীবনবাণী, উপলব্ধি ও দার্শনিক তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষাষ্টকের মাত্র আটটি শ্লোকেই অখণ্ড অমৃতাকারে বিধৃত। এক্ষেত্রে ভাগবতের পয়োনিধি তাঁর ভাবগম্ভীর চিত্তে যে কিভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তা এতাবধি আলোচনায় অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই উপসংহারে এসে স্বীকার করতেই হয়, ভাগবত-আস্বাদন ও ভাগবত-অনুভবেরই শেষ সীমা শিক্ষাষ্টক।

পঞ্চম অধ্যায়

ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন

ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—ভারতবর্ষীয় ভেদবাদী এই চতুঃসম্প্রদায়েই ভাগবত শাস্ত্ররূপে স্বীকৃত। দ্বৈতবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছেও "শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং"। কিন্তু ভেদবাদীর সেই সাধারণ শাস্ত্র ভাগবতকে আশ্রয় করেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তার জীবব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্যে, নামান্তরে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে, ব্রজপ্রেমের অনুগতিতে রাগানুগাসাধনের শ্রেষ্ঠত্ব-নির্দেশে, তথা পঞ্চম পুরুষার্থ পরমপ্রেমের আলোকে অতি সূক্ষ্ম ও অভিনব রসতত্ত্ব-অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভাবনে উক্ত চতুঃসম্প্রদায়-বহির্ভূত এক সম্পূর্ণাঙ্গ মত ও পথের প্রবর্তক। 'অমল প্রমাণ' ভাগবতশাস্ত্রের উৎস থেকে এই নব-মত ও পথের উৎসারণ বিশেষ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। সেই-সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়-গুরু শ্রীচৈতন্যের ভাগবতাতিরিক্ত ভাবোপলব্ধি এ-ধর্মদর্শনে যে সর্বশাস্ত্রাতিশায়ী সোপান সংযোজনা করেছে সে-বিষয়েও অবহিত না হয়ে উপায় নেই। তবে ভাগবত-শাস্ত্র থেকে গৌড়ীয় মতের উদ্ভবকে দার্শনিক পরিভাষায় 'বিকার' বা পরিবর্তন না বলে বিকাশ বা বিবর্তন বলাই শ্রেয়। ভাগবতে যা অনুচ্চারিত, অব্যক্ত বা আভাসিত মাত্র, তার সম্যক্ পরিস্ফুরণের মধ্যেই সেই ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরা নিহিত রয়েছে।

আমরা তো জানি, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন, এই ত্রিতত্ত্ব নির্ধারণেই ভারতীয় ধর্মদর্শনগুলির আবির্ভাব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবের পরম সেব্য কে, সেবনের উপায় কি, সেবাপ্রাপ্তির ফলই-বা কি, এই তিনটি পারমার্থিক জিজ্ঞাসার উত্তরদানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সম্বন্ধাদি ত্রিতত্ত্বের উপস্থাপন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর 'তত্ত্ব' 'ভগবৎ' 'পরমাত্ম' 'কৃষ্ণ' 'ভক্তি' এবং 'প্রীতি' এই ষট্সন্দর্ভের প্রথম চারটিতে সম্বন্ধ, এবং শেষ দুটির একটিতে অভিধেয়, অপরটিতে প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীজীবের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় কোষগ্রন্থের সমুদয় তত্ত্বগত ও রসগত সিদ্ধান্তের মোটা-মুটি ভিত্তিস্থাপন অবশ্য করে গিয়েছিলেন রূপ-সনাতন এবং গোপাল ভট্ট। তদুপরি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রূপ-সনাতন-শিক্ষাদি প্রসঙ্গে জানা যায়, পথিকৃৎ বৈষ্ণব আচার্যকুলের মানসদীক্ষা আবার চৈতন্য-প্রসাদেই সম্পন্ন হয়েছে। চৈতন্য-প্রসাদলাভে ধন্য উক্ত গোস্বামী-সমাজের সিদ্ধান্তসমূহের সারসংগ্রহ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সেইসঙ্গে গৌড়ীয়

বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের অন্যতম প্রবক্তারূপে নিজেও নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁর চৈতন্যচরিত গ্রন্থে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় আচার্যগণের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন বিষয়ক প্রস্থানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বে, ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাগবতের অভিমতই উদ্ধারযোগ্য।

সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে ভাগবত পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে প্রথমেই বলেছে: "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"[১]—জ্ঞানীর কাছে পরতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে, যোগীর কাছে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তের কাছে ভগবান্ রূপে কথিত হয়ে থাকেন। কৃষ্ণই 'ভগবান্ স্বয়ম'। ভাগবত তাই তাঁকে 'পরমানন্দ' 'পূর্ণ' 'ব্রহ্ম' 'সনাতন' প্রভৃতি পরতত্ত্ববাচী শব্দেও অভিহিত করেছে। তিনি আবার শুধু 'পূর্ণং ব্রহ্ম' রূপেই নন, 'পরং ব্রহ্ম' রূপেও ভাগবত-প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষে গর্গাচার্য নন্দকে জানিয়েছিলেন, এঁর বহু নাম বহু রূপ। সেই 'বহু নাম বহু রূপে'র একটি আংশিক তালিকা আমরা এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে 'ভাগবতে কৃষ্ণ' অনুচ্ছেদে উদ্ধার করেছি। এখানে স্বতন্ত্রভাবে আর দু'একটি নামরূপের কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। উদাহরণত প্রথমেই তাঁর 'বাসুদেব' নামটি মনে পড়বে। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" ভাগবতের এই দ্বাদশাক্ষর বীজমন্ত্রে 'বাসুদেব' শব্দ ভগবৎ-শব্দ-সংজ্ঞক হয়ে উঠেছে। বস্তুত ভাগবতে শুদ্ধ, একস্বরূপ, বাহ্যাভ্যন্তর-শূন্য, পরিপূর্ণ, বিষয়াকারে অপরিণত ও নির্বিকার—এই ষড়ৈশ্বর্যগুণময় জ্ঞানই ভগবান্‌রূপে শব্দিত, ভগবান্‌ও আবার বাসুদেব-নামেই হয়েছেন চিহ্নিত। মায়ারচিত দ্বৈতপ্রপঞ্চে একমাত্র সত্যস্বরূপ সেই পরমার্থজ্ঞানকেই পণ্ডিতবর্গ বলেন 'বাসুদেব'। ভাগবতের ভাষায়:

"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥"[২]

এক কথায়, ভাগবতে বিশুদ্ধ সত্ত্বই 'বাসুদেব'। প্রমাণস্বরূপ "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশব্দিতং"[৩] শ্লোকটি স্মরণ করা যায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপে তিনি যেমন বাসুদেব, সর্বব্যাপক বস্তুরূপে তিনি তেমনি 'বিষ্ণু', আর সর্বজীবের আশ্রয়রূপে 'নারায়ণ'। ভীষ্ম তাঁকে "সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ"[৪] বলে

১ ভা° ১।২।১১
২ ভা° ৫।১২।১১
৩ ভা° ৪।৩।২৩
৪ ভা° ১।৯।১৮

প্রণতি জানিয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মমোহনলীলায় যে-নারায়ণকে কৃষ্ণের অঙ্গমাত্র[১] বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শেষোক্ত নারায়ণ অবশ্যই আদিপুরুষেতর চতুর্ভুজ নারায়ণ হবেন। এখানে বলা প্রয়োজন, ভাগবতে কৃষ্ণের অংশাবতারত্ব-সূচক শ্লোক পাওয়া যায় না, এমন নয়। তবে উপক্রম-উপসংহারাদি অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করেই বলা যায়, ভাগবতের মূল অভিপ্রায় কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা প্রতিষ্ঠায়। 'সর্বকারণকারণ' রূপে তাঁরই সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে ভাগবতীয় শক্তিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। চতুঃশ্লোকীতে তাঁরই রূপ গুণ কর্ম বা লীলাদির তত্ত্বানুভব হয়েছিল ব্রহ্মার। ভাগবত-সিদ্ধান্তিত পথে অগ্রসর হলে দেখি, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের কারণ, সর্বজ্ঞ ও স্বরাট্, ভাষান্তরে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান। 'ধাম্না' বা মহৎ তেজঃপ্রভাবে তিনি 'নিরস্তকুহক' বা মায়াকপটের অপসারকও বটেন। উল্লেখযোগ্য, ভাগবতে পরব্রহ্মের শক্তিও স্বীকৃত। "অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ"[২] শ্লোকে তাই বলা হলো, যিনি অব্যক্ত অপ্রমেয় তাঁ থেকেই নানাশক্তির উদয়। রাসলীলায় ব্রজগোপীরাও পরমপুরুষের শক্তির সঙ্গেই উপমিতঃ— "পুরুষঃ শক্তিভির্যথা"[৩]। অপরপক্ষে 'মায়া'ও তাঁর 'স্বশক্তি' রূপে[৪] উল্লিখিত। যে-মায়া সম্বন্ধে ভাগবতেই বলা হয়েছে, সে ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে পর্যন্ত আসতে লজ্জা পায়,[৫] বলা বাহুল্য, সেই মায়া ও পূর্বোক্ত গোপীরা ভগবানের একই শক্তির বিকাশ হতে পারে না। এখানেই ভগবানের চিৎ ও অচিৎ দুই বিভিন্ন শক্তি স্বীকার্য হয়ে পড়ে। মায়া অচিৎ শক্তির বিকার হয়েই সর্বভূতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে ভগবানের সহায়তা করে চলেছে[৬]। আর তাঁর চিৎশক্তি করছে সেই মায়ারই গুণপ্রবাহকে নিরস্ত[৭]। ধ্রুব তাঁর প্রার্থনায় অখিলশক্তিধরের এই চিৎশক্তি প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, 'স্বধাম্না' বা স্বশক্তিবলেই ভগবান জীবের অন্তরে প্রবেশ করে তার সুপ্ত বাক্‌শক্তি তথা হস্তপদ শ্রবণত্বক

১ ভা° ১০।১৪।১৪

২ ভা° ৪।১১।২৩

৩ ভা° ১০।৩৩।১০

৪ "স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ" ভা° ৪।১১।২৬

৫ "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া" ভা° ২।৫।১৩

৬ "এষ ভূতানি ভূতাত্মা ভূতেশো ভূতভাবনঃ।
স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ॥" ভা° ৪।১১।২৬

৭ "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সঞ্জীবিত করে তোলেন[১]। ভাগবতে বারংবার উল্লিখিত এই 'স্বধাম্না' বা 'স্বতেজসা' পদটিকে শ্রীধর এবং সনাতন গোস্বামী সংগত কারণেই ব্যাখ্যা করেছেন 'চিচ্ছক্ত্যা' বা 'স্বরূপশক্তিপ্রভাবেণ' বলে। ভাগবত অবশ্য ভগবানের স্বরূপশক্তির তিনটি বিকাশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের মতো স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ"[২] না বললেও হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিৎ এই ত্রিশক্তির অধিষ্ঠাতা শক্তিমান্‌রূপে ভগবান যে 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' এ-বিষয়ে ভাগবতীয় অভিপ্রায় অন্যরূপ নয়। তাই দেখি, বসুদেব তাঁর কৃষ্ণবন্দনায় ভগবান্‌কে "কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্"[৩] বলেছেন। তাঁর এই অনুভব-আনন্দ-বুদ্ধিদৃক্ তথা সৎ-চিৎ-আনন্দময় মূর্তি যে তাঁর স্বরূপভূত, তারও আভাস মেলে "নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ"[৪] শ্লোকে। স্পষ্টই বলা হলো এখানে, তাঁর রূপ তাঁর স্বরূপের মতোই আনন্দমাত্র, 'অবিকল্প' বা ভেদশূন্য এবং 'অবিদ্ধবর্চ' বা অনাহতপ্রকাশ, ভাষান্তরে অনাবৃত; আবার বিশ্বের সৃষ্টিকারী বলে এ-রূপ বিশ্ব থেকে ভিন্নও বটে এবং ভূতসমূহের ও ইন্দ্রিয়বর্গের কারণ বলে উপাসনারও যোগ্য। স্মরণীয়, তাঁর শঙ্খচক্রাদি ভূষণকেও ভাগবত বলেছে "বিকল্পরহিতং স্বয়ম্"[৫]। আর তাঁর "মর্ত্যলীলৌপয়িকং" বা মর্ত্যলীলার উপযোগী দেহরূপ তাই ভাগবতের মতে "রূপমনিদং"[৬] বা প্রপঞ্চাতীত রূপ। নারদকেও বলতে শুনি, ভগবান একদিকে যেমন "স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া গুণপ্রবাহং" বা চিৎ-শক্তিবলে নিত্য মায়াগুণ-প্রবাহকে নিবৃত্ত করছেন, অন্যদিকে তেমনি আবার "আত্মমায়য়া বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম"[৭], অর্থাৎ আত্মমায়ায় অশেষবিশেষ কল্পনা নির্মাণ করে থাকেন। সে "কল্পনম" কি? "ক্রীডার্থমাত্তমনুষ্যবিগ্রহং"—ক্রীডার্থে "আত্ত" বা গৃহীত মনুষ্যবিগ্রহ, এক কথায়, কৃষ্ণ-রূপ। এ-রূপ সম্বন্ধে অক্রুর-সংবাদে বলা হয়েছে "ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্", অর্থাৎ ত্রিলোক-

মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥" ভা° ১।৭।২৩

১ "যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্ প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥" ভা° ৪।৯।৬

২ বিষ্ণু° ১।১২। ৬৯

৩ ভা° ১০।৩।১৩

৪ "নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥" ভা° ৩।৯।৩

৫ ভা° ৬।৮।৩২ ৬ ভা° ১০।২।৪২ ৭ ভা° ১০।৩৭।২৩

সুন্দর। তবে যে লীলাসংবরণকালে তাঁর সেই লোকাভিরাম স্বতনু তাঁরই স্বকৃত যোগধারণার দ্বারা অগ্নিতে দগ্ধ[১] হওয়ার প্রসঙ্গ পাই ? এই স্ববিরোধিতার উত্তরদান করে ভাগবতে বলা হয়েছে, মর্ত্যদেহের শেষ গতি কি, তাই দেখবার জন্যই তাঁর এই লীলা[২]। তাৎপর্য, পঞ্চভূতাতীত তাঁর "রূপমনিদং" ভস্মীভূত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়।

লক্ষণীয়, ভাগবতে পরমাত্মারূপী, পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শুধু সবিশেষ সশক্তিক সচ্চিদানন্দ বগ্রহই নন, তিনি অনন্তগুণালয়ও বটেন। শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মলক্ষণের বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ও তাঁতে নিত্য-বিরাজিত। ধ্রুব তাঁর প্রার্থনায় হরিকে বলেছিলেন কূটস্থ আদিপুরুষ তথা ত্রিগুণের অধীশ্বর, "কূটস্থ আদি-পুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ",[৩] তাঁকে বিরুদ্ধধর্ম নিত্য উদ্ভূত হচ্ছে, "যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি"[৪]। প্রসঙ্গত উদ্ধবের কৃষ্ণলীলানুস্মরণও মনে পড়ে :

"কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন রতে খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥"[৫]

অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয় হয়েও তিনি কর্ম করেন, অজ হয়েও করেন জন্মগ্রহণ, স্বয়ং কালরূপী হয়েও শত্রুভয়ে পলায়নপর হয়ে তাঁর দুর্গাশ্রয়, আত্মরতি হয়েও বহুস্ত্রীপরিবৃত হয়ে গার্হস্থ্যাশ্রম পালন। স্বভাবতই এই বিচিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে বিদ্বজ্জনের বুদ্ধি সংশয়ে খিন্ন হয়।

বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়রূপে যুগপৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যেরও পরাকাষ্ঠা তিনি। তারই প্রমাণস্বরূপ ভাগবতের একটি অনবদ্য শ্লোক উদাহরণীয় :

"সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা
বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥"[৬]

অর্থাৎ, যে-কর কমলে পূজোপকরণ প্রদান করে দেবরাজ ও বলি ত্রিজগতের

......

১ "যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্", ভা° ১০।৩০।৬

২ 'মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্', ভা° ১১।৩১।১৩

৩ ভা° ৪।৯।১৫

৪ ভা° তত্রৈব। ১৬

৫ ভা° ৩।৪।১৬

৬ ভা° ১০।৩৮।১৭

ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন, সেই করপঙ্কজই আপন স্পর্শে রাসবিহারিণী ব্রজরমণীদের শ্রমজল মার্জনা করে দিয়েছিল।

ভগবানের বিশুদ্ধ ঐশ্বর্যরূপের চূড়ান্ত বর্ণনা হিসাবে ভাগবতের উক্তি স্মরণ করা যায়, অনন্তে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র পরমাণুর মতোই পরিভ্রমণ করছে[১]; অথবা ব্রহ্মমোহনলীলার অন্তে কৃষ্ণচরণে ব্রহ্মার সাধ্বসপূর্ণ উক্তিও, কোথায় আমি এই প্রকৃতি-মহত্তত্ত্ব-অহংকারতত্ত্ব-আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-পৃথিবী অষ্টাবরণ বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডঘটের মধ্যে সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহধারী ক্ষুদ্র জীব, আর কোথায়ই-বা মহামহিম আপনি যাঁর লোমকূপে এরূপ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে।[২] পুত্রের জৃম্ভিত মুখবিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করে যশোদাও বিস্ময়বিমূঢ়া হয়ে চিন্তা করেছিলেন, একী স্বপ্ন, একী দেবমায়া। নাকি আমারই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটলো। অথবা এ আমার এই শিশুরই কোনো স্বাভাবিক ঐশ্বর্য ?[৩] কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয়, দেবকীর মতো ভয়ভীতচিত্তে কৃষ্ণবন্দনা না করে তিনি এরপরও কৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধিই পোষণ করেছিলেন। এখানেই ঐশ্বর্যের উর্ধ্বে মাধুর্যের স্থান নিরূপিত হয়ে গেছে; সেইসঙ্গে ব্রজে তাঁর মাধুর্যের চরমোৎকর্ষও। ভগবান্ গোকুলেশ্বর-রূপে ব্রজই তাঁর নিত্যধাম। এই নিত্যধাম ব্রজে বিকশিত তাঁর লীলামাধুরী আস্বাদনের জন্য এমনকি নারায়ণের বক্ষোলগ্না লক্ষ্মীও সুকঠোর তপশ্চর্যা করেছিলেন বলে ভাগবত জানিয়েছে[৪]। ব্রজপ্রেমের এমনই 'অকথ্যকথন' মহিমা। ব্রজের সমুদয় গোপগোপীই যে তাঁর নিত্যসিদ্ধ পরিকর তার ইংগিত আছে ভগবানের সঙ্গে তাঁদেরও ধরাবতরণের প্রসঙ্গে। বসুদেব-দেবকীও স্বভাবতই তাঁর আবির্ভাবের নিত্যস্থান। বসুদেব তাই "আনকদুন্দুভি" এবং দেবকী "দেবরূপিণী"। সূর্যের সঙ্গে তুলনা[৫] করে কৃষ্ণের লীলাকেও যে নিত্য বলা হয়েছে এবং সূর্যগতির মতো তাও আবর্তিত হয়ে চলেছে, এ সম্পর্কেও অনেকেই নিঃসন্দেহ। ভগবানের ভক্তবিনোদন বৃত্তিও ভাগবতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে যখন কংসকারাগারে দেবকীর

১ ভা° ৬।১৬।৩৭ ২ ভা° ১০।১৪।১১

৩ "কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথ অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ ১০।৮।৪০

৪ "কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥" ১০।১৬।৩৬

৫ ভা° ৩।২।৭

গর্ভবন্দনায় হরির উদ্দেশে সম্মিলিত দেবতারা বলেন, আপনার তো জন্মাদি কিছুই নেই, তবু যে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাতে আপনার বিনোদ বা ক্রীড়া ছাড়া আর কোনো হেতু আছে বলে মনে করতে পারি না।[১] ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রহ্মাও নিবেদন করেছিলেন, প্রপঞ্চাতীত হয়েও আপনি প্রপন্ন বা শরণাগতজনের আনন্দবর্ধনের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন।[২] ব্রহ্মার এই উক্তির মধ্যে প্রপঞ্চ বা মায়ার সঙ্গে প্রপঞ্চাতীত ভগবানের যোগসূত্র স্থাপনের অবকাশ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, দেখা যাক।

ভাগবতের মতে, 'ত্রিবর্ণা' রূপে মায়া সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের 'গৌণ' নিমিত্ত-কারণ মাত্র। পক্ষান্তরে পরব্রহ্মই জগতের যুগপৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁরই কটাক্ষে প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ জন্মায় বলে মায়া জগতের মুখ্য উপাদান কারণও তাই হতে পারে না। সর্ব একান্তভাবে তদধীন হয়েই অনিত্য সংসারে মোহগ্রস্ত করে তুলছে জীবকে, মায়াই তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সহায়িকা শক্তি: "স্বশক্ত্যা মায়য়া যুক্তঃ সৃজত্যত্তি চ পাতি চ।" এখানেই মায়াতত্ত্বের সঙ্গে অন্বিত জীবতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের ভাগবতীয় ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ ওঠে।

ভাগবত বলেছে, জীব ও ঈশ্বরভেদে ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ। ঈশ্বর তো সর্বব্যাপী বায়ুর মতোই স্থাবর-জঙ্গমে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করছেন।[৩] আর সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরই সূক্ষ্মতম বস্তুরূপে জীব-নামে অভিহিত। উদ্ধবের নিকট বিভূতিযোগ-কথনে ভগবান্ তারই সমর্থনে বলেন "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ"[৪] বা সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে আমিই জীব। স্বরূপত চিদ্বস্তু হওয়ার ফলে এই অণু ও বিভু, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ-নির্ণয় ভাগবতের "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্"[৫] হয়ে উঠেছে। এইজন্যই ভাগবতের নির্দেশ "ধিয়া যোগপ্রবৃত্তয়া" "ভক্ত্যা" "বিরক্ত্যা" এবং "জ্ঞানেন" জীবাত্মাতে পরমাত্মার অনুচিন্তা করতে হবে[৬]। এখন প্রশ্ন, দেহস্থ হয়ে পরমাত্মার কি বিকার সম্ভাবনা থাকে না? ভাগবত এ-প্রশ্নেরও উত্তরদান করে বলেছে,

১ "ন তেহভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে" ১০।২।৩

২ "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥" ১০।১৪।৩৭

৩ "যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্ট" ভা ৪।১১।১১

৪ ভা° ১১।১৬।১১ ৫ ভা° ১২।১৩।১২ ৬ ভা ৩।২৬।৭২

জলে প্রতিবিম্বিত হয়েও সূর্য যেমন সলিলাক্রান্ত হয় না, তেমনি দেহস্থ হয়েও পরমাত্মা প্রকৃতির গুণজনিত সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হন না[১]। তাঁর সংসার-পদবীপ্রাপ্তির একমাত্র সম্ভাবনা থাকে তখনই যখন তিনি অহংকার-বিমূঢ়াত্মা হয়ে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন। বিষয়টি আরো পরিস্ফুট হয়েছে ভাগবতেরই পুরঞ্জন-কাহিনীর অবতারণায়। উক্ত কাহিনার রূপকাবরণভঙ্গে জীবাত্মার উদ্দেশে পরমাত্মাকে বলতে শুনি, তুমি-আমি দুই হংস "হংসাবয়ঞ্চ", একদা মানস-সরোবরে বাস করতাম; কালগ্রস্ত ও মায়ামোহিত হয়ে তুমি পূর্বজন্মে নিজেকে পুরুষ এবং এ-জন্মে নিজেকে স্ত্রী ভাবছো; কিন্তু পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব কোনো ভাবই জীবে নেই, পরন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই আমরা শুদ্ধ; আমি তোমার থেকে ভিন্ন নই, তুমিও আমার থেকে ভিন্ন নও, বিশেষত পণ্ডিতবর্গ আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ দেখতে পান না; পুরুষ যেমন দর্পণে ও অপর পুরুষের চোখে তার এক দেহকেই দুই দেহ-রূপে দর্শন করে, তেমনই অলীক জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদকল্পনা[২]। স্মরণীয়, জীব ও পরমেশ্বরের অভেদ-প্রতীতির মতো ভেদ-প্রতীতিও আবার ভাগবতেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। পূর্বেই দেখেছি, জীবকে অণু এবং ঈশ্বরকে বিভু পদার্থ বলে বর্ণনা করেছে ভাগবত। অন্যত্র দেখি, ঈশ্বরকে যখন "মায়েশ"[৩] বলে বর্ণনা করে এ-পুরাণ, জীবকে তখন বলে মায়াপরাধীন[৪]। পরব্রহ্মের দৃষ্টিপথে আসতেও যে-মায়া লজ্জিত বোধ করে, সেই মায়াই আবার জীবপক্ষে "দুরত্যয়া", দুষ্পার। এই মায়ার প্রভাবেই জীব লিঙ্গশরীর ধারণ করে কখনও জন্ম, কখনও মৃত্যুর বশীভূত। ভাগবতে কৃষ্ণ তাই উদ্ধবসকাশে জীবকে বলেছিলেন, 'অনাদি-অবিদ্যা-যুক্ত'[৫]। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞসমাগমে সাধুসঙ্গে আত্মস্বরূপের পরিচয় লাভেই তার মায়াবন্ধ-মোচন হয় বলেও বলা হয়েছে। এখানেই ভাগবত-কথিত জীবতত্ত্বের একটি নূতন স্তরের ইংগিত পাওয়া যায়। সেটি আর কিছু নয়, পরমেশ্বর ও জীবের সেব্যসেবকত্ব। ভাগবতের মুচুকুন্দ-স্তবে প্রার্থ্যতম

১ "প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ॥" ভা° ৩।২৭।১

২ "যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ॥" ভা° ৪।২৮।৬৩

৩ ভা° ২।৫।২১ ৪ ভা° ২।৫।১৩

৫ ভা° ১১।২২।১০

অপবর্গ বা পুরুষার্থরূপে কৃষ্ণের পাদসেবনাধিকারই উল্লিখিত। জীব ও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ অভিন্ন হলে সেবনও স্বভাবতই অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিশেষত ভাগবত থেকে উভয়ের ভেদবাচী উক্তিসমূহও একই ভাবে উদ্ধারযোগ্য। সর্বোপরি, মায়াধীশ ঈশ্বর সৃষ্টিতত্ত্বে এসে একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে আত্মপ্রকাশ করে জীবেরও চিত্তবৃত্তির পরিচালক সর্বাধ্যক্ষ হয়ে উঠেছেন। জীব-হৃদয়ে তিনিই "অধ্যাত্মদীপ"[1] বা বুদ্ধ্যাদির প্রকাশক। ভাগবতে জীবতত্ত্ব তাই শেষ পর্যন্ত পরতত্ত্বেরই মুখাপেক্ষী বলতে হয়। প্রসঙ্গত শ্রুত্যভিমানিনীদের উক্তি মনে পড়ে যাবে, জীব যদি সর্বগত নিত্যস্বরূপ হয়, তাহলে, 'দেহধারী জীব শাসনাধীন' বলে যে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আছে, তা আর সংগত হয় কি ?[2]

ভাগবতে সৃষ্টিতত্ত্বও পরতত্ত্বেরই একান্ত অঙ্গীভূত। পরব্রহ্মই এ-পুরাণে জগতের যুগপৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। 'ঊর্ণনাভি' তাই তাঁর সার্থকতম উপমান[3]। ভাগবত বলে, তিনি "অসঙ্গ" হয়েও মনের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করেছেন : "মনসৈব বিশ্বং সৃজতঃ বততঃ গুণৈরসঙ্গঃ"[4]। এখানে "অসঙ্গ" শব্দটি লক্ষণীয়। ভাগবতের অভিমত অনুসারে, পরমপুরুষ বা "প্রধানপুরুষ"-রূপে ঈশ্বর হলেন প্রকৃতি থেকে ভিন্ন : "প্রকৃতেঃ পরঃ"। স্বপ্রকাশ তিনি, "স্বয়ং-জ্যোতিঃ"। সূক্ষ্মা দেবী গুণময়ী প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে "লীলয়া" বা লীলাহেতু উপগতা হলে তিনি তাঁকে যদৃচ্ছাক্রমে গ্রহণ করেন,[5] এইমাত্র। পরম-পুরুষের "অসঙ্গ" অভিধা তাই অযথার্থ নয়। আবার সেই অসঙ্গ পরমপুরুষই জীবের অন্তরে 'ভগবান্', বাইরে 'কাল'। তাঁরই বীর্যাধানে প্রকৃতিগর্ভে সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে বলে ভাগবতের সিদ্ধান্ত[6]। এইভাবেই পরব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হওয়ার ফলে ভাগবত আর বিশ্বসৃষ্টিকে তত্ত্বত 'অসৎ' বা মিথ্যা বলতে পারে না। জগৎ তাই তার মতে, "স্বপ্নাভং" বা

---

১ ভা ১০।১।২৯

২ "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা" ভা° ১০।৮৭।৩০

৩ "ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে" ভা° ২।৯।২৮ তাৎপর্য, ঊর্ণনাভ যেমন নিজেরই সূত্রজালে নিজেকে আবদ্ধ করে, অব্যর্থসংকল্প মাধবও তেমনি নিজের থেকেই জগৎ রচনা করে ক্রীড়া করেন।

৪ ভা° ১।৫।৬

৫ "স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥" ভা° ৩।২৬।৪

৬ "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥" ভা° ৩।২৬।১৯

স্বপ্নবৎ মিথ্যাভূত হয়েও শুধু অনন্তে তথা নিত্যানন্দ-বোধ-তনুতে অধিষ্ঠিত বলেই সত্যবৎ আভাসিত[১]। তবে এইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, পরব্রহ্মের সঙ্গে জগতের ভেদও ভাগবত সুস্পষ্টরূপেই নির্দেশ করেছে। তাই দেবর্ষিকে বলতে শুনি, সূর্যপ্রভা সূর্য থেকে স্বরূপত অভিন্ন হয়েও যেমন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি হরিও 'জগদাত্মক' হয়েও 'জগদতিরিক্ত' রূপে প্রতায়মান। এখানেই ভাগবতকে সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণামবাদী বলতে হয়। ভাগবতে বহুস্থলেই পরব্রহ্মকে "অবিকার" বলা হয়েছে ; তাৎপর্য, জগৎরূপে পরিণত হয়েও তিনি অপরিবর্তিত। এ সম্বন্ধে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি করেছিলেন শঙ্কর—হরিপাদপদ্মে মোহিনীরূপ-দর্শনের বিনীত প্রার্থনায় :

"একস্ত্বমেব সদসদ্ দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥"[২]

অর্থাৎ, স্বর্ণ যেমন এক হয়েও অলংকাররূপে অনেক হয়, সেইরূপ আপনিও এক হয়েও কারণরূপে সৎ ও অদ্বিতীয়, এবং কার্যরূপে বা জগৎ-রূপে অসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, এতে বস্তুগত কোনো ভেদ ঘটছে না। অবশ্য আপনি স্বরূপত উপাধিমুক্ত হলেও গুণসমূহের দ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত হয়। আর সেইজন্যই জীবগণ অজ্ঞানতাবশত আপনাব বিকল্প বা তত্ত্বভেদ কল্পনা করে থাকে।

ভাগবতীয় সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ে এই যে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা ভাগবত-বিখ্যাত চতুঃশ্লোকীতেই মাত্র চারটি শ্লোকে নিবদ্ধ হয়েছে। সৃষ্টি-তত্ত্ব জীবতত্ত্ব মায়াতত্ত্ব—এই ত্রিতত্ত্ব-সমন্বিত তথা ত্রিতত্ত্বাতীত পরব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অপরিহার্য এই চতুঃশ্লোকীই তাই আমাদের সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনার সারসংগ্রহে সর্বার্থসাধক হয়ে উঠবে। সৃষ্টির পূর্বে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়ে ভগবান্ বলছেন :

১. সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, সদসৎ আর কিছুই ছিল না, প্রলয়ের পরও যা থাকবে, তাও আমিই। এই যে জগৎ, এও সেই আমি।[৩]

১ 'তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥" ভা° ১০।১৪।২২

২ ভাঃ ৮।১২।১

৩ "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যদ্ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥" ভা° ২।৯।৩৩

২. আমার প্রতীতি না হলেই যার প্রতীতি হয়, আমার প্রতীতি হলে যার প্রতীতি হয় না, আবার আমার আশ্রয় ব্যতিরেকেও যার স্বয়ংপ্রতীতি সম্ভব নয়, তাকেই আমার মায়া বলে জানবে। যেমন, জ্যোতির্বিম্বের প্রতিভাস, যেমন অন্ধকার।[1] [চক্ষু-রোগ জন্মালে আকাশের এক চন্দ্রই দুই বলে প্রতিভাত হয়, আর গৃহে অন্ধকার থাকলে কোনো বস্তুই চোখে পড়ে না। দ্বিতীয় চন্দ্রের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কোথায়? অথচ যা বস্তুত আছে, গৃহস্থ সেই দ্রব্যগুলি অপ্রতীত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। এই যে অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান এবং যথার্থ বস্তুতে জ্ঞানের অভাব, এই হলো মায়ার কার্য।]

৩. ক্ষিতি-আদি মহাভূতসমূহ যেমন প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট না হলেও জগৎসৃষ্টির পর তাদের দেহের উপাদানরূপে প্রবিষ্ট, আবার জীবদেহের বাহিরে থাকে বলে অপ্রবিষ্টও বটে, আমিও তেমনি প্রাণিবর্গে প্রবিষ্ট হয়েও তাদের বাহিরেও অবস্থান করি বলেই একাধারে প্রবিষ্ট অপ্রবিষ্ট।[2]

৪. যিনি পরমেশ্বরতত্ত্ব জানতে উৎসুক, তাঁর একটিই মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়—যা যুগপৎ অন্বয়মুখে বা বিধিবাক্য অনুসারে এবং ব্যতিরেকমুখে বা বা নিষেধবাক্য অনুসারে সর্বত্র সর্বদা উপপন্ন, তাই পরতত্ত্ব।[3]

উল্লেখযোগ্য, ভাগবতে ভগবান এই চতুঃশ্লোকী-গত পরতত্ত্ব ব্রহ্মাকে শুধু উপদেশই দেননি, তাঁর স্বরূপ লক্ষণ রূপ গুণ লীলাদির তত্ত্বানুভবও ঘটাবেন, আশ্বাস দিয়েছেন—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ। তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"[4] শ্লোক তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বস্তুত ভাগবতীয় পরতত্ত্বের, নামান্তরে কৃষ্ণতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য এখানেই। পরমাত্মারূপে তিনিই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করে তার বুদ্ধিবৃত্তিও চালনা করছেন, মায়ারই সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করেও প্রতিমুহূর্তে মায়ার কুহক "স্বতেজসা" বিদূরিত করছেন। গুরুরূপে তিনিই অন্তর্যামী[5], অবতার-রূপে তিনিই

১ "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়া যথাভাসো যথা তমঃ॥" তত্রৈব। ৩৪

২ "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥" তত্রৈব, ৩৫

৩ "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ তত্রৈব, ৩৬

৪ ভা° ২।৯।৩২ ৫ "স গুরুর্হরিঃ", ভা° ৪।২৯।৫১

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" ভা° ১১।২৯।৬

ধর্মসংস্থাপক[১]। পরিপূর্ণ তত্ত্বরূপে, স্বয়ং ভগবৎস্বরূপে প্রপন্ন-জনের বিনোদার্থেই প্রপঞ্চে তাঁর অবতরণ।

সম্বন্ধতত্ত্বে এই যাঁকে পরতত্ত্বরূপে ঘোষণা করেছে ভাগবত, অভিধেয়তত্ত্বে তাঁকেই জীবের পরমসেব্যরূপে নির্দেশ দিয়ে তাঁর সেবনকেই শ্রেষ্ঠ অপবর্গ বলে প্রচার তার। তাই দেখি ভাগবত বলে, ভগবান সাত্বতপতিই জীবের "শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ"[২]। এমনকি সাত্বতপতির পূর্ণস্বরূপে আবির্ভাব যে জীবের "শ্রবণস্মরণার্হাণি" বা শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলাবিস্তারের উদ্দেশ্যেই ঘটেছে, এ বিষয়েও ভাগবতের অভিপ্রায় অন্যরূপ নয়। তাই "ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ",[৩] অর্থাৎ ভক্তি-যোগের বিধানের জন্যই কৃষ্ণাবির্ভাব, এ শুধু দেবী কুন্তীরই 'স্ত্রীবুদ্ধি-সম্ভব' প্রতীতি নয়, শুকদেবও রাসান্তে আপন উপলব্ধিকে ভাষা দিয়ে বলেন, ভগবানের আবির্ভাব এমন সব ক্রীড়া করার জন্য, যা শ্রবণ করে জীব "তৎপরো ভবেৎ," অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরক্ত হয়[৪]।

আসলে, ভক্তিযোগের মহিমাকীর্তনে সমুদয় সাত্বতশাস্ত্রের মধ্যে ভাগবতের স্থানই নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চ। ভাগবতে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ সাধন, "ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা"[৫]। এ শাস্ত্রমতে, ব্রহ্মা নির্বিকার চিত্তে তিনবার সমগ্র বেদ বিচার করে, যা থেকে গোবিন্দে রতিলাভ হয়, সেই ভক্তিযোগকেই পরম সাধন বলে বিনিশ্চয় করেছেন[৬]। এখন প্রশ্ন হলো, ভক্তি কি। ভাগবত বলে, সত্ত্বমূর্তি হরির প্রতি ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভক্তি "সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা"[৭]। তামস, রাজস, সাত্ত্বিকভেদে ভক্তির বিচিত্র স্তর। কিন্তু সর্বোপরি আছে "নির্গুণ ভক্তি"। ভাগবত একেই "অহৈতুকী" "অব্যবহিতা" "অনিমিত্তা" ভক্তি বলে উল্লেখ করেছে। এ-ভক্তি সিদ্ধি বা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী : "অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী"[৮]। তাই যাঁরা

১ "সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বর ॥ ভা ১০।৩৩।৭

২ ভা° ১।২।১৪ ৩ ভা ১।৮।২০

৪ "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।' ভা ১০।৩৩।৩৭

৫ ভা° ২।২।৩৩ ৬ ভা° ২।২।৩৪

৭ ভা° ৩।২৫।৩২ ৮ ভা° ৩।২৫।৩৩

আত্মারাম ও অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য মুনিপ্রবর তাঁরাও "কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ"[১], অর্থাৎ অদ্ভুতগুণ হরিতে অহৈতুকী ভক্তি পোষণ করে থাকেন। সনকাদি মুনিবর্গ, শুকদেবাদি নির্গ্রন্থ আত্মারামই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদও হরিসেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন জ্ঞান করেছিলেন—তাঁর ভগবদারাধনা ছিল 'শ্রবণ' 'কীর্তন' 'স্মরণ' 'পাদসেবন' 'অর্চন' 'বন্দন' 'দাস্য' 'সখ্য' 'আত্মনিবেদন' এই নবাঙ্গ যুক্ত।

কিন্তু ভাগবতে ভক্তি শুধু শ্রেষ্ঠ সাধন-রূপেই উল্লিখিত নয় শ্রেষ্ঠ সাধ্য-রূপেও একাধিক স্থলে স্বীকৃত। ভাগবতের অভিমত তাই, ভক্ত একমাত্র সর্ব-অপবর্গদাতা হরিতেই অবিচ্ছিন্না ভক্তি চান, এমনকি মুক্তিও তার কাম্য নয়। ভগবানও ভজনকারীকে মুক্তি পর্যন্ত দেন, কিন্তু "ন ভক্তিযোগম্"[২]। এই ভক্তিরূপ পরমপুরুষার্থ প্রার্থনাই সেইজন্য ভাগবত-ভক্তের শেষ ভিক্ষা:

"ভবে ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো॥"[৩]

উদ্ধব বলছেন, হে দেবেশ, হে আমাদের পরিচালক প্রভু জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মে যাতে আমাদের ভক্তি জন্মায়, তাই করুন

ভক্তি যে উভয়ত ঈশ্বরপক্ষে ও জীবপক্ষে প্রীতিফলপ্রদ হয় সে বিষয়েও ভাগবত স্পষ্টোক্তি করেছে। ভাগবতে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদই বলেছিলেন, দান তপ যাগ শৌচ ব্রত বা অন্য কিছুতেই হরি সেরূপ প্রীত হন না যেরূপ হন নির্মল ভক্তিতে

"ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ বিড়ম্বনম॥"[৪]

আর সেই "সর্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ" পরমপুরুষের পাদোপসর্পণে জীবপক্ষে সর্বাত্মস্নাপক প্রীতিলাভের পরাকাষ্ঠা তো প্রহ্লাদ নিজেই। পুলকাঞ্চিত হয়ে তূষ্ণী অবলম্বন, আনন্দস্পৃষ্ট হয়ে স্পন্দনহীন দেহে নীরবিগলিত নয়নে অবস্থান তো তারই সাত্ত্বিক অনুভাব:

"কচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ॥"[৫]

১ ভা° ১।৭।১০ ২ ভা° ৫।৬।১৮ ৩ ভা° ১২।১৩।২২
৪ ভা° ৭।৭।৫২ ৫ ভা° ৭।৪।৪১

এই "অস্পদপ্রণয়ানন্দ"ই ভাগবতীয় প্রয়োজনতত্ত্বের শেষ কথা। এই প্রণয়ানন্দেরই চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করি ভাগবতীয় ব্রজপ্রেমে, সখ্য-বাৎসল্য-মধুরারতির পরিকরবৃন্দে। জ্ঞানী-পক্ষে ব্রহ্মসুখানুভবস্বরূপ, ভক্ত-পক্ষে পরদৈবত এবং মায়াশ্রিতপক্ষে প্রাকৃত বালকরূপে প্রতীয়মান কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠ বিহার করে ফেরার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন তাই গোপকুমারগণ,[১] বসুদেব-দেবকীও যা অনুভব করেননি, কৃষ্ণের সেই অদ্যাপি কবি-কীর্তিত অর্ভকলীলা প্রত্যক্ষ করার পুণ্যলাভ করে থাকেন নন্দ-যশোদা[২]; পদ্মিনী স্বর্কন্যারা, এমনকি লক্ষ্মীও পরমপুরুষের যে-প্রসাদ লাভ করেননি, রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠা গোপীরা তাই অর্জন করেন[৩]। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর অনুরাগই শুধু যে "দুস্ত্যজ" ছিল, এমন নয়, ব্রজবাসীর প্রতি কৃষ্ণের প্রীতিও ঔৎপত্তিক বা স্বাভাবিক[৪] ছিল বলে জানা যায়। আর এই পারস্পরিক দুস্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে পরমপ্রীতিলাভের প্রেক্ষাপটে ভাগবতীয় সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়তত্ত্বের শেষ স্তর বাহিত হয়ে 'প্রেম'-প্রয়োজনের শিখরসীমা স্পর্শ করেছে।

ভাগবতের এই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের অখণ্ড পরিপূর্ণ আদর্শকে সম্মুখে রেখেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন তার মতাদর্শ কিভাবে গঠন করেছে, বিশ্লেষিত হলে নিঃসন্দেহে বিস্ময়েরই সৃষ্টি করবে। আমাদের পরিসর অতিশয় স্বল্প, কাজেই আমাদের মন্তব্যের সমর্থনে দু'একটি প্রধান সূত্রই এখানে উল্লিখিত হবে মাত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের সারাৎসার সংগ্রহ করে চৈতন্য-মতমঞ্জুষা টীকায় শ্রীনাথ চক্রবর্তী যা বলেছিলেন, প্রথমেই তা উদ্ধৃত হবার দাবী রাখে :

> "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
> রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
> শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহা-
> নিত্থং গৌরমহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

১ "ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥' ভা ১০।১২।১১

২ "পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবযো যল্লোকশমলাপহম্॥" ১০।৮।৪৭

৩ "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্॥" ভাং ১০।৪৭।৬০

৪ "দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥" ১০।২৬।১৩

এখানে চৈতন্যমত হিসাবে দেখছি, ব্রজেশতনয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্যরূপে নির্দেশিত, তাঁর ধাম-রূপে মথুরা-দ্বারকা নয়, বৃন্দাবনই উল্লিখিত, ব্রজবধূর আনুগত্যময়ী রাগানুগা মার্গসেবনাই 'রম্যা' বলে অভিহিতা, আর প্রেমই পুরুষার্থ বলে চিহ্নিত। তদুপরি ভাগবত 'অমল' প্রমাণ রূপে বন্দিত, 'শাস্ত্র' রূপে স্বীকৃত।

মিথ্যা নয়, শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস সহ ভারতীয় ধর্মদর্শনের বিরাট ঐতিহ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ অবনতমস্তকে অঙ্গীকার করেছেন। বেদোপনিষদকে তো শ্রীজীব গোস্বামী প্রমাণশ্রেষ্ঠ শব্দপ্রমাণ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর সর্বসংবাদিনীতে তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়। কিন্তু তিনিও সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন ভাগবতকে। তাঁর মতে, সর্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণার্থের সারসম্ভূত ব্রহ্মসূত্রোপজীবী তথা জগতে প্রচারোপযোগী এরূপ কোনো পুরাণলক্ষণধারী অপৌরুষেয় একটি মাত্র গ্রন্থ যদি সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকে, তা আর কিছুই নয়, সর্বপ্রমাণের চক্রবর্তিভূত ভাগবত[১]। ভাগবতকে শ্রীজীব পুরাণশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যেও আবার শীর্ষস্থানীয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, ভাগবত-প্রমাণের স্থান এমনই সর্বাতিশায়ী যে, অপর শ্রুতিপুরাণাদির উদ্ধৃতবচনসমূহও ভাগবতসন্দর্ভে উৎকলিত হয়েছে গ্রন্থকারের নিজ-প্রদর্শিত অর্থবিশেষের প্রমাণের জন্য, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণাপেক্ষায় নয়[২]। ভাগবতের এই 'সর্বপ্রমাণচক্রবর্তিভূত' স্বরূপ লক্ষ্য করেই তথা "পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায়" "পৌর্বাপর্যাবিরোধেন" শ্রীজীব তাঁর ষট্সন্দর্ভাত্মক কোষগ্রন্থে সূত্রস্থানীয়, অবতারিকাবাক্য, এমনকি বিষয়বাক্যও ভাগবত থেকে আহরণ করেছেন[৩]। স্বভাবতই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের সেবা, সেবনের উপায় এবং সেবাপ্রাপ্তির ফল, এককথায় সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন এই ত্রিতত্ত্বই একান্তভাবেই ভাগবতভিত্তিক হয়ে উঠেছে। দু'একটি উদাহরণ যোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়।

১ "…যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং সর্ববেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এব সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা", তত্ত্বসন্দর্ভ।১৮, শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস তীর্থ সম্পাদিত, চৈতন্য-রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রকাশিত

২ "অত্র চ স্বদর্শিতবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতিপুরাণাদি-বচনানি" ইত্যাদি, তত্ত্ব°। ২৮

৩ "তদেবং পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায় শ্রীভাগবতমেব পৌর্বাপর্যাবিরোধেন বিচার্যতে। তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্কাত্মকে গ্রন্থে সূত্রস্থানীয়মবতারিকাবাক্যং বিষয়বাক্যং শ্রীভাগবতবাক্যং" তত্ত্ব°। ২৭

তত্ত্বসন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যার সূচনাতেই শ্রীজীব বলেছিলেন, পরতত্ত্বই উদ্দিষ্ট, তাই হলো সম্বন্ধ। আর যেহেতু পরতত্ত্ব শাস্ত্রবাচ্য সুতরাং ষড়্‌বিধ লিঙ্গ-দ্বারাই সে-তত্ত্ব বিবৃত করা বিধেয়। লক্ষণীয়, উক্ত ষড়্‌লিঙ্গের প্রতিটি সূত্রবাক্যই ভাগবত থেকে আহরিত. যেমন,

ক. উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য: "বেদ্যং বাস্তবম"। ভা° ১।১।২

খ. অভ্যাস: "সর্ববেদান্তসারম"। ভা° ১২।১৩।১২

গ. অপূর্বতা: "অত্র সর্গ" ইত্যাদি, ভা° ২।১০।১

ঘ. অন্য কোনো প্রমাণের অধিগত নয় বলে অর্থবাদ "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদং"। ভা° ১।২।১১

ঙ ফলশ্রুতি: "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম"। ভা° ১।১।২ এবং এরূপ আরও বহু বাক্য।

চ. উপপত্তি: "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং"। ভা° ২।১০।২

বস্তুত, ভাগবত-নির্দেশিত 'দশম' পদার্থ 'আশ্রয়'কেই শ্রীজীব সম্বন্ধতত্ত্বের বাচ্য পরতত্ত্বরূপে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, চিন্মাত্র জীবের যিনি 'অংশী' তথা স্বয়ং চিৎস্বরূপ, তিনিই আশ্রয়[১]। এই 'দশম' আশ্রয়ই সব-কারণকারণ এবং সর্বাধাররূপে মুখ্যবস্তু। সর্গাদি অপর ন'টি লক্ষণের বাচ্য 'আশ্রয়' ব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপেই প্রসিদ্ধ। ভাগবতীয় শ্লোকের "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি" শ্লোকাংশে "ইতি" অব্যযোগে ব্রহ্ম-পরমাত্মার তুল্য ভগবানও আশ্রয়তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হয়ে যান। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ. ভাগবতের দশম স্কন্ধে সেই শ্রীকৃষ্ণ-রূপ 'আশ্রয়' তত্ত্বেরই প্রাধান্য. শ্রীজীবের ভাষায়: "অতোঽত্র স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপস্যাশ্রয়স্যৈব বর্ণনপ্রাধান্যং বিবক্ষিতম্"[২]। এ যে টীকাকার শ্রীধরেরও বিবক্ষিত. তা তাঁরই রচিত দশমারম্ভের ভাগবত-অবতারিকাবাক্যের সার্ধপদ উদ্ধার করেই উল্লিখিত, "দশমে দশমং লক্ষ্য-মাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম"। তাৎপর্য, দশম স্কন্ধে আশ্রিতদেব আশ্রয়বিগ্রহ কৃষ্ণই হলেন লক্ষ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যকেও বলতে শুনি:

"অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দদেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর ॥"[৩]

---

১ "এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং তৎ স্বরূপং, তদীয়াকৃত্যা তদংশিত্বেন চ, তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যম্ ইতি ব্যষ্টিনির্দেশদ্বারা প্রোক্তম্। তদেব হ্যাশ্রয়সংজ্ঞকম্" তত্ত্ব°। ৫৪

২ তত্ত্বসন্দর্ভ, ৫৯

৩ চৈ. চ. মধ্য। ২০, ১৩১-৩২

আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহ এই যে "সর্বাশ্রয়" "সর্বেশ্বর" কৃষ্ণ, তাঁরই পরমতত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রীজীব প্রথমেই বলে নিয়েছেন, বেদ-রামায়ণ-মহাভারতে বা পুরাণাদিতে সর্বত্রই হরি পরকীর্তিত। এমনকি গায়ত্রীও কৃষ্ণপর। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে "ওঁ নমস্তে ভগবতে আদিত্যায়" শ্লোকে সূর্যকে যে-স্তব করা হয়েছে, পরমাত্মদৃষ্টিতে সেটি সূর্যেরও অধিদাতা স্বয়ং ভগবানেরই বন্দনা বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীজীবের মতে, ব্রহ্মও স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের নির্বিশেষ আবির্ভাব মাত্র, তাই সূতপাঠক ব্যাস-সমাধিতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার দর্শন পৃথক্রূপে কীর্তন করেননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যও কৃষ্ণতত্ত্বকেই সর্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য 'সম্বন্ধ' বলে নির্ণয় করেছেন: "সর্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ"[১]। তাঁর মতে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ," আর গোলোকই তাঁর নিত্যধাম। প্রাভব ও বৈভব রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ দ্বিবিধ। রাসে ও মহিষী বিবাহে প্রাভব প্রকাশ, চতুর্ভুজরূপে বৈভববিলাস। "অবতারাহ্যসংখ্যেয়া"[২]—অসংখ্য তাঁর অবতার। তন্মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার এবং শক্ত্যাবেশাবতার এই ষড়্‌বিধ প্রকারভেদ করা যায়। পুরুষাবতারের আবার ত্রিরূপ। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ যেবার ক্ষুভিত প্রকৃতিগর্ভে বীর্যাধান করেন, তা থেকেই সৃষ্টি সম্ভব। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী হলেন হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী সহস্রশীর্ষ রূপে পরিচিত; 'মায়াশ্রয়' তিনি, 'মায়াপর'। তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী পালনকর্তা বিষ্ণু বলে কথিত। লীলাবতার পক্ষে আছেন "মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ"[৩]-ইত্যাদি। অপরপক্ষে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গুণাবতার। ভাগবত অনুসারে[৪] গৌড়ীয় বৈষ্ণব এঁদের বলেন শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা বা অংশাংশ। আর চতুর্দশ মন্বন্তরে আবির্ভূত চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার। তেমনি আবার সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে আবির্ভূত হন যথাক্রমে শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত অবতার। প্রমাণ ভাগবত থেকেই উদ্ধৃত: "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"[৫]। পরিশেষে শক্ত্যাবেশাবতার দ্বিবিধ বলে উল্লিখিত। প্রথমত, "সাক্ষাৎ শক্ত্যো অবতার," দ্বিতীয়ত "আভাসে বিভূতি"। তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে আবেশাবতার রূপে সনকাদির

১ চৈ.চ. মধ্য।২০, ১১৫ ২ ভা° ১।৩।২৬ ৩ ভা° ১০।২।৪০

৪ ভা° ১০।৬৮।৩৭ ৫ তত্রৈব, ভা° ১০।৮।৯

উল্লেখ লক্ষণীয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভূতি বা শক্তিভাবাবেশ রূপে গীতার একাদশ অধ্যায়ের উল্লেখ স্মরণীয় হয়ে আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাগবতের মতোই কৃষ্ণলীলার নিত্যত্বে বিশ্বাসী। তাই সনাতন-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যকে বলতে শুনি: "নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়"[১]। এ-মতে কৃষ্ণলীলাকে জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে নিত্য বলা হয়েছে, ফলত "অলাতচক্রবৎ সেই লীলাচক্র ফিরে"[২]। কৃষ্ণের সমুহ লীলার মধ্যে আবার ব্রজলীলার সর্বাধিক মহিমাকীর্তনই ভাগবতে বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলাকে গুরুত্বদানে ভাগবত অপেক্ষা আরও বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, দ্বারকায় কৃষ্ণলীলা 'পূর্ণ', মথুরায় 'পূর্ণতর,' একমাত্র ব্রজেই 'পূর্ণতম':

"কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ গোকুলান্তরে
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু।"[৩]

অতঃপর তাঁর ধামপ্রসঙ্গও ওঠে। ভাগবতে নারদ ধ্রুবকে হরির নিত্যধামরূপে যমুনাতীরস্থ মধুবনেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবও ব্রজধামকেই নিত্যধাম বলেছেন তাঁদের মতে অনন্তবৈকুণ্ঠ-ধাম ঘিরে আছে পরব্যোমকে, আর পরব্যোমেরই মধ্যস্থ কর্ণিকাররূপে রয়েছে 'কৃষ্ণলোক,' তাই 'গোলোক,' 'শ্রীবৃন্দাবন,'

"অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ।
মধুরৈশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা সার॥"[৪]

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের দুইপাদ গোলোক-পরব্যোম। আর এক পাদ আছে 'বাহ্যাবাসে' 'বিরজার পার', তারই নাম 'দেবাধাম', জীবের বাস সেখানেই। অবশ্য গূঢ়ার্থে, 'ত্র্যধীশ্বর' বলতে গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা ও দ্বারাবতীর অধীশ্বরকেও বোঝায়। আর এই ত্রিলোকের অধীশ্বর-রূপে কৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তিও ত্রিবিধা. "চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি"[৫]। তবে ভাগবতের মতো

১ চৈ. চ. মধ্য। ২০, ৩১৯ ২ তত্রৈব। ৩২৭

৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণাবভাগ, ১। ১২০

৪ চৈ. চ. মধ্য। ২১,৩৩-৩৪ ৫ তত্রৈব, ২০,১০৩

কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মত মাধুর্যেরই সম্যক্ অনুকূলতা করেছে। বিশেষত কৃষ্ণের মাধুর্যলীলা ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের যে রসস্ফূর্তি ঘটেছে, এরূপ আর কিছুতে নয়। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নিঃশ্রেয়স্ প্রেমভক্তিই তাঁর সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করেছে। ভাগবতে উদ্ধব বলেছিলেন, কৃষ্ণের মর্ত্যলীলার উপযোগী দেহ তাঁর যোগমায়াবল প্রদর্শনের জন্যই পরিগৃহীত। উদ্ধবের এই ঐশ্বর্যমিশ্র মাধুর্যরসাশ্রিত অনুভব শ্রীচৈতন্যের বিশুদ্ধ মাধুর্যরসোপলব্ধিতে কৃষ্ণসুখাস্বাদনের শেষ সীমায় অভিনব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে :

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"[১]

ভাগবতে "জ্ঞানমদ্বয়ম্"[২] পরতত্ত্বের যে-রসরূপতার বীজ নিহিত ছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে তারই এই পূর্ণপরিণতি পরম বিস্ময়াবহ।

অদ্বৈতবাদিগণ অবশ্য বলেন, জ্ঞানের আবার শক্তি কি? নারায়ণকে অদ্বয়জ্ঞান বলে তাঁর আবার আকারাদি কল্পনা কতদূর সমীচীন? তাঁর পরিচ্ছদাদি, দ্রব্যবিশেষ, ধাম সম্বন্ধেও তো একই জিজ্ঞাসা। "অদ্বয় জ্ঞানে"র কথা উত্থাপন করে পরে এসকল স্বকপোল-কল্পনার ফলে পুরোটাই কি কুঞ্জর-স্নানের মতো নিষ্ফল হয়ে পড়ে না?

উত্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে শ্রীজীব বলেন, জগদাদি সৃষ্টির ব্যাপারে স্বরূপশক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, কেননা বস্তুর ধর্মবিশেষই শক্তি, শক্তি ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। বিশেষত শ্রুতির অর্থ অক্ষত রাখতে স্বরূপশক্তি স্বীকার না করে উপায় নেই। মূল ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব স্বরূপশক্তির যে ব্যাখ্যা[৩] দিয়েছিলেন, সর্বসংবাদিনীর অনুব্যাখ্যায় তারই উল্লেখ করে বলেছেন, পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াদি বিবিধ শক্তির উল্লেখ শ্রুতিতেই

১ চৈ. চ. মধ্য ভা° ১।২।১১

৩ "কিঞ্চ বিশ্বকার্যান্যথানুপপত্ত্যা যথা পরমকারণরূপং তদভ্যুপগম্যতে তথা তৎশক্তিরপি স্বাভাবিকী এব অভ্যুপগম্যতে। কার্যবিশেষোৎপত্তৌ কিঞ্চিৎ করণত্বেনের কারণতয়া বস্তুবিশেষাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিৎ করণত্বমেব স্বাভাবিকী শক্তিরিতি। তদেবাজ্ঞানাতিরিক্ত স্বাভাবিক-জ্ঞানেন স্বগতবিশেষত্বে প্রাপ্তে "স্বাভাবিকজ্ঞান বলক্রিয়া চ' ইতি প্রতিপাদিতম্। তদেব স্বরূপশক্তিরিতি ; সৈব সর্বং ভগবৎ-তত্ত্বং সাধয়েৎ"।

মেলে। ভাগবতে নাগপত্নী-স্তুতিতেও "জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে"[১] পদের ব্যাখ্যায় শ্রীধর বলেন, জ্ঞান—জ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান—চিৎশক্তি : এতদুভয়ের দ্বারা পূর্ণ যিনি, তাঁকে নমস্কার। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সেখানে আরো বলা হয়েছে, "ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে"—অনন্তশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম তিনি। তবে এ-শক্তি যে অপ্রাকৃত, সে বিষয়ে শ্রীজীব দৃঢ় অভিমতই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অপাণি-পাদ' ইত্যাদি শ্রুতি-বচনে পরব্রহ্মের প্রাকৃত অবয়বেরই নিষেধ আছে, অপ্রাকৃত-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের নয়। ফলত ব্রহ্মের 'নির্গুণ' সংজ্ঞার গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় মতে তাৎপর্য দাঁড়ায়, প্রাকৃত- তথা হেয়-গুণ-বর্জিত তিনি : "প্রাকৃতৈ-র্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ইতি"। পক্ষান্তরে তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলী যে অসংখ্যাত, তা ভাগবতের "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং"[২] শ্লোকটির প্রামাণ্যবলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শ্রীজীব। বিষ্ণুপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি "সমস্তকল্যাণ গুণাত্মকোঽসৌ" বলেছেন। তাঁর মতে, ভগবানের আনন্দপ্রকাশের অনন্ততা বোঝাবার জন্যই ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধে দত্তাত্রেয়-বন্দনাশ্লোকে "সন্দোহ" শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে : "কেবলানুভবানন্দ সন্দোহো নিরুপাধিকঃ"[৩]। এককথায় শ্রীজীব ভাগবতের আশ্রয়েই পরতত্ত্বের সবিশেষত্ব ও সশক্তিকত্ব প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। আবার ভাগবতের মতো তিনিও মনে করেন, জগতের দৃষ্ট শ্রুত পরস্পরবিরোধী সর্বপ্রকার ধর্মের যুগপৎ আশ্রয় একমাত্র ভগবানই। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, শক্তিসমূহের অপ্রচুরতায় পরতত্ত্ব পান ব্রহ্মসংজ্ঞা এবং শক্তিসমূহের প্রাচুর্যে ভগবৎ-সংজ্ঞা। ভগবানের শক্তি স্বরূপভূত বলে, পরবস্তু বহিরাগত নয় বলেই তিনি 'নিরুপাধি'। অগ্নির দাহিকাশক্তির মতো ভগবানের শক্তিসমূহও 'অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর'। প্রসঙ্গত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শক্তি-শক্তিমান বিষয়ক অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়, সূর্যকিরণ এবং সূর্য যেমন স্বরূপত অভিন্ন তেজ-পদার্থ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি সম্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য। আবার তেজ-রূপে ভেদ না থাকলেও, এতদুভয়ের যেমন ভেদ-

১ "জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ॥" ভা° ১০।১৬।৪০

২ ভা° ১০।১৪।৭

৩ ভা° ১১।৯।১৮

ব্যপদেশ রয়ে গেছে ভগবান ও তাঁর স্বরূপ-শক্তিতেও তেমনি। উভয়ত ভেদ ও অভেদ চিন্তার অগোচরতা-বশত শ্রীজীব-কর্তৃক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' রূপে স্বীকৃত হয়েছে[১]। এ-শক্তিকে তিনি "সা চ ত্রিবিধা" বলে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা এই তিন বিভাগে বিভক্তও করেছেন। চিচ্ছক্তিও আবার ত্রিবিধা, চৈতন্য-চরিতামৃতের সুভাষণে :

"সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥"[২]

চিৎশক্তিরই বিপরীতকোটিতে রয়েছে অচিৎ শক্তি বা মায়া। তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীব বলেছেন, মায়া ভগবানের কাছে আসতে লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে. এতেই বোঝা যায়, মায়া তাঁর স্বরূপভূতা শক্তি নয়, "ন তৎস্বরূপভূতত্বমিত্যপি লভ্যতে"[৩]। মায়ার আশ্রয় যে পরব্রহ্মই তারই প্রমাণস্বরূপ তিনি চতুঃশ্লোকীর "ঋতেঽর্থং" শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। সেই সঙ্গে ভাগবতের "এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী"[৪] ইত্যাদি শ্লোকও উদ্ধার করে তাঁর পরমাত্মসন্দর্ভে বলেন, অথর্ববেদীদের অভিমত অনুসারে বিভু বা সর্বব্যাপক ব্রহ্মের শুক্লা, রক্তা ও কৃষ্ণা এই ত্রিবর্ণা মায়া সবকামপূরণী ও বিশ্বসৃষ্ট্যাদির সংকল্প পূরণকর্ত্রী। তবে এই কর্ত্রীত্ব হলো গৌণ, "যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি"। কবিরাজ গোস্বামীর সুভাষণে :

"কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥"[৫]

আবার, ব্রহ্মের কটাক্ষেও প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ জন্মায়, এই ভাগবত-সিদ্ধান্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের পূর্ণ সম্মতি থাকায় বোঝা যায়, এ-দর্শনও মায়াকে জগতের মুখ্য উপাদান কারণ বলে স্বীকার করে না। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে

১ "স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়তে ইতি শক্তি-শক্তিমতো-ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ।

২ চৈ. চ. আদি। ৪, ৫৪-৫৫

৩ তত্ত্বসন্দর্ভ।৩১

৪ ভা° ১১।৩।১৬

৫ চৈ. চ. আদি। ৫,৫২

মায়ারূপিণী প্রকৃতিকে এইজন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন "অজাগলস্তন"। তাঁর বক্তব্য :

"অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥"[১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে মায়াও আবার যোগমায়া ও মায়ারূপে দ্বিবিধা। ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব ভাগবতের "যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ"[২] ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় যোগমায়া তথা বিদ্যারূপিণী মায়াকে "সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তি" বলে অভিহিত করেছেন। পরমাত্ম-সন্দর্ভে তাঁকেই জীব গোস্বামী "বিদ্যাখ্যা বৃত্তিরিয়ং স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ-বিদ্যাপ্রকাশে দ্বারমেব ন তু স্বয়মেব"[৩] বলায় বিদ্যা মোক্ষের স্বয়ংদাত্রী না হলেও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে উঠেছে। রাসলীলায় ইনিই ছিলেন সহায়িকা, আর ভক্তিযোগের অনুকূল সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত চিত্ত ইনিই ভক্তপক্ষে করেন সৃষ্টি।

প্রসঙ্গত জীবতত্ত্বের কথাও ওঠে। এক্ষেত্রেও জীবব্রহ্মের ভেদাভেদতত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত। জীব যে ব্রহ্মের মতোই চিৎস্বরূপ সে-বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁরা মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ তথা ভাগবত উদ্ধার করে জীবের অণুত্বই প্রতিপাদিত করতে চেয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবকে তাই রূপ-শিক্ষায় জীবতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে বলতে শুনি :

"কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥"[৪]

এই যে "কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি" বলে "সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ" নির্ধারণ করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তা তো শ্রুতি-ভাগবতের যথাক্রমে "কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ। জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ" এবং "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। জীব-শক্তিকে শ্রীজীব গোস্বামী অবশ্য শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ বলেননি, বলেছেন জীবশক্তি-বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ। ভাগবতের "পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং" শ্লোকে তত্ত্বসমূহের যে-পারস্পরিক অনুপ্রবেশের কথা বলা হয়েছে, তা থেকেই

১ চৈ. চ. আদি। ৫, ৫৩

২ ভা° ১।৩।৩৪

৩ পরমাত্মসন্দর্ভ ৫৯

৪ চৈ. চ. মধ্য। ১৯, ১২৬

শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করেন অনুপ্রবেশ-বশতই ভগবান্ জীবশক্তিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত তিনি তাঁর পরমাত্মসন্দর্ভে পরিচ্ছেদবাদ-আভাসবাদ-প্রতিবিম্ববাদ সহ একজীববাদও খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে, "সংখ্যাতীতো চিৎকণঃ" জীব-সমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করাই বিধেয়, একদল হলেন অনাদি-ভগবদুন্মুখ, অপর দল অনাদি-ভগবদ্‌বহির্মুখ। অনাদি-ভগবদুন্মুখ ভক্তচিত্তে কৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ নিক্ষেপ করেন বলে জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত। আর অনাদি-ভগবদ্‌বহির্মুখ জীব "ধর্মতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়" তবেই একদিন শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব বলে তাঁর প্রত্যয়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীজীব উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ-বাক্য উদ্ধার করে জানিয়েছেন, অনাদি-অবিদ্যাযুক্ত পুরুষের স্বতঃ জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এজন্য অপর তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদ গুরুগ্রহণ করাই কর্তব্য[১]। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের প্রসিদ্ধ গুরুবাদের ভিত্তিভূমি এইভাবেই রচনা করেছে ভাগবত। আর কৈবল্যেও শুদ্ধজীবের কর্তৃত্বসুখ বর্তমান থাকে, এমনকি ব্রহ্মানন্দ অতিক্রম করে যায় সে-সুখ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও ভাগবতের "যা নির্বৃতিস্তনু-ভৃতাং"[২] শ্লোকের প্রামাণ্যবলে প্রতিষ্ঠিত। মুক্তাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব মানেন বলেই শ্রীজীব 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্কর-অনভিলষিত পথে[৩]। তত্ত্বসন্দর্ভে জানান তিনি, 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের যে একত্বের কথা বলা হয়েছে তা জাতিগত অভেদ, অর্থাৎ চিদ্রূপ সত্তায় অভেদ বুঝতে হবে, নতুবা জীব যদি নিজেই ব্রহ্ম হয় তাহলে আরাধনার সার্থকতা থাকে কি? জীব আসলে নিত্য কৃষ্ণদাস, এই হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় জীবতত্ত্বের শেষ কথা। চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতনশিক্ষায় শ্রীচৈতন্যকে এ-দর্শনেরই জীবতত্ত্ব-সার সংকলন করে বলতে শুনি :

> "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
> কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
> সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।"[৪]

জীবতত্ত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব যেমন ভেদাভেদবাদী : "কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ", সৃষ্টিতত্ত্বেও তেমনি ভেদাভেদবাদীর সঙ্গে সঙ্গে সৎ-

১ ভা° ১১।২২।১০   ২ ভা° ৪।৯।১০

৩ দ্র° সর্বসংবাদিনী, পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা

৪ চৈ. চ. মধ্য। ২০,১০১-১০২

কার্যবাদীও বটেন। সৃষ্টির পূর্বে কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল, এ-বিশ্বাস তাঁদের আছে। এক্ষেত্রে তাঁরা একান্তভাবেই পরিণামবাদী। অর্থাৎ তাঁদের বিশ্বাস, সদ্‌ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হন। অবশ্য পরিণত হয়েও যে পরব্রহ্ম তাঁর অচিন্ত্য-শক্তি প্রভাবে অবিকৃতই থাকেন সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সংশয়মাত্র নেই। তাঁরা "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"[১] এবং "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"[২] এই দুই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা পরিণামবাদের আলোকেই করে থাকেন। স্বভাবতই শুক্তিতে রজতভ্রমের মতো সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার শঙ্করের তুল্য তাঁদের কাছে 'অধ্যাস' বা অলীক নয়। তাঁরা জগৎকে মিথ্যা বলেন না, তবে তাঁদের মতেও জগৎ প্রলয়ে অপ্রকট হয়। নশ্বর তাই জগতের অস্তিত্ব। তাঁরা বলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক ভাগবতীয় সর্বাদি শ্লোকেই ব্যাখ্যাত। সেখানে ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান বলা সম্পূর্ণ সংগত হয়েছে বলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভিমত। হিন্দুশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ উর্ণনাভের উপমানটি তাই তাঁরা ব্রহ্মপক্ষে মেনে নিয়ে ব্রহ্মকেই জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা একান্তভাবেই ভাগবতানুসারী। ভাগবতেরই "কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং" শ্লোকের আশ্রয়ে তাঁরাও বলেন, পুরুষের ঈক্ষণে কালপ্রভাবে প্রকৃতিরূপা মায়ার সাম্যাবস্থা ক্ষুব্ধ হয়, তখন মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পুরুষে লীন জীবাত্মাকে বার্যরূপে আধান করা হয় প্রকৃতিতে। ফলত জন্মলাভ করে মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব থেকেই কালকর্মাদির প্রভাবে তমোগুণের প্রাধান্যময় অহংকারতত্ত্বের উদ্ভব হয়। এইভাবেই জ্ঞান-ক্রিয়া-দ্রব্য, শক্তি, তথা দশ-ইন্দ্রিয়ের দশ দেবতা, বুদ্ধি ও প্রাণ, ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমাদির ক্রমোৎপত্তি। এককথায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব তার সমগ্র সম্বন্ধতত্ত্বের অঙ্গীভূত হয়েই ভাগবতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। সম্বন্ধতত্ত্বের মতো, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বও ভাগবতের শাস্ত্রপ্রামাণ্যবলে প্রতিষ্ঠিত।

কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি আবির্ভাবসমূহের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবেরই পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদন করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধতত্ত্বে "স চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্ধারিতম্"—সেই ভগবান্‌ই যে শ্রীকৃষ্ণ তাই নির্ধারিত হয়েছে। আর তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে তিনি ভগবান্

---

১ ব্রহ্মসূত্র, ১।৪।২৬

২ তত্রৈব, ২।১।২৮

অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি—এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা ভক্তিযোগের অভিধেয়ত্বই ভাগবতে সর্বাত্মকভাবে স্বীকৃত। ভাগবতের বীজরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া" শ্লোকের জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গ অংশের "রহস্য" শব্দের তাই শ্রীধরানুমোদিত ব্যাখ্যা করে শ্রীজীব বলেন, রহস্য—প্রেমভক্তি, তদঙ্গ—সাধনভক্তি। সাধনদশাতেও বটে, সিদ্ধদশাতেও বটে, ভক্তির সুখরূপত্বই তিনি সর্বত্র সূচিত হতে দেখেন। আর সেইজন্যই ভাগবতে ভক্তিযোগাখ্য রতি জীবের পুরুষার্থরূপে নিরূপিত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

এখন প্রশ্ন, নিরতিশয় নিত্যানন্দরূপ ভগবানে কিভাবে ভক্তিজাত সুখ উৎপন্ন হতে পারে? কেননা তাতে তাঁর শাস্ত্রকথিত নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্বের বিরোধ ঘটে। বিশেষত ভক্তিরও আবার ভগবৎ-প্রীতিহেতুত্ব শোনা যায়। জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীজীব বলেন, পরমানন্দৈকরূপ ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীই তো তাঁর পরমাবৃত্তিরূপা। প্রকাশবস্তু যেমন নিজেকে ও অন্যকে প্রকাশ করে, এ-বৃত্তিও ঠিক তেমনি নিজেকে ও তাঁকে আনন্দিত করে তোলে। কাজেই ভগবান যখন সেই পরমবৃত্তিরূপা হ্লাদিনীকে ভক্তবৃন্দে নিক্ষেপ করেন, তখন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও অত্যন্ত প্রীতিপ্রাপ্ত হবেন, এ আর বিচিত্র কথা কি?[১]

ভক্তির সুখরূপতা প্রতিপাদনের পর শ্রীজীব ভক্তির বিচিত্র স্তরবিভাগ করে তন্মধ্যে অকিঞ্চনাভক্তিকেই সর্বশাস্ত্রসার বলে ঘোষণা করেছেন। ভাগবতে এ-ভক্তিকেই শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন এই নব-লক্ষণাক্রান্ত ভক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীজীবের অভিমত অনুসারে, অকিঞ্চনা ভক্তিই জীবসাধারণের 'স্বভাবত উচিতা'। কেননা জীবগণ স্বাভাবিকভাবেই সেই ভগবানেরই আশ্রিত। আর এ-

তাৎপর্য, ভগবানের চরণনিঃসৃত সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সলিল মস্তকে ধারণ করেই শিব 'শিব' হয়েছেন।

১ "তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী নাম্নী বর্ততে প্রকাশবস্তুনঃ স্ব-পর-প্রকাশনশক্তি-পরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতাতি"।

ভক্তিবিষয়ে সৎসঙ্গই নিদান: "সৎসঙ্গস্যৈব তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্"। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যোক্তিতেও শুনি:

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥"[১]

ভাগবতে শৌণকও ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গকে স্বর্গবাস বা মোক্ষলাভেরও বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন[২]।

তবে শ্রীজীব ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভে ভগবৎকৃপাকেই প্রথম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কৃপাবশতই ভক্তহৃদয়ে ভগবান তাঁর স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী-রূপা পরাবৃত্তিকে নিক্ষেপ করেন, আর সেই শক্তিই ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করে যুগপৎ ভক্ত এবং ভগবানকেও আর্দ্রভাবাপন্ন করে তোলে[৩]। যে যে পরিমাণ ভগবানের প্রিয়ত্বধর্মের অনুভব, সেই সেই পরিমাণ ভক্তির উৎকর্ষ। কেনন ভক্তিই প্রেম। প্রেমই পরম পুরুষার্থ। রূপ-শিক্ষায় চৈতন্যদেবকেও বলতে শুনেছি:

"এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"[৪]

এখানে উল্লেখযোগ্য, স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর আলোকে ভক্তিবৃত্তির অপূর্ব ব্যাখ্যা যেমন শ্রীজীব গোস্বামীর বৈশিষ্ট্য, ভক্তির সূক্ষ্মতম স্তরপরম্পরা বিশ্লেষণ তেমনি রূপ গোস্বামীর। শ্রীরূপও তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তিকে ভাগবতীয় শুকভাষণের আশ্রয়ে "সর্বৈর্গুণৈস্তত্র" বা সর্বগুণের আকর বলেছেন। সেই সঙ্গে এ-ভক্তিকে ত্রিধাও বলেছেন: "সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা"[৫]। সাধন, ভাব ও প্রেম এই হলো এর তিনটি বিভাগ। শ্রীরূপ আমাদের সচেতন করে দিয়ে বলেছেন, ভাব ও প্রেম 'সাধ্য' নামে চিহ্নিত করার ফলে ভ্রম উপস্থিত হতে পারে, আসলে কিন্তু তা 'নিত্যসিদ্ধ' বস্তু বলেই বুঝতে হবে: "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য

১ চৈ. চ. মধ্য। ২২, ৩৩

২ "তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ভা° ১।১৮।১৩

৩ "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষ"।

৪ চৈ. চ. মধ্য।১৯,১৪৬

৫ পূর্ব। ২য় লহরী, ১

প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"[১]। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধনভক্তি দ্বিবিধা। অনুরাগের উদ্দীপনে নয়, শাস্ত্র শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জীবের যে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাই বৈধী ভক্তি। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশে "এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ" শ্লোকে তারই ইংগিত বর্তমান বলে জানিয়েছেন শ্রীরূপ। ভাগবতে এ-ভক্তির অধিকারীকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রূপ গোস্বামী আবার অধিকারীকে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ, এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে রূপ-শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যের বক্তব্যে অতি সংক্ষেপে অথচ খুবই স্পষ্টভাবে অধিকারী-ভেদের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। সেখানে উত্তমভক্তের লক্ষণ ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে, "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার"। মধ্যম ভক্তের লক্ষণ: "শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান"। সবশেষে অধমভক্তে: "যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন"। কিন্তু ভক্ত যে-শ্রেণী-ভুক্তই হোন না কেন, তাঁর চিত্তে ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপিণী পিশাচী বাস করতে পারে না। বস্তুত গৌড়ীয় বৈষ্ণব "জন্ম ন-জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি" অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই প্রার্থনা করেছেন, "নাপুনর্ভবং বা", অপুনর্ভব বা মোক্ষ নয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা নয়, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেয় বলেই তাঁরা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছাকেই "কৈতবপ্রধান" বলেছেন। হরিতে একান্ত অনুরক্তজন তাই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনোটিই চান না বলে শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত, যদিও মুক্তাবস্থাতেও জীব কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হতে পারে বলে তিনি ভাগবতপ্রমাণ উদ্ধার করেছেন। হরিভক্তিবিলাস থেকে তিনি আবার এ-ভক্তির কয়েকটি সাধনাঙ্গেরও উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রসিকজনের সঙ্গে ভাগবতার্থের আস্বাদন[২] স্মরণীয় হয়ে আছে। অপরাপরের মধ্যে গুরুসেবা, কীর্তনাদি ভাগবতীয় উদাহরণেই বিশদীভূত। সাধনাঙ্গ সখ্যাত্মনিবেদন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীজীব গোস্বামী আবার বিভিন্ন সাধনাঙ্গের মধ্যে ভাগবত-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে নামসংকীর্তনকে বিশেষ গুরুত্বদান করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ভাগবতপ্রমাণের পাশাপাশি স্থাপন করেছেন চৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের অন্যতম "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্লোকটি।

১ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব। ২।২

২ "শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ"

অথ রাগানুগা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছে, ব্রজবাসিজনের প্রকাশ্য-রূপে বিরাজমানা ভক্তিই রাগাত্মিকা, আর রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা[১]। এখন প্রশ্ন, রাগাত্মিকার স্বরূপ কি? শ্রীরূপের ব্যাখ্যানুসারে, অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা, তারই নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে-ভক্তি, তাকেই বলা চলে রাগাত্মিকা[২]। সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা নন্দযশোদা ও বলরামাদিতে অধিষ্ঠিত। আর কামরূপা রাগাত্মিকা একমাত্র ব্রজসুন্দরীতেই নিত্য বিরাজমানা। তাঁদের অনির্বচনীয় 'কাম'ই পরমপ্রেমরূপে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। শ্রীজীবও বলেন, ভজনের পরমবৈশিষ্ট্য বাৎসল্যে নয়, মধুরে; রাসাদি লীলাতেই ভক্তির পরমত্ব; রাধাই শ্রেষ্ঠা আরাধিকা, তৎসংবলিত লীলাময় কৃষ্ণভজনই পরমতম। সেইসঙ্গে শ্রীজীব সতর্ক করে দিয়েছেন, যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তিনিও লোকশিক্ষার জন্য বৈধীযুক্তা রাগানুগা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করবেন। বস্তুত শ্রীচৈতন্যের তুল্য লোকোত্তম ভক্তশ্রেষ্ঠের পক্ষেই রাধাভাব অঙ্গীকারে রাগাত্মিকা মধুরারতি সম্ভব, ভক্তসাধারণের পক্ষে কামানুগা বা সম্বন্ধানুগা কোনো এক প্রকারের রাগানুগা সাধনই শ্রেয়। বিশেষত, শ্রীচৈতন্য নিজেও রাগানুগা সাধনকেই জীবের সর্বাপেক্ষা অনুধাবনযোগ্য মার্গ বলে উপদেশ দিয়েছেন। ভক্তপক্ষে এ-উপদেশের তাৎপর্য যেমন হয়েছে সর্বাংশে রক্ষিত, তেমনিই আবার ব্রজভাবের আনুগত্যময়ী রাগানুগা-সাধনার সঙ্গে চৈতন্যভজনাও হয়েছে অনুস্যূত। চৈতন্যসম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণের মতোই শ্রীচৈতন্যও "সর্বঅবতারময়"[৩] ভগবান্‌রূপে বন্দিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যেরও পরমোপাস্য-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এর বিরোধিতা করলেও, চৈতন্য-উপাসনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ভক্তবৃন্দের কাছে তিনিই সাক্ষাৎ "চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ"। প্রীতিসন্দর্ভের উপসংহারে শ্রীজীবের গৌরবন্দনা মনে পড়ছে, বৃন্দাবনভূমিতে রাধামাধবের প্রকাশমধুর উল্লাস-কল্পতরু তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে আমাকে প্রমোদিত করুক। উক্ত ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আবির্ভূত দুর্জন-

১ "বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব। ২।১৩১

২ "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব। ২।১৩১

৩ "সর্বঅবতারময় চৈতন্য গোসাঞি", চৈ. ভা. অন্ত্য। ৮

পর্যন্ত সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহ কৃষ্ণের জয়[১]।

রাধামাধবের প্রকাশমধুর উল্লাস-কল্পতরু তার সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে ভক্তজনকে প্রমোদিত করুক—প্রীতিসন্দর্ভের পক্ষে এ-ভরতবাক্য যথাযোগ্য বটে। ভক্ত-ভগবানের যে-প্রীণনীয়ত্ব ভক্তিসন্দর্ভে আভাসিত মাত্র, প্রীতিসন্দর্ভে তাই বিশেষিত। চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষায় চৈতন্যদেব একেই বলেছিলেন "ভক্তিফল," ভাষান্তরে "প্রেম-প্রয়োজন"[২]। প্রীতিসন্দর্ভের নির্ণেয় এই প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে 'পঞ্চম পুরুষার্থ' নামে পরিচিত। শ্রীজীবের ভাষায়, প্রীতি বা প্রিয়ত্বলক্ষণের সাক্ষাৎকারই পরমপুরুষার্থ: "প্রিয়ত্বলক্ষণ-ধর্মবিশেষ-সাক্ষাৎকারমেব পরমার্থত্বেন মন্যন্তে"। আর এই প্রীতির দ্বারাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব: "তয়া প্রীত্যৈবাত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিঞ্চ"। প্রমাণ, "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"[৩] ইত্যাদি ভাগবতীয় ঋষভবাক্য। এখন প্রশ্ন, ভাগবতে যদি প্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ বলা হয়ে থাকে, তাহলে আবার "কৈবল্যৈকপ্রয়োজনমিতি" অর্থাৎ, কৈবল্য বা মুক্তিকেই ভাগবতের প্রয়োজন বলা হলো কেন? উত্তরে শ্রীজীব বলেন, মুক্তিতেও আনন্দ বর্তমান, অতএব ভক্তি, প্রীতি বা আনন্দ ব্রহ্মসম্পত্তিরও উপরিস্থিত। তাই ভাগবতে গোপগণের ব্রহ্মসম্পত্তি লাভের পরেই বৈকুণ্ঠদর্শন ঘটেছে। ভাগবতের প্রমাণবলে[৪] তিনি আরো দেখিয়েছেন, প্রীতি গুণময়ী নয়, কাজেই তাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এতেই চিত্তশুদ্ধি হয়, বিষয়সম্বন্ধ অপগত হয়। শেষ পর্যন্ত ভগবৎপ্রীতিতেই জীবের শ্রেষ্ঠ বিশ্রান্তি ঘটে, এ-প্রীতিই "শোকমোহভয়াপহা"। প্রীতিবৃত্তির সবাপেক্ষা স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীজীব বলেছেন, যিনি স্বয়ং প্রীত্যাস্পদ, সেই ভগবান্‌ই প্রীতিলাভে সন্তুষ্ট। ভাগবত-প্রমাণই তো বলে, যিনি প্রীত হলে দেবতা-মানুষ পশু-পাখি তৃণ-লতা ইত্যাদি আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই তৎক্ষণাৎ প্রীতিলাভ করে, সেই প্রীতিস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গয়রাজের যজ্ঞে প্রীতিলাভ করতেন[৫]। তিনি আত্মারাম ও পরমানন্দ-স্বরূপ হলেও সূর্যপূজায়

১ "বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্বাতিশায়িশ্রিয়া।
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ॥
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥"

২ চৈ. চ. মধ্য। ২৩ ৩ ভা° ৫।৫।৬

৪ ভা° ১১।২৫।২৩-২৮ ৫ ভা° ৫।১৫।১৩

দীপদানের মতো তাঁর অর্চনে-বন্দনে প্রীতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন[১]। প্রসঙ্গত জীবপক্ষে এই প্রীতিলাভের তটস্থ লক্ষণরূপে ভাগবত থেকেই পুলক, চিত্তদ্রবতা, রোমহর্ষ, আনন্দাশ্রুকলা উদাহৃত। তবে প্রীতির স্তর-পরম্পরা, যথা, রতি-প্রেম-প্রণয়-মান-স্নেহ-রাগ-অনুরাগ-মহাভাব শ্রীজীব রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকেই উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই পঞ্চরতির পঞ্চরসে পরিণতিও তাঁর সমর্থন লাভ করেছে। শ্রীরূপের মতো তিনিও সর্বরসের সর্বপরিকর মধ্যে ব্রজদেবীরই 'অসমোর্ধ্ব' মহাভাবকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ ভাগবতবাক্য[২] উদ্ধার করেই বলেছেন, মুমুক্ষু বা মুক্তজনও এই প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রার্থনা করে থাকেন। আর গৌড়ীয় মতে বৃন্দাবনভূমির এই 'সর্বসাধ্যশিরোমণি প্রেম' অঙ্গীকার করে রাধামাধবের উল্লাস-কল্পতরুর রসবিস্তারের জন্যই আবির্ভূত চৈতন্যাবতার। চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনও তাই 'অমল শাস্ত্র' ভাগবতের মূলীভূত তত্ত্বপ্রস্থানের সঙ্গে 'চৈতন্যবিগ্রহ-কৃষ্ণ' শ্রীচৈতন্যের তুল্য লোকোত্তর সাধকের আত্মসাক্ষিক উপলব্ধির অপূর্ব মহামিলনে অনবদ্য। সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন অপেক্ষা রসতত্ত্বের আলোচনাক্রমেই দর্শন ও ভাবসাধনার সেই মহাসংগম-সুধার কণামাত্র আস্বাদন করা যেতে পারে।

ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব

"এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ"[৩]। এই কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবই ভক্তিরস হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসপ্রমাতার এ-ঘোষণাই মুহূর্তে ভারতীয় কাব্যালংকারশাস্ত্রের নব-অধ্যায় রচনা করে ফেলে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে এতদিন রত্যাদি ন'টি ভাবকেই চিত্তস্থ স্থায়িভাবরূপে গণ্য করা হতো, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী যোগে তাদের শৃঙ্গারাদি "সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ" "বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ" রসে পর্যবসানই ছিল আলংকারিকগণের অভিমত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই প্রচলিত রসশাস্ত্রবিধিকে লঙ্ঘন করলেন 'শাস্ত্র ভাগবতে'রই নিরন্তর প্রবর্তনায়। বস্তুত, ভাগবত যে সিদ্ধান্ত করেছিল, হরির জগৎপাবন যশ যাতে বর্ণিত না হয়, সে কাব্য যতই মনোরঞ্জক বিচিত্র

১ ভা° ১।১১।৪-৫ ২ ভা° ১০।৪৭।৫১

৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ৫।৬

পদসমূহ বিন্যস্ত হোক না কেন, তা কাকসেবিত তীর্থ মাত্র, পরন্তু মানসহংসের আবাসস্থল নয়,[১] গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসপ্রমাতাগণ যেন তাকেই শিরোধার্য করে নবরসশাস্ত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ব্যাখ্যাত স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি তাই ভগবানের হ্লাদিনী-সম্বিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিমাত্র, তা "শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে 'লভয়ে' উদয়"। বিভাবের বিষয় তাই 'ভগবান্ স্বয়ং' শ্রীকৃষ্ণই—তিনি একাধারে রস এবং রসিকও; আর আশ্রয় তদধীন ভক্তবৃন্দ। সাত্ত্বিকাদি অনুভাবসমূহ কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবেরই ভক্তদেহাশ্রিত বিকার, নির্বেদাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চারীও কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব-সমুদ্রে তরঙ্গের মতোই উন্মজ্জিত হয়ে স্থায়িভাবকেই বর্ধিত করছে, স্থায়িভাব-রূপতা প্রাপ্ত হচ্ছে, আবার স্থায়িভাবসমুদ্রেই হচ্ছে নিমজ্জিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রস তাই ভক্তিরস, তা অপ্রাকৃত, অলৌকিক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নির্দেশিত এই অপ্রাকৃত অলৌকিক রসকে এক কথায় 'পারমার্থিক রস' বলে চিহ্নিত করেছেন 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থপ্রণেতা মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তাঁর মতে,

"এই পারমার্থিক রসের বন্যা বহাইবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"[২]

অতঃপর রূপ গোস্বামীর অনুসরণে তিনি 'পারমার্থিক রসে'র যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে এর নিত্যসিদ্ধ-স্বভাবই প্রকটিত হয়েছে সর্বাধিক :

"ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন :

"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"।

পারমার্থিক রসেব স্থায়ী ভাব যে কৃষ্ণরতি, তাহা নিত্যসিদ্ধ ; সুতরাং তাহা সাধ্য বা উৎপাদ্য হইতে পারে না।"[৩]

রূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব' কৃষ্ণরতি-সম্ভব পারমার্থিক রসতত্ত্বকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলেছেন 'চতুর্থ প্রস্থান'। অর্থাৎ, শ্রুতি-প্রস্থান, ন্যায়-প্রস্থান এবং স্মৃতি-প্রস্থানের পর রূপ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত রস-প্রস্থানই 'চতুর্থ প্রস্থান' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। এ-প্রস্থানের মূল কথা তাঁর মতে ভক্তির সান্দ্রতাতেই নিহিত। আবার পক্ষান্তরে,

---

১ "ন তদ্ বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত-কর্হিচিৎ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্রহি সাধবোঽমলাঃ॥" ভা' ১২।১২।৫০

২ 'পারমার্থিক রস', বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, পৃ' ৪১

৩ তত্রৈব, পৃ: ১২২

"ভক্তির সান্দ্রতা প্রেমই অমৃত। প্রেম—'পঞ্চম পুরুষার্থ'।...ভক্তিরই পরম পরিণতি প্রেম।"[১]

বৈষ্ণব ভক্ত দীনশরণ দাস আবার এই 'পঞ্চম পুরুষার্থ' প্রেমকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করে তার রসতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বৈষ্ণব আচার্যকুলের অভিমত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন,

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমরসেরও আলম্বনবিভাব এবং শৃঙ্গাররসেরও আলম্বন-বিভাব। প্রেমরসে অঙ্গসঙ্গ নাই...এই স্পর্শবাঞ্ছাহীন প্রেম হইতে যে রস তাহারই নাম প্রেমরস।

"কবিকর্ণপূরের মতে প্রেমরসের স্থায়ী ভাব চিত্তদ্রব। তাহা ভাববিশেষ নহে, কিন্তু ভাবেরই অনুভাব-বিশেষ।... রুদ্রট তৎকৃত অলংকারগ্রন্থে 'স্নেহস্থায়ী ভবেৎ প্রেয়ান্' বলিয়াছেন। প্রেয়োরস বা প্রেমরসের স্থায়ী ভাব স্নেহ। কবিকর্ণপূর প্রেয়োরসকে প্রেমরস এবং স্নেহস্থানে স্থায়ী ভাবে চিত্তদ্রব বলিয়াছেন।"[২]

সাধারণভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রস কিংবা বিশেষভাবে প্রেমরস সম্বন্ধেও ড° উমা রায়ের গবেষণাগ্রন্থ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব' প্রণিধান-যোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বে প্রাচীন রসপ্রস্থানের অনুবৃত্তিসহ অভিনবত্ব সৃষ্টি কোথায় এবং কতটা, সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবেই আলোকপাত করেছেন।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ভাগবতের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচকগণের একজনও আলোচনা করেননি। প্রমথনাথ তর্কভূষণ, দীনশরণ দাস বা ড° উমা রায় উদাহরণক্রমে কচিৎ ভাগবতাংশ স্মরণ করেছেন বটে ; বিশেষত শেষোক্ত গবেষক স্পষ্টতই বলেছেন,

"শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাব্যসম্পদ ধনী করেছে বৈষ্ণবকাব্যকে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্তে বিধৃত আছে তত্ত্বনির্ণয়ের শেষ কথা।"[৩]

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈষ্ণবীয় অলংকারের ধারায় ভাগবত কিভাবে রসতত্ত্ব-নির্ণয়েরও 'শেষ কথা' হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। আবার তিনি যখন এও স্বীকার করেন,

১ 'চতুর্থ প্রস্থান এবং পঞ্চম পুরুষার্থ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬

২ 'প্রেমরস ও অনন্ত প্রকাশ', বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্যসম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ

৩ 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব', পৃ° ৪

"বৈষ্ণব অলংকারিকেরা রস-তত্ত্ব নিয়ে যতখানি আলোচনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে,"[১]

—তখন আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা জাগে, এই "রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে" বৈষ্ণব আলংকারিকগণের আলোচনায় ভাগবত যে "সর্বপ্রমাণ-চক্রবর্তিভূত"-রূপে কী বিপুল পরিমাণে উদাহৃত হয়েছে, সে সম্বন্ধেও তিনি আমাদের অবহিত করবেন। বস্তুত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় অলংকারশাস্ত্রে ভাগবতের স্থাননিরূপণে বিদগ্ধজনের খেদজনক নীরবতার ফলে এ-কাজে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদেরই ব্রতী হতে হয়েছে। কেননা আমরা মনে করি, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের মতো রসতত্ত্বের ক্ষেত্রেও ভাগবতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আকরগ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারের মূলত তিনটি সূত্রই আমাদের প্রমাণাপেক্ষায় আছে :

ক. ভাগবতে কৃষ্ণ 'রসস্বরূপ' বলে কথিত হয়েছেন কিনা।

খ. কৃষ্ণ সম্বন্ধী ভক্তি এ-পুরাণে 'ভাব' রূপে আদৌ উল্লিখিত কিনা।

গ. এই কৃষ্ণ সম্বন্ধী ভক্তি বা 'ভাব' রসতাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো ইংগিত ভাগবতে আছে কিনা।

প্রসঙ্গত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আলংকারিকগণ প্রদর্শিত রসের 'বিচিত্র প্রকার' বর্ণনায় উদ্ধৃত ভাগবতের বিপুল উদাহরণ-সম্ভারের কিয়দংশও উল্লিখিত হবে। তবে সেইসঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, যেহেতু পুরাণ অলংকারশাস্ত্র নয়, সেহেতু অলংকারশাস্ত্রে মুহুর্মুহু উচ্চারিত পরিভাষাসমূহ ভাগবতে প্রাপ্তির আশা বাতুলতা মাত্র। ভাগবতীয় রস 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' মাত্র নয়, তা স্বয়ং ব্রহ্মাস্বাদ, তারও অধিক, কৃষ্ণানন্দ-সুখানুভব ; আর রসীভবনও শ্রবণাদি নবাঙ্গ সাধনযোগেই সিদ্ধ।

আমরা তো জানি, ভাগবতেই ভাগবতপুরাণকে আমোক্ষকাল পেয় 'রস' বলা হয়েছে, 'ভাগবতং রসমালয়ং'। ভাগবতকে রস-ই বা বলা হলো কেন, সে সম্বন্ধে ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ যুগপৎ শ্রীধরটীকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুধাবন করে বড়ো সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন[২]। তিনি দেখিয়েছেন, রস হচ্ছে আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় সুখ, অলংকারকৌস্তুভের ভাষায়, "চমৎকারি সুখং রসঃ"। শ্রুতি অনুসারে একমাত্র ভূমা বা ব্রহ্মবস্তুই

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব, পৃ° ৯৫

২ দ্র°, ভা° ১।১।৩ শ্লোকের গৌর-মন্দাকিনী টীকা, 'শ্রীমদ্ভাগবতম্' প্রথম স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়

সুখ, "ভূমৈব সুখম্"। আবার রসও সেই ব্রহ্মবস্তুই, "রসো বৈ সঃ"। ভাগবতে কৃষ্ণ, ব্রহ্ম পরমাত্মা বা ভগবান্ বলে কথিত, "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"। অতএব কৃষ্ণই "রসো বৈ সঃ", এককথায় রসস্বরূপ। তাঁরই নাম-গুণাদি কীর্তন করেছে বলে ভাগবতও তাই রস-রূপে স্বীকৃত। আবার রসস্বরূপ কৃষ্ণ হলেন একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"[১]। কাজেই ভক্তিতেই শেষ রসাশ্রয়, আর ভক্তগণই রসিকোত্তম। 'রস-ফল' ভাগবত তাই তাঁদের আমোক্ষকাল পেয়। আমোক্ষকাল বলতে মোক্ষলাভের পরেও বোঝায়। অর্থাৎ কর্মবাসনা-ছিন্নকারী মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মারাম মুনিবৃন্দের কাছেও ভাগবত পরমাস্বাদ্য। স্বয়ং শুকদেবই তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লক্ষণীয় এঁদের আস্বাদনে ভাগবত নিগমকল্পতরুর ফল মাত্র নয়, সাক্ষাৎ 'রসফল'। তাৎপর্য, তাতে বর্জনীয় হেয়াংশ কিছুই নেই, তা পদে পদে আস্বাদনীয়, "যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে"[২]। লোকোত্তর রসিক-ভাবুকরূপে চৈতন্যের আস্বাদনও ছিল অনুরূপ। রসস্বরূপ কৃষ্ণের অবতার-রূপে ভাগবত তাই তাঁর কাছে সাক্ষাৎ "প্রেমরূপ"[৩] বলে প্রতিভাত, ভাষান্তরে, "মূর্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরসমাত্র"[৪]। 'রস' রূপে এইভাবেই সর্ব-রসিকোত্তম-স্বীকৃত ভাগবতে 'দশম পদার্থ' 'আশ্রয় কৃষ্ণ'ও পরমরস-রূপে বর্ণিত।

প্রসঙ্গত, কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে ব্রহ্মার সেই বিস্মিত দর্শন ভোলার নয়। ব্রহ্মা দেখেছিলেন, নিত্য তাঁকে ঘিরে আছেন যে-ভক্তবৃন্দ, শ্যামসুন্দরের মতো তাঁরাও "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তি"[৫]। আর তিনি যে সুখস্বরূপ, তাও ভাগবত-অনভিপ্রেত নয়। ব্রহ্মাই তো তাঁকে "একঃ" "আত্মা" "পুরুষঃ" "পুরাণঃ" "সত্যঃ" "স্বয়ংজ্যোতিঃ" "অনন্তঃ" "আদ্যঃ" "নিত্যঃ" "অক্ষরঃ" "নিরঞ্জনঃ" "পূর্ণঃ" "অদ্বয়ঃ" "উপাধিতঃ মুক্তঃ" বলার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছেন যে, তিনি যুগপৎ "অমৃতঃ" এবং "অজস্রসুখঃ"[৬]। বসুদেবও তাঁকে বলেছিলেন "কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ"[৭]। প্রহ্লাদও পরমেশ্বর হরিকে একই আখ্যায় ভূষিত করে[৮] অপবর্গের প্রশ্নে বলেছিলেন,

১ ভা° ১১।১৪।২১
২ ভা° ১।১।১৯
৩ চৈ° ভা°, মধ্য।২১, ১৫
৪ চৈ° ভা°, অন্ত্য।৩, ৫১৯
৫ ভা° ১০।১৩।৫৪
৬ ভা° ১০।১৪।২৩
৭ ভা° ১০।৩।১৩
৮ ভা° ৭।৬।২৩

"কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসঙ্কাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥"[১]

অর্থাৎ, তুচ্ছ নশ্বর অন্তঃসারশূন্য পদার্থসমূহ নিত্যানন্দ রসসাগর আত্মার কি করবে?

এই 'নিত্যানন্দরসোদধি' আত্মার আবার আত্মা হলেন হরি, "সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ"[২]। সুতরাং তিনিই সাক্ষাৎ নিত্যানন্দরসসাগর এই বক্তব্য। শেষ পর্যন্ত তাই দান তপ যাগ শৌচ ব্রত বা অন্য কিছুতেই নয়, নির্মল ভক্তিতেই রসসাগরের সর্বাধিক প্রীতি, এ ছাড়া সবই তো বিড়ম্বনা —ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের ভাষায়, "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্"[৩]। যাতে সর্বত্র তাঁর দেখা মেলে "যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্", সেই গোবিন্দে একান্ত-ভক্তিই, "একান্তভক্তি র্গোবিন্দে", প্রহ্লাদের মতে, "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ"[৪]; ইহলোকে জীবের পরমপুরুষার্থ: "পরঃ স্বার্থঃ"।

পরম-স্বার্থ কৃষ্ণভক্তি ভাগবতে কোথাও 'প্রীতি', কোথাও আবার 'রতি' রূপেও উল্লিখিত। প্রথমত, প্রীতি-রূপে উল্লিখিত হওয়ার উদাহরণস্বরূপ ঋষভদেবের বাক্যই উদ্ধার করা যায়: "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ"[৫]। অর্থাৎ, যতদিন না বাসুদেবে প্রীতি জন্মাচ্ছে, ততদিন দেহবন্ধন থেকে মুক্তি নেই।

দ্বিতীয়ত, রতি-রূপে উল্লিখিত হওয়ার দৃষ্টান্তক্রমে স্মরণীয় উদ্ধবসকাশে নন্দের উক্তি "রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে"[৬]: ভগবান্ কৃষ্ণে আমাদের রতি হোক।

কৃষ্ণে প্রীতি বা রতি আবার এ-পুরাণে ভাবরূপেও চিহ্নিত। অজা-মিলোপাখ্যানে ভক্তিযোগকে তাই 'ভাবযোগ'রূপে উল্লিখিত হতে দেখি। যমদূতদের কাছে বৈষ্ণবের উৎকর্ষ বর্ণনা করে যমরাজ বলছেন: "এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্"[৭]। তাৎপর্য, এরূপ বিচার করেই সুধী ব্যক্তিবর্গ ভগবান্ অনন্ত হরিতে সর্বতোভাবে ভক্তিযোগেরই অনুষ্ঠান করে থাকেন।

ভক্তিযোগকে ভাবযোগ বলার তাৎপর্য গভীর। ভাগবতেরই আশ্রয়ে সে-তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্"[৮]—ইত্যাদি শ্লোকটির সহায়তা গ্রহণ করা চলে। উক্ত

১ ভা° ৭।৭।৪৫ ২ ভা° ৭।৭।৪৯ ৩ ভা° ৭।৭।৫২ ৪ ভা° ৭।৭।৫৫
৫ ভা° ৫।৫।৬ ৬ ভা° ১০।৪৭।৬৭ ৭ ভা° ৬।৩।২৬ ৮ ভা° ১১।১৪।২৫

শ্লোকে বলা হয়েছে, অগ্নিতে সন্তাপিত সুবর্ণ যেমন মলিনতা ত্যাগ করে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়, জীবও তেমনি ভক্তিযোগেই কর্মবাসনা পরিত্যাগ করে হরিভজনা করে থাকে। এখানে হেম-পক্ষে "স্বং রূপম্" বা স্ব-রূপ যা, জীব-পক্ষে তাই হলো স্ব-ভাব—জীবের স্ব-ভাব আর কিছু নয়, ভক্তিযোগে কৃষ্ণ-ভজনার বাসনা। ভক্তিযোগ এই অর্থেই ভাবযোগ-রূপে সার্থক অভিহিত।

ভক্তি, প্রীতি বা রতির পরিপক্ব অবস্থানান্তর বোঝাতেও ভাগবতে 'ভাব' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন, প্রথম স্কন্ধে নারদ কেশবকর্তৃক তাঁকে তাঁর ভাব—"ময্যস্মিন্ ভাবঞ্চ"[১] দানের কথা বলেছিলেন। ক্রমসন্দর্ভ-টীকাকার বলেন, এই 'ভাব' হলো মহাপ্রেম : "ভাবং মমতাপ্রেমাণাঞ্চ"[২]। ভাগবতে "ভাব" যে কোথাও কোথাও মহাপ্রেমের ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। উদাহরণস্বরূপ বৃন্দাবনসুলভ কৃষ্ণানুরাগ যে-স্থলে ভাব-রূপে উল্লিখিত, তা উদ্ধার করা যায়। শেষবারের মতো ব্রজের গো-গোপী-নগ-মৃগাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উদ্ধবের নিকট ভগবান বলেছিলেন, "কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ"[৩]—একমাত্র ভাবের দ্বারাই, অর্থাৎ, কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্টতার বলেই বৃন্দাবনস্থ গোপী-গো-নগ-মৃগ কৃতার্থ হয়েছে। ব্রজ-লভ্য এই সাধারণ "ভাব" গোপীগণে যে আবার অনন্যবিশেষ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা উদ্ধব-কর্তৃক গোপীবন্দনা-পদেই স্পষ্ট। উদ্ধব সেখানে ব্রজবধূর কৃষ্ণানুরক্তিকে "অনুত্তমা ভক্তিঃ" "মুনীনামপি দুর্লভা"[৪] বলে অভিহিত করে বলেছেন, আধোক্ষজে তাঁদের তো 'সর্বাত্মভাব' ই কৃত। যুগপৎ মিলনে-বিরহেই তা অনুত্তম বলে বুঝতে হবে। উদ্ধবের বক্তব্য অনুসারে, রাসে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা হয়ে গোপীবৃন্দ যে-প্রসাদ লাভ করেছিলেন, তাও যেমনি পদ্মিনী স্বর্কন্যাসহ লক্ষ্মীরও অলব্ধ, তাঁদের বিরহও তেমনি নিখিল ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহ-বিশেষ। উদ্ধবের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাক্যে : "বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেহনুগ্রহ কৃতঃ"[৫] আপনাদের বিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ। মিলন-বিরহে সুদুর্লভ এই "সর্বাত্মভাব" তাই উদ্ধব-কর্তৃক 'রূঢ়ভাব' রূপে বিশেষিতঃ "এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ"[৬]। অর্থাৎ, সার্থক এই গোপীদের দেহধারণ, নিখিলাত্মা গোবিন্দে যাঁরা রূঢ়ভাবা, ভাষান্তরে পরমাত্মায় যাঁদের

১ ভা° ১।৫।৩৯ ২ ভা° ১।৫।৩৯ শ্লোক-টীকা ৩ ভা° ১১।১২।৮
৪ ভা° ১০।৪৭।২৫ ৫ ভা° ১০।৪৭।২৭ ৬ ভা° ১০।৪৭।৫৮

'রূঢ়ভাব'—"পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ"[১]। শ্রীধরস্বামী তাঁর ভাবার্থদীপিকায় এই "রূঢ়ভাব" শব্দের টীকায় লিখেছেন: "পরমপ্রেমবত্যঃ" বা পরমপ্রেমবতীগণ। সুতরাং 'রূঢ়ভাব' পরমপ্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্ধব একেই নামান্তরে বলেছেন 'অনুত্তমা ভক্তি'। গোবিন্দে একান্ত ভক্তিকে প্রহ্লাদ যখন ইহলোকে জীবের 'পরঃস্বার্থঃ' বা পরমপুরুষার্থ বলেন, তখন গোপীদের অনুত্তমা ভক্তি 'রূঢ়ভাব'কে তো পরতর স্বার্থ বা পরমতম পুরুষার্থ বলতে হয়।

পুরুষার্থকে আবার রস-রূপে ব্যাখ্যা ভাগবতের সনাতন-সংসার-তরু বর্ণনায় বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রাসঙ্গিক স্থলে দেখি, সংসারকে "পুরাণ-বৃক্ষের" সঙ্গে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ তুলনায় সুখ ও দুঃখ হয়েছে দুটি ফল, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিবিধ মূল এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পুরুষার্থ-চতুষ্টয় "চতুরসঃ"[২]। ভাগবতের পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তিও যখন পরম-আস্বাদ্য রস হয়ে ওঠে তখন স্বভাবতই আর বিস্ময়ের কিছু থাকে না। ভাগবত "অদ্ভুতগুণ হরির" প্রতি জীবের অহৈতুকী ভক্তিরই আকর গ্রন্থ। সেক্ষেত্রে ভাগবত যে "রসমালয়ং", তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়। আর ভাগবতের মতে, যেহেতু এই রসই 'পরম রস', তাই তার অন্তিম প্রত্যয়ও এত দৃঢ়—"তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য" তার রসামৃতে তৃপ্তজনের, "নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ কচিৎ"[৩]—কখনো অন্যত্র রতি জন্মাতে পারে না। কোনো সন্দেহ নেই, "শাস্ত্র"ভাগবতের পথেই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-প্রণেতা কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবের ভক্তিরসে পর্যবসানের কথা ঘোষণা করতে পেরেছেন। আর প্রীতিসন্দর্ভকারও যে একমাত্র অলৌকিক কৃষ্ণরতিরই রসরূপতা স্বীকার করেছেন, লৌকিক ভাবাদির নয়, তারও মূল ভাগবতেই সন্নিবিষ্ট:

> "তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
> তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
> তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং
> যদুত্তমঃশ্লোক যশোঽনুগীয়তে॥"[৪]

তাৎপর্য, যে-বাক্যে উত্তমঃশ্লোকের যশ অনুগীত হয়, তাই রম্যরুচির, নিত্য নবায়মান, মনের শাশ্বত মহোৎসব এবং শোকাপহারী। এক কথায় তাই হল যথার্থ কাব্য লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ, সত্ত্বোদ্রেককারী অখণ্ড-প্রকাশানন্দ-চিন্ময়

১ ভা° ১০।৪৭।৫৯ ২ ভা° ১০।২।২৭
৩ ভা° ১২।১৩।১৫ ৪ ভা° ১২।১২।৪৯

বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য রসের উদাহরণ। পক্ষান্তরে, যাতে "হরের্যশো জগৎ-পবিত্রং" কথা নেই তা "চিত্রপদং" হয়েও কাকতীর্থ মাত্র, পরন্তু হংসসেবিত নয়, "তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসেবিতং"। বক্তব্য এই, লৌকিক ভাব ন্যক্কার-জনক, তাই তা শুধু বীভৎস-রসলোলুপেরই আস্বাদ্য হতে পারে, কিন্তু কমল-বনচারী মানসহংসের চিত্তরসায়ন একমাত্র কমলনেত্র কৃষ্ণেরই কথামৃত। জীব গোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের ভাষায়, "তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি"। অর্থাৎ, লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব আছে, এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। আর লৌকিক বিভাবাদির দ্বারা রস জন্মায়, এ কথা যদি কেউ বলে তাহলে বলতে হয়, সে রস বীভৎস রস।

এহোত্তম। শুধু রূপগোস্বামীর ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠাতেই নয়, কবিকর্ণপূরের প্রেমরসের প্রতিষ্ঠাতেও "শাস্ত্র" ভাগবতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা জানি, ভোজরাজের অনুসরণে কবিকর্ণপূরও তাঁর অলংকারকৌস্তুভে বলে-ছিলেন, বৎসলতা ও প্রেমসহ রস একাদশাবধি[১]। উপরন্তু তিনি মনে করেন, যাবতীয় রসের প্রেমরসেই অন্তর্নিবিষ্টতা ঘটে, এমনই এর অতিমহান্ প্রপঞ্চ: "প্রেমরসে সর্বে রসা অন্তর্ভবন্তীতাত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ"[২]। পূর্বেই বলা হয়েছে গৌড়ীয় মতানুসারে, প্রেমই অঙ্গী, শৃঙ্গার অঙ্গ মাত্র। তারই উল্লেখে কবিকর্ণপূর তাঁর গ্রন্থে বলেন, "বয়ন্তু প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ"[৩]।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, শৃঙ্গার থেকে "বিশেষ" এই 'প্রেম-রসের'র কোনো ভাগবতীয় আদর্শ গৌড়ীয়-মত প্রভাবিত করেছে কিনা। এ-প্রশ্নের সমাধানে কবিকর্ণপূরেরই গুরুদেব শ্রীনাথ চক্রবর্তীর চৈতন্যমতমঞ্জুষা-টীকাধৃত ভাগবতীয় "প্রেমরসানুভাবিনী" বস্ত্রহরণলীলার ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হবে। শ্রীনাথের মতে, বস্ত্রহরণলীলায় অনূঢ়া গোপীদের শৃঙ্গার নয়, প্রেমরসই অভিব্যক্ত হয়েছে। এস্থলে স্থায়ী—মমকার। আলম্বন ও উদ্দীপন যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁর পরিহাসোক্তি অনুভাব—অন্যোন্যপ্রেক্ষণাদি এবং সঞ্চারী—ব্রীড়া প্রভৃতি। উক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারী যোগে পুষ্ট

১ দ্র° ৫ম কিরণ। ৩ ২ দ্র° তত্রৈব। ১২,

৩ তত্রৈব

মমকাররূপ স্থায়ী ভাব যে-রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাকে কুমারীদের প্রেমাখ্য রসই বলতে হয়, পরন্তু শৃঙ্গারাখ্য রস নয়।[১]

শ্রীনাথ চক্রবর্তীর ভাগবতাশ্রিত এই প্রেমরসভাবনা তৎশিষ্য কবিকর্ণপূরকে প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি গুরু-প্রদর্শিত পথের আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েই ঘোষণা করেছেন, কৃষ্ণাশ্রিত যে-রসে সর্বরসের অন্তর্নিবিষ্টতা ঘটে, তাই প্রেমরস[২]। আর প্রেমই অঙ্গী, শৃঙ্গার অঙ্গমাত্র। এইজন্যই অলংকারকৌস্তুভ-প্রণেতা কৃষ্ণকে বিশেষভাবে "রসঃ শৃঙ্গারনামায়ং শ্যামলঃ কৃষ্ণদৈবতঃ," অর্থাৎ শৃঙ্গারনামা শ্যামরসের পরমদৈবত বললেও, সর্বোপরি তাঁর সর্বরসাত্মকতাই[৩] স্বীকার করেছেন।

কৃষ্ণের এই সর্বরসাত্মকতার একটি অপূর্ব উদাহরণ হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কংসের সভায় মল্লবেশধারী কৃষ্ণের ব্যক্তিভেদে দর্শনভেদ[৪] ভাগবত থেকে উদ্ধার করেছেন। সেখানে দেখি, কৃষ্ণ মল্লদের কাছে বজ্র, সাধারণজনের কাছে নরশ্রেষ্ঠ, নারীদের কাছে স্মর-মূর্তিমান্, গোপবৃন্দের কাছে বয়স্য, দুর্বৃত্ত ক্ষিতিপালকদের কাছে শাস্তা, আবার আপন পিতামাতার কাছে শিশু, ভোজপতি কংসের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞের কাছে বিরাট বা প্রাকৃতমনুষ্য, যোগীর কাছে পরতত্ত্ব, বৃষ্ণিদের কাছে পরমদৈবত। রসের আলোকে এই বিচিত্র-দর্শনেরই অনবদ্য ব্যাখ্যা করে বিশ্বনাথ বললেন, "অশনিবৎ" রূপে কৃষ্ণ রৌদ্ররসের, "নৃণাং নরবরঃ" রূপে অদ্ভুতরসের, "স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্" রূপে শৃঙ্গাররসের, "গোপানাং স্বজনঃ" রূপে হাস্যরসের, "অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা" রূপে বীররসের, "স্বপিত্রোঃ শিশুঃ" রূপে করুণরসের, "মৃত্যুর্ভোজপতেঃ" রূপে ভয়ানকরসের, "বিরাজবিদুষাং" রূপে বীভৎসরসের, "তত্ত্বং পরং যোগিনাং" রূপে শান্তরসের এবং "বৃষ্ণীণাং পরদেবতা" রূপে ভক্তিরসের আলম্বন।

১ "অয়ং হি প্রেমাখ্যো দশমো রসঃ, তথাহি মমকারোঽত্র স্থায়ী ভাবঃ, আলম্বনং শ্রীকৃষ্ণঃ, উদ্দীপনং তৎক্ষ্বেলিতাদি। অনুভাবঃ—অন্যোন্যং প্রেক্ষণাদি, ব্যভিচারী ব্রীড়িতা ইতি ব্রীড়া—এভিঃ পরিপুষ্টো মমকারঃ স্থায়ী রসতামাপন্ন ইতি প্রেমাখ্যো রসঃ। অতঃ কুমারীণাং প্রেমাখ্য এব রসঃ ন শৃঙ্গারঃ'॥ চৈতন্যমতমঞ্জুষা ১০।২২।১২ টীকা

২ অলংকারকৌস্তুভ, ৫ম কিরণ। ১২ ৩ "সর্বরসাত্মকত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য," তত্রৈব

৪ "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাজবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥" ১০।৪৩।১৭

ভাগবতে 'নিত্যানন্দরসোদধি' আত্মারও আত্মা বলে বর্ণিত কৃষ্ণ এই-ভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে 'পূর্ণানন্দ' 'পূর্ণরস-স্বরূপ' হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় :

"কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে ;
পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্‌জন ॥"[১]

"আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন" কথাটি মুহূর্তে ব্রহ্মসংহিতার উক্তি স্মরণ করায়,

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"[২]

তাৎপর্য, যে আনন্দচিন্ময় পুরুষ রসাত্মতা-বশত নিখিল প্রাণীর চিত্তে স্মর-রূপে প্রতিফলিত হয়ে নানা লীলায় বিশ্বজয় করছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

লক্ষণীয়, রসস্বরূপেই আনন্দচিন্ময় পুরুষ অগণ্য ভুবন জয় করছেন। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" উপনিষদ-বচনের মতোই বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেও রস ও আনন্দ একার্থক হয়ে উঠেছে। ভাগবত তাই রস-স্বরূপকে বলেছে 'অজস্রসুখ' তথা 'কেবলানুভবানন্দস্বরূপ,' আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব—'পূর্ণানন্দ'। চৈতন্য-চরিতামৃতে এই 'পূর্ণানন্দ'-স্বরূপেরই প্রশ্ন শুনি : "আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্‌জন"? এক্ষেত্রে ভাগবতের অনুসরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবও বিশ্বাস করেন, সূর্যপূজায় দীপদানের মতো আপ্তকাম পূর্ণানন্দ পুরুষকেও আনন্দিত করার ভক্তকৃত প্রয়াস ব্যর্থ নয়। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রসিকশেখর কৃষ্ণের পরেই তাই 'ভক্তিরসপাত্র' কৃষ্ণভক্তের স্থান। এই যে 'বিষয়' কৃষ্ণ, 'আশ্রয়' ভক্ত এবং এঁদের অন্যোন্য ক্রীড়া যাতে, সেই নিত্যসিদ্ধ ভক্তিরসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে রূপ গোস্বামী যে কী বিপুল পরিমাণে ভাগবতের উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। দু'চারটি পরিসংখ্যান উপস্থিত করেই বিষয়টি প্রমাণীকৃত করা সম্ভব।

১ চৈ, চ, আদি। ৪, ১২৫-১২৬ ২ ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৩৭

আমরা তো জানি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ববিভাগের চারটি লহরীর মধ্যে প্রথমটিতে স্থান পেয়েছে সামান্যভক্তি, দ্বিতীয়টিতে সাধনভক্তি, তৃতীয়ে ভাব-ভক্তি এবং চতুর্থে প্রেমভক্তি। এক "অন্যাভিলষিতাশূন্য" প্রথম শ্রেণীর ভক্তিরই প্রমাণরূপে ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ থেকে চতুর্দশ শ্লোকসমূহ উদাহৃত। এ ভক্তিরই অপ্রারব্ধ-পাপহারী স্বরূপের পরিচয়দানে আবার ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের "যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চিঃ" শ্লোকটি উদ্ধৃত। পক্ষান্তরে প্রারব্ধ-পাপহারী, পাপবীজহারী এবং অবিদ্যাহারী সদ্‌গুণপ্রদ স্বরূপের উদাহরণ প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণেরই যথাক্রমে তৃতীয় স্কন্ধের "যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাদ্‌," ষষ্ঠ স্কন্ধের বাদরায়ণি-বচন "তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে" চতুর্থের ব্রহ্মকুমার-বচন "যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ" এবং পঞ্চমের শুকদেবসুভাষণ "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈ-স্তত্র সমাসতে সুরাঃ" সংকলিত। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হয়ে আছে, এ-ভক্তিরই সুদুর্লভতার প্রমাণসংগ্রহে ভাগবতেরই বিখ্যাত ভগবদ্বাক্য উদ্ধার: "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌" এক কথায় যার তাৎপর্য, ভজনকারীকে ভগবান তবু যদি মুক্তিও দেন, তবু ভক্তিযোগ কদাপি নয়। স্বভাবতই এ-ভক্তির যুগপৎ কৃষ্ণাকর্ষিণী এবং কৃষ্ণবশীকরণ-পারদর্শিনী শক্তিও স্বীকার্য। প্রথমোক্ত শক্তিরই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধবের নিকট ভগবানের উক্তি উদ্ধার করেছেন রূপ,—ভক্তি আমাকে যেমন অধিকার করে উদ্ধব, তেমন আর কিছুই নয়, না যোগ-সাংখ্য, না স্বাধ্যায়, না তপস্যা-ত্যাগ।

এই সামান্যভক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদের বিশ্লেষণেও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পদে পদে ভাগবতের সূক্তিমুক্তাবলী আহরণ করেছে। সামান্যার 'সাধন'-অঙ্গের বৈধী ও রাগানুগার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। শাস্ত্র-শাসনের ভয়ে ভগবানের প্রতি জীবের যে-প্রবৃত্তি জন্মায়, তাই বৈধী। মূলত ক্রিয়াযোগপথের পথিক তথা বৈদিক-তান্ত্রিক মার্গের যাত্রীই যে এই বৈধী-ভক্তির সাধক তা একাদশে উদ্ধবের উদ্দেশে ভগবানের উপদেশেই স্পষ্টীভূত। বৈধীর পথেই ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারূপিণী পিশাচীর অন্তর্ধানে জীবের ভক্তিসুখে অধিকার জন্মায়। ভক্তিসুখ বা প্রেম যে সাধকের মনঃপ্রাণ হরণ করে, তারই সমর্থনে রূপ ভাগবতীয় তৃতীয় স্কন্ধের কপিলবাণী উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে এই ভক্তিসুখের অনন্য প্রসাদ ও অদ্বিতীয় মহিমা কীর্তনে তিনি উদ্ধব, ধ্রুব, পৃথু, ভরত, বৃত্র, ইন্দ্র, প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র, বৈকুণ্ঠনাথ, নাগপত্নীবৃন্দ, শ্রুতিগণ,

রুদ্র, কুন্তী প্রমুখের অবিস্মরণীয় ভাগবতীয় উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই বক্তব্যে মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি গরীয়সী বলে স্বীকৃত। রূপও জানান, এ-ভক্তির এমনই মহিমা যে একাদশে স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে স্বধর্ম-ত্যাগ করেও এর সাধনে নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈধীর মতো রাগানুগা-রাগাত্মিকা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও রূপ গোস্বামীর আদর্শ 'শাস্ত্রং ভাগবতং'। 'ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন' অনুচ্ছেদে আমরা তো দেখেছি, রূপের বক্তব্য অনুসারে, অভিলষিত বস্তুতে যে-স্বাভাবিকী আবেশ-পরাকাষ্ঠা তারই নাম 'রাগ', আর সেই রাগময়ী ভক্তিই 'রাগাত্মিকা'। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে রাগাত্মিকাকে তিনি যে দ্বিবিধা বলেছেন তাও প্রসঙ্গত উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে কামরূপা রাগাত্মিকার দৃষ্টান্ত রূপে "গোপ্যঃ কামাৎ"[১] ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে উল্লিখিত ব্রজগোপীদের কামরূপা আবেশ-পরাকাষ্ঠা অনুস্মৃত। আর সম্বন্ধরূপার উদাহরণস্বরূপ নন্দযশোদাবলরামাদির রাগময়ী ভক্তি উপস্থাপিত। ভাগবতীয় কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার আনুগত্যময়ী রাগানুগা ভক্তি-সাধনের স্তরবিভাগ অবশ্য অনেকটাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য-সূচক। ভাগবতেও শ্রুত্যভিমানিনীদের গোপী-আনুগত্যময়ী ভক্তিসাধনার ইংগিত মেলে বলে রূপাদি রসিক-ভাবুকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু আমরা মনে করি, এই রাগানুগাকে প্রেমভক্তির সাক্ষাৎ পুষ্টিকারিণী বলে চিহ্নিত করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বচর্চারই নবদিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে।

শুধু ভক্তির বিচিত্র স্তরবিন্যাসেই নয়, রসীভবনের ক্ষেত্রেও বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী-স্থায়ী এই পঞ্চ-অঙ্গের বিশদীভবনে ভাগবতের ভূমিকা রূপের অলংকারগ্রন্থে লক্ষণীয় হয়ে আছে। যেমন, আলম্বন-বিভাব কৃষ্ণ ভাগবত-সিদ্ধান্তের পথেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নায়ক-শিরোরত্ন-রূপে কথিত[২]। তাঁর বনিতোৎসব-রূপশীলতা, নিত্যনূতনত্ব বা কৈশোরাদি নিত্যবিরাজিত একাধিক উল্লেখযোগ্য মহাগুণের দৃষ্টান্তও রূপ গোস্বামী সংগ্রহ করেছেন ভাগবত থেকেই। একইভাবে উল্লেখ্য হয়ে আছে অপর আলম্বন বিভাব কৃষ্ণভক্তেরও ভাগবত থেকেই বিভিন্ন লক্ষণাদি সংকলন। উক্ত ভক্ত-মণ্ডলী-প্রকটিত

১ ভা° ৭।১।৩০

২ "নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥" ভ° র° সি°, দক্ষিণ বিভাগ ১।১৬

'বিলুঠিত' 'লোকানপেক্ষিত' অনুভাবসমূহেরও দৃষ্টান্তস্থল হয়েছে ভাগবত। সাত্ত্বিকের হর্ষবশত স্তম্ভ, বিস্ময়বশত বা আনন্দবশত রোমাঞ্চ, অথবা বিস্ময়ে স্বরভঙ্গ, বিষাদে অশ্রু ইত্যাদিও ভাগবতীয় উদাহরণযোগেই স্পষ্টীকৃত। ব্যভিচারী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তেত্রিশটি ব্যভিচারীর অনেকগুলিই ভাগবতের দৃষ্টান্তে বিশদীভূত। যেমন, সদ্বিবেকে নির্বেদ, দুঃখে-ত্রাসে-অপরাধে দৈন্য, রতিবশত শ্রম, সর্বোত্তমাশ্রয়ে গর্ব, হর্ষজ আবেগ, বিরহে উন্মাদ, হর্ষে-বিষাদে মোহ প্রভৃতি। ভাগবতান্তর্গত উক্ত উদাহরণসমূহ রূপের ব্যাখ্যানুসারে পাঠ করলে বোঝা যায়, পৃথক্‌ভাবে ভাগবতটীকা রচনার প্রয়োজন হয়নি কেন তাঁর। বস্তুত, তাঁর প্রণীত বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্রই তো ভাগবতের সরস টীকাভাষ্য। ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের রূপ-কৃত অনবদ্য বিশ্লেষণেই বিষয়টি প্রাঞ্জল হবে।

কৃষ্ণরতির পাক থেকে পাকান্তর-প্রাপ্তির মোট আটটি স্তরের ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন রূপ। তিনি ভাব ও মহাভাবকে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করেননি, আর পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করে চৈতন্যচরিতামৃতে এ-স্তর হয়েছে সংখ্যায় ন'টি, যথা, রতি প্রেম স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব। অলংকারকৌস্তুভে স্তর আটটিই, তবে স্তরবিন্যাস কিছু স্বতন্ত্র, যেমন, ভাব পূর্বরাগ রাগ অনুরাগ প্রণয় প্রেম স্নেহ মহারাগ। কিন্তু স্তরবিন্যাসে যতই পার্থক্য যাক, এই পাক ও পাকান্তর-প্রাপ্ত স্তরের অন্তত কয়েকটির পূর্বগামিনী ছায়া ভাগবতেই মিলবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেমন, রূপ-ব্যাখ্যাত 'স্নেহ' স্তরটি উল্লেখযোগ্য। রূপের অভিমত অনুসারে, প্রেমই গাঢ় হয়ে চিত্তকে দ্রবীভূত করলে নাম নেয় 'স্নেহ'। এই স্নেহের ক্ষণবিচ্ছেদেরও সহিষ্ণুতা "ক্ষণিকস্যাপি··· বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা"[১] নেই। ভাগবতে এই 'ক্ষণবিচ্ছেদেও অসহিষ্ণু' স্নেহের এক আশ্চর্য উদাহরণ মেলে গোপীপ্রসঙ্গে। রাসে তিরোহিত কৃষ্ণকে গোপীরা ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ করতে বেরিয়েছিলেন 'ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা' অরণ্যভূমির পথে পথে। তাঁদের সেই "সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবে" স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিশেষ অভিরুচি ছিল। তাই তিনি গোপীবৃন্দের উক্ত দুর্লভ প্রেমানুভূতিকে স্মরণ করে বহু পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে বলেছিলেন, "দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ"[২]—আমারই সৌভাগ্যক্রমে আমার প্রতি তোমাদের এই স্নেহ উপজাত হয়েছে।

১ ভ° র° সিং ৩।২।৬৩ ২ ভা° ১০।৮২।৪৪

উৎকর্ষবশে স্নেহ যখন আবার কৌটিল্য বা অদাক্ষিণ্য ধারণ করে তখনই তা 'মান' হয়ে ওঠে[১]। বস্তুত "স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা" বশত এই অদাক্ষিণ্যেরই প্রতিমাটি রূপ গোস্বামী পেয়েছেন ভাগবতের রাসমঞ্চে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের প্রেক্ষাপটে "একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা" পরমমানবতীরই কটাক্ষ-ক্ষেপের সন্দষ্টদশনের কল্যাণে।

আর সদানুভূত প্রিয়কেও যা প্রতিক্ষণে নব নব বোধ করায় সেই 'অনুরাগে'র কল্পনাও নিতান্ত ভাগবত-বহির্ভূত মনে করবার কারণ নেই। বিশেষত কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর অনুভব যখন 'অনুরাগ' শব্দেই চিহ্নিত হয়েছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা দর্শনেও বিশুদ্ধ মাধুর্যরসে আপ্লুত বিস্মিত ব্রজ-বাসীর নন্দসমীপে সেই বিহ্বল উক্তি মনে পড়ে,নন্দ, তোমার পুত্র কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর দুস্ত্যজ অনুরাগ এবং তোমার পুত্রেরও ব্রজবাসীর প্রতি ঔৎপত্তিক বা স্বাভাবিক প্রীতির কারণ কি ?

কৃষ্ণের এই পরমভক্তবৃন্দের কাছে শুধু কৃষ্ণই কেন, তাঁর নামলীলাদির শ্রবণকীর্তনও প্রতিক্ষণে নব নব বলে অনুভূত হয়। ব্রহ্মমোহনলীলায় ব্রহ্মার উক্তি মনে পড়ে "প্রতিক্ষণং নব্যবনচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা,"[২] অর্থাৎ রমণী-প্রসঙ্গ নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন-অনুচিন্তনেও যেমন বিটবর্গের প্রতিক্ষণে নূতন নূতন বোধ হয়, সাধুদেরও তেমনি কৃষ্ণ-গুণলীলাদি আস্বাদনে।

এই নিত্যনবায়মান অনুরাগই পাক থেকে পাকান্তর প্রাপ্ত হয় ভাবে, আর ভাবই মহাভাবে। মহাভাবই নামান্তরে মহারাগ-রূপে উল্লিখিত। রূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বলনীলমণিতে এই মহাভাবকেই বলেছেন 'বরামৃতস্বরূপশ্রী'। তাঁর মতে, এ-মহাভাব এমনকি মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দ-দুর্লভ, একমাত্র ব্রজদেবী-সংবেদ্য। রূঢ়-অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব আবার দ্বিবিধ। পুনরপি, রূঢ় অপেক্ষাও অধিকতর অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত 'অধিরূঢ়' মোদন ও মাদন এই দুই স্তরে বিলসিত। মোদনই প্রবাসদশায় হয়ে ওঠে 'মোহন'—দিব্যোন্মাদ ইত্যাদি তখন তার বিশিষ্ট অনুভাব। এই দিব্যোন্মাদেরই মূর্তিমতী বিগ্রহ ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার সারিকা।

কিন্তু দিব্যোন্মাদকেও নয়,অধিরূঢ়ের মাদনকেই রূপ গোস্বামী "সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী" বলেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে "পরাৎপর" এই মাদন

---

[১] উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব, প্রকরণ, ৭১

[২] ভা° ১০।১৩।২

"হ্লাদিনী-সার" রূপে একমাত্র রাধাতেই নিত্য বিরাজিত। এরই বিচিত্র অনুভাবের অন্যতম 'সদাভোগেও কৃষ্ণের গন্ধধারী বস্তুর স্তব' ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের জনৈকা গোপীকর্তৃক পুলিন্দরমণীর সৌভাগ্যবর্ণনার সাধুবাদ[১] থেকে গ্রহণ করেছেন রূপ। দয়িতাবক্ষের কুঙ্কুম রহোবিহারকালে কৃষ্ণের পাদপদ্মে সংক্রামিত হয়, তাই আবার বনবিহারে পতিত হয় তৃণদলে। পরে সেই তৃণদল দেখেই অকস্মাৎ কামপীড়ায় আতুর শবররমণীরা গোবিন্দ-পাদস্পৃষ্ট ওই কুঙ্কুমেই বক্ষ-রঞ্জিত করে শান্তি পায়—এই অভিনব সাভিলাষ কল্পনাতেই গোপীর কাছে শবরীরা ধন্যা, অতুল তাদের সৌভাগ্য। বস্তুত, কৃষ্ণাকর্ষণ যাঁর অন্তরে এমন সদানুভূত তীব্র, রূপ যথার্থই বলেছিলেন, বিচিত্র ভাবান্তর-দশা-প্রাপ্ত সে-গোপীর প্রেমই তো একমাত্র সমর্থারতির শেষ সীমা স্পর্শ করতে পারে। উদ্ধবের ভাষায় বলতে গেলে, গোবিন্দে তাঁরই তো সর্বোপরি 'সর্বাত্মভাব' অধিকৃত। আর রূপের ভাষায়, সকল ভাব-বৈচিত্র্যই তাঁতে বিরাজমান। এই 'সর্বাত্মভাব' তথা সকল ভাববৈচিত্রীর লক্ষণ দেখেই ভাগবতের প্রধানা গোপীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব "সর্বথাধিকা" "হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী"[২] রাধারূপে চিহ্নিতা করেছেন। আর তাঁরই মাদনাখ্য মহাভাব-রতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বসিন্ধুর শেষ সুধা—এ-সুধার সন্ধান নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতমুনিও যে রাখতেন না, চৈতন্যচরিতামৃতের বক্তব্যে তাই সুস্পষ্ট :

"আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥...
দোঁহার যে সমরস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥
অন্যোন্যসঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥...
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥"[৩]

প্রধানা গোপীর 'সর্বাত্মভাব' ভাগবতবিশ্রুত হলেও 'বিষয়ে'র 'আশ্রয়' জাতীয় সুখ আস্বাদনের জন্যই 'রসো বৈ সঃ' কৃষ্ণের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হয়ে শচী-

---

১ ভা° ১০।২১।১৭ ২ উজ্জ্বলনীলমণি, রাধাপ্রকরণম্। ৬

৩ চৈ, চ. আদি। ৪, ১২৮, ২১৪-২১৫, ২১৭

গর্ভসিন্ধুতে আবির্ভাব—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত, বলাই বাহুল্য, সকল রসশাস্ত্র-সিদ্ধান্তকেই অতিক্রম করে গেছে ॥

ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণ

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"—ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্য, বুদ্ধিতেও নয়, টীকাতেও নয়। চৈতন্যচরিতামৃতে সনাতনের কাছে ভাগবতীয় "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকব্যাখ্যার ব্যপদেশে শ্রীচৈতন্যদেবকে উপরি-উক্ত প্রাচীন সুভাষিতটি উদ্ধার করতে শুনি। বস্তুত, ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্য, বুদ্ধিতে নয়, এটিই হলো ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণের মূলমন্ত্র। অবশ্য ভাগবতের ভক্তিসম্মত ব্যাখ্যার প্রথম সূচনা বাঙালী টীকাকারগণের কৃতিত্ব নয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হয়েও এক্ষেত্রে শ্রীধরই হলেন পথিকৃৎ। নৃসিংহ ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। চরম অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভাগবতীয় ইষ্টনিষ্ঠ ভক্তিযোগ যুক্ত হয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব ধর্মমত। এরই আলোকে তাঁর ভাবার্থদীপিকাও ভাস্বর। এ-টীকায় কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা ঘোষণাকে সর্বোপরি স্থান দেওয়ায়, এবং মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি, স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া, মথুরা অপেক্ষা বৃন্দাবন-মহিমা কীর্তনের ফলে শ্রীধর চৈতন্যসম্প্রদায়ের আদর্শ-স্থানীয় বলে বন্দিত। চৈতন্যচরিতামৃতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকেও বলতে শুনি:

"শ্রীধর স্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি ॥"[১]

তবে এ থেকে আমরা যেন এই সিদ্ধান্ত না করি যে, ভাগবতব্যাখ্যায় শ্রীধর অদ্বৈতবাদের তথা মায়াবাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন। একমাত্র এই কারণেই শ্রীধরসহ অপরাপর আরও কয়েকজন টীকাকারের ক্বচিৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রীজীব এত সতর্ক। তত্ত্বসন্দর্ভে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটিই মনে পড়তে পারে, শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুগত হয়, একমাত্র তাহলেই যথাবৎ লিখিত হবে[২]।

আসলে ভাগবতের যে-ভক্তিসম্মত ব্যাখ্যার সূত্রপাত শ্রীধরে, বলতে পারা

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ৭. ১১৭

২ "পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে।... মূলগ্রন্থস্বারস্যেন চান্যথা চ। অদ্বৈতব্যাখ্যানন্তু প্রসিদ্ধত্বান্নাতিবিতায়তে" তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৭, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবতসিদ্ধান্ত সম্পাদিত।

যায়, তারই পূর্ণ পরিণতি শ্রীজীবে। অনর্পিতচরিত শ্রীচৈতন্যের স্বারসিকী রাগ এবং তদ্‌ভাবনাচতুর রূপ-সনাতনাদির নিরন্তর ভক্তিরসতত্ত্ব-চর্চা এই অত্যাশ্চর্য ক্রমপরিণতিরই সাক্ষাৎ প্রেরণা। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, ভাগবতের বাঙালী টীকাকার বলতে মূলত আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারদেরই বুঝি। আর তাঁদের রচিত টীকা বলতে কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা-মাত্রও বোঝায় না, ভাগবতের আশ্রয়ে তাঁরা স্বসম্প্রদায়ের মতবাদই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর এমনকি ভক্তিসাধনার সূক্ষ্ম পার্থক্যটিও নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। সেইজন্য তাঁদের ভাগবতব্যাখ্যা যত-না টীকা নামে তারও চেয়ে বেশী সার্থক সম্ভাষিত হবে 'ভাষ্য' নামে। অর্থাৎ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাগবত-টীকা মূলত ভাগবত-ভাষ্য বলেই স্বীকার করতে হয়। ঈশান নাগরের অদ্বৈতমঙ্গলে আছে, শ্রীচৈতন্য নিজে নাকি একখানি ভাগবত-ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানেও 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিদ্যা' বিভাগে প্রাচীন হস্তলিপি প্রসঙ্গে দেনুড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের হস্তাক্ষরে ভাগবত-টিপ্পনীর ঈষৎ সংশয়পূর্ণ উল্লেখ লক্ষ্য করি। তবে শ্রীচৈতন্য-প্রণীত এই শ্রেণীর টীকাগ্রন্থের অনুকূলে আজও কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এ-বিষয়ে আমরা নীরব থাকাই শ্রেয়োজ্ঞান করি। সেক্ষেত্রে এইমাত্র বক্তব্য, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির, বিশেষত চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুসারে চৈতন্যকেই স্ব-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাগবত-ব্যাখ্যার পথপ্রদর্শক রূপে পাই। উদাহরণত চৈতন্যভাগবতে দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হতে পারে। মোক্ষ-অভিলাষী আজন্ম-উদাসীন দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবতব্যাখ্যা ছিল নবদ্বীপ-বিখ্যাত। কিন্তু সে ব্যাখ্যা ভক্তিবর্জিত শুষ্ক জ্ঞানচর্চা মাত্র। তাই দেখি, দেবানন্দের ভাগবত-পাঠ-সভায় চৈতন্যপারিষদ শ্রীবাসের সাত্ত্বিক ভাবোদয় হলে তাঁরই ইংগিতে তাঁরই শিষ্যবর্গের হাতে শ্রীবাস হলেন লাঞ্ছিত, বহিষ্কৃত সে-সংবাদে ক্রুদ্ধ শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন, ভাগবত-শ্রবণে যিনি কৃষ্ণরসে ক্রন্দন করেন, তিনি পাঠে বাধাসৃষ্টির অভিযোগে বহিষ্কৃত হবারই যোগ্য বটেন!

"বুঝিলাঙ্‌ তুমি যে পঢ়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত॥"[১]

---

১ চৈ. ভা. মধ্য। ২১, ৭১

তাঁর মতে ভাগবত-গ্রন্থের সেই 'অভিমত'টি কি? তার আভাস তিনি পূর্বেই দিয়েছিলেন:

"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥"[১]

পরে অবশ্য "চৈতন্য প্রিয়পাত্র" বক্রেশ্বর পণ্ডিতের একান্ত সেবা করায় দেবানন্দও শ্রীচৈতন্যের প্রসাদপ্রাপ্ত হন। নীলাচল থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমবার গৌড় আগমনের কালে একদা দেবানন্দকে তাই শ্রীচৈতন্যের পাদ-মূলে ভাগবতব্যাখ্যার উপদেশ প্রার্থনা পর্যন্ত করতে দেখা যায়। সেই সময় তাঁকে ভাগবতব্যাখ্যার মূলসূত্র সম্বন্ধে অবহিত করে শ্রীচৈতন্য যা বলেছিলেন, ভাগবতের বাঙালী টীকাকার প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য:

"শুন বিপ্র ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥"[২]

তাঁর মতে, যা 'নিত্যসিদ্ধ', 'অক্ষয় অব্যয়' এবং 'মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি' সেই বিষ্ণুভক্তিই ভাগবতের আদ্য-মধ্য-অন্ত্য সর্বত্র বিরাজিত। সুতরাং তাঁরও শেষ উপদেশ:

"আদ্য-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্বমতে॥"[৩]

স্বয়ং ব্যাখ্যাতার ভূমিকা গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যকে আমরা চৈতন্যভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবতীয় 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোক-ব্যাখ্যায় যথাক্রমে যে ত্রয়োদশ ও একষট্টি প্রকার অর্থ উদ্ধার করতে দেখি, তা যদি অংশতও শ্রীচৈতন্য-কৃত বলে ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন, তবে বলতেই হবে, "ভক্তি-যোগ মাত্র বাখানিহ সর্বমতে", ভাষান্তরে, "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা" বা ভক্তিতেই ভাগবত গ্রাহ্য, বুদ্ধিতে নয়, ভাগবতের বাঙালী টীকাকারগণের এই ধ্রুবপদ শ্রীচৈতন্যই স্বহস্তে দিয়েছিলেন তাঁদের তন্ত্রীতে বেঁধে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণের ভাগবতব্যাখ্যার আলোচনাক্রমেই আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত হবে বলে বিশ্বাস।

এখানে বলা প্রয়োজন, ষোড়শ শতকের বৈষ্ণবতোষণী-টীকাকার থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত শত শত বাঙালী বৈষ্ণব টীকাকার ভাগবতের পূর্ণ বা আংশিক টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য, নিবন্ধ বা প্রকরণাদি

১ চৈ. ভা. মধ্য। ২০ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৩, ৪৯৫ ৩ চৈ. ভা. তত্রৈব। ৫১০

রচনা করেছেন। এঁদের একটি বিরাট তালিকা মেলে Theodor Aufrecht প্রণীত Catalogus Catalogorum গ্রন্থে সর্বভারতীয় টীকাকারগণের নামাবলীর মধ্যে। উক্ত টীকাকারগণের ভাগবতটীকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁদের নাম পর্যন্ত স্মরণ করাও এই ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাই চৈতন্যযুগের মাত্র প্রতিনিধি-স্থানীয় দু' চারজনের মধ্যেই আমাদের বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্য হলেন সনাতন গোস্বামী। তাঁর বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের অনুপম ভাষ্য। তাছাড়া তাঁর ভাগবতামৃতের কিছু কিছু সিদ্ধান্তও ভাগবতের গূঢ় অংশের জটিলতামোচনে বিশেষ সহায়ক হয়ে আছে।

জ্যেষ্ঠতাতের "রসবৈদগ্ধি"র যোগ্য উত্তরসাধক শ্রীজীবের নাম তারপরই স্মরণীয়। সনাতনের বৃহৎতোষণীর তিনি শুধু লঘুতোষণী সম্পাদনেই নন, ক্রমসন্দর্ভে স্বাধীনভাবে ভাগবতের স্কন্ধ ধরে টীকারচনাতেও সুখ্যাত। শ্রীজীব বৃহৎক্রমসন্দর্ভের একটি লঘুসংস্করণও করেছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সৌধনির্মাণকারীরূপে তথা ভাগবতের অপূর্ব ভাষ্যকাররূপে তাঁর বিপুল খ্যাতির মূল তাঁর ষট্‌সন্দর্ভ তথা ভাগবতসন্দর্ভ। ক্রমসন্দর্ভ-টীকার মঙ্গলাচরণে তিনি নিজে আবার স্বীকার করে গেছেন. মূলত বৈষ্ণবতোষণী ও ভাগবতসন্দর্ভ দেখেই তিনি যথাবৎ ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন[১]। আর সনাতনের ক্ষেত্রে যেমন ভাগবতামৃত, জীবের ক্ষেত্রে তেমনি গোপাল-চম্পূ কাব্য ভাগবতের উল্লেখযোগ্য রসপ্রকরণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

অপর পক্ষে ভাগবতের স্বতন্ত্র টীকা রচনা না করলেও রূপ গোস্বামীকেও ভাগবতের অন্যতম প্রধান টীকাকারের মর্যাদা না দিয়ে উপায় নেই। তাঁর প্রণীত বৈষ্ণবীয় অলংকার গ্রন্থসমূহে ভাগবতের যে-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাই, তা ভাগবত-টীকা প্রণয়নে গৌড়ীয় রসরসিকতার একটি দুরতিক্রম্য নিদর্শন বলেই পরিগণিত হবে। রসের আলোকে ভাগবত-ব্যাখ্যার অপর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থদর্শিনী।

এ পর্যন্ত বৃন্দাবনের ইষ্টগোষ্ঠীর ভাগবতটীকাই উল্লিখিত হলো। নবদ্বীপ-গোষ্ঠীতেও একইভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন চৈতন্যমতমঞ্জুষা টীকাকার

১ "শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্ শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবতোষণীম্। দৃষ্ট্বা ভাগবত-ব্যাখ্যা লিখ্যতেঽত্র যথামতি," ক্রমসন্দর্ভ, মঙ্গলাচরণ ৩, পুরীদাস-সম্পাদিত।

শ্রীনাথ চক্রবর্তী। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য, সর্বোপরি চৈতন্য-প্রসাদপ্রাপ্ত কবিকর্ণপূর দশমটীকার জন্য খ্যাত।

বৃন্দাবনেরই হোন, অথবা নবদ্বীপেরই হোন, চৈতন্যচরণগামী এই বাঙালী টীকাকারগণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি অতি সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে আমরা উক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত করতে পারি:

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী টীকাকারগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—তত্ত্বসিদ্ধান্তের দিকে; পক্ষান্তরে তৎপরবর্তী মহাজনগণ বিশেষভাবে রসসিদ্ধান্তের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়াছেন।"[১]

এতাবৎকাল অবহেলিত "রসসিদ্ধান্তের দিকেই অধিকতর মনোযোগ" দিলেও চৈতন্যানুগামী মহাজনবর্গ "তত্ত্বসিদ্ধান্ত" যে উপেক্ষা করেছেন, তা যেন আদৌ কেউ মনে না করেন। উদাহরণত শ্রীজীবের ভাগবত-ভাষ্যই তো স্মরণ করা যায়। এ ভাষ্যে তত্ত্বের ওপর শ্রীজীব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেই সঙ্গে আবার ভক্তি-প্রীতি-সন্দর্ভে তাঁর রসসিদ্ধান্তও অপরিসীম গুরুত্বলাভে অনন্য। বস্তুত ভাগবতের গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় টীকা তত্ত্বদর্শন ও রসভাবনার মহাসংগম বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের আলোচনায় আমরা এটিই দেখাবার চেষ্টা করবো, বাঙালী বৈষ্ণব-কৃত টীকায় ভাগবতের তত্ত্বই রসরূপে বিগলিত হয়েছে, আবার রস তত্ত্বরূপে উঠেছে ফ'লে। সেক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে টীকাকারগণের ভাগবতটীকার পরিচয় গ্রহণ না করে সামগ্রিকভাবে এক একটি তত্ত্বের ওপর তাঁদের মিলিত ভাষ্য উপস্থিত করাই বিধেয়। তত্ত্বও আবার সব ক'টির মধ্যে মাত্র দু'তিনটিই গুরুত্ব অনুসারে উদাহৃত হতে পারে। যেমন, কৃষ্ণতত্ত্ব গোপীতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হচ্ছে তিনটি, ভাগবতের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বক্তব্য কি, গোপীতত্ত্ব সম্বন্ধেই-বা তাঁদের অভিমত কি, প্রসঙ্গত ভাগবতে রাধানাম অনুচ্চারিত কিনা, সে বিষয়েও তাঁদের বক্তব্য অনুধাবন করা যাবে। আর পরিশেষে থাকবে ভাগবতীয় প্রেমতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তাঁদের মনীষা ও রসরসিকতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ। স্থানে স্থানে অবশ্য চৈতন্যচরিতামৃতের উক্তিও

১ 'শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার,' শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, ১ম খ', পৃ ৫৫১, ১ম স'

উদ্ধার করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। কেননা, উপরি-উক্ত তত্ত্বাবলীর গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভাষ্য বাঙ্লা সাহিত্যে যদি কোথাও সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে তবে তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেই। আর যেখানে কৃষ্ণদাস নিজেই ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেখানে তো তাঁর অভিমত স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আমরা জানি, ভাগবতের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘোষণা : "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, আর সব অবতার সেই পরমপুরুষেরই অংশকলা মাত্র। এর বিরুদ্ধ ঘোষণা, অর্থাৎ কৃষ্ণ পূর্ণ নন, অংশকলা মাত্র, ভাগবতেই মেলে বটে, কিন্তু কি শ্রীধর, কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ, এটিকেই ধ্রুবপদ করে 'অংশকলা' ঘোষণা-সমন্বিত শ্লোকসমূহ এরই অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীধর তো টীকায় স্পষ্টই বলেছেন, মৎস্যাদি অবতারের দ্বারা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমানের জ্ঞানক্রিয়া শক্তির আবিষ্করণ মাত্র ঘটেছে। নারদাদিতে তেমনি তাঁর অংশকলাবেশ, সনৎকুমারাদিতে জ্ঞানাবেশ, পৃথু-আদিতে শক্ত্যাবেশ। অপর পক্ষে কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, তাঁতেই সর্বশক্তির পূর্ণস্ফূর্তি—উক্ত-অনুক্ত আর সব অবতার তাঁরই "কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়ঃ"[১]। এক্ষেত্রে শ্রীধরের অনুসরণ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা ঘোষণাকেই সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন।

প্রমাণস্বরূপ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উদ্ধার করা যায়। তাঁর মতে, শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অবতারে যথাযোগ্য অংশত্ব ও কলাত্ব বিধান করাই এ-শ্লোকের উদ্দেশ্য। তাই "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" এই নিয়মানুসারে প্রথমে "এতে" অনুবাদ, পরে "পুংস অংশকলাঃ" এই বিধেয় স্থাপিত হয়েছে, তথা, "কৃষ্ণস্তু" অনুবাদ প্রথমে, "ভগবান্ স্বয়ম্" বিধেয় পরে স্থাপিত[২]।

বস্তুত, অবতার-প্রকরণ প্রসঙ্গে বিংশ অবতারের পর একনিঃশ্বাসে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হওয়ায় একোনবিংশ অবতার-রূপে পাছে কৃষ্ণ গণ্য হন, এই আশঙ্কাতেই বোধ করি সর্বসংশয় নিরসন করে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ঘোষণায় কৃষ্ণের অবতারিত্বই স্বীকৃত হয়েছে, অবতারত্ব নয়। আর

১ ভা° ১।৩।২৮ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকা

২ ভা° ১।৩।২৮-ক্রমসন্দর্ভ টীকা দ্রষ্টব্য

ক্রমসন্দর্ভকারের মতে, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", এ-শ্লোকের "কৃষ্ণস্তু" পদে "তু" শব্দ থাকায় "সাবধারণা শ্রুতির্বলবতী" এই ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণই 'স্বয়ং ভগবান্' এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে শ্রীজীব ভাগবতের ১১।১১।২৮ শ্লোকের উদ্ধবোক্তি[১] উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, কৃষ্ণই ব্রহ্ম, পরমব্যোম, প্রকৃতির-অতীত পুরুষ, স্বেচ্ছায় তিনি পৃথক্ বপুগুলি আত্মসাৎ করে অবতীর্ণ[২]। সেই সঙ্গে ভাগবতের ৩।২।১৫ শ্লোকটিও পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে, যার তাৎপর্য, অজ হয়েও পরাবরেশ ভগবান্ অগ্নির মতোই মহদংশযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, "পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ"। শ্লোকোক্ত "মহদংশযুক্তো" পদের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবের বক্তব্য ছিল, "মহৎ" অর্থাৎ নিজের অংশ ভগবৎস্বরূপসমূহ, আর তাঁদেরই সঙ্গে যুক্ত যিনি--মহদংশযুক্তো"। তাছাড়া "মহান্তং বিভুমাত্মানামিত্যাদি" শ্রুতিবাক্যে 'বিভু' তো 'মহান্' শব্দেই বিশেষিত। বেদান্তের প্রসিদ্ধ "মহদ্বচ্চেতি" সূত্রেও পরমাত্মা মহৎ-বাচীই বটেন। আবার "মহান্তো যে পুরুষাদয়োঽংশাঃ তৈর্যুক্ত ইতি বা"—অর্থাৎ, মহৎ যে-পুরুষাদি অংশ, তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, এরূপ তাৎপর্যেও তিনি "মহদংশযুক্তো" হতে পাবেন। বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রের "লোকনাথং মহদ্ভূতম্" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মহৎস্বরূপের যেমন অব্যভিচার প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি "মহদংশযুক্তো" শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিজ অংশসমূহ সম্মিলিত হলেও তাঁর স্বরূপের ব্যতিক্রম ঘটে না, এই দেখানো হলো।

আমরা জানি, কৃষ্ণের মহদংশযুক্ত বা সর্বাকর্ষী স্বরূপ রূপ-সনাতনের দ্বারাও সমর্থিত। "ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ"[৩]—নন্দের নিকট গর্গাচার্যের এ-উক্তির "কৃষ্ণতাং" পদের তাই অনুকূল ব্যাখ্যা পাই বৈষ্ণবতোষণীতে। সনাতনের অভিমত অনুসারে, ইনি সমস্ত অংশকে গ্রহণ করে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন বলে

১ "ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্‌বপুঃ॥" ভা ১১।১১।২৮

২ "ব্রহ্ম ত্বং পরমব্যোমাখ্যো বৈকুণ্ঠস্ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষোঽপি ত্বমিতি। ভগবানপি কথম্ভূতঃ সন্নবতীর্ণঃ স্বেচ্ছয়োপাত্তানি ততস্ততঃ আকৃষ্টানি পৃথগ্‌বপূংষি নিজতত্তদাবিভাবাঃ যেন তথাভূতঃ সন্নিতি"।

৩ ভা° ১০।৮।১৩

"সর্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ", তথা 'স্বয়ং কৃষ্ণ' বলে "অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ" এবং নিজের সমস্ত অংশ কৃষ্ণীকৃত করেছেন বলে "সর্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ", সর্বোপরি সর্বাকর্ষক বলে "সর্বাকর্ষকত্বাচ্চ", এঁর মুখ্য নাম কৃষ্ণ : "মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম"[১]।

লঘুভাগবতামৃতে রূপও বলেন, পরমব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি-অংশাবতার, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিতাদি সকল ভগবৎস্বরূপই অনুক্ষণ কৃষ্ণে যুক্ত থাকেন। আবির্ভাবকালে কৃষ্ণ এঁদের আকর্ষণ করেই অবতীর্ণ হন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও কৃষ্ণের পঞ্চগুণের অন্যতম রূপে 'অবতারাবলী-বীজ' উল্লিখিত। কৃষ্ণকে অবতারসমূহের 'বীজ' বা মূল বলে শ্রীরূপ ভাগবতের 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ঘোষণারই একান্ত অনুবর্তিতা করেছেন। "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" প্রসঙ্গে বিশ্বনাথও বলেন, শুক্ল-রক্ত-পীত উপলক্ষণে মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিও বোঝায়। আর এসবই অংশী কৃষ্ণের অংশ।

অর্থাৎ, এক কথায়, গৌড়ীয় মতে, "একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টি-রূপঃ"[২]—এক সেই কৃষ্ণই নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ। ফলত কৃষ্-ধাতু নিষ্পন্ন 'কৃষ্ণতা'র অর্থও দাঁড়াচ্ছে আকর্ষকতা। সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তাৎপর্যও দাঁড়ায় এই, "বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ"[৩] ভাগবতোক্তিতে নন্দসুতের যে-বহু নাম ও রূপের আভাস আছে, তা সমস্তই আকর্ষণ করে ইনি হয়েছেন 'কৃষ্ণ'। পদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে সনাতন তাই 'কৃষ্ণ' নামকেই বলেন 'মুখ্যতর' নাম, আর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৬৫৭-৫৮ ধৃত বচন উদ্ধার করে রূপ করেন অংশসমূহের তালিকা প্রস্তুত। পরিশেষে গৌড়ীয় মতের ক্ষীরসংগ্রহ করে চৈতন্যচরিতামৃতে গৌড়ীয় ভাষায় তা জনে জনে বিতরণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন :

> "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
> আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
> নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
> যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥

---

১ বৈষ্ণবতোষণী, ১০।৮।১৩-টীকা ২ বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২।৪।১৮৬

৩ ভা° ১০।৮।১৫

সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥"[১]

"কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ"—এই ভাগবত-সিদ্ধান্তের বিরোধী ঘোষণাও তো ভাগবতে আছে। কৃষ্ণের অংশবাচী সেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সমাধান কিভাবে করেছেন টীকাকারগণ, কৌতূহল জাগে। আমরা এ প্রসঙ্গে পূর্বেই বলেছি, শ্রীধরসহ সমুদয় বৈষ্ণব টীকাকারই বিরুদ্ধ বক্তব্যের সমাধান খুঁজেছেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ঘোষণাতেই। একটি উদাহরণযোগেই বিষয়টি এখানে এবার স্পষ্ট করা যাক।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান্ যোগমায়াকে বলেছিলেন, আমি অংশভাগে দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবো: "অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে"[২]। এ-উক্তির "অংশভাগেন" পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীধর যা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবেই উদ্ধারযোগ্য। তিনি প্রথমেই পদটির ছয় প্রকার সম্ভাব্য অর্থ নির্দেশ করেন। যথা,

১. "অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্বান্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তান্ ইত্যংশভাগস্তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ"—যিনি আব্রহ্মস্তম্ব "অংশে" বা স্বশক্তিতে অবস্থান করছেন, তিনিই 'অংশভাগ'। এখানে অংশ—শক্তি। অংশে—শক্তিতে।

২. "যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানৈশ্বর্যবলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ানিতি যদা তেনেতি"—যিনি নিজভক্তবৃন্দকেও স্বশক্তিজ্ঞানৈশ্বর্য বলে সংযুক্ত করেন, তিনিই 'অংশভাগ'। এখানে অংশে—জ্ঞানৈশ্বর্য বলে।

৩. যদ্বা অংশেন পুরুষরূপেণ মায়য়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য তেন"—যিনি তাঁর অংশ পুরুষাবতার রূপে মায়ায় ঈক্ষণ করেন, তিনিই 'অংশভাগ'। এখানে অংশ—পুরুষ।

৪. "যদ্বা অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদি-রূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন"—ত্রিগুণময়ী মায়ার অধীশ্বররূপে যাঁর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রি-গুণাবতার প্রকাশিত, তিনিই 'অংশভাগ'। এখানে অংশ মায়া। ভাগ—ত্রিগুণাবতার।

৫. "যদ্বা অংশা এব মৎস্যকূর্মাদিরূপা ভজনীয়া ন তু সাক্ষাৎস্বরূপং যস্য তেন"—যাঁর সাক্ষাৎ-স্বরূপ দূরে থাকুক, এমনকি মৎস্যকূর্মাদিরূপ অংশও

---

১ চৈ. চ. আদি।৪, ৯-১১ ২ ভা° ১০।২।৯

ভজনীয়, তিনিই 'অংশভাগ'। এখানে অংশ— মৎস্যকূর্মাদি অবতার। ভাগ— ভজনীয়।

৬. "যদ্বা অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনমনুবর্তনং ভক্তেষু যস্য তেন"—যিনি নিজ "অংশৈঃ" বা শক্তিতে জ্ঞান ও বলাদির দ্বারা ভক্তের অনুবর্তন বা মনোরথ পূরণ করেন, তিনিই অংশভাগ। এখানে 'অংশ'—জ্ঞানবলাদি। ভাগ— ভজন।

অর্থাৎ এককথায় বুঝতে হবে, "সর্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্‌"— সর্বথা কৃষ্ণের পরিপূর্ণ রূপই বিবক্ষিত। প্রমাণ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌"।

শ্রীধরের প্রদত্ত ছয় প্রকার অর্থকে অঙ্গীকার করেই সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণবতোষণী-টীকায় 'অংশভাগে'র আরও তিনটি অর্থ যোজনা করেছেন। প্রথমত, "যদ্বা আংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন স্বরূপেণ"—যাঁতে অংশসমূহের ভাগ বা ভজন প্রবেশ করে, অর্থাৎ মিলিত হয়, তিনিই অংশ-ভাগ। দ্বিতীয়ত, "যদ্বা অংশানাং ব্রহ্মাদীনাং ভাগধেয়েন হেতুনা"—যিনি তাঁর অংশসমূহের অর্থাৎ গুণাবতার ব্রহ্মাদির সৌভাগ্যবশতই (আবির্ভূত), তিনিই অংশভাগ। পরিশেষে, "নিগূঢশ্চায়মর্থঃ। অংশভাগেন প্রকাশ-ভেদেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামাত্যেবং প্রকাশান্তরেণ শ্রীযশোদায়া অপি পুত্রতাং প্রাপ্স্যামীতি জ্ঞেয়ম্‌"—'অংশভাগেন' পদের নিগূঢ়ার্থ এই, প্রকাশভেদে কোনো এক রূপে যিনি দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকাশান্তরে যশোদার পুত্ররূপেও বটে, তিনিই অংশভাগ। অর্থাৎ সনাতনের ব্যাখ্যানুসারে, "অংশভাগেন" পদের শেষ অর্থ দাঁড়ায় "প্রকাশভেদেন"। মুহূর্তে মনে পড়ে, লঘুভাগবতামৃতে রূপ 'প্রকাশ' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করে বলেছেন, একই বিগ্রহের একই কালে বহুরূপে যে-আবির্ভাব, তাকে 'প্রকাশ' বলা হয়[১]। সুতরাং এই ব্যাখ্যার আলোকে বৈষ্ণবতোষণীর পূর্বোক্ত আলোচনার গূঢ় মর্ম হবে, ভগবানের একই মূর্তি একই কালে দেবকীগর্ভে ও যশোদাগর্ভে প্রকটিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে তাই দেবকীগর্ভজাত চতুর্ভুজ কৃষ্ণ যশোদাগর্ভজাত দ্বিভুজ মুরলীধরের সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে যান। অর্থাৎ কৃষ্ণ আক্ষরিক অর্থেই যশোদাসুত। ভাগবতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কথিত "নন্দস্তাত্মজ উৎপন্নে" "পশুপাঙ্গজায়" প্রভৃতি

১ "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে॥" ল° ভা°, পূর্ব খ°, ১।২১

উক্তি তাঁদের অভিমতে এইভাবেই নিগূঢ় ইংগিতে কৃষ্ণের যশোদাগর্ভজাততত্ত্বের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে।

যুগপৎ শ্রীধর ও সনাতনের "অংশভাগেন" পদের সমুদয় অর্থ স্বীকার করেই শ্রীজীব কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯২-অনুচ্ছেদে বলেছেন, "অংশভাগেন" পদের দ্বারা, অংশসমূহের প্রবেশ যাতে, সেই পরিপূর্ণস্বরূপেই কৃষ্ণ আবির্ভূত বুঝতে হবে। ভাগবতে ব্রহ্মার উক্তিতে কৃষ্ণের "পুমানংশেন"[১] আবির্ভাব তাই শ্রীধরসহ সনাতনের ব্যাখ্যায় সহার্থে তৃতীয়া অনুসারে দাঁড়িয়েছে, অংশসহ পরমপুরুষের আবির্ভাব, অংশে নয়। এ-সিদ্ধান্তের আলোকে শ্রীজীব ভাগবতের বিরুদ্ধবক্তব্যসমূহের কিভাবে অনুকূল মীমাংসা করেছেন, তা গৌড়ীয় মনীষারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত হতে পারে।

ভাগবতীয় কৃষ্ণকে যাঁরা 'ভগবান্ স্বয়ম্' না বলে, বলেন 'অংশাবতার,' তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে মনে করেন 'বিকুণ্ঠাসুতের অবতার,' কেউ কেউ 'নরনারায়ণের অবতার', কেউ কেউ 'উপেন্দ্রের অবতার,' কেউ 'ক্ষীরোদশায়ীর অবতার', কেউ 'বিষ্ণুর কেশাবতার', কেউ-বা 'যুগাবতার', কেউ আবার 'নারায়ণের অবতার'। কৃষ্ণের অংশ-বাচক প্রায় প্রত্যেকটি বিরুদ্ধ বক্তব্যই শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভে তথা কৃষ্ণসন্দর্ভে পরীক্ষিত হয়েছে। আধুনিক-কালে ড° রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিরুদ্ধবাদীর সবকটি বক্তব্যই বিচার করেছেন। আমাদের পরিসর নিতান্তই স্বল্প। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ক্তিতর্কাদির মাত্র দু' চারটি ক্ষেত্রই আলোচিত হবে। তার মধ্যে ভাগবতের ১১।৬।৩১ ও ১১।৬।২৭ শ্লোকদ্বয়ের শ্রীধর টীকানুসারে[২] যাঁরা কৃষ্ণকে বিকুণ্ঠাসুতের অবতার বলেন, তাঁদের সিদ্ধান্তই বিবেচিত হতে পারে সর্বাগ্রে।

টীকানুসারে শ্লোকোক্ত তাৎপর্য দাঁড়িয়েছে, যদুকুল ধ্বংস হলে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে যাবেন। অর্থাৎ, তিনি বৈকুণ্ঠের অধিপতি মাত্র, তাই অপ্রকটে বৈকুণ্ঠ গমনের প্রসঙ্গ এসেছে। কাজেই তাঁকে 'বিকুণ্ঠাসুতের অবতার' বলা অসংগত নয়। কিন্তু তাহলে কৃষ্ণকে পূর্ণ ভগবান্ বলার সার্থকতা থাকে কি? সমাধানে শ্রীজীব তাঁর কৃষ্ণসন্দর্ভের ৯০-অনুচ্ছেদে জানান, শ্রীকৃষ্ণ 'স্বয়ং ভগবান্' বলে তাঁর মধ্যে বিকুণ্ঠাসুতেরও অবস্থান। শিশুপাল ও দন্তবক্র

---

১ "দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ" ভা° ১০।২।৪১

২ দ্র° ভাবার্থদীপিকা ১১।৬।৩১, ১১।৬।২৭-টীকা

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নিহত হয়ে তাদের পূর্বরূপ জয়-বিজয় দেহ লাভ করেই বিকুণ্ঠা-সুতের পার্ষদত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেই প্রবেশ করে। যদুকুল ধ্বংসের পর কৃষ্ণ যখন অপ্রকটধামে যাত্রা করেন, তখন সেই সর্বাকর্ষী দেবদেব থেকে বহির্গত হয়ে বিকুণ্ঠাসুতও জয়-বিজয় সহ সত্যলোকের উপরিস্থ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। ক্রমসন্দর্ভেও শ্রীজীবের একই অভিমত ব্যক্ত: "স্বধাম প্রাপঞ্চিকা-প্রকটীভূতং দ্বারকায়া এব প্রকাশবিশেষং শ্রীকৃষ্ণরূপেণ প্রবিশ; শ্রীবিষ্ণুরূপেণ তু সলোকাঁল্লোকপালান্নঃ পাহি,—নানা বৈকুণ্ঠনাথরূপৈশ্চ বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ পাহীতি সর্বাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাৎ॥"[১] টীকায় "সর্বাংশমাদায়াবতীর্ণত্বাৎ" বা কৃষ্ণের সর্বাংশ পরিগ্রহণে আবির্ভাব হেতু, কথাটি বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। বস্তুত "কৃষ্ণতাং গতঃ"—ভাগবতীয় এ-উক্তির সনাতন-কৃত ব্যাখ্যায় কৃষ্ণের আকর্ষণবার্তা স্বরূপ জীবের টীকাভাষ্যে যে কীভাবে মূল প্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে, বলা বাহুল্য, এটি তারই এক নিঃসংশয় প্রমাণ।

একইভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণার্জুনের নরনারায়ণাবতার রূপে আবির্ভাবের প্রসঙ্গ। ভাগবতে আছে, ভগবান্ হরির অংশভূত নর-নারায়ণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে ভূভারহরণের জন্য কৃষ্ণার্জুন হয়েছেন:

"তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ।
ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥"[২]

এ-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব তাঁর ক্রমসন্দর্ভে সম্প্রদায়-অভিমত পরিস্ফুট করে বলেছিলেন, কৃষ্ণের অংশভূত নর ও নারায়ণ, ভূভারহরণের জন্য আবির্ভূত কৃষ্ণার্জুনকে প্রাপ্ত হলেন, এই অর্থ বুঝতে হবে. "কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জুনৌ প্রতি তাবিমৌ প্রবিষ্টবন্তাবিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ, অংশই অংশীতে প্রবিষ্ট হলো। এককথায় নরনারায়ণ কৃষ্ণের স্বাংশ মাত্র।

যাঁরা হরিবংশের উক্তি উদ্ধার করে কৃষ্ণকে 'উপেন্দ্রের অবতার' বলে থাকেন, তাঁদের বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেননি শ্রীজীব। এক্ষেত্রে তিনি লঘুভাগবতামৃতে ধৃত হরিবংশেরই ১২৮।২১-২৩ বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, একই গ্রন্থে 'উপেন্দ্র' বা বামনাবতার আবার কৃষ্ণের অংশরূপে উল্লিখিত: "অংশেন তু ভবিষ্যামি পুত্রঃ খল্বহমেব তে"। বিষ্ণু বলছেন অদিতিকে, আমিই অংশে জন্মগ্রহণ করবো তোমার পুত্ররূপে।

১ ক্রমসন্দর্ভ ১১।৬।২৭-টীকা ২ ভা° ৪।১।৫৮

বিষ্ণু প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে 'বিষ্ণুর কেশাবতার'রূপে কৃষ্ণের বিলক্ষণ খ্যাতির কথা। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করে এঁরা কেউ কেউ বিষ্ণুর কৃষ্ণকেশে কৃষ্ণের এবং তাঁরই শুক্লকেশে বলরামের অবতারত্ব ঘোষণা করেছেন। এবিষয়ে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য খণ্ডন করতে দেখি। সম্প্রদায়-গুরুর পদাঙ্ক-অনুসরণে ক্রমসন্দর্ভকারও বলেন, এক্ষেত্রে শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ আদৌ বিচারসহ নয়। কেননা তাহলে ক্ষীরোদশায়ীর পক্ককেশের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু, "সুরমাত্রস্যৈব নির্জরত্বং প্রসিদ্ধম্"—সুরমাত্রেরই জরা-রাহিত্য প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, যিনি স্বয়ং ভগবান্-রূপে বন্দিত, তিনি কি কারো কেশের অবতার হতে পারেন? বিশেষত যে-বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর কেশাবতার বলা হয়েছে, সেই-বিষ্ণুপুরাণেই আবার কৃষ্ণ 'পরব্রহ্ম নরাকৃতিম'[১] রূপে স্বীকৃত। আসলে 'কেশ'কে এখানে ভগবানের 'অংশুক' বা 'তেজঃ', ভাষান্তরে কিরণাদি অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। মহাভারতে সহস্রনামভাষ্যে দেখি, কেশ বা অংশুসমূহের অবস্থান যাঁতে, তিনিই 'কেশব'। মোক্ষধর্মে নারদের বিশিষ্ট দর্শনে তথা নৃসিংহাদি পুরাণের প্রমাণযোগেই কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব তাই বলেন, "কেশেতর শব্দপ্রয়োগাৎ," কেশেতর শব্দ-প্রয়োগে "নানাবর্ণাংশু" বা নানাবর্ণের জ্যোতিই বোঝাচ্ছে। তাৎপর্য, ক্ষীরোদশায়ী "আত্মনঃ" বা নিজের কাছ থেকে যে-দুই শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতি প্রদর্শন করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ-স্বরূপ রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইংগিত মাত্র করছে। সুতরাং ভাগবতের "কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ"[২] অংশের ব্যাখ্যায় ক্রমসন্দর্ভকার এবার বলতে পারেন, যিনি সিতকৃষ্ণ 'কেশ' দেখিয়েছিলেন, সেই ক্ষীরোদশায়ী যাঁর অংশ,[৩] সেই স্বয়ংভগবান্ই আবির্ভূত হলেন। 'এই সুমেরু' বলে সুমেরুর একদেশ দেখিয়ে যেমন অখণ্ড সুমেরুকেই নির্দেশ করা হয়, শ্বেত-কৃষ্ণ জ্যোতি প্রদর্শন করে তেমনই পূর্ণস্বরূপে আবির্ভাব নির্দেশিত

---

১ বিষ্ণু° ৪। ১১। ১২

২ "ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিত-কৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি॥" ভা° ২।৭।২৬

তাৎপর্য, অসুরসৈন্যে বিমর্দিত ধরার ভার অপনোদনে, সেই দুর্জ্ঞেয়লীল সিত-কৃষ্ণ-কেশ ভগবান্ তাঁর স্বীয় অংশ বলদেবের সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে নিজ মহিমা-দ্যোতক ক্রীড়া করবেন।

৩ ক্ষীরোদশায়ী জগতের পালনকর্তারূপে বিষ্ণু বা নারায়ণেরই নামান্তর মাত্র। ভাগবতে নারায়ণ কৃষ্ণের 'অঙ্গ'রূপে চিহ্নিত [দ্র ব্রহ্মা-স্তুতি, ভা° ১০। ১৪।১৪]

হলো বুঝতে হবে, "অত্র 'অয়ং সুমেরুঃ' ইত্যেকদেশদর্শনেনৈবাখণ্ডসুমেরু-নির্দেশবত্তদ্দর্শনেনাঽপি পূর্ণস্যৈবাবির্ভাব-নির্দেশো জ্ঞেয়ঃ"।

ক্ষীরোদশায়ীর অংশাবতাররূপে অবশ্য কৃষ্ণের পরিচয় দান করেছেন কোনো কোনো বিরুদ্ধবাদী। প্রমাণস্বরূপ এঁরা ভাগবত-কথিত ব্রহ্মা-স্তবে পরিতুষ্ট ক্ষীরোদশায়ীর উক্তির উল্লেখ করেন :

"পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি ॥"[১]

ব্রহ্মা-শ্রুত এই আকাশবাণীর তাৎপর্য : ভগবান্ পূর্বেই পৃথিবীর দুঃখবার্তা অবগত হয়েছেন। তিনি যতদিন নিজকালশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর ভারহরণের জন্য প্রকটিত থাকবেন, ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যদুবংশে তথা তাঁদের আত্মীয়বংশে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে অবস্থান কর।

বিরুদ্ধবাদীর বক্তব্য হলো, ক্ষীরোদশায়ীই হলেন 'ঈশ্বরেশ্বর', তাঁরই অংশে যদুবংশে কৃষ্ণের আবির্ভাব। ক্ষীরাব্ধিতীরে ব্রহ্মা-শ্রুত আকাশবাণীতেই তার সমর্থন।

পক্ষান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, ক্ষীরোদশায়ীকে ভাগবতে শুধু 'জগন্নাথ' বা জগতের পালনকর্তা, 'বৃষাকপি' বা অভীষ্টবর্ষণকারী পুরুষ বলেই জানা যায়।[২] আর যিনি আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বয়ং "ঈশ্বরেশ্বরঃ", "সাক্ষাদ্ ভগবান্" এবং "পুরুষঃ পরঃ", বসুদেব গৃহে তাঁর আবির্ভাব ; "বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ"।[৩] সুতরাং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ এবং পুরুষপর ভগবান এক হন কিভাবে? ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে ক্ষীরোদশায়ী হলেন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের অংশাংশ, সেই প্রথম পুরুষ আবার দেবকীসুতের অংশ হওয়ায় ক্ষীরোদশায়ী হয়ে দাঁড়ান দেবকীসুতের অংশাংশের অংশ। সনাতন তাঁর বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর সেই পরিচয়ই মুখে তাঁর অভিব্যক্ত করাচ্ছেন এইভাবে : "পুংসা যস্যাহমংশাংশস্তেনাদিপুরুষেণ স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন"[৪]। আমি যাঁর অংশেরও অংশ সেই অনাদিপুরুষ স্বয়ং

---

১ ভা° ১০।১।২২
২ ভা° ১০।১।২০
৩ ভা° ১০।১।২৩
৪ বৈষ্ণবতোষণী ১০।১।২২-টীকা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনিই বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হবেন, ক্ষীরোদশায়ীর বক্তব্যের এই নিগলিতার্থ। ব্রহ্মসংহিতা উদ্ধার করে সনাতন দেখিয়েছেন, "বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো"[১]—মহান্ বিষ্ণুও যাঁর কলাবিশেষ মাত্র, তিনিই আদিপুরুষ গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণ। ভাগবতেও দেবকী কৃষ্ণবন্দনায় স্পষ্টতই বলেছিলেন: "যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তি-লয়োদয়াঃ"[২] যাঁর অংশেরও অংশে আবার তারও অংশে এ-বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি লয় হচ্ছে, সেই পরমপুরুষের শরণ গ্রহণ করি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় অভিমতে কৃষ্ণই হন অংশী, ক্ষীরোদশায়ী তাঁর অংশাংশাংশ। ভাগবতে ভগবৎ-উক্তি "অথাহমিতি" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্রমসন্দর্ভকারও বলেন, বসুদেবগৃহে কৃষ্ণাবির্ভাব, "অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র, তেন পূর্ণস্বরূপেনৈব"[৩]।

কৃষ্ণকে যাঁরা 'পরমব্যোমাধিপতি' নারায়ণের অবতার বলেন, তাঁদের যুক্তিও একইভাবে খণ্ডন করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। ভাগবতে কৃষ্ণার্জুনের মৃত ব্রাহ্মণপুত্র আনয়নের প্রসঙ্গে মহাকালরূপী পরমব্যোমাধিপতি ভূমাপুরুষকে বলতে শুনি:

> "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
> ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে।
> কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
> হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥"[৪]

যথাশ্রুত অর্থ, আপনারা উভয়ে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমারই কলায় বা অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু আপনাদের দেখবার জন্যই ব্রাহ্মণ সন্তানদের এখানে এনেছি। ভূভারকারী অসুরদের বধ করে আবার অবিলম্বে আমার কাছে আসবেন।

শ্লোকে ভূমাপুরুষের উক্তি "মে……কলাবতীর্ণৌ" অনুসরণে বিরুদ্ধবাদীরা কৃষ্ণার্জুনকে পরমব্যোমাধিপতির অংশাবতার বলে প্রচার করেন। পক্ষান্তরে

১ "যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৪৮

২ ভা° ১০।৮৫।৩১ ৩ ক্রমসন্দর্ভ, ১০।২।৯-টীকা ৪ ভা° ১০।৮৯।৫৯

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্লোকটির ভিন্নপ্রকার অন্বয়ার্থ প্রকাশ করে বলেন, ভূমাপুরুষের বক্তব্য ছিল, ধর্মরক্ষা হেতু "কলাবতীর্ণৌ" বা সর্বকলা-সর্বঅংশসহ অবতীর্ণ হে কৃষ্ণার্জুন, আপনাদের দর্শনলাভের আশায় "মে ভুবি" আমার ধামে আমি দ্বিজপুত্রদের আনয়ন করেছি। পুনরপি আপনারা পৃথিবীর ভারকারী অসুরদের হনন করে "মে অন্তি" আমার সমীপে প্রেরণ করুন।

লক্ষণীয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব "মে" পদের সঙ্গে "কলাবতীর্ণৌ" পদকে অন্বিত বলে মনে করেননি। তাঁদের মতে, এইভাবে অন্বয় সাধন করলে মূল শ্লোকার্থ দাঁড়াবে, "শ্রীকৃষ্ণ ভূমাপুরুষের অংশ" - যা স্বীকার করলে নানা বিরোধের উৎপত্তি ঘটে বলে তাঁরা মনে করেন।

প্রথমত, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের যে ছ'টি উপায় আছে, সেই শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান ও সমাখ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালা উপায় শ্রুতিরই সঙ্গে ঘটে চরম বিরোধ। গোপালতাপনী-আদি শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণেরই পরব্রহ্মত্ব খ্যাপন করেছে, ভূমাপুরুষের নয়। আর যদি দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ করা যায়, অপ্রকটে কৃষ্ণার্জুন ভূমাপুরুষেই আবার লীন হবেন, এ-কথা বলে ভূমাপুরুষ কৃষ্ণের অংশত্বেরই আভাস দিলেন, তাহলেও বিরোধ উপস্থিত হয় বলে জানান গৌড়ীয় বৈষ্ণব। কেননা দ্বারকাই বাসুদেব কৃষ্ণের নিত্যধাম, অপ্রকটে তিনি মহাকালপুরে প্রবেশ করলে দ্বারকাধামের নিত্যত্ব থাকে কি? ভূমাপুরুষ কৃষ্ণার্জুনকে আবার এও বলেছেন "যুবাং নরনারায়ণাবৃষী"[১]। তাহলে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ই বা কেন তাঁদের নিত্য-অবস্থানভূমি বদরিকাশ্রম পরিত্যাগ করে মহাকালপুরে চলে আসবেন? অর্থাৎ, দ্বিতীয় বাক্যের অন্বয়ও হবে ভিন্নপ্রকার আর সেই অন্বয়-বলেই তাৎপর্য দাঁড়াবে, পৃথিবীর ভারকারী অসুরাদি বধ করে শীঘ্র আমার কাছে প্রেরণ করুন। ণিজন্ত "ত্বর"ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ "যাতম্" প্রত্যয় নিষ্পন্ন "ত্বরয়েতম্" পদের এ ছাড়া সংগত অর্থ আর কিছু হয় না বলেও জানিয়েছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রশ্ন, কৃষ্ণ যদি ভূমাপুরুষের অংশই হন, তাহলে তাঁকে দেখবার জন্য ভূমাপুরুষকে দ্বিজপুত্র হরণই বা করতে হবে কেন? আর মহাকালপুরে ভূমাপুরুষের জ্যোতিতে অর্জুনের নেত্রপীড়া উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ-জ্যোতিতে অর্জুনের তা হয় নি, এর দ্বারাও কৃষ্ণের

১ ভা° ১০।৮৯।৫৯

নরলীলার বিশিষ্ট ভঙ্গিমাত্রই ব্যঞ্জিত বলে মন্তব্য করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বিশেষত হরিবংশে এ-জ্যোতিকে কৃষ্ণেরই 'সনাতন তেজঃ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে শ্রীধর স্বামীর বক্তব্যও কৃষ্ণের অবতারী-স্বরূপের অনুকূলতা করছে। তাঁর মতে, কৃষ্ণার্জুনের মহাকালপুরে গমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই ঘটেছিল, আর তার উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনের মোহভঙ্গ তথা কৃষ্ণের অনন্য মহিমার সঙ্গে পরিচয় সাধন। অতএব শেষ পর্যন্ত বিশিষ্ট সম্প্রদায় মতে, যিনি সর্বঅংশসহ অবতীর্ণ, যাঁর বিভূতিমাত্র নরনারায়ণ ঋষি, সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভে উৎকণ্ঠ ভূমাপুরুষ অংশী কৃষ্ণের অংশ। অংশ ভূমাপুরুষ অংশী কৃষ্ণার্জুনকে যে 'নরনারায়ণাবৃষী' বলেছিলেন, তাতেই যেন কেউ না সিদ্ধান্ত করে বসেন, কৃষ্ণার্জুন নরনারায়ণ ঋষি। নরনারায়ণ ঋষি যে কৃষ্ণার্জুনের অংশ তা তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় যুক্তিতর্কে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এও আলোচিত হয়েছে যে পূর্ণ ভগবানের আবির্ভাব কালে অংশসমূহও আকর্ষিত হয়। এই হিসাবে ভাগবতে 'বিভূতি' রূপে বর্ণিত নর-নারায়ণ ঋষি-দ্বয়ও কৃষ্ণার্জুনে আকর্ষিত হবেন, এ আর আশ্চর্য কথা কী। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় :

> "সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী॥
> অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
> কেহো কোন মতে কহে, যেমন যার মতি॥"[১]

সুতরাং

> "অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার॥"[২]

উদাহরণস্বরূপ যুগাবতার প্রসঙ্গই তো উত্থাপিত হতে পারে। শ্রীজীব ভাগবত উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, দ্বাপরের যুগাবতার কৃষ্ণ নন, 'শ্যাম'[৩]। বিষ্ণু-ধর্মোত্তর প্রমাণবলে তিনি আরো দেখিয়েছেন, এ শ্যাম আবার 'শুক-পত্রাভ'[৪]। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সঙ্গে এঁকে এক করে ফেলা ঠিক নয়। তবে যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত, সে-দ্বাপরে 'শ্যাম' যুগাবতারও তাঁতে মিলেছেন। তিনি এই ভাবে নানাবতারময় এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের

---

১ চৈ. চ. আদি। ২, ৯৩-৯৪ ২ তত্রৈব, ৯৬

৩ "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥" ভা° ১১।৫।২৭
"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্তিতঃ", ক্রমসন্দর্ভ ১১ ৫।২৭ টীকা

আশ্রয় বলে নারায়ণও বটেন। কাজেই গোবর্ধন ধারণের পর নন্দ যে তাঁকে নারায়ণের অংশ বলেছিলেন[১], তা বিশুদ্ধ বাৎসল্যবশতই বলতে হয়। কেননা ভাগবতেই ব্রহ্মমোহনলীলায় চতুর্ভুজ নারায়ণ আবার কৃষ্ণের বা সর্বাশ্রয় নারায়ণের অঙ্গরূপেই চিহ্নিত হয়েছে। ভাগবতে যে যুগপৎ কৃষ্ণ ও রাম সম্বন্ধে 'অসাম্যাতিশয়' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, শ্রীরামকে 'অসাম্যাতিশয়' বা যাঁর সমান কেউ নেই বলা হয়েছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'স্বয়ং ভাগবান্' অভিধাটি কুত্রাপি অর্পিত হয়নি। বিরুদ্ধবাদী অবশ্য বলতে পারেন, স্বয়ংভগবানই জ্ঞাত বস্তু, বা অনুবাদ, আর কৃষ্ণ অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়। অর্থাৎ, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যের প্রকৃত গঠন হবে, "স্বয়ং-ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ"। উত্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলেন, "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণ-ত্বমিত্যায়াতম্"[২]। অর্থাৎ, একাদশীতত্ত্বে ধৃত ন্যায় অনুসারে অনুবাদই প্রথমে বসে, পরে বসে বিধেয়। আর যেহেতু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বাক্যে কৃষ্ণই অনুবাদ, ভগবান্ বিধেয়, সেহেতু কৃষ্ণেরই ভগবত্ত্ব-লক্ষণধর্ম সিদ্ধ হচ্ছে, ভগবানের কৃষ্ণত্ব নয়। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও বলেন, 'অনুবাদ' হলো জ্ঞাত বস্তু, 'বিধেয়' অজ্ঞাতবস্তু। জ্ঞাতবস্তু-অনুবাদের পূর্বে অজ্ঞাতবস্তু-বিধেয় বসালে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ ঘটে। ভাগবতীয় শ্লোকে কৃষ্ণই জ্ঞাতবস্তু, আর তাঁর 'বিশেষ জ্ঞান' অবিজ্ঞাত। ফলে বিরুদ্ধবাদীর 'স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ' এইরূপ অন্বয়ে পূর্বোক্ত অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বা বিধেয়াংশকে প্রধানরূপে নির্দিষ্ট না করার দোষ ঘটে[৩]। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদী যদি বলেন, কৃষ্ণই অজ্ঞাতবস্তু বা বিধেয়, আর ভগবান্ই জ্ঞাতবস্তু বা অনুবাদ, তাহলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই ভাগবত-বাক্যই উক্ত দোষ-দুষ্ট বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু শাস্ত্র মতে,

> "ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
> আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"[৪]

১ "মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্", ভা° ১০।২৬।২৩

২ ক্রমসন্দর্ভ ১।৩।২৮-টীকা

৩ "বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ॥" চৈ. চ. আদি।২, ৭৩

৪ তত্রৈব, ৭২

সুতরাং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বচন নির্দোষ, আর কৃষ্ণই অনুবাদ, স্বয়ং ভগবত্ত্ব বিধেয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়:

"'কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য।
'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য॥"[১]

'বাধ্য' অর্থাৎ "বাধা-প্রাপ্ত; অসিদ্ধ; শাস্ত্র-বিরুদ্ধ"[২]। শ্রীজীবের ভাষায়, "কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্"। এককথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, সর্বদোষমুক্ত ভাগবতীয় ঘোষণাবাক্য: আর সবই অংশকলা যাঁর সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

বলা বাহুল্য ভাগবতীয় কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণের মুখ্যত মনীষারই প্রাধান্য ঘটেছে। আর যেখানেই গোপী-প্রসঙ্গের সূচনা, সেখানেই তাঁদের "বিস্ময় প্রেম কল্পনা"র উদ্বোধন, রসিক-চিত্তের পূর্ণস্ফূর্তি। এ বিষয়ে সনাতন গোস্বামীই বৈষ্ণব টীকাকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি যেভাবে নানা শাস্ত্রপুরাণের সহায়তায় ভাগবতের প্রধানা গোপী ও অন্যান্যা গোপীর অনুচ্চারিত নাম উদ্ধার করেছেন এবং তাঁদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ভেদে চিহ্নিত করেছেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি চমকপ্রদ। উদাহরণত ভাগবতের "অনয়ারাধিতো"[৩] শ্লোকটিই স্মরণ করা যায়। এ-শ্লোকে কৃষ্ণ-আরাধিকা যে দুর্লভ-সৌভাগ্যবতীর উল্লেখ আছে, তাঁর সম্বন্ধে শ্রীধরটীকায় কোনো বিশেষ-উল্লেখই পাইনা। পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামী স্পষ্টই বলেন, "অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতং নত্বস্মাভিঃ রাধয়তি আরাধয়তীতি. রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং"। এককথায়, "আরাধয়তীতি রাধেতি', এইভাবেই এ শ্লোকে রাধানাম নির্দেশিত বলে সনাতনের অভিমত। সংক্ষেপে রাসের পরিচয় দিতে গিয়েও তিনি "বংশী-সংজল্পিতমনুরতং" বলেই "রাধয়ান্তর্ধিকেলিঃ"[৪] বা রাধার সঙ্গে অন্তর্ধান-কেলির উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, ভাগবতের প্রধানা গোপী যে রাধা, সে

১ তত্রৈব, ৬৯

২ দ্র° ড° রাধাগোবিন্দ নাথ-কৃত গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী শ্রী. চৈ. চ. আদি।২. ৬৯

৩ ভা° ১০।৩০।২৮

৪ "বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্ধিকেলিঃ প্রাদুর্ভূয়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ। নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা," বৈষ্ণবতোষণী; ১০।৩৩।২৭-টীকা।

বিষয়ে কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারেরই কোনোপ্রকার সংশয় মাত্র নেই। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রধানা গোপী যদি রাধাই হবেন, তবে তাঁর নাম প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হলো না কেন? উত্তরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, রাধার স্বপক্ষ ও সুহৃদপক্ষ গোপীগণ পদচিহ্ন দেখেই কৃষ্ণপ্রিয়া সেই প্রধানা গোপাকে বৃষভানুনন্দিনী বলে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তটস্থপক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ গোপীজনসংঘট্টে সখানামটি প্রকাশ না করে অভিনয়-ছলেই "নিরুক্তিদ্বারা" বা নিরুক্তিতে রাধার সৌভাগ্যই সংহর্ষে ঘোষণা করেছিলেন। সারার্থদর্শিনীতে তিনি আরও বলেন, পরীক্ষিতের প্রায়োপ-বেশন-সভাস্থলে বিপুল জনমণ্ডলী মধ্যে নামপ্রকাশ না করার জন্য গোপী কর্তৃক অন্তরে আদিষ্ট হয়েই শুকদেব তাঁদের নাম প্রকাশ করেননি, যদিও পরমানন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের রাসাদি ক্রীড়ার কথা পরিবেষণ না করেও পারেননি।

শুকদেব যা প্রকাশ করেননি সনাতন তা কিভাবে উদ্ধার করেছেন তা পরিস্ফুট করার জন্য আমরা রাসপঞ্চাধ্যায়ের দু' একটি বিশেষ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। প্রণয়কোপের অবসানে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীর বাঞ্ছিতমিলনের দৃশ্যবর্ণনায় শুকদেব বলেছিলেন, প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লবদনা গোপীদের সঙ্গে মিলিত সেই উদারচেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ উদারহাস্যপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে তারকাবলী-পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের মতোই শোভমান হলেন[১]। শ্লোকটির "সমেতাভিঃ" পদের ব্যাখ্যায় সনাতন বলেন, 'মা' শব্দের অর্থ শোভা বা পরমসৌন্দর্য। সেই শোভা বা পরমসৌন্দর্যের সঙ্গে বর্তমানা, এতদর্থে রাধাই 'সমা'। তাঁরই সঙ্গে সম্মিলিত গোপীগণের সঙ্গে আবার মিলিত হয়েছিলেন কৃষ্ণ। এইভাবেই "সমেতাভিঃ" পদটিতে 'সমা' বা রাধার উপস্থিতির ইংগিত আছে বলে সনাতনের অভিমত।

বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা কারো কারো কাছে কষ্টকল্পনাশ্রিত বলে মনে হতে পারে, যদিও বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে এ হলো 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। সনাতনের এই বিশিষ্ট ব্যাখ্যারীতি পরবর্তী কোনো কোনো বৈষ্ণব টীকাকারও অনুসরণ করেছেন। যেমন ভাগবতের "তাসাং তৎ সৌভগমদং"[২]

---

১ "তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুত।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ"॥ ভা° ১০।২৯।৪৩

২ ভা° ১০।২৯।৪৮

শ্লোকের টীকায় 'কেশব' শব্দের ব্যাখ্যা করে বিশ্বনাথ তাঁর সারার্থদর্শিনীতে বলেন, কৃষ্ণ হলেন 'কেশব'—অর্থাৎ 'ক' বা ব্রহ্মা এবং 'ঈশ' বা শিবেরও নিয়ন্তা তিনি। অপরার্থে 'কেশান্ বয়তে সংস্করোতি', অর্থাৎ মানিনীদের কেশ-প্রসাদন ইত্যাদি প্রেমব্যবহারে চতুর বলেও 'কেশব' সার্থকনামা তিনি। আমরা জানি, ভাগবতীয় গোপীগীতে প্রধানা গোপীর কেশে কৃষ্ণকর্তৃক পুষ্পসজ্জার প্রসঙ্গ আছে[১]। আবার এই প্রধানা গোপা যে রাধাই, সে-বিষয়েও পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ সনাতনের সঙ্গে একমত। কৃষ্ণসঙ্গ লাভে গোপীরা গর্বিতা হলে, কার সঙ্গে গোপাবল্লভ কৃষ্ণ অন্তর্ধান করেন, বলতে গিয়ে বিশ্বনাথও তাই বলেন, "শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ম্"। কেন এই অন্তর্ধান, এ-প্রসঙ্গে বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাটি বড়ো সুন্দর। তাঁর মতে, সর্বগোপী-সঙ্গে কৃষ্ণের সমভাববশত তথা "সাধারণেনৈব রমণাৎ", যিনি মুখ্যতমা সেই রাধা হলেন মানিনী।

শুধু প্রধানা গোপীরই নয়, অন্যান্য গোপীর বৈশিষ্ট্যানুসারে নাম-উদ্ধারের ক্ষেত্রেও সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পথিকৃৎ টীকাকারের মর্যাদাভাগী। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমরা কৃষ্ণবিরহবিহ্বল গোপীমধ্যে পীতাম্বরধর স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথের আবির্ভাব দৃশ্যটি সনাতনের ব্যাখ্যার আলোকে স্মরণ করতে পারি। এ-দৃশ্যের পূর্বেই এক শ্লোকব্যাখ্যার অবকাশে সনাতন, (ক) "তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর", (খ) "সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরা-মৃতপূরকেণ", (গ) "তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন" এবং (ঘ) "শন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো"—গোপীবাণীর এই চারটি বাক্যশেষ দেখে কৃষ্ণের চারিদিকে স্থিত গোপীদের যূথচতুষ্টয়ের কথা বলেছিলেন[২]। স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা ও তটস্থপক্ষা—এই যূথচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রধানাদের স্ব-স্ব ভাব অনুসারী "চেষ্টাভেদে ভাবভেদ" এইভাবে উদ্ধার করেছেন সনাতন :

প্রথমত, এক গোপী স্পর্শোৎসুকো কৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ করলেন। দ্বিতীয়জন সুহৃৎ সখাপ্রায়-দাস্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা নায়িকা, তাই দেখি তিনিও প্রথমার মতোই নিজে থেকেই কৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত বামবাহু গ্রহণ করলেন, অবশ্য নিজস্কন্ধে তা স্থাপন করায় কিছুটা প্রখরার স্বভাবও পরিস্ফুট হয়েছে। তৃতীয়া যিনি তিনি কৃশাঙ্গী, বিরহবেদনা নিবারণে অঞ্জলি-

১ "কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥" ভা° ১০।৩০।৩৪

২ "চতুষ্টয়স্থং যূথশো দিক্‌চতুষ্টয়-স্থিতত্বাত্তাসাং", বৈষ্ণবতোষণী, ১০।২৯।৩১ টীকা।

পুটে কৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন—সনাতনের মতে ইনি মৃদু দাস্য-প্রায়-সখ্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা। অপরপক্ষে চতুর্থী বিরহসন্তাপে সন্তাপিত হয়ে কৃষ্ণের চরণকমল বক্ষে স্থাপন করলেন—প্রখরা হয়েও তিনি দাস্যপ্রায়-সখ্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা। পঞ্চমী প্রণয়কোপে 'ললিতাখ্য' বা অতিমনোহর অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভ্রূকুটিভঙ্গে অধরৌষ্ঠ দংশনে কেবলই বক্র-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে "বিব্বোক" অনুভাব, অর্থাৎ গর্বমানে অভিলষিত বস্তুতেও অনাদর, প্রদর্শন করতে লাগলেন। ইনিই প্রখরা, সুসখ্যা অত্যন্ত-স্বাধীনকান্তা বামা। ষষ্ঠী যিনি, তিনি নিমেষহীন নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখসৌন্দর্য-মধু আস্বাদন করেও তৃপ্তিলাভ করলেন না। এই গোপী পূর্বোক্তা ভ্রূকুটিভঙ্গকারিণীর মতোই স্বস্থান থেকে পদমাত্র অগ্রসর না হওয়ায় প্রখরা, সুসখ্যা, স্বাধীনকান্তা বামা। সপ্তমী আর এক ব্রজসুন্দরী কৃষ্ণকে নেত্রপথে হৃদয়ে এনে নয়ন মুদিত করে পুলকিতাঙ্গী হয়ে যোগীর মতোই আনন্দাপ্লুতা হলেন। তিনি প্রখরা কিন্তু সরলা। ভাগবতের এই সপ্তমী গোপী বিষ্ণুপুরাণে অষ্টমী-রূপে উল্লিখিতা। সেখানে এ-গোপীকে শুধু মুদিত নয়নে কৃষ্ণধ্যানে পুলকিতাঙ্গী হতেই দেখিনা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম জপ করতেও শুনি।

এই সমুদয় গোপীকে সনাতন রত্যাখ্য ভাবানুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একদল—'আমি কৃষ্ণের' এই অনুভবে তদীয়তাভাবনাময়। এঁরা আনুকূল্যময়ী, ধীরা, কান্তপরাধীনা এবং দাক্ষিণ্যাদিপরায়ণা। এঁদের প্রেম-ভাবকে রূপ গোস্বামী "আত্যন্তিকাদরময়ঃ" ঘৃতস্নেহ বলেছেন। চন্দ্রাবলী-'গণ' এই আত্যন্তিক আদরময় ঘৃতস্নেহ পোষণ করেন। পক্ষান্তরে রাধিকার 'গণ' বাম্যের জন্য বিখ্যাত। সনাতন যথার্থই বলেছেন, "মমতাধিক্যো ন হি গম্ভীর প্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি"—মমতাধিক্যে গভীর প্রেমপ্রবাহের আধিক্য নেই। বস্তুত এ-আধিক্য আছে বাম্যার কৌটিল্যাভাসে নামান্তরে মদীয়তাময় অভিমানে। 'একমাত্র কৃষ্ণই আমার' এ-অভিমানে বাম্যা-প্রখরার আদরশূন্য মধুস্নেহই ভরতমুনি-বাক্যের সেই প্রেম, যার গতি সর্পের মতোই স্বভাবকুটিল। উজ্জ্বলনীলমণিকার রুদ্রবচন উদ্ধার করে এ-প্রেমেরই জয়গান করে বলেছেন, স্ত্রীগণের বামতা দুর্লভতা এবং নিবারণা কন্দর্পের মহাস্ত্র। হরিবংশে সত্যভামাও এরূপই কৌটিল্যাভাসে দৃষ্টা হন। উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণা-বামা এই উভয়বিধা গোপীর অতিরিক্ত আর একটি দল গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ব্যাখ্যায় উদাহৃত হয়েছেন। এই দলভুক্তা গোপীরা

তদীয়তা-মদীয়তা উভয় ভাবময়ী, তটস্থা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, উপরি-উক্ত তিন দলের মধ্যেই সেই 'একা,' যিনি ভ্রূকুটিসহ দশনচ্ছদ করছিলেন, তিনিই ভাববৈশিষ্ট্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। বলা বাহুল্য, সনাতনের অভিমতে, পরমভাবে তথা সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠায় ইনিই শ্রীরাধা হবেন, "একা ভ্রূকুটীত্যাদি বর্ণিত সা পরমভাব-সৌভাগ্যোপরিকাষ্ঠাপন্নত্বাচ্ছ্রীরাধৈব"। পদ্মপুরাণের ভাষায় ইনিই "সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা"।

লক্ষণীয়, "কচিৎ করাম্বুজং"[১] শ্লোক থেকে অর্ধাংশ করে চন্দ্রাবলী শ্যামা শৈব্যা পদ্মার বর্ণনা অধিকৃত। আর পরবর্তী পূর্ণ তিনটি শ্লোকে[২] যথাক্রমে রাধা ললিতা বিশাখা চিত্রিতার বর্ণনা। ভাগবতে অনুল্লিখিত আর এক গোপী ভদ্রার বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধার করেছেন সনাতন। অতএব বলতে হয়, সনাতনের অভিমত অনুসারে অষ্ট গোপী[৩] প্রধানা. যদিও এঁদের নামের তালিকা প্রসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্র ও সংহিতায় কিছু কিছু মতদ্বৈধ বর্তমান। যেমন, চন্দ্রাবলীর পরিবর্তে 'ধন্যা'র নাম পাই স্কন্দপুরাণে। তবে সনাতন ঠিকই বলেছেন, ধন্যার পরিবর্তে চন্দ্রাবলাই অধিকাংশের মতে অধিকতরা প্রসিদ্ধা। তিনিই তদীয়তাময়ী প্রথমবর্গভুক্তা গোপীর মধ্যে প্রথমা—রাধার সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা বিরাজমান। বিল্বমঙ্গলবাক্যে বর্ণিত চন্দ্রাবলী-সমীপে কৃষ্ণের 'গোত্রস্খলন' বা অনবধানতায় রাধানাম উচ্চারণের কৌতুককর বিবরণ উদ্ধার করে সনাতন এই প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন। এই রাধা-প্রতিযোগিনী চন্দ্রাবলীরই সখী শৈ ও পদ্মা। অঞ্জলিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধারণাদি করেছিলেন এই দক্ষিণা নায়িকারাই। আর সখীর সমদুঃখে যাঁরা দূরবর্তিনী থেকে নিমিষাহত চোখে চেয়েছিলেন বা নেত্ররুদ্ধ করেই থাকলেন, তাঁদের রাধাগণভুক্তা যথাক্রমে ললিতা

---

১ "কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্॥ কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূলচর্বিতম্। একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥"
ভা° ১০।৩২।৪-৫

২ "একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা। ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা॥ অপরা নিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্। আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥ তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥"
ভা° ১০।৩২।৬-৮

৩ "নৌমি চন্দ্রাবলীং ভদ্রাং পদ্মাং শৈব্যাঞ্চ শ্যামলাম্। বিশাখাং ললিতাং রাধামিত্যষ্টৌ শ্রেষ্ঠতাং গতাঃ॥" বৈষ্ণবতোষণী

ও বিশাখা বলে বুঝতে হবে। ভদ্রাও বক্রস্বভাববিশিষ্টা। তবে শ্যামলা তটস্থা—শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি নিজেই গমন করায় একদিকে যেমন তাঁর তদীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত, অন্যদিকে দয়িতের বাহু স্কন্ধে স্থাপন করায় মদীয়তাময় প্রেমও প্রকটিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে, ইনি তটস্থা হলেও মদীয়তাময় প্রেমের প্রাধান্যবশত রাধিকারই সুহৃৎপক্ষা সখী। যে গণভুক্তাই হোন, রাধা ও চন্দ্রাবলী সহ এঁরা প্রত্যেকেই নিত্যসিদ্ধা গোপা বলে সনাতনের অভিমত। প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ভাগবতের "অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ"[১] শ্লোক থেকে জানা যায়, কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা গোপীশতযূথ যখন রাসস্থলীতে উপস্থিত, তখন কতিপয় গৃহাবদ্ধা গোপী কৃষ্ণভাবনাযুক্তা হয়েও নিষ্ক্রান্তা হতে না পেরে নিমীলিত নয়নে তাঁরই ধ্যান করতে লাগলেন। এঁরা যে কেন রাসে কৃষ্ণমিলনের অধিকার লাভ করলেন না, তারই কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় সনাতন নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা ভেদে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রেয়সীদের দুটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিত্যসিদ্ধাদের আরাধনাবিধি 'অনাদিসিদ্ধ' তন্ত্রশাস্ত্রেই প্রচলিত বলে জানিয়েছেন সনাতন। ব্রহ্মসংহিতার উদ্ধৃতি সহযোগে সনাতন আরও জানান, চিন্তামণি-বিনির্মিত ভবনে পরিশোভিত, কল্পবৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত এবং কামধেনু বিচরিত বৃন্দাবনে লক্ষ্মীরূপা গোপীরাই গোবিন্দের "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা," তাঁর নিজ-"কলা"। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধা গোপীরাই ব্রহ্মসংহিতায় 'লক্ষ্মী' নামে সম্বোধিতা। সুতরাং গৌতমীয় তন্ত্রমতে 'পরদেবতা', 'কৃষ্ণময়ী' রাধা যে আবার 'সর্বলক্ষ্মীময়ী' হয়ে উঠবেন, এতে আর আশ্চর্য কী। পক্ষান্তরে সাধনসিদ্ধাদের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত সংগ্রহে সনাতনের সহায় হয়েছে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ড। উক্ত খণ্ড থেকে জানা যায়, দণ্ডকারণ্যবাসী কতিপয় মহর্ষি সুবিগ্রহ-শ্রীরামচন্দ্রের রূপমাধুরীপানে উৎসুক হয়ে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বামনপুরাণের বিবরণ অনুসারে সাধনসিদ্ধাদের মধ্যে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরাও ছিলেন। ভাগবতের "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো"[২] শ্লোক থেকে জানতে পারা যায়, এঁরা গোপী আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার অধিকার প্রার্থনা করেছিলেন। পাদ্মোত্তর

---

১ ভা° ১০।২৯।৯

২ ভা° ১০।৮৭।২৩

খণ্ডে এবং বিষ্ণুপুরাণেও সুরস্ত্রীদের গোপীরূপে জন্মের কথা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। শেষপর্যন্ত তাহলে শ্রুতিপূর্বা ঋষিপূর্বা দেবীপূর্বা গোপারাই সাধনসিদ্ধা বলে স্বীকৃত হলেন। ভাগবতে "অন্তর্গৃহগতাঃ" গৃহাবদ্ধা যে-গোপীদের প্রসঙ্গ পাই, তাঁরা বলাই বাহুল্য সাধনসিদ্ধা গোপী। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্তির যোগ্যতা তখনও তাঁরা লাভ করেননি। আসলে তাঁদের সেবাদেহে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে বলেই রাসস্থলাপথে যাত্রায় তাঁদের বিঘ্ন ঘটেছে বলে সনাতনের সিদ্ধান্ত। বিশ্বনাথের অভিমতে, এই ত্রুটি আর কিছু নয়, তাঁরা 'গোপোপভুক্তা' হয়ে "অপত্যবত্যো বভূবুঃ"। শ্রীজীবও তাঁর ক্রমসন্দর্ভে স্বীকার করেছেন, কৃষ্ণের সেবাধিকার না পাওয়ায় পুত্রবতী এই গোপীরা তীব্র ক্ষোভে পতিভুক্তদেহ ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং ভাগবতের "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ"[১] শ্লোকে যে-শিশুদের দুগ্ধপান করাবার প্রসঙ্গ আছে, তারা গোপীদের ভ্রাতৃপুত্রাদি বলেই বুঝতে হবে, "অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ"। অর্থাৎ রাসে যাঁরাই যোগদান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন একমাত্র কৃষ্ণগৃহীতমানসা শুদ্ধা। উজ্জ্বলনীলমণিকারও ব্রজগোপীদের অনাঘ্রাত-স্বরূপ সর্বাংশে স্বীকার করে বলেছেন, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ"।

উল্লেখযোগ্য, ভাগবতের টীকারচনায়, বিশেষত গোপীপ্রসঙ্গে সনাতন মুহুর্মুহু কনিষ্ঠভ্রাতা রূপের উজ্জ্বলনীলমণিকে স্মরণ করেছেন। তাই দেখি, অনুভাবাদি ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবতোষণীতে রূপের অলংকারগ্রন্থের নানা উদ্ধৃতি উদাহৃত। এর একটি কারণ বোধকরি এই, স্থায়ী-প্রকরণ বা অনুভাবসমূহ বিশদীভবনে রূপ গোস্বামী ভাগবতের প্রত্যক্ষ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ অনুভাব প্রকরণেরই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। সর্বাবস্থায় চারুতার নামই 'মাধুর্য'—এই লক্ষণবলেই রূপ কৃষ্ণের স্কন্ধে আলস্যে হস্তার্পণ-কারিণী-স্বাধীনভর্তৃকাকে রাধা বলে চিহ্নিত করেন। রূপের এই কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং রসানুভবের প্রগাঢ়তার শেষ উদাহরণ বোধ হয় দিব্যোন্মাদ-চিত্রজল্প বিভাগে ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার ব্যাখ্যা। প্রিয়জনের কোনো সুহৃদের সঙ্গে দেখা হলে গূঢ়রোষে গর্ব-অসূয়া-দৈন্য-চাপল্য-ঔৎসুক্য চরমে পৌঁছে তীব্রোৎকণ্ঠা-পূর্ণ আলাপ হয়ে উঠলেই তা 'চিত্রজল্প' নামে পরিচিত হয়। রূপের ভাষায় বস্তুতই এ হলো "অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎ-

১ ভা° ১০।২৯।৬

কৃতিসুহৃত্তরঃ"। ভাগবতীয় ভ্রমরগীতার ১০।৪৭।১২ থেকে ১০।৪৭।২১ পর্যন্ত এই দশটি শ্লোককে রূপ চিত্রজল্পের দশটি সূক্ষ্ম ভাগের উদাহরণস্থল করেছেন। প্রথমত 'প্রজল্পে' আছে অসূয়া, ঈর্ষা, মদযুক্ত অবজ্ঞা এবং "প্রিয়স্যা-কৌশলোদ্গারঃ"। দৃষ্টান্ত ভাগবতীয় "মধুপকিতববন্ধো" শ্লোকটি। এস্থলে কৃষ্ণকে 'কিতব' বা শঠ বলায় অসূয়া প্রকাশিত, পক্ষান্তরে সপত্নীপ্রসঙ্গে ঈর্ষা, 'চরণস্পর্শ করোনা'—উদ্ধবের প্রতি এ-বাক্যে মদ এবং 'কৃষ্ণ সেই ক্ষত্রিয় স্ত্রীবর্গের প্রসাদই অঙ্গীকার করুন' এ-বাক্যে স্পষ্টতই অবজ্ঞা, আর 'যদুসভায় গোপীপ্রসঙ্গ বিডম্বনামাত্র' বাক্যে কৃষ্ণের অকৌশল অভিব্যক্ত। দ্বিতীয় ভাগ 'পরিজল্পিত'। এতে আছে শ্রীকৃষ্ণে নির্দয়তা শাঠ্য চাপল্যাদির অভিযোগ অর্পণ এবং নিজপক্ষে সর্বনৈপুণ্যের ব্যঞ্জনা। 'সকৃদধরসুধাং' শ্লোকে এরই নিদর্শন মেলে। মোহকারী অধরসুধা পান করিয়ে সদ্য-ত্যাগের প্রসঙ্গে আগে শাঠ্য, পরে নির্দয়তা সূচিত। ভ্রমরের মতো তাঁকে চঞ্চল বলায় তেমনি আবার চাপল্যও ব্যঞ্জিত। তৎসত্ত্বেও, অর্থাৎ তাঁর চপল-স্বভাব জেনেও লক্ষ্মী তাঁর পাদপদ্মের পরিচর্যা করছেন, এতে লক্ষ্মীর অবিচক্ষণতা এবং ব্যঙ্গ্যার্থে নিজের বিচক্ষণতাই অভিব্যক্ত। তৃতীয় বিভাগ 'বিজল্পে' আছে সুস্পষ্ট অসূয়াযুক্ত কটাক্ষ এবং আচ্ছন্ন মানভঙ্গি। দৃষ্টান্ত "কিমিহ বহু" শ্লোকটি। কৃষ্ণসঙ্গে মথুরানাগরীদের সম্ভোগলীলা গান করলে উদ্ধব অনায়াসেই সেই নাগরীবৃন্দের প্রসাদ লাভ করবেন, ফলত তাঁর অভীষ্টপূরণ হবে অবিলম্বেই—এবাক্যে বলা বাহুল্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সকটাক্ষ উপহাস। 'বিজয়সখ-সখী' এবং 'যদুপতি' শব্দ দুটিতে গূঢ় মানাচ্ছাদনও রয়েছে। চতুর্থত 'উজ্জল্প'। গর্বযুক্ত ঈর্ষার সঙ্গে অসূয়া, সেই সঙ্গে আবার কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ মিলিত হয়ে উজ্জল্প সৃষ্টি করে। "দিবি ভুবি চ রসায়াং" হলো এর উদাহরণ। 'যাঁর চরণরজ সর্বথাসঙ্গিনী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যখন নিত্যসেবা করছেন, তখন আমরা গোপীরা আর কে', এবাক্যে আপাতদৈন্যের অন্তরাল থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে গর্ব। পক্ষান্তরে, 'দীনজনই তোমার প্রভুর উত্তম চরিত্র কীর্তন করে থাকে, আমাদের মতো কৃপণারা নয়,' এ-বাক্যে গর্বযুক্ত ঈর্ষার সঙ্গে কোথায় একটি আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত। পঞ্চম বিভাগ 'সংজল্প' হলো অনির্বাচ্য, দুস্তর্ক্য, সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপভঙ্গিতে কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, কঠিনতা এবং শাঠ্যের কথন। 'বিসৃজ শিরসি পাদং' শ্লোক তারই উদাহরণ। গোপী যখন উদ্ধবকে বলেন, 'মুকুন্দের কাছ থেকে তো দূতকর্ম চাটুকারিতা ভালোই

শিক্ষা করেছ,' কিংবা 'নিজের প্রয়োজনেই সমাগতা এই আমাদের ত্যাগ করেছেন তিনি,' অথবা 'শঠপ্রবরের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব?' ইত্যাদি, তখন এই বৈদগ্ধ্যভণিতি সংজল্পের বৈশিষ্ট্যে স্বীকৃতি লাভ করে। ষষ্ঠ বিভাগ 'অবজল্প' হলো কৃষ্ণের কাঠিন্য কামিত্ব এবং ধূর্ততা স্মরণে নিজ-আসক্তির পরিণাম ভেবে ভয়মিশ্রিত ঈর্ষার প্রকটন। যেমন, 'মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং' শ্লোকটিতেই তো গোপীর বক্তব্য উক্ত ভয়মিশ্রিত ঈর্ষায় বিলসিত। কৃষ্ণের শ্যামতাস্বভাবেই কি শুধু ভয়? না, গোপীর আরও আশঙ্কা, 'পূর্বজন্মে ব্যাধবৎ বালিবধ তো এঁরই গুপ্তঘাতক-স্বরূপ উদ্ঘাটন করছে।' আর 'সীতাপরতন্ত্র হয়েছেন বলে কি কামিনী শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ করতে হবে?' 'বামনাবতারে বলিরাজের পূজোপহার গ্রহণ করে তাঁকেই কিনা কাকবৎ বন্ধন করলেন।'—এই প্রতিটি বাক্যই গোপীর ভয়মিশ্রিত ঈর্ষার পরিচয় বহন করছে। চিত্রজল্পের সপ্তমভেদ 'অভিজল্পিত' আবার আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃষ্ণেরই জন্য যাঁরা বিহঙ্গচর্যাপরায়ণ হয়েছেন, সেই সাধুবৃন্দ কৃষ্ণের কাছ থেকেই খেদলাভ করায় কৃষ্ণকে ত্যাগ করার ঔচিত্য সম্বন্ধে গোপীর সানুতাপ উক্তি স্মরণীয় হয়ে আছে। অভিজল্পিত শ্লোক 'যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্' ইত্যাদিতে গোপীর আরও বক্তব্য ছিল, কৃষ্ণসঙ্গ করে ফল কি, কেননা কৃষ্ণের কথামৃত যারা শ্রবণপুটে পান করে, তাদের তো সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না! বলা বাহুল্য, এ হলো নিন্দাচ্ছলে স্তুতি মাত্র। তেমনি আবার নির্বেদবশত কৃষ্ণের কৌটিল্য আর পীড়কস্বভাব বর্ণনায়, তাঁর প্রদত্ত সুখের প্রসঙ্গই কীর্তিত হলে অষ্টম বিভাগ 'আজল্প' হবে উদাহরণীভূত। যেমন, 'বয়মৃতমিব' শ্লোকে গোপী কৃষ্ণকে বলছেন 'ব্যাধ'—এ-ব্যাধ কৃষ্ণসার-বধূরূপিণী গোপীদের কপটছলনাবাক্যের দ্বারা শুধু মুগ্ধই করেননি, সেই সঙ্গে নখস্পর্শে বাণসন্নিধানও করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৌটিল্যই স্পষ্ট। আবার উদ্ধবকে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ত্যাগ করে অন্য প্রসঙ্গে যাবার নির্দেশদানে প্রকারান্তরে কৃষ্ণপ্রসঙ্গের সুখপ্রদত্বই ব্যক্ত। পরবর্তী বিভাগ 'প্রতিজল্প'। কৃষ্ণমিলন অনুচিত বলেও কৃষ্ণদূতের প্রতি সম্মানদানে এ-স্তরটি চমৎকৃতির সৃষ্টি করে। "প্রিয়সখ পুনরাগাঃ' শ্লোকের প্রথমেই তির্যক ভঙ্গি থেকে সহসা কৃষ্ণদূতকে গাঢ়কণ্ঠের সম্ভাষণে ভাববৈচিত্রীর এক অপূর্ব স্তর রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রণয়কোপে ঈর্ষাদির মোক্ষণ এখনো হয়নি। তাই গোপী বলেন, লক্ষ্মীই তো কৃষ্ণের নিত্যবক্ষোবিলাসিনী, তবে

সে-বক্ষে আর ব্রজবধূদের যাবার আবশ্যক কি! ঈর্ষাদির মোক্ষণে প্রেম শেষ সীমা স্পর্শ করেছে দশম বিভাগ 'সুজল্পে'। এতে সর্ব প্রণয়কোপের অবসান সারল্য গাম্ভীর্য দৈন্য চাপল্য এবং কৃষ্ণকুশলসংবাদের জন্যে উৎকণ্ঠ সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত। ভাগবত-বিখ্যাত "অপিবত মধুপুর্যামার্যপুত্রঃ" শ্লোকটি এরই পরম দৃষ্টান্তস্থল। 'আর্যপুত্র কি এখন মথুরাতেই আছেন?' 'মাতা-পিতার কথা মনে পড়ে তাঁর?' 'স্বজনবান্ধবদের কথা?' 'কখনো কোনো অবসরে এই কিঙ্করীদের?' 'কবে তিনি আসবেন, এসে তাঁর সুগন্ধহস্ত আমাদের মস্তকে অর্পণ করবেন?'—এই বিচিত্র প্রশ্ন-তরঙ্গে ব্রজগোপীর বিচিত্র ভাবসিন্ধু উদ্বেল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ভাগবতের শেষ সুধাচয়নে রসশাস্ত্রকার রূপ গোস্বামীর কবিমনের সবটুকু মাধুর্য নিঃশেষিত হয়েছে। টীকা এখানে আর শুষ্ক টীকা থাকেনি 'আস্বাদন' হয়ে উঠেছে। রূপ তাই এখানে আর ব্যাখ্যাতা মাত্র নন, রসিক-ভাবুক; গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় কৃষ্ণ-গোপী লীলাস্বাদনে 'মঞ্জরী'। মঞ্জরী রূপে সম্ভাষিত আর এক রসিক-ভাবুক কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাই চৈতন্যলীলাস্বাদনে ভ্রমরগীতার ভাববৈচিত্রী অনুরূপভাবেই তরঙ্গিত হতে দেখেন :

> "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
> এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥
> নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
> ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ ॥"[১]

কবিরাজ গোস্বামীর অভিমতে আবার, "ভাবের অবধি" শ্রীরাধার ভাব পরকীয়া বলেই, তাতে দেখি, "অতি রসের উল্লাস," আর এ-ভাবের "ব্রজবিনা ..... অন্যত্র নাহি বাস"[২]। বস্তুত, এই স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্বই ভাগবতীয় গোপীতত্ত্ব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রাধাতত্ত্বের অন্তিম জিজ্ঞাসা। বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বেরও এটি একটি অনিবার্য অধ্যায়।

প্রশ্নটি প্রথম ওঠে ভাগবতে অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধা গোপীদের প্রসঙ্গে

১ চৈ, চ, মধ্য। ২, ২-৪

২ "পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥
ব্রজবধূদের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥" চৈ, চ, আদি।৪,৪২-৪৩

শুকদেবের "জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ"[১] কথাটির জন্য! কৃষ্ণ সাক্ষাৎপরমাত্মা বলেই তাঁর সঙ্গে জারবুদ্ধিতে বা উপপতিভাবে মিলিত হয়েও সেই দ্বাররুদ্ধা গোপীরা সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে গুণময় দেহ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, ভাষান্তরে পরমনির্বৃতি লাভ করতে পেরেছিলেন, এই হলো উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য। উপপতিভাবে কৃষ্ণভজনা শুধু এই কয়েকজন গোপীতেই সীমাবদ্ধ থাকলে কথা ছিলনা, কিন্তু রাসশেষে পরীক্ষিতের চর্যাচর্যবিনিশ্চয়মূলক প্রশ্নে সমুদয় গোপীপ্রসঙ্গেই উপপতিভাবে ভজনার অভিযোগ উঠেছে। বিশেষত এ-ব্যাপারে পরীক্ষিৎ স্বয়ং কৃষ্ণ সম্বন্ধেই সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন, ভগবান্ তো জগদীশ্বর, ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁর আবির্ভাব, তিনিই ধর্মের বক্তা কর্তা পালয়িতা, তবে তাঁর একী বিপরীত আচরণ। পরদারাভিমর্ষণের তুল্য ঘৃণ্য আচরণ তিনি করেন কিভাবে? অর্থাৎ লক্ষণীয়, রাসে সমবেত সমগ্র গোপীসমাজই এখানে 'পরদার' রূপে চিহ্নিত।

গোপীরা কৃষ্ণের 'পরদার' ছিলেন কিনা এবং কৃষ্ণ গোপীদের উপপতি—এককথায় ভাগবতীয় গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া, না পরকীয়া, সে বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণ একমত নন। এক্ষেত্রে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পরস্পর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে যথাক্রমে বিশুদ্ধ স্বকীয়া ও বিশুদ্ধ পরকীয়ার বিধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রসোৎকর্ষের দিক দিয়ে পরকীয়ারই প্রাধান্য দেখিয়েছেন রূপ, যদিও তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সনাতনের মতোই অপ্রকটে রাধাদি গোপীবৃন্দের নিত্যস্বকীয়াত্বেই বিশ্বাসী ছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

উল্লেখযোগ্য সনাতন নিজে গোপীদের উভয়ত স্বকীয়া ও পরকীয়া স্বরূপেরই অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। উদাহরণত ভাগবতীয় "সংস্থাপনায় ধর্মস্য"[২] ইত্যাদি শ্লোকের সনাতন-কৃত ব্যাখ্যা মনে পড়তে পারে। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি গোপীদের 'কৃষ্ণবধূ' বলেই বর্ণনা করে বলেছিলেন, 'পরদার' বলতে 'পরা' বা পরমাশক্তিরূপা যে দারা অর্থাৎ স্বীয় রমণীগণকেই বোঝাচ্ছে। অতএব স্বকীয়া রমণীদের যে-অভিমর্ষণ তাতে কি করে ধর্মের প্রতিকূল আচরণ হয়? বিশেষত ইতোপূর্বেই যখন ভাগবতে

১ ভা° ১০।২৯।১১

২ ভা° ১০।৩৩।২৭

ব্রজসুন্দরীদের 'কৃষ্ণবধূ' বলা হয়েছে[১]। শুধু তাই নয়, সনাতন ভাগবত থেকে গোপীদের স্বকীয়াত্বসূচক শ্লোকসমূহ উদ্ধার করে একটি তালিকা পর্যন্ত প্রস্তুত করে দিয়েছেন। ভাগবতেরই অপর একটি শ্লোক "ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ"[২] ব্যাখ্যায় তিনিই আবার স্বকীয়াত্ব পরিহারের অনুকূল যুক্তি দেখিয়েছেন। ভাগবতামৃতেও কুলগত নারীধর্ম তৃণজ্ঞান তথা নিজপতিকে দূরে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও রাধাকে তিনি "সতী চ সাভীপ্সিত-সচ্চরিত্রা" বলে অভিহিত করেছেন।

রূপও যুগপৎ স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব বুদ্ধি পোষণ করেছিলেন বলে মনে হবে। তাই একদিকে তাঁর 'ললিতমাধব' নাটকের দশম অঙ্কে দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামা-রূপিণী রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিধিমতে বিবাহদান করেন তিনি, অন্যদিকে উজ্জ্বলনীলমণিতে জানান, পরকীয়া হরিপ্রিয়ারাই নায়িকাশ্রেষ্ঠা—স্বকীয়া অপেক্ষা তাঁদেরই বিলক্ষণ উৎকর্ষ। একদিকে 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে বলেন, অভিমন্যুগোপের সঙ্গে রাধিকার বিবাহ সত্য নয়, পরন্তু যোগমায়াকৃত প্রতিভাস মাত্র, অন্যদিকে রসশাস্ত্র প্রণয়নে স্বীকার করেন, পরকীয়ার মূল উপপতিভাবেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত[৩]। ভাগবতে যে কৃষ্ণ বলেছিলেন, কুলরমণীর পক্ষে ঔপপত্য সর্বত্রই ঘৃণ্য[৪] তার উত্তরেও রূপের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ঔপপত্যের যে লঘুতা শাস্ত্রসমূহ প্রতিপাদন করে থাকেন, তা লোকোত্তর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য নয়। রূপের আনুগত্যে শ্রীজীব যদিও তাঁর প্রীতিসন্দর্ভে প্রকটলীলায় ব্রজবধূর পরকীয়াত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন[৫] তবু প্রকট-অপ্রকট নির্বিশেষে ব্রজবধূর পরমস্বকীয়াত্বেই তাঁর যথার্থ সমর্থন ছিল। তাই গোপালচম্পূতে তাঁকে বলতে শুনি, গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে 'জারবুদ্ধ্যাপি' সংগতা হননি; অর্থাৎ শুধু অপ্রকটেই নয়, প্রকটেও তাঁরা-ছিলেন কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। তাঁর মতে, রাধাদি গোপীগণের যোগমায়া কল্পিত মূর্তির সঙ্গেই অন্যগোপের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল, যেহেতু প্রকৃত

১ "পরমস্বরূপশক্তিরূপা যে দারাঃ স্বীয়রমণ্যস্তদভিমর্দনমপি কথং প্রতীপমাচরৎ অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতোভবদ্ভিরেবোক্তং কৃষ্ণবধ্ব ইতি"। বৈষ্ণবতোষণী, ১০।৩৩।২৭-টীকা

২ ভা° ১০।৩৩।৩৯

৩ উজ্জ্বলনীলমণি, হরিপ্রিয়া-প্রকরণ, ১৪

৪ "জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ" ১০।২৯।২৬

৫ "অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ" প্রীতিসন্দর্ভ

রাধাদির পাণিগ্রহণে নিখিলসংসারে একমাত্র কৃষ্ণই অধিকারী। রাধাকৃষ্ণের বিবাহদান তাঁর চম্পূকাব্যের বিখ্যাত ঘটনা।

শ্রীজীবের এই নিত্য-স্বকীয়াত্ব ধারণারই বিরুদ্ধকোটিতে দাঁড়িয়ে গোপীর নিত্য-পরকীয়াত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর সারার্থদর্শিনীতে বলেন, গোপীদের ঔপপত্যভাব যদি মায়াবিরচিতই হতো, তাহলে তো শুকদেব পরদারাভিমর্ষণের শঙ্কার উত্তরে এককথায় বলতে পারতেন, পরকীয়া-সম্বন্ধ প্রতীতি মাত্র। তা না বলে তাঁকে বলতে হয়, ভগবান্ পরম তেজীয়ান, পরমাত্মা, সর্বাধ্যক্ষ, তাঁতে জারত্বদোষের সম্ভাবনা কোথায়, ইত্যাদি। বিশ্বনাথের মতে, 'গোপী' বলতে গোপবধূই বোঝায়, তাঁদেরই 'বল্লভ', এতদর্থেই কৃষ্ণ 'গোপীজনবল্লভ'। প্রকটের পরকীয়াভাব অপ্রকটে স্বকীয়া হয়ে যায়, এ ধারণাও তাঁর মতে রসাভাস ঘটায়। সেক্ষেত্রে পরকীয়া রতিমূলক মহাভাবেরও নিত্যতার হানি ঘটতে বাধা বলে তাঁর বিশ্বাস।

আসলে অপ্রকটে যতই মতভেদ থাকুক, প্রকটে রসোৎকর্ষের দিকটি বিচার করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ মোটামুটিভাবে কৃষ্ণগোপীর পরকীয়াবুদ্ধিরই সমর্থন করে গেছেন বলে মনে হবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজও গোপীদের ঔপপত্যভাবকেই স্বীকার করেছেন : তাঁর গ্রন্থে ভগবান্‌কে তাই বলতে শুনি :

> "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
> যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
> আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
> দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥
> ধর্ম ছাড়ি রাগে দুঁহু করয়ে মিলন॥
> কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
> এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
> এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ॥
> ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
> রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম॥"[১]

"রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম"—বস্তুতঃ ভাগবতীয় গোপীরা পাতিব্রত্যাদি সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে শুধু কৃষ্ণেরই শরণাগতা হয়েছিলেন। তাঁদের

১ চৈ. চ. আদি। ৪, ২৬-৩০

পরমপ্রেমের ভূয়সী সাধুবাদ করে ভাগবতে কৃষ্ণ তাই বলেছেন, দুর্জর গেহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করে তোমরা আমাতেই আত্মনিবেদন করেছ, তোমাদের প্রেমেব এ-ঋণ অপরিশোধ্য।

স্মরণীয়, পরকীয়াতেই একমাত্র 'দুর্জরগেহশৃঙ্খলা'র প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই ভাগবতের 'নিরবদ্য' 'সর্বোপার' প্রেম যে পরকীয়া গোপীপ্রেমেই বিভাবিত তাতে আর সন্দেহ কী। ভাগবতের এই সর্বপ্রকার সামাজিক ধর্ম ও দেহগেহশৃঙ্খলের বন্ধন-বিমুক্ত অপূর্ব অনঘ প্রেমেরই প্রতিমা রাধা বাঙ্লার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মূর্তিমতী :

"কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ-মরিয়াদ- সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥"[১]

অর্থাৎ, শ্রীজীব গোস্বামীর তুল্য মনস্বী পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণের বিবাহ-দানে যতই উদ্যোগী হোন না কেন, ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের স্বকীয়াত্বসূচক ব্যাখ্যা বাঙালী রসিকভাবুকের চিত্তে কোনোদিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বাঙালী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে, "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস"। বাঙালীর 'ভাগবতাভ্যাসবশাদ্' বিশদীভূত মনোমুকুরে পরবাসনিনী গোপীর মিলনোৎকণ্ঠায় বিরহোদ্বেগে বিশুদ্ধ পরকীয়া ভাবেরই তন্ময়ীভবনযোগ্যতা ঘটেছে॥

---

১ 'গোবিন্দদাসের পদাবলী', ড° বিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত ৩৫৪ পদ,

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাগবত ও চৈতন্য যুগসাহিত্য

ভাগবত ও বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য

গীত অর্থে 'পদ' শব্দের প্রয়োগ অর্বাচীন নয়। মেঘদূত কাব্যে "মদ-গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা"[১] ইত্যাদি অংশে 'পদ' সংগীতার্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। ভাগবতের বিখ্যাত গোপীগীতে গোপীরা বলেছিলেন, "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতং"। দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের এই বেণুগীত' উনত্রিংশ অধ্যায়ে 'কলপদ' হয়ে উঠেছে: "কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীতসম্মোহিতার্য-চরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং"। টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন "কলানি পদানি যস্মিন তৎ আয়তং দীর্ঘমূর্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন"। স্বরালাপ-ভেদ-সমন্বিত গীতমূর্ছনা হিসাবে এই 'কলপদে'র ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও গীতসমষ্টি অর্থে 'পদাবলী' শব্দের প্রয়োগ বোধ করি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। এ-সম্পর্কে হরিদাস দাস বাবাজী প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে বলা হয়েছে:

"'পদাবলী' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন—শ্রীজয়দেব, 'মধুরকোমল-কান্ত-পদাবলী'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম ভারতে ইহাকে বাণী বলে, যেমন 'মাধুরীবাণী', 'মোহিনীবাণী' ইত্যাদি। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এবং শ্রীচৈতন্যযুগ ও তৎপরবর্তী যুগে রচিত সংগীতসমূহও পদাবলী আখ্যায় অভিহিত।"[২]

আলোচ্য বিষয়ে পদাবলী-রসরসিক অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর আলোকপাতও স্মরণীয়

"'পদাবলী' শব্দের উৎস জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী'। পদসমুচ্চয় অর্থে 'পদাবলী'র প্রয়োগ করিয়াছিলেন সপ্তম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য দণ্ডী—"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী' (কাব্যাদর্শ ১.০)। বাঙলার বৈষ্ণব সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলীকে যোগরূঢ়ভাবে গানের পর্যায়ভুক্ত করিয়া আসিতেছেন।"[৩]

মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর মন্ত্রদ্রষ্টা জয়দেব থেকে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা পদাবলীসাহিত্যের ধারা অব্যাহত। জয়দেবের

১ মেঘদূত, উত্তর।২৫

২ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ২য় খণ্ড ক, পৃ° ১০৬৯

৩ 'বৈষ্ণব পদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা, ৪র্থ সং, পৃ° ৮০

একমাত্র আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত ভাষা, পরবর্তী পদকর্তাগণের—সংস্কৃত, মৈথিলী, ব্রজবুলি এবং বাঙলা। বৈষ্ণব রসিকের দৃষ্টিতে পদাবলী-স্রষ্টা জয়দেবের গীতগোবিন্দ আকরগ্রন্থ ভাগবতেরই বিশদীভূত টীকা; আবার বৈষ্ণব পদাবলী একাধারে ভাগবত ও গীতগোবিন্দের তত্ত্বভাষ্য—দর্শন ও কবিত্বের মহাসংগম—মহাজন-সুভাষণে "রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবিভাবুকাঃ"। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজে পদাবলী তাই "চতুর্থ প্রস্থান"। এ বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

"বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথার—তথা গোপীকথার কবিত্বময় উদাহরণ, আখ্যানমূলক রসশাস্ত্র। ইহাই চতুর্থ প্রস্থান।"

পদাবলী যে যুগপৎ বঙ্গীয় তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক, সে কথাও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

"ভারতের আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবহমানকাল ব্যাপিয়া সংগীতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বেদের সূক্তসমূহ, পুরাণের স্তোত্রমালা, তামিল বেদ নামে পরিচিত দক্ষিণাপথের আড়বারগণের রচনারাজি, উত্তর ভারতের সুরদাস, তুলসীদাস, দাদু, কবীর ও নানকের দোহা চৌপাই[১], উড়িষ্যার কবিগণের রচিত গান, আসামের শঙ্করদেব মাধবদেবের 'বরগীতি' ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলী এই ধারারই উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি। বাঙালী হৃদয় আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[২]

বাঙালীর কাব্যসংগীতের এই বিচিত্র মুক্তধারার "বেণীমাধব" হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। "যদি গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে হইত কেমনে ধরিত দে"—বঙ্গীয় ধর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে এটি আক্ষরিক অর্থেই মহাসত্য বাণী। ভাগবত-গীতগোবিন্দ তথা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের রসান্তঃপুরের সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়-লোকের নিগূঢ় সেতুবন্ধ রচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। "বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙালী কবি প্রেম-বর্ণনায় অদ্বিতীয়"—আচার্য দীনেশচন্দ্রের এ-উক্তির তাৎপর্যও তাই। বস্তুত বঙ্গীয়, এমনকি ভারতীয় প্রেমভক্তি-সাধনার ইতিহাসে চৈতন্যদেব মধ্যযুগের একটি অলঙ্ঘ্য অধ্যায়। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিতে রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ যথার্থই নিবেদন করেছেন,

১ এই সঙ্গে মীরাবাঈয়ের ভজনও উল্লিখিত হবার দাবী রাখে—মদীয়।

২ 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ-প্রকাশিত, ভূমিকা, পৃ° ৮০.

"তিনি [শ্রীচৈতন্য] শ্রীমদ্‌ভাগবত ও বৈষ্ণবগীতিসমূহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিত্তিতে, নয়নের অশ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে দণ্ডায়মান।...চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিতদ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয়।"[১]

মধ্যযুগীয় বিপুল পদাবলীসাহিত্যের "প্রবেশ চাতুরী সার", "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" শ্রীচৈতন্যকে মধ্যবিন্দুতে স্থাপন করে তাই আমরা একাধিক পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনটি যুগবিভাগে আমাদের আলোচনা সুবিন্যস্ত করতে চাই— ১. চৈতন্য পূর্ব।
২. চৈতন্য সমসাময়িক।
৩. চৈতন্য পরবর্তী।

তুলনার ভিত্তিতে উপরি-উক্ত তিনযুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভাগবতীয় প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয়ই আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে। এর মধ্যে আবার বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সাহিত্যকৃতিই সর্বাগ্রে স্থান পাবার যোগ্য। 'মহাজন' রূপে স্বীকৃত এই দুই পদকর্তার প্রতি শ্রীচৈতন্যের অনুরক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'অমল শাস্ত্র' ভাগবতের আদৌ কোনো প্রভাব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে পড়েছে কিনা।

আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গদেশে অন্যতম ভাগবত-প্রচারকের সম্মান যেমন প্রাপ্য মাধবেন্দ্রপুরীর, মিথিলায় তেমনি বিদ্যাপতির। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ড° বিমানবিহারী মজুমদার তাঁদের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদসংকলন গ্রন্থে বলেছেন, ১৪২৮ সনে রাজবনৌলিতে বিদ্যাপতি ভাগবতের অনুলিপি সমাপ্ত করেন। ড° সুকুমার সেন আবার তাঁর বিদ্যাপতি-গোষ্ঠীতে জানিয়েছেন, ৩৪৯ লক্ষ্মণ সংবতে, অর্থাৎ ১৪৬৮ সনে বিদ্যাপতির হাতে নকলকরা ভাগবত পুরাণের পুঁথি পাওয়া গেছে। বিদ্যাপতির জীবনকাল বা তাঁর ভাগবত-পুঁথির সনতারিখ নিয়ে যত বিবাদবিতণ্ডাই থাক না কেন, ভাগবতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় লাভের[২] প্রেক্ষাপটে বিদ্যাপতির পদ-

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান থেকে পুনরুদ্ধৃত।

২ ভাগবতের সঙ্গে ঠিক করে বিদ্যাপতির প্রথম পরিচয় ঘটে বলা সম্ভব নয়। তবে মধ্যযৌবনে ঘটেনি বলেই বিশ্বাস। রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে বিদ্যাপতির যে একটি মাত্র রাসলীলার পদ পাই, সেটি বাসন্তরাস বিষয়ক। পক্ষান্তরে কবিশেখর ভণিতায় "যব ঋতু-পতি নব পরবেশ"

সাহিত্যে যে একটি অন্তর্লীন পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, সে বিষয়ে অনেকেই একমত। বস্তুত বিদ্যাপতির মধ্যযৌবনে রচিত পদাবলীর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য, শৃঙ্গার রসের নায়করূপে "শ্যামমেব পরং রূপম্" বা শ্যাম-পরমরূপকে তিনি যতটা অনুধ্যান করেছেন, "স্বয়ং ভগবান্" রূপে আদৌ ততটা নয়। মনে করা যেতে পারে, জীবনমধ্যাহ্নের প্রখর তপনতাপের উপান্তে ভাগবত-পরিচয়ের প্রচ্ছায়ে ঘনীভূত হয়ে এসেছে সায়াহ্নের জলদসম্ভার। বিরহ-বিষয়ক পদেই বিদ্যাপতির আকূতি অশ্রুজলে আর্দ্র এবং আধ্যাত্মিকতায় গভীর হয়ে উঠেছে। মিত্র-মজুমদার সংকলনে পদানুক্রমে কবির প্রথম ঐকান্তিক বিরহভাবনা পাই ৪৯৮ সংখ্যক পদে: "মাধব, তোঁহে জনু জাহ বিদেসে"। লক্ষণীয়, বয়ঃসন্ধি ও নবসমাগমে তরলকণ্ঠ কবির চতুর-ভাষণ এখানে কত সজল ও গম্ভীর হয়ে উঠতে পেরেছে। তবে এ পদের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের প্রতি রাধার 'প্রভু' ও 'পতি' সম্বোধন। ভাগবত ও গীত-গোবিন্দের মতো বিদ্যাপতির পদেও এ-সম্ভাষণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে:

"বনহিঁ গমন করু হোএতি দোসর মতি
বিসরি জাএব পতি মোরা।
হীরা মনি মানিক একো নহি মাঁগব
ফেরি মাঁগব পহু তোরা॥"

বনে ["গোকুল ও মথুরার মধ্যস্থিত বনে"—মিত্র-মজুমদার টীকা] গিয়ে তুমি অন্যমতি হবে; পতি, তুমি আমায় ভুলে যাবে। হীরা-মণিমাণিক্য একটিও চাই না। প্রভু, তোমাকেই ফিরে পেতে চাই।

এই একান্ত পতি-সম্ভাষণ ৪৯৯ পদে হয়েছে 'স্বামী':

"পাউস নিঅর আএলারে
সে দেখি সামি ডরাঞো।
জখনে গরজি ঘন বরিসতারে
কএোন সে বিপরাঞো॥"

পদটিতে শারদরাসের স্মৃতিচারণ লক্ষণীয়: "শারদে নিরমল চন্দ। তাক কিরন লেই দন্দ॥ পূরবক রাস-বিলাস। সোঙরিতে না বহয়ে শ্বাস॥" তরু ১৮৩২॥ রাধাবিরহের বারমাস্যামূলক এ-পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলে সকল সমালোচকই স্বীকার করে নেননি। মিত্র-মজুমদার সংস্করণে অবশ্য এটিকে বিদ্যাপতির মৌলিক রচনাভুক্ত দেখি [দ্র° ৭১৭ সংখ্যক পদ]। হতে পারে এ-পদ ভাগবত-পরিচয়লাভের পরের রচনা।

প্রাবৃষের মেঘান্ধকারে এখানে ঘনীভূত হয়েছে 'ভাবী' বিরহের আশঙ্কা। কিন্তু বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব 'ভূত' বিরহের মর্মভেদা আর্তনাদে, সর্বশূন্যময় জগতে যেখানে বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর চলে ব্যর্থ পক্ষসঞ্চালন :

"মন করে তঁহা উড়ি জাইঅ
জহাঁ হরি পাইঅ রে।
পেম পরসমনি জানি
আনি উর লাইঅ রে॥" [৫২১]

এই প্রেম-পরশমনি বক্ষে ধারণ করতে চেয়ে সখির কাছে মিনতি করছেন গোপী :

"কতি দুর মধুপুর কত সখি জানি।
জহাঁ সে মাধব সারঙ্গপানি॥" [৫৩০]

সারঙ্গপাণি-শ্রীকৃষ্ণের কল্পনায় পুরাণ-প্রতীক এখানে পুনরুজ্জীবিত। বস্তুত বিরহ-পর্যায়ে এসে অনুভব করি, এই পদকর্তা ইতোমধ্যেই ভাগবত-প্রসাদ লাভ করেছেন। তারই প্রমাণস্বরূপ ৫৪০ সংখ্যক পদটি সর্ব-উদ্ধারযোগ্য :

"চানন ভেল বিসম সর রে
ভূসন ভেল ভারা।
সপনহুঁ নাহি হরি আএল রে
গোকুল গিরধারী।
একসর ঠাডি কদম তর রে
পথ হেরথি মুরারী।
হরি বিনু দেহ দগধ ভেল রে
ঝামরু ভেল সারী॥
জাহ জাহ তোঁহে উধব হে
তোঁহে মধুপুর জাহে।
চন্দ্রবদনি নহিঁ জীউতি রে
বধ লাগত কাহে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি তন মন দে
সুনু গুনমতি নারী।

আজু আওত হরি গোকুল রে
পথ চলু ঝট ঝারী ॥”

“জাহ জাহ তোঁহে উধব হে তোঁহে মধুপুর জাহে। চন্দ্রবদনি নহি জীউতি রে বধ লাগত কাহে”—যাও যাও উদ্ধব, মধুপুরে যাও, [গিয়ে বল] চন্দ্রবদনী বাঁচবে না, তাকে বধ করার পাপ লাগবে কাকে? বস্তুত, এই যুগলচরণই ভাগবতীয় উদ্ধবদূতের অনুভাবনায় প্রধানা গোপীর দিব্যোন্মাদকেই ধারণ করে আছে। রাধা জানেন,

“কতএ দামোদর দেব বনমালি।
কতএ কহমে ধনি গোপ গোআরি ॥” [৫৬৮]

কোথায় দামোদর দেব বনমালী, আর কোথায় আমি মূঢ় ব্রজগোপী! তিনি আরও জানেন, মধুপুরে সহস্র সপত্নী বাস করেন, প্রিয়তমকে তিনি তাঁদেরই মধ্যে হারিয়েছেন। তবু 'দশ যুগ জপ' করে সিদ্ধিলাভ করাও সম্ভব হয়েছে, আজ [স্বপ্নে] দেব বনমালীর দর্শন পেয়েছেন :

“কে মোরা জাএত দুরহুক দূর।
সহস সৌতিনি বস মাধুরপুর ॥
অপনহি হাথ চললি অছ নীধি।
জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি ॥
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চান্দ কুমুদ দুহু দরসন ভেল ॥” [৫৬৮]

কৃষ্ণলাভহেতু গোপীদের কাত্যায়নী ব্রতের কথা ভাগবতে আছে; “অনয়ারাধিতো” শ্লোকেও আরাধনার উল্লেখ পাই। কিন্তু “জুগ দস জপল” জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিরহিণী রাধা সম্বন্ধে সখীর উক্তিকেই স্মরণ করাবে “হরি হরি হরি হরি জপতি সকামম্”। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও রাধার আকুল জিজ্ঞাসা ছিল, “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে।” যাঁরা কৃষ্ণনাম-জপের উল্লেখে বাঙ্লার আদি অকৃত্রিম চণ্ডীদাসের পাশাপাশি আর একজন দ্বিজ চণ্ডীদাসকে[১] খাড়া করার প্রয়োজন

১ “দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে একজন স্বতন্ত্র কবি শ্রীচৈতন্যের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা তাঁহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরমভক্ত কবি ছিলেন। “সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটি তাঁহারই রচনা; কেন না, ইহাতে দেখা যায়, রাধা শুধু ‘পিরিতি’তে আকুল নহেন, তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের মত নাম জপ করেন”
‘চণ্ডীদাসের পদাবলী’, ড° বিমানবিহারী মজুমদার-কৃত ভূমিকা, দ্র° পৃ° ৩৭

বোধ করেন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রেও যে তাঁদের যুক্তি অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়ে যাবে তা বিদ্যাপতির "জুগ দস জপল" কথাটিতেই তো অভ্রান্তভাবে নির্দেশিত। কৃষ্ণের জন্য রাধার এই জপসাধনার ইংগিত শ্রীচৈতন্যের বহুপূর্ব-যুগের সাধক জয়দেবেই প্রথম আভাসিত হয়ে পরে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে স্পষ্টীভূত হয়েছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলী একান্তভাবেই লৌকিক কাব্যসাহিত্যের অঙ্গীভূত ছিল মাত্র, আর চৈতন্যাবির্ভাবের পরেই শুরু হলো এ-সাহিত্যের 'দেবায়ন', এরূপ একটি মিথ্যা ধারণা এইভাবেই খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। "বৃন্দাবন কাহ্নু ধনি তপ করই" [৫৪০]—চৈতন্যেরও বহুপূর্বে বিরহের হোমানলে তাই বৃন্দাবনের ধনিকে কৃষ্ণপ্রেম-তপস্যায় লীন হতে দেখছি বিদ্যাপতির পদেই। আবার শ্রীচৈতন্যদেবকে যে-বিলাসবৈবর্তের মূর্ত বিগ্রহ বলে দাবী করেন বৈষ্ণব রসিকসমাজ, সেই বিলাসবৈবর্তেরও একটি চূড়ান্ত প্রকাশ বিদ্যাপতির পদেই মেলে :

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব সভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবুধাঈ॥

মাধব, অপরূপ তোহারি সিনেহ।
অপনে বিরহ অপন তনু জর জর
জিবইতে ভেল সন্দেহ॥

ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রটইত
আধা আধা কহু বানি।

রাধা সযেঁ জব পুনতহি মাধব
মাধব সযেঁ জব রাধা।
দারুন প্রেম তবহি নহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা।

দুহু দিশে দারুদহনে জৈসে দগধই
আকুল কীট পরান।

ঐসন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥" [৭৫১]

পদটি আদৌ বিদ্যাপতির কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের সীমা নেই। উক্ত বিতর্কে প্রবেশ না করে এইমাত্র বলা চলে, পদটি বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার পক্ষেও শ্লাঘনীয়। আর "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মধাঈ" অংশের বিলাসবৈবর্ত তো ভাগবত-জয়দেব বাহিত পথেই বিদ্যাপতির পদসংগমে মিশেছে। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপীরা কৃষ্ণ-অন্তর্ধানে কৃষ্ণবিরহে নিজেদেরই কৃষ্ণ বলে মনে করে প্রিয়ের ভাবে বিভাবিত অন্তরে তাঁরই বিবিধ লীলানুকরণ করেছিলেন। জয়দেবের কাব্যেও কৃষ্ণের অনুরূপ বসনভূষণ ধারণে "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা" রূপে বা 'আমিই কৃষ্ণ' এরূপ ভাবনায় বাসকসজ্জিকা রাধাকে দেখতে পাই। সুতরাং বলতে হয়, দীর্ঘকালের ঐতিহ্যক্রমেই বিদ্যাপতি লিখতে পেরেছেন,

"রাধা সয়েঁ জব পুনতহিঁ মাধব
মাধব সয়ে জব রাধা।"

আর এই একই ঐতিহ্যক্রমে রায় রামানন্দ যখন স্বরচিত পদে গেয়ে ওঠেন,

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥"

তখন বিলাসবৈবর্তের মূর্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের পক্ষে নিরুপাধি প্রেমে রায় রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করা সম্ভব হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলে বলতেই হবে, গোদাবরীতীরে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎলাভের পূর্বেই রায় রামানন্দ এপদ রচনা করেছিলেন। তাহলে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞার অধিকারী কবি বিদ্যাপতির পক্ষেই বা "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মধাঈ" রচনা করা এমন কি অসম্ভব? এ-পদ চৈতন্যসাক্ষিক কোনো কবির রচনা, পরে বিদ্যাপতির নামে চলে এসেছে, এ কথা মেনে নেওয়ার চেয়ে বোধ করি এই বলাই সংগত হবে, চৈতন্যের তদ্‌ভাবিত চিত্তে রসানুকূলতা সাধন করেছে বলেই ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণামৃতের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রায় রামানন্দের কবিকৃতিও তাঁর কৃষ্ণবিরহদশায় সুধাসঞ্জীবনী হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি মনে পড়ছে:

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"[১]

বিদ্যাপতির পদে ভারতীয় ভক্তিসম্পদের ঐতিহ্য যে কিরূপ যত্নে রক্ষিত, তার দ্বিতীয় উদাহরণ তাঁর প্রার্থনার পদত্রয়[২]। এরা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ব্যক্তিজীবনের অন্তস্তলে বিকশিত তিনটি অমল পদ্ম। তথাপি বিদগ্ধ-কবি বিদ্যাপতির আলোচ্য তিনটি পদে ঐতিহ্যের অনুসৃতিও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। উদাহরণ হিসাবে ভাগবতের প্রভাবই তো নির্দেশ করা যায়। বিদ্যাপতি ব্যর্থজীবনভার জীবনস্বামীর চরণে নিবেদন করে বলেছিলেন :

"আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা ॥" [১৬৩]

মুহূর্তে ভাগবতে শৌনকের আক্ষেপোক্তি মনে পড়ে যাবে :

"মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ ॥"[৩]

তাৎপর্য, অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি হরিভজনে অলস ব্যক্তিদের আয়ু নিশীথে নিদ্রায় ও দিবাভাগে বৃথাকর্মে ব্যয়িত হয়ে যায়।

কর্মবিপাকে যে-যোনিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, হরিপ্রসঙ্গে মতি থাকে যেন এই ছিল কবি বিদ্যাপতির প্রার্থনা :

"কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগত পুনপুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥" [১৬৫]

---

১ চৈ, চ, মধ্য। ২

২ মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থ থেকে পদ তিনটির প্রথম চরণগুলি উদ্ধৃত হলো :

ক. "তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম" ১৬৩

খ. "জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ" ১৬৩

গ. "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়" ১৬৫

৩ ভা° ১।১৬।৯

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিতের প্রার্থনাও ছিল অনুরূপ। প্রমাণ-স্বরূপ পরীক্ষিতের বক্তব্যের অংশবিশেষ স্মরণীয়: "পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু। মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং"[১]—আমি যে যে জন্মলাভ করবো, সেই সকলজন্মেই যেন ভগবান্ অনন্তে রতি থাকে এবং যেন তাঁর আশ্রিতজনের নিবিড় সঙ্গ লাভ করি। কোনো সন্দেহ নেই, ভাগবতের "ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ" বিদ্যাপতির পদে হয়েছে "মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ"। বিদ্যাপতির জীবনে ভাগবতের অনুলিপি-প্রস্তুতের ঘটনাটি তাৎপর্যহীন বলে তাই মনে হয়না। উদ্ধবের হরিপাদপদ্মাশ্রয়ের মতো বিদ্যাপতিরও শরণাগতিলাভ ঘটেছে গোবিন্দপদেই:

"এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়।
তুঅ পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥" [৭৬৪]

বিদ্যাপতির পরে চণ্ডীদাসের কাব্যে ঐতিহ্যানুসরণের প্রসঙ্গ উঠবে। পদাবলীর চণ্ডীদাস কোন্ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাসই কিনা অথবা ভিন্ন, ইত্যাকার সমস্যায় পথিভ্রান্ত না হয়ে এইমাত্র বলা যায়, পদাবলীর চণ্ডীদাস যিনিই হোন না কেন এবং যে-যুগেরই কবিপুরুষ, তাঁর কাব্যে আক্ষরিক প্রমাণযোগে পুরাণিক প্রভাব আবিষ্কার সত্যই কষ্টসাধ্য। অবশ্য ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তর বাহিত ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম নির্যাসে তাঁর কাব্যও কম অনুবাসিত নয়। উদাহরণ-স্বরূপ ভাগবত-গীতগোবিন্দ-কৃষ্ণকর্ণামৃত কথিত বংশীমহিমাকে কবি চণ্ডীদাস বাঙালী কুলবধূর জীবনে যে অভিনব প্রতীকব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা তাঁর পদাবলীর উদ্ধৃতিযোগেই আস্বাদন করা চলে:

"বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ॥

১. ভা° ১।১৯।১৬

কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥"[১]

চণ্ডীদাসের পদে "নাটের গুরু কালা"র "বিষম বাঁশী" শুনে "পুলকিত হয় তরু লতাগণ," আর ভাগবতেও তাদের একই অবস্থা: "বেণুস্বনৈঃ··· পুলকস্তরূণাং"[২]। চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব, তিনি ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেও এক অদ্বিতীয় কবিভাষার জনক হয়ে উঠেছেন। "কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে। পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥" কুলবধূর জীবনে "বিষম বাঁশীর" অমোঘ আকর্ষণের এই তীব্রতম উৎপ্রেক্ষাসৃষ্টিতে চণ্ডীদাস কবিপ্রতিভার সর্বসর্ত পালন করেছেন। "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ" যার, সেই বাঙালী বধূরই যেন দ্বিতীয়মূর্তি চণ্ডীদাসের পদাবলী, বাঙালীর অন্তর্লোক থেকে তা বাঙ্‌লা বুলিকে আশ্রয় করেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এসেছে বেরিয়ে। সংস্কৃত পুরাণের নক্ষত্রলোক নয়, বাঙ্‌লাদেশের ধূলিমাটি তৃণপল্লবই সেখানে অধিক স্পৃষ্ট। 'গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা' বা 'প্রবাস'-পরিকল্পনা, এই তো চণ্ডীদাসের পুরাণগ্রহণের দু'চারটি ক্ষেত্র। আসলে বাহ্য ঘটনা তাঁর কাব্যে গৌণ; মুখ্যবস্তু মানবহৃদয়—কাব্যের যা অন্যতম মৌলিক উপাদান। তুলনায় চৈতন্যপরবর্তী দীন চণ্ডীদাসে যতটা পুরাণ-আনুগত্য দেখা দিয়েছে, ততটাই কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখা দেয়নি। দীন চণ্ডীদাস গোষ্ঠ-রাসলীলা-অক্রুর-আগমন ইত্যাদি ভাগবতীয় ঘটনাবিবরণের নৈষ্ঠিক অনুবর্তনে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু কোথাও পদাবলীর বিখ্যাত চণ্ডীদাসের মতো ঐতিহ্যের মোহানামুখে মৌলিক কবিকল্পনার শোভাশ্যাম ব-দ্বীপ সৃষ্টি করতে পারেননি। এর দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, মহৎ-প্রতিভার ঐতিহ্যবরণ যেখানে নূতন কাব্যস্বর্গ রচনার সহায়ক, স্বল্পক্ষমতার পুরাণ-গ্রহণ সেখানে শুধুই বস্তুগত অনুকৃতি। চৈতন্যবর্তী ও চৈতন্যপরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা-গণের আলোচনা প্রসঙ্গে সূত্রটি স্মরণ রাখতে হবে। বিশেষত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কাব্যে ভাগবতগ্রহণ যখন আনুমানিক মাত্র, চৈতন্য-বর্তী ও পরবর্তী বৈষ্ণব কবিকুলের পদসাহিত্যে ভাগবত-অঙ্গীকার তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা মনে করি, চৈতন্য-বর্তী ও পরবর্তী এই দুই কালখণ্ড বাঙ্‌লাদেশের

১ 'চণ্ডীদাসের পদাবলী.' ড° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পদ ৪১

২ ভা' ১০।২১।১৯

ইতিহাসে ভাগবতানুশীলনের স্বর্ণযুগ রূপে স্বীকৃত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ছিলেন এই ভাগবতচর্চার কেন্দ্রীয় পুরুষ। তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামী-সহ বঙ্গদেশীয় অগণ্য বৈষ্ণব পণ্ডিত ভাগবতানুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বাঙালীর এই ভাগবতাস্বাদ গ্রহণ শুধু সংস্কৃত কাব্যনাটক টীকাদি রচনায় বা রসশাস্ত্র প্রণয়নেই সার্থক হয়নি, পদাবলীসাহিত্য সৃষ্টিতেও সফল হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, মূলত ভাগবতাশ্রয়ে রচিত বৈষ্ণবাচার্যগণের কাব্য-নাটক-টীকা-রসশাস্ত্র ইত্যাদির প্রভাবেও আবার পুষ্ট হয়েছে বৈষ্ণবীয় পদসাহিত্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা চৈতন্য-পরবর্তী যুগে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সমসাময়িক কবিবৃন্দের কথাই স্মরণ করতে পারি। চৈতন্য-পরবর্তী বঙ্গদেশে আর একবার ভাগবতচর্চার প্লাবন এনেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। তিনি ষড়্গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের ছিলেন প্রিয়শিষ্য এবং "দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" রূপে ভক্তসমাজে হয়েছিলেন সমাদৃত। চৈতন্যচরিতামৃতের আদেষ্টা হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধনদীপিকায় "শ্রীনিবাসাচার্যকৃত চতুঃশ্লোকী টীকা"র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। হরিদাস দাস বাবাজী বৃন্দাবনের রাধা-দামোদর গ্রন্থাগারে ৪২৭ সংখ্যক পুঁথিতে শ্রীনিবাস-কৃত এই "চতুঃশ্লোকী"-ভাষ্য আবিষ্কারও করেছেন। আর এও তো সর্বজনবিদিত ঘটনা, মল্লভূমের অধিপতি হাম্বীরকে শ্রীনিবাস ভ্রমরগীতার ব্যাখ্যায় মুগ্ধ করেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে প্রথমবার তাঁর আনীত গ্রন্থাবলীর মধ্যেও তাঁর প্রগাঢ় ভাগবত-রসরসিকতার পরিচয়ই স্পষ্ট। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, হরিভক্তিবিলাস লীলাস্তব, বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, লঘু-ভাগবতামৃত, স্তবমালা, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, মথুরামাহাত্ম্য গীতাবলি, কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি, বৃহৎ ও লঘু রাধাকৃষ্ণগণো-দ্দেশদীপিকা, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, দানকেলিচিন্তামণি, স্তবাবলী, মুক্তাচরিত্র, গোবিন্দলীলামৃত। এ-গ্রন্থগুলি প্রধানত ভাগবতকথারই প্রস্রবণ-মুখে উৎসারিত বিভিন্ন নগনদী মাত্র। এক উজ্জ্বলনীলমণিতেই তো ভাগবতীয় শ্লোক বিচিত্র রসপ্রকরণের উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে সাতচল্লিশবার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের প্রধান পাঁচটির অন্যতম "ভাগবত শ্রবণ"। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসেও ভাগবত শাস্ত্রমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সনাতন-কৃত বৈষ্ণবতোষণী ভাগবতীয় লীলাতত্ত্বেরই

রসভাষ্য। উদ্ধবসন্দেশও ভাগবতের বিশিষ্ট লীলার রসপারক্রমা। এ ছাড়া লীলাস্তব-স্তবমালা-গীতাবলীর মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী ভাগবতীয় প্রেম-সৌন্দর্যে কল্পনাসৌরভে অনুবাসিত। সুতরাং আলোচ্য অমূল্য গ্রন্থরাজিকে সযত্নে সংগ্রহ করে এনে শ্রীনিবাস আচার্য যে বাঙলাদেশের কবিকুলকে ভাগবতীয় ভাবপ্লাবনে নূতন করে আপ্লুত করে তুললেন, তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য গোবিন্দদাসের পদাবলীই তো তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এযুগের অপর বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তমদাসও ছিলেন ভাগবত-রসের রসিক, ভাবের ভাবুক। তাঁর শিষ্যসমাজের মধ্যে অগ্রগণ্য বসন্ত রায়, বল্লভদাস, উদ্ধব দাস প্রমুখের পদাবলীও ভাগবতীয় ভাবসৌরভে নিষ্ণাত। এক্ষেত্রে পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির প্রমাণযোগেই আমাদের বক্তব্য বিশদীভূত হবার অপেক্ষায় আছে। সংগ্রহগ্রন্থগুলির মধ্যেও আবার বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'ই আমাদের পরম সহায়। পদকল্পতরুর বিচিত্র-শাখায়িত রস-কল্পনার গভীরে আমাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করতে গিয়ে পদকল্পতরুর আধুনিক সম্পাদক যে গূঢ় সাবধানবাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন, প্রসঙ্গত সেটি মনে না রেখে উপায় নেই :

"পদাবলী-পাঠক সর্বদা স্মরণ রাখিবেন—বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে অবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি—এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না।"[১]

আমরা তো জানি, ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনার উপান্তে এসে শুকদেব পরীক্ষিতের সংশয় নিরসন করে বলেছিলেন, 'শ্রদ্ধান্বিত' ও 'ধীর' ব্যক্তিই এই দুরবগাহ রহস্যলীলায় প্রবেশ করে চিরতরে কামাদি হৃদ্রোগ বিনির্মুক্ত হন। চৈতন্য-সাক্ষিক পদাবলী-সাহিত্যের আস্বাদনেও 'অধিকারী' ভেদ আছে বৈকী। পদাবলী-সাহিত্য একটি বিশিষ্ট ঐ[illegible] বাতাবরণে সৃষ্ট। কবির আপন মনের মাধুরী মিশায়ে প্রাকৃত জগৎ ও জীবনের যে বিচিত্র রূপ আধুনিক গীতিকবিতার মধ্যে আমরা পাই, বৈষ্ণব পদাবলীতে তা অনুপস্থিত। সেখানে

১ 'পদাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত্ব,' পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ° ২০৪

কবির ভক্তমানসই মুখ্য। আর কবির ব্যক্তিনিরপেক্ষ জীবন ও জগতের একটি অপরূপ রসভাষ্য সেখানে কাব্যরূপে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। বিশ্বসৃষ্টির পরমসুন্দর বৃন্দারণ্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নরবপুধারী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরই হ্লাদিনীশক্তির ঘনীভূত রূপ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার যে অলৌকিক নিত্যপ্রেমলীলা, তারই আনন্দিত শিল্পরূপ বৈষ্ণব পদাবলী। পদকর্তার মানসদর্পণে সেই অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষীভূত হয় মাত্র। তিনি লীলাশুকের মতো সেই লীলার ভাষ্যকার। বস্তুত, বৈষ্ণব কবির এই "নিশিতা দুরত্যয়া" ভাবসাধনার নিগূঢ় মর্ম অন্তত আংশিকভাবেও হৃদয়ঙ্গম না করলে পদাবলীর "ক্ষুরস্য ধারা"য় চিত্তার্পণ করতে পারবো না আমরা।

একথা সর্বজনবিদিত, দ্যুলোক-ভূলোক-বিহারিণী কবিকল্পনা নিত্যই বিচিত্র-বিষয়িণী। বাঙ্‌লার পদাবলী সাহিত্যের কিন্তু একমাত্র উপজীব্য 'প্রেমভক্তি', ভাষান্তরে 'কৃষ্ণরতি'। তথাপি এই এক ও অদ্বিতীয় বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবির স্বেচ্ছাবিহারিণী প্রতিভা প্রেমের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে লঘুপক্ষ বিস্তার করে উপলব্ধির অতিসূক্ষ্ম তারতম্য ও আবহের অসামান্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ, আধেয় এক হলেও আধারের বিভিন্নতাবশত এক প্রেমই 'বহুস্যাম্' হয়ে বিবিধ-বিষয়িণী পদাবলীর অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। তাই দেখি, গৌর-পদাবলী, রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী, ভজন-বা প্রার্থনা পদাবলী এবং সাধন-মূলক পদাবলী, মোটামুটি ভাবে এই সামান্য তিন চারটি বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও পদসাহিত্য এমন আকর্ষণীয়। এক্ষেত্রে বাঙ্‌লাবুলির মাধুর্য এবং ব্রজবুলির ললিত সৌন্দর্যও পদাবলীর অপূর্ব রসান্তঃপুর রচনায় অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে। এই বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলির যুগলধারায় উৎসারিত পদসাহিত্যের যা মুখবন্ধস্বরূপ তথা 'প্রবেশ চাতুরী সার' সেই গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি 'ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য' অধ্যায়েই আমরা সম্যক্ আস্বাদন করেছি। এখানে তাই মূলত রাধাকৃষ্ণ পদাবলীই আস্বাদিত হবে। এ শ্রেণীর পদাবলীতে আবার প্রথমেই স্থান পেয়েছে নরবিগ্রহে বিলাসরত কৃষ্ণ-রাধার জন্মোৎসবলীলা। তারপরই স্মরণীয় বাল-গোপালের ব্রজধামে শুক-বন্দিত অর্ভকলীলা। এ-লীলার অন্তর্গত হয়ে আছে বালগোপালের নৃত্য, মৃত্তিকাভক্ষণ, যশোদাকর্তৃক বিশ্বরূপ-দর্শন, ননীচৌর্য্য, উদূখলবন্ধন, যমলার্জুনভঙ্গ, ব্রহ্মমোহনলীলা, ফলক্রয়, গোষ্ঠলীলা, বন-ভোজন। পৌগণ্ডলীলার অন্তর্ভুক্ত কালিয়দমন, নন্দমোক্ষণ। ভাগবতীয়

কৈশোরলীলার মুকুটমণি শারদরাস পদাবলীসাহিত্যেও ছন্দ-স্পন্দে ভাব-গভীরতায় অনবদ্য। রসিকের দৃষ্টিতে, শারদরাসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভবের যে-পূর্ণবিকাশ, গোবর্ধন ধারণের দিনে তারই উষাভাস। সে-দিনই অভিষেক ও পূর্বরাগ, এরপর গোষ্ঠে রাধার সঙ্গে মিলন। এতাবধি নায়ক-পক্ষে লীলাবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। নায়িকাপক্ষেও তার অভাব নেই। বস্তুত পদাবলীর নায়িকা বিচিত্ররূপিণী—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। এই বিচিত্ররূপিণী-হ্লাদিনীপরতন্ত্রা রাধার সঙ্গে পরমপুরুষের নিত্যতরঙ্গিত লীলায় মান ও মানভঙ্গ, কুঞ্জমিলন, রসালস এবং রসোদ্গারও বিশিষ্ট পর্যায় হয়ে আছে। আর ভাগবত-বহির্ভূত লীলারঙ্গে আছে দান, নৌকাবিলাস, ঝুলন, হোলি। ভাগবতীয় শারদরাসের সঙ্গে সঙ্গে গীতগোবিন্দীয় বাসন্তরাসও স্মরণীয়। মিলনের মতো বিরহলীলারও নব নব পর্যায়। এক বিরহই কখনও ভাবী, কখনও ভবন্, কখনও আবার ভূত হয়ে ধরা দিয়েছে পদাবলীসাহিত্যে। অতঃপর সখীর দৌত্য, রাধার বারমাস্যা। এগুলিও মূলত শাস্ত্রবহির্ভূত কবিকল্পনা। কিন্তু মাথুরপালার আসরেই তো বৈষ্ণব কবি গানভঙ্গ করেন নি। বিরহের পূর্বমেঘ যেখানে 'জগতের নদীগিরি সকলের শেষে' উত্তরমেঘ হয়ে নিত্যমিলনভূমিকে করেছে স্পর্শ, সেখানে বৈষ্ণব কবি হৃদয়ের গুপ্ত নিকুঞ্জভবনে রাধাকৃষ্ণের যুগল চরণ আপন বক্ষে ধারণ করে আনন্দাশ্রুসজল কণ্ঠে গেয়েছেন ভাবোল্লাস-আত্মনিবেদনের পদাবলী। শুধু তাই নয়, অষ্টকালীয় লীলার ধ্যানে তাঁরা রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলাকেই করেছেন কণ্ঠভূষণ।

এই যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমনাট্যলীলার সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভাখ্য বিভিন্ন দৃশ্যাবলী এগুলি মোটামুটিভাবে ভাগবতানুগতই বলতে হয়। কিন্তু পদাবলীর অন্তর্নিহিত স্বরূপের সঙ্গে ভাগবতের মূলগত স্বরূপের কিছু কিছু পার্থক্যও লক্ষণীয়। প্রথমত, পদসাহিত্যে রাধাই হলেন কেন্দ্রস্থ পদ্মবীজকোষ, তাঁকে ঘিরেই পদাবলীর আনন্দভুবন শতদলের মতো এক একটি লীলাপর্যায়কে বিকশিত করে তুলেছে। আর রাধানুগতা সখী ভূমিকায় পদকর্তার কখনও তাড়ন-ভর্ৎসন-সমবেদন-সান্ত্বন-সেবনও সত্যই অভিনব। ভাগবতের সঙ্গে পদাবলীর আর একটি বড়ো বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে ঐশ্বর্য-ভাবনার তর-তমে। ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে,"ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবাদধৌ'.

—ভারহরণার্থে তাঁর অবতরণ; সাধু ও দুষ্কৃতের যথাক্রমে "ক্ষেমায় বধায়" তাঁর নরবপুস্বীকার। ভাগবতে অসুরবধের তাই এত ঘনঘটা। অবশ্য রাসলীলায় মাধুর্যের চরমসীমায় শুকদেব এ-কথাও বলেছেন :

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"[১]

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশত অনুষ্ঠিত এই বিভিন্ন "ক্রীডার" উল্লেখে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপক্ষও স্বীকৃত হলো। প্রসঙ্গত পদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধারযোগ্য : "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"। উভয়ক্ষেত্রেই কৃষ্ণের ভক্তবিনোদন লীলার প্রকাশ, আত্মবিনোদন লীলার নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মসাহিত্য কৃষ্ণলীলার এই ঐশ্বর্যলবলেশটুকুও পরিত্যাগ করেছে। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি, নিত্য ও প্রকট উভয় লীলাপ্রসঙ্গেই কৃষ্ণের নরবপু-ধারণের কারণ-স্বরূপ রাধার প্রেমাস্বাদনকেই মুখ্য কারণ বা অন্তরঙ্গ হেতু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥"[২] শ্লোকে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যশূন্য মাধুর্যমূর্তিই উজ্জ্বলতর। মথনদণ্ডের অবিশ্রান্ত আবর্তনে দুগ্ধ নবনীতসারে পরিণত হয়, পদকর্তার ঐকান্তিক আগ্রহে শক্তিময়-প্রেমময় কৃষ্ণও পদাবলীসাহিত্যের মধুরৈকসর্বস্ব কিশোর-কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। পদাবলীতে ভাগবতীয় সমুদয় ঐশ্বর্যলীলার এই স্বরান্তর সকৌতুকে লক্ষ্য করার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার দ্বারাই আলোচনাটির সূত্রপাত করা চলে। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের পটভূমিকা ধ্রুপদী। "অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ"—অতঃপর সর্বগুণোপেত পরমশোভন কাল উপস্থিত হলো। সেই সঙ্গে রোহিণী উদিত হয়, আর শান্ত হয়ে আসে অশ্বিনী। দেবকী-ক্রোড়ে জ্যোতির্ময় শিশু আবির্ভূত হন। বসুদেব অকরুণ কংসের কোপ থেকে রক্ষা করতে সেই নবজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করে যাত্রা করলেন। রবির উদয়ে অন্ধকার বিমোচনের মত সব দ্বার গেল উন্মুক্ত হয়ে। বাইরে ঘনতমসাবৃত অম্বরধরণী। দুর্যোগপূর্ণ নিশায় "ভয়ানকাবর্তা শতাকুলা নদী" যমুনা পার হয়ে যেতে শেষনাগ তার ফণাবিস্তার করে শিশুদেহে বারিবর্ষণ নিবারণ করলেন। ভগবানের আদেশে ইতোমধ্যে অন্যপারে গোকুলে ভূমিষ্ঠা

১ ভা° ১০।৩৩।৩৬ ২ চৈ, চ, মধ্য। ৮

হয়েছেন যশোদা-কন্যারূপিণী যোগমায়া। শিলাপট্টে কংস তাঁকেই উন্মুলিত করতে চাইবেন।—এককথায় সমগ্র পরিবেশটি ঘনীভূত আশঙ্কাপূর্ণ এবং দৈবসংকেতে নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময়।

পদাবলীতে এই ধ্রুপদী পরিমণ্ডল কোথাও গৃহীত হয়নি। বিস্ময়কর, কোনো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভা কৃষ্ণের জন্মলীলার প্রতি আকৃষ্ট হননি। বোধকরি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যবশত কৃষ্ণের নিত্যলীলায় বিশ্বাসী পদকর্তা কৃষ্ণ-'জন্মে'র প্রসঙ্গে আগ্রহহীন। অবশ্য নিত্যলীলায় বিশ্বাস ভাগবত থেকেই বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে সঞ্চারিত। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণজন্মের প্রতি পদাবলীকারের অনুৎসাহের যুক্তি মাধুর্যরসৈকপ্রবণতা ছাড়া আর কি হতে পারে। কৃষ্ণের অনুসরণে রাধার জন্মোৎসব বর্ণনাতেও ভাগবতের নয়, ভাগবতেতর কৃষ্ণকথার প্রভাবই জয়ী।

অতঃপর নন্দোৎসব। পদকল্পতরু-ধৃত ভক্ত শিবাইয়ের কৃষ্ণের জন্মলীলার মানবিক-রসে সঞ্জীবিত পদটিই তো উদাহণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে :

'জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপানন্দ অভিনন্দ আনন্দ নন্দন নন্দ
পঞ্চ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপসব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লইয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥"

শুধু তাই নয়,

"দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥"[১]

ভাগবতে এই নন্দ-মহোৎসবের বর্ণনা পাই দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে। শেষোক্ত চরণটির চিত্র সেই পৌরাণিক দৃশ্য থেকেই আহরিত :

"গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীর ঘৃতাম্বুভিঃ
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥"[২]

অর্থাৎ, গোপগণ পরমানন্দে / দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, নবনীত প্রভৃতি পরস্পর

---

১ দ্র° পদকল্পতরু, ৩য় শাখা, ১৮শ পল্লব ২ ভা° ১০।৫।১৪

পরস্পরের অঙ্গে লেপন করে পরস্পর পরস্পরকে পিচ্ছিল পঙ্কে নিক্ষেপ করতে লাগল।

ভাগবতের চিত্রটিতে গোপবৃন্দের আনন্দের অভিব্যক্তি খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। বিপরীত পক্ষে পদাবলী-প্রদত্ত নৃত্যপর নন্দের চিত্র কিঞ্চিৎ আতিশয্য-দুষ্ট। ভাগবতে নন্দ-বসুদেব-সংবাদে শুনেছি, অধিক বয়সে পুত্রলাভ করে নন্দ নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পুত্রমুখদর্শনের সে-আনন্দ ছিল একান্ত ভাবেই সংযত ও আভিজাত্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে পদাবলীতে কৃষ্ণ-জন্মলীলার আনন্দকাকলি লোকজীবনেরই অকৃত্রিম হর্ষোচ্ছ্বাস হয়ে উঠেছে।

এরপর "বাৎসল্যং কৌমার-কালোচিতং যথা"। এক্ষেত্রে বালগোপালের নৃত্যমাধুরী ও মৃত্তিকাভক্ষণলীলা প্রথমেই স্থানলাভ করেছে। গৌরচন্দ্রের প্রসিদ্ধ নৃত্যকলাই পদাবলীতে কৃষ্ণচন্দ্রের অপূর্ব নৃত্যচ্ছন্দের প্রেরণা হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও শিশুমুখে যশোদার বিশ্বরূপ-দর্শনের প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবি অবশ্য একান্তভাবেই ভাগবতানুগত। উদ্ধবদাসের অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণনাটির অংশবিশেষ স্মরণ করা যায়:

"বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥
নিজ- প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণমাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥"[1]

১ পদকল্পতরু ১১৪৪

তুলনীয় ভাগবতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকত্রয় :

"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥
এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকাল-স্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মনমবাপ শঙ্কাম্ ॥"[১]

"নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে। দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে ॥" এবং "সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মনমবাপ শঙ্কাম্" দুইই অভিন্ন। কিন্তু বৈষম্য ঘটেছে ঘটনায় নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। ভাগবতকার "কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া" ভাবিতা বিহ্বলা যশোদা প্রসঙ্গে বলছেন, অতঃপর যশোদা নারায়ণের চরণে শরণাগতা হলেন :

"অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥"[২]

যশোদা বলছেন, চিত্ত মন কর্ম ও বাক্যের দ্বারা যিনি যথার্থত তর্কের বিষয়ীভূত হন না, যিনি বিশ্বের আশ্রয়, এবং যাঁর প্রেরিত ইন্দ্রিয়শক্তিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতেই সব কিছু জ্ঞানগোচর হয়, সেই সুদুর্জ্ঞেয় পরমপুরুষের চরণে প্রণাম।

বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত যশোদা-স্তব ঐশ্বর্যভাবনাশিথিল হয়ে পড়েছে। যশোদার শেষ প্রতিক্রিয়াও অনুরূপ ঐশ্বর্যমিশ্র—হরি মায়া বিস্তার করলেন, ফলত তাঁর পূর্বস্মৃতি লোপ পেল, তিনি পুনরায় পুত্রস্নেহে অভিভূতা হলেন, ইত্যাদি।

এই 'অলৌকিক' 'আশ্চর্যজনক' ঘটনাগুলির তুলনায় পদাবলীর ঘটনা-বিবরণ নিতান্ত লৌকিক বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত হয়েই জীবনানুগ, সহজসুন্দর। বস্তুত সেই বিশুদ্ধ মাধুর্যের বৃন্দারণ্যে 'ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে'র স্থান মাত্র নেই। তাইতো পদকর্তা বলেন :

"নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥

১ ভা' ১০।৮।৩৭-৩৯ ২ ভা' ১০।৮।৪১

ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজেশ্বরীর প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥"[১]

শুধু "ব্রজেশ্বরীর প্রেম" নয়, সর্বস্তরের ব্রজপ্রেমই পদকর্তার দৃষ্টিতে "কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম"। আমরা পূর্বে বলেছি, কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবনার অভাববশত জন্মলীলার ঐশ্বর্যবহুল মহাকাব্যিক পরিবেশ পদাবলীতে যথোচিত মর্যাদালাভ করেনি। আমাদের মতে, এটি পদাবলীর মহদ্‌দোষ। আবার এখানে এসে সেই মহদ্‌দোষই ঐশ্বর্যনিষ্কাশনের মহদ্‌গুণ হয়ে উঠেছে। 'জাম্বুনদ হেম'ই পদাবলীর পদে পদে আস্বাদনীয়। কৌমার-পৌগণ্ড-কালোচিত বাৎসল্যলীলার অনুস্মরণেও তাই নৃত্যপর বালগোপালের মোহনমূর্তিই পদকর্তার তদ্‌ভাবিত চিত্তে এমন মর্মস্পর্শী রেখাঙ্কন করে যায়:

"ধাতু প্রবাল-দল নব গুঞ্জাফল
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুঙ্গুর বাজে॥
নাচত মোহন বালগোপাল।
বরজ-বধূ মেলি দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল॥
নন্দ সুনন্দ যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশি কহই সব ব্রজ-রমণীগণ
আনন্দ-সায়রে ভাস।
হেরইতে রেশিতে লালন করইতে
স্তন-খিরে ভীগল বাস॥"[২]

নৃত্যপর বাল-গোপালের বর্ণনা ভাগবতেও আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুকভাষণ:

---

১ তরু ১১৪৪ ২ তরু ১১৫৪

"গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥"[১]

এখানে 'ভগবান'কে আমরা করতালির দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে কখনো বালবৎ নৃত্য করতে দেখছি, কখনো আবার সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠপুত্তলীর মতো গোপীদের বশীভূত হয়ে মুগ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করতেও দেখছি, কিন্তু তবু শুক-ব্যবহৃত 'ভগবান' শব্দের সম্ভ্রমসংকোচে বাৎসল্যরসের যে কিছু হানি ঘটেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। অবশ্য নবনীতহরণ ও যশোদাতাড়নের বর্ণনায় যুগপৎ ভাগবত ও পদাবলী স্বতঃ-উৎসারিত।

একদা গৃহদাসীরা কর্মান্তরে নিযুক্ত থাকায় নন্দগেহিনী যশোদা নিজেই দধিমন্থন করছিলেন। দধিমন্থনকালে তিনি কৃষ্ণের নানা বাল্যচরিত গান করায় স্নেহরসে অভিসিক্ত হচ্ছিল তাঁর বক্ষ, শ্রমভারে স্খলিত হচ্ছিল তাঁর কবরীমাল্য। এমন সময় ক্ষুধার্ত বালকপুত্র এসে স্বহস্তে মথনদণ্ড নিবারণ করে মাতৃসুধা পান করতে থাকেন। বালকের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়নি, অথচ ওদিকে চুল্লাস্থ দুগ্ধ উথলিত হয়ে ওঠে। পুত্রকে অতৃপ্ত রেখেই শশব্যস্তে যশোদা গাত্রোত্থান করলেন। ক্রুদ্ধ বালকও যত্র তত্র দধিভাণ্ড চূর্ণ করে ফেরে, নবনীভক্ষণ ও নিক্ষেপ করতে থাকে। যশোদা পুত্রের এই আচরণে গোপনে হাস্য করেও বাহ্যত যষ্টিহস্তে ধাবমানা হলেন। উদূখল থেকে অবতরণ করে কৃষ্ণও ভীতবৎ পলায়নপর হন। ভাগবতকার বলছেন, নির্বিকল্প সমাধিরূঢ় যোগীরাও পরম একাগ্রতা সত্ত্বেও যাঁর চরণ স্পর্শ করতে পান না, সেই কৃষ্ণকে ধরবার জন্য যশোদা পশ্চাৎ ছুটে চললেন। অবশেষে কৃতাপরাধ রোরুদ্যমান, বামহস্তে কজ্জলব্যাপ্ত-নয়ন মার্জনে রত, মাতৃমুখে বারংবার ভীতদৃষ্টিসঞ্চারণপর কৃষ্ণের প্রতি মমত্ববশত তিনি হস্তস্থিত যষ্টি ত্যাগ করে রজ্জুদ্বারা তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইলেন। এর পরের ঘটনা দামোদর-লীলা ও যামলার্জুনভঙ্গ ভাগবতপাঠকের অতিপরিচিত। এখানে আমরা শুধু দামোদরলীলার সূচক-শ্লোকে যশোদার প্রতি ব্যবহৃত বিস্ময়কর অভিধাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: "ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভক-বৎসলা"—"অর্ভকবৎসলা", অর্থাৎ "বালকমাত্রে পরমবাৎসল্যবতী"—কৃষ্ণে পুত্রজ্ঞানমাত্রসম্পন্না, ভগবদ্‌স্বরূপের "প্রভাবানুসন্ধানরহিতা" যশোদা বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রতিমা। এই "অর্ভকবৎসলা" যশোদার ভাবকল্পনায় পদাবলী

১ ভা° ১০।১১।৭

ভাগবতের সঙ্গে এক ও অভিন্ন। ঘনরাম দাসের এ-পর্যায়ের একটি পদ আমাদের উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত হলো :

"দু বাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চরি ভীত॥
হেদেরে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পালাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥
রাণীর কোল হইতে গোপাল গেলা পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া॥
ঘরে ঘরে উকটিয়া সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল॥
করি ঘরে-আছ গোপাল বোল ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বোলে কানাই আমাদের ঘরে
সভাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে।
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন।
প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥"[১]

ভাগবতীয় ঘটনার রূপান্তরটুকু লক্ষণীয়। ফলত, এখানে ঐশ্বর্যলীলার পরিসর আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ভাগবতের ভাষায়, "যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"[২] পদাবলীর ভাষায়, "এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে," সেই "স্বয়ং ভগবান্" কৃষ্ণকে শ্রুতি বলেছেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী॥"—ঘনরাম দাসের বক্তব্যও অনুরূপ : "প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥"

ভাগবতে 'ফলক্রয়ে'র প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে দশম স্কন্ধের একাদশ

১ তরু ১১৬৪ ২ ভা° ১।১।১৪

অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ের মাত্র দুটি শ্লোকে[১] ভাগবতকার সূত্রাকারে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলবিক্রয়িণীর কাছ থেকে কৃষ্ণ ফলক্রয় করতেই তার ফলপাত্র রত্নভাণ্ডারে রূপান্তরিত হলো—ভাগবতীয় এই সংক্ষিপ্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই পদকল্পতরু-সংগৃহীত বিভিন্ন পদে[২]। এ পর্যায়ের পদকার প্রধানত উদ্ধবদাস ও ঘনরাম দাস।

ভাগবতে এরপর নন্দ-উপনন্দ গোপবৃদ্ধগণ সমভিব্যাহারে ব্রজবাসীদের বৃন্দাবন-গমনের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনেই রাম ও কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারের সূত্রপাত। প্রথমে অদূর গোচারণলীলা, পরে সুদূর গোষ্ঠলীলা। প্রকৃতপক্ষে উভয় গোষ্ঠবিহার-লীলাই অসুরবধের অগণিত দৃশ্যে আড়ম্বরপূর্ণ। সর্বাগ্রে আছে বৎসাসুর, তারপর ক্রমান্বয়ে বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর ইত্যাদি। অঘ ও ধেনুক-বধের মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য লীলা—বনভোজন ও ব্রহ্ম-মোহন। ভাগবতীয় অসুর বধাদি ঐশ্বর্যলীলার প্রতি পদকর্তাগণ বিশেষ আকৃষ্ট হননি। পক্ষান্তরে তাঁদের সমগ্র মনোযোগ বাহিরঙ্গ ঘটনার ঘনঘটা থেকে হৃদয়ের অন্তরঙ্গলোকে গিয়ে পড়েছে। অঘাসুরের রক্তমেঘতুল্য অতিকায় ওষ্ঠের অলৌকিক বর্ণনার চেয়ে গোপালের গোষ্ঠগমনে একাধারে ব্যাকুলা বিষণ্ণা বিচ্ছেদবিয়োগাতুরা শঙ্কিতা যশোদার অশ্রুজলের মহিমাকেই তাঁরা অমূল্য জ্ঞান করেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে একদা বলেছিলেন, "পদাবলী-সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য, পূর্বরাগ, সম্ভোগ, অভিসার, মান, প্রবাস, প্রেমবৈচিত্ত্য, নৌকা-বিলাস, বাসন্তীলীলা, বিরহ, পুনর্মিলন—প্রেমের এই বহু বিভাগের পর্যায়ে পর্যায়ে কেবল কোমল অশ্রুর উৎস"। পদাবলীসাহিত্য "নয়নজলের রাজ্য" কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আচার্য সেন বোধকরি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন, এই "অশ্রুর উৎস" সহস্রধারে সর্বপ্রথম অবারিত হয়েছে গোষ্ঠগানেই। পদাবলীতে বাৎসল্য ও সখ্যের শ্রেষ্ঠ স্বর্গও রচিত হয়েছে এখানেই। "কান্দিয়া

১ "ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ॥
ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥" ভা° ১০।১১।১০-১১

২ দ্র° তরু ১১৪৬,—৪৭,—৪৮,—৪৯

সাজায় নন্দরাণী"[১] —পূর্বগোষ্ঠের এই ক্রন্দনধারা বধূসরার মতো যশোদাদুলালকে অনুসরণ করে এসে দিনান্তে উত্তরগোষ্ঠের রত্নদীপে কথঞ্চিৎ শুষ্ক হয়েছে :

"নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥
রতন-প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
এক দিঠে দেখে রাঙা চরণ দুখানি॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরি যাউক মা॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে॥"[২]

এই পরকীয় বাৎসল্যের লালন-মমতাধিক্যের আদর্শ অবশ্য ভাগবতই স্থাপন করেছে। শুকদেবের সঙ্গে কথোপকথনে পরীক্ষিৎকে তাই বলতে শুনি :

পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥"[৩]

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের যে পরমমধুব বাল্যলীলাকথা শ্রবণ-কীর্তনে সর্বজীবের সর্ববিধ পাপ প্রশমিত হয়, যে বাল্যলীলাকথা অদ্যাপি আত্মারাম-শিরোমণিগণ কীর্তন করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব দেবকী সেই বাল্যলীলা-রস আস্বাদন করতে পারেননি। শুকদেবও স্বীকার করেছেন, বৃন্দাবনের এই পরকীয়া বাৎসল্য-প্রেমভক্তি "নিতরাং"[৪], অর্থাৎ সর্বতোগরীয়সী। তবে, এই সর্বোৎকৃষ্ট বাৎসল্যের বিশদীভবনে ভাগবতকার যে সর্বত্র সফল হয়েছেন এমন নয়। ঐশ্বর্যমিশ্রিত জ্ঞানের কাছে তিনি প্রায়শই অভিভব স্বীকার করেছেন। এদিক দিয়ে পদাবলী সত্যই অতুলনীয়। ভাগবতে যে মাতৃ-হৃদয় অর্ধোন্মোচিত, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত। "আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে / পরাণের পরাণ নীলমণি"[৫] মাতৃ-হৃদয়ের এই নিত্যজাগরিত স্নেহোৎকণ্ঠাই সমগ্র গোষ্ঠলীলার নেপথ্যসংগীত।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রানুসারে সখ্য, বাৎসল্যের চেয়ে নিম্নতর ভূম্যধিকারী। কিন্তু বৈষ্ণব কবি বাৎসল্যের মতো সখ্যকেও চূড়ান্ত রূপ দান করেছেন। সখ্যে

১ তরু ১১৭৯ ২ তরু ১২১০ ৩ ভা° ১০।৮।৪৭
৪ ভা° ১০।৮।৫১ ৫ তরু ১১৮৯

আছে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সর্বোপরি 'বিশ্রম্ভ' বা সমপ্রাণতা। গোষ্ঠবিহার কৃষ্ণের প্রতি গোপবালকদের বিশ্রম্ভই বিচিত্র স্তরে বিলসিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধে একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় যথাক্রমে অদূর ও সুদূর গোষ্ঠের লীলাবিবরণ। এর মাধুর্যে ও মহিমায় শেষোক্ত অধ্যায়টিই পদাবলী সাহিত্যকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে। এ অংশের প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে আছেন বিপ্রদাস ঘোষ, বংশীবদন, শিবরাম, ঘনরাম, মাধবদাস, যাদবেন্দ্র, নবচন্দ্র প্রমুখ। গোষ্ঠগানে নবনব বৈচিত্র্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বোপরি জ্ঞানদাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গোষ্ঠগানে তাঁর বৈশিষ্ট্য 'ষোড়শ গোপালের'[১] বর্ণনায়। উত্তরগোষ্ঠের পদে তিনি ভাগবত-বহির্ভূত কতকগুলি অভিনব দৃশ্য সংযোজনা করেও তাঁর কবিকল্পনার অনন্যতাকেই প্রমাণীভূত করে গেছেন। তবে ঐতিহ্যানুগত গোষ্ঠলীলা গানেও বৈষ্ণব কবি উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি করেছেন। প্রমাণস্বরূপ প্রথমেই গোষ্ঠবিহারীর বিচিত্র সজ্জার কথা মনে পড়ে যায়। ভাগবত গোপালকের সাধারণভাবে যে-সজ্জার বর্ণনা করে বলেছে: "ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ। কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূ সতা অপ্যভূষয়ন্"[২], পদাবলীতে সেই সজ্জাই গোপালের বিশিষ্ট ভূষণ হয়ে উঠেছে:

"নবীন-জলদ-শ্যাম-তনু মনোহর।
ধাতু-রাগ-নব-গুঞ্জা-শৃঙ্গ-বেণুধর॥"[৩]

আবার ভাগবত গোচারণলীলায় গোপালকের বিচিত্র ক্রীড়ালাপের বর্ণনা দিয়ে বলে: "কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে·· নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ"[৪], আর এরই অনুসরণে পদকর্তাও বলেন:

"কোই কোকিল সম গরজই কুহুকুহু
কোই ময়ূর সম নৃত্য রসাল॥"[৫]

১ "জ্ঞানদাস নিম্নলিখিত ষোলজন সখার রূপগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীদাম, সুদাম, স্তোক-কৃষ্ণ, সুবল, অংশুমান, বসুদাম, কিঙ্কিণী, অর্জুন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরূথপ, নন্দক, বিশালা, বিষয়া, উজ্জ্বল এবং সুবাহু। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে [১০।২২।৩১-৩২] 'স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বিশালা এবং বরূথপের নাম আছে। ভাগবত বর্ণিত বৃষভ এবং ওজস্বিনের নাম জ্ঞানদাস উল্লেখ করেন নাই।" দ্র° 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী', পৃ° ১০৬, টীকা, ড° মজুমদার সম্পাদিত।

২ ভা° ১০।১২।৪ ৩ তরু ১২৩৯ ৪ ভা° ১০।১২।৭-৮ ৫ তরু ১২০৫

এ হলো বিখ্যাত বনভোজনলীলারই পূর্বভূমিকা। আর সেই বনভোজনের চিত্রটিও বিশ্বম্ভর দাসের তূলিকায় কম শোভাশ্যাম হয়ে ওঠেনি :

"সব সখা মেলি করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈয়া
সভে দেই কানু মুখে॥
সভে কহে ভাই আমার কানাই
মোরে বড় ভাল বাসে।
আমার সমুখে বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥"[১]

কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালের এই অপূর্ব সমপ্রাণতা যে ভাগবত-ভাবিত তারই প্রমাণস্বরূপ স্মরণ করা যায় :

"কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ॥"[২]

পুনরপি,

"সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ॥"[৩]

অর্থাৎ, প্রফুল্ল কমলের বীজকোষের চতুর্দিকে যেমন মণ্ডলাকারে শ্রেণিবদ্ধ দলগুলি বিরাজ করে, তেমনি গোপবালকরাও ঘন মণ্ডলাকৃতিতে কৃষ্ণকে বেষ্টন করে তাঁর মুখোমুখি হয়ে আনন্দোৎফুল্ল লোচনে যমুনাতীরস্থ বিপিনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁরা কৃষ্ণসহ পরস্পর পরস্পরের ভোজ্য আস্বাদন করাতে করাতে, হাসতে হাসতে এবং হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন।

গোষ্ঠলীলার আরও কয়েকটি অন্তরঙ্গ তথ্যচিত্র পাচ্ছি পদকল্পতরু সংগ্রহে। যেমন, "শ্রীদাম কোরে অলসে তহি শূতল। সুবল-কোরে বলরাম॥"[৪] তুলনীয় ভাগবতের প্রাসঙ্গিক শ্লোকদ্বয় : "ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্। স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥"[৫] এখানে কৃষ্ণ কর্তৃক বলরামসেবা বর্ণিত ; পরে গোপকর্তৃক কৃষ্ণসেবা :

১ তরু ১১৯৯ ২ ভা° ১০।১৩।৮ ৩ ভা° ১০।১৩।১০ ৪ তরু ১২০১
৫ ভা° ১০।১৫।১৪

"কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ॥"[১]

অপর গোষ্ঠলীলা পর্যায় হলো বিনোদ খেলা বা হেরে গিয়ে পরাজিত জন-কর্তৃক বিজিত জনকে স্কন্ধে ধারণ। ভাগবতে এই স্কন্ধে ধারণ বর্ণিত হয়েছে প্রলম্বাসুরবধের ভূমিকারূপে :

"উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥"[২]

পদাবলীতেও কৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীদামকে বহনের ঘটনা পাই :

"কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥"[৩]

গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের অপর একটি উল্লেখযোগ্য লীলা হলো দাবানল-পান। পদাবলীতে এ-লীলার বিবরণ পাই গোষ্ঠপ্রত্যাগত কৃষ্ণসখাদের বর্ণনায়, পরোক্ষে। সহচর-অনুচরেরা নন্দরাণীকে বলছেন :

"লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ।
বেণুবে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥
যে দিন যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে।
খুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া॥"[৪]

ভাগবতীয় অগ্নিপানলীলার উল্লেখটি এখানে সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। ভাগবতে আছে, একদা গোপ-বালকদের ঘিরে ধরেছিল দাবানল। ভীত শরণাগত বালকবৃন্দের আকুল প্রার্থনায় তখন কৃষ্ণ তাঁদের দুই চক্ষু বন্ধ করতে বলেন,

"তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ॥"[৫]

যোগেশ্বর কৃষ্ণ অতঃপর সেই অগ্নি পান করে ফেললেন। "তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া"—গোপবালকেরা নয়ন মুদ্রিত করে ছিলেন, তাঁদের তাই কারণ জানার কথা নয়। অতএব নন্দরাণীর নিকট ব্রজরাখালটির সাক্ষ্য

১ ভা° ১০।১৫।১৬ ২ ভা° ১০।১৮।২৪
৩ তরু ১১৮৪ ৪ তরু ১২২১ ৫ ভা° ১০।১৯।১২

চমৎকার সংগতি লাভ করেছে। "বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক"—ব্রজগাভীকুলের এই কৃষ্ণ-বেণুগীতসম্মোহনের সমর্থন পাই বৃন্দাবনগোপীর পূর্বরাগাখ্য গীতে: "গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।"[১] পরিশেষে "খুধা লাগিল অন্ন কোথা হৈতে আনে" চরণটিকে যজ্ঞবধূ-সংবাদের সূচকরূপে উপস্থাপন করা যায়।

ভাগবতে যজ্ঞবধূ-সংবাদ পাবো দশম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে। একদা ক্ষুধায় কাতর হয়ে গোপবালকগণ কৃষ্ণের নিকট অন্নপ্রার্থনা করায় কৃষ্ণ তাঁদেরই কয়েকজনকে অদূরস্থ কোনো যজ্ঞস্থলে গিয়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অন্নভিক্ষার আদেশ দিলেন। ক্ষুদ্র স্বর্গাদি অপবর্গ বাসনায় আবদ্ধ উক্ত পণ্ডিতম্মন্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কিন্তু এই আহার্য প্রার্থনার যৎকিঞ্চিৎ উত্তর-দানেরও আবশ্যক বোধ করেননি। গোপাবালকেরা রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন করলেন। মৃদু হেসে এবার কৃষ্ণ বিপ্রবধূদের কাছে তাদের প্রেরণ করেন। কৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরাগবতী বিপ্রবধূরা অগ্রজ বলরামসহ প্রিয় কৃষ্ণের আগমন-সংবাদে ব্যাকুল হয়ে তৎক্ষণাৎ নানা ভোজ্য বিবিধপাত্রে বহন করে নিয়ে চললেন, পিতা-পতি কেউই তাঁদের গতি রোধ করতে সমর্থ হন না। শুধু জনৈকা বধূ গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ায় ধ্যানযোগেই অচ্যুতাশ্লেষ লাভে সমর্থা হলেন। বৃন্দাবনের উপবনস্থলীতে বিশ্রামরত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই দুর্জরগেহ-শৃঙ্খল বিচূর্ণকারী অনুরক্তির প্রশংসা করেলেন। সেই সঙ্গে বললেন, গার্হস্থ্যই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম; বিশেষত, সঙ্গ অপেক্ষা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনেই তাঁকে অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা।

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥"[২]

অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তন তাঁদের কর্তব্য; গোবিন্দ-ইচ্ছায় আত্মীয়বর্গ বিনা-দ্বিধায় তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণ-সুভাষিতের মাধুর্যে ও প্রসাদে পরিতৃপ্ত বিপ্রবধূরাও সানন্দে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করলেন। যে-অহৈতুকী ভক্তিবশত তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ চরণলাভ করলেন, তারই অভাবে স্বর্গকামী বিপ্রবর্গ মাত্র যজ্ঞধূমে সমূহ ইষ্ট বিসর্জন ছিলেন। পরে অবহিত হয়ে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের তাই আর আক্ষেপের সীমা থাকে না।

---

১ ভা° ১০।২১।১৩
২ ভা° ১০।২৩।২৬। শ্লোকটি ভাগবতের সকল পাঠেই পাওয়া যায় না। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের পাঠে আছে, রাধামোহন গোস্বামীর পাঠে নেই।

পদাবলীতে উপরি-উক্ত ভাগবতীয় ঘটনা গুরুত্বলাভ করেছে। এ অংশের নিষ্ঠাবান পরিবেষক হলেন উদ্ধবদাস। তাঁর লেখনীর মধুর স্পর্শে যজ্ঞপত্নী-কর্তৃক রাম-কৃষ্ণ দর্শনের বর্ণনাটি বাঞ্ছিত হৃদয়গ্রাহিতা লাভ করেছে :

"নানা অন্ন ব্যঞ্জন লৈয়া মুনি-পত্নীগণ
যেখানে বসিয়া রাম কানু।
নবঘন-শ্যাম দেখি প্রেমে ছলছল আঁখি
সমর্পিল অন্ন সহ তনু॥"
"নিরখিয়া শ্যাম-রূপ কি কোটি কন্দর্প-ভূপ
পদতলে করয়ে নিছনি।
উদ্ধবদাস কয় লখিলে লখিল নয়
অখিল অমিয়া-রস-খনি॥"[১]

"অখিল অমিয়া-রস-খনি"—এই "অমিয়া-রস-খনি"র সুবিখ্যাত দৃষ্টান্ত পেয়েছি ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন কালিয়দমনলীলায়। কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারের বিস্তীর্ণ পরিসরে কালিয়দমন সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করেছে। এই কালিয়-দমনই গোপী-কৃষ্ণ-প্রেমের প্রথম "চাতুরী সার"। তাই ঘটনা পরম্পরায় কালিয়দমন বিপ্রবধূ-সংবাদের পূর্ববর্তী হওয়া সত্ত্বেও এটিকে আমরা এক দীর্ঘ প্রেমনাট্যের নান্দীপাঠরূপে পরিবেষণের পক্ষপাতী।

প্রেমভক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্রম-উত্তরণে এবং ঘটনার সুদৃঢ় শৃঙ্খলার সন্নিবেশে ভাগবতকারের যথার্থই তুলনা নেই। দশম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশ সংখ্যক শ্লোকটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা যায়। এটি ধেনুকাসুর বধদৃশ্যের পরবর্তী উত্তরগোষ্ঠের বর্ণনা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধেনুকাসুর বধের অব্যবহিত পরেই ষোড়শ অধ্যায়ে কালিয়দমনলীলা ব্যাখ্যাত। সুতরাং এই দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী খণ্ডচিত্রটি রসিকজনের কাছে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হবে। আলোচ্য শ্লোকে শুকদেব বলছেন :

"পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥"

অর্থাৎ, ব্রজরমণীগণ তাঁদের নয়নভ্রমর দিয়ে মুকুন্দমুখ-কমলমধু পান করে

১ তরু ১২৩৪

দিবসে কৃষ্ণ-অদর্শন জনিত বিরহতাপ নিবারণ করলেন। কৃষ্ণও তাঁদের সব্রীড় হাস্য এবং বিনীত কটাক্ষকে তৎকৃত সমাদর বলে গ্রহণ করে গোষ্ঠান্তর্গত নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, কালিয়দমনে পরিস্ফুট পূর্বরাগের এ হলো মুখবন্ধ।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির ব্যাখ্যা অনুসারে কালিয়দমন 'অদূর প্রবাসে'র লক্ষণাক্রান্ত। আর গোষ্ঠ নন্দমোক্ষণ রাসান্তর্ধান প্রভৃতি এরই অন্তর্গত হয়ে পর পর ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত। তন্মধ্যে এখানে সর্বাগ্রে কালিয়-দমনই আলোচনীয়। বৈষ্ণব কবি কালিয়দমনের পটোত্তোলন করছেন এইভাবে :

"কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাঁহা রহে
বিষ-জল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥
বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যদি যায় কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরি আছে কত
বিষ-জ্বালা সহিতে না পারে॥
দেখি যদুনন্দন দুষ্ট-দর্প-বিনাশন
উঠিলেন কদমের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালীদহ-জলে॥
দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল মন
পড়ে সভে মুরছিত হৈয়া
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহো থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সভে পাঞা॥
কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু বৎস কান্দে উভরায়।
শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানি
মাধব অবনী গড়ি যায়॥"[১]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি পড়ে ভাগবত-পাঠক মাত্রেই বুঝবেন, এক্ষেত্রে পদকর্তা

১ তরু ১৫৬৭

কতদূর ভাগবতানুগত। কৃষ্ণকে বিষজলে সর্প-কবলিত দেখে কালিয় হ্রদের তীরে নন্দ-যশোদার শোক পর্যন্ত একান্তভাবেই ভাগবতাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। ভাগবতে কালিয়দমনের দৃশ্যে বাৎসল্যপরায়ণা যশোদার পাশাপাশি নবানুরাগিণী গোপীদের মর্মবেদনাও কম উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি :

"গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥"[১]

অর্থাৎ, কৃষ্ণানুরক্তা গোপীরা অনন্ত গুণনিধি প্রিয়তমকে সর্পগ্রস্ত দেখে অতিশয় দুঃখকাতরা হলেন। তাঁরা তাঁর সৌহৃদ্য, সস্মিত দৃষ্টি এবং মধুর বচন স্মরণ করে প্রিয়বিরহে ত্রিলোক শূন্য দেখলেন।

ভাগবতের এই সাধারণভাবে গোপী দুঃখ বর্ণনা পদাবলীতে বিশেষ করে রাধার মর্মবিলাপ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পদাবলীর নিগূঢ় ঐক্য বর্তমান। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ছিলেন পূর্বসংগতা, কাজেই অনুরাগবতী; আর পদাবলীতে রাধা বিশুদ্ধা পূর্বরাগবতী। তবু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরাগিণী রাধার অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশের সঙ্গে পদাবলীর পূর্বরাগবতী রাধার অভিব্যক্তি একাকার হয়ে গেছে। প্রমাণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালিয়দমন-পর্বের গৌরীরাগে গেয় পদটির প্রথম চতুষ্কই উদ্ধার করা যায় :

"আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণ পতা।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী ॥১॥"

এরপরই উদ্ধারযোগ্য ভাটিয়ালী রাগে গেয় পদটির মধ্যাংশ :

"হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী ॥
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী ॥
কভোঁ না লঙ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন ॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিনি সব নিফল মোরে ॥ ২ ॥

১ ভা° ১০।১৬।২০

হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞি কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল ॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে ॥৩॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই "মোর পরাণ-পতী''রই ভাষান্তর পদাবলীর "মঝু জীবন-নাথ"। "হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই নিখাদ বিলাপগীতির নব-স্বরলিপি রচনা করেছে পদাবলীর "হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত"। পদকল্পতরু থেকে মাধবদাসের প্রাসঙ্গিক পদটির অংশবিশেষ আমাদের বক্তব্যের প্রমাণাপেক্ষায় তুলে ধরা হলো :

"সহচরি সঙ্গে রাই খিতি লূঠই
খণহি খণহি মুরছায়।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায় ॥
হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত
কাহে লাগি কালিন্দি-বিষ-জলে পৈঠল
সো মঝু জীবন-নাথ ॥"[১]

ভাগবতে কালিয়দমন দৃশ্যে বলরামের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্পগ্রস্ত কৃষ্ণকে দেখে তিনি নন্দ-যশোদা-গোপগোপীর মতো শোকাকুল হয়ে পড়েননি। কেননা তিনি ছিলেন তত্ত্বজ্ঞ, অনুজের প্রভাব তিনি জানতেন : "প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ"[২]। সেইজন্য সেই কৃষ্ণানুভাববিদ্‌ই শোক-সন্তপ্ত ব্রজবাসীকে কালিয়হ্রদে প্রবেশের থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন :

"কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥"[৩]

কালিয়দমনের দৃশ্যে বলরামের এই ভূমিকাটি পদকর্তা ভাগবত থেকে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে উদ্ধার করেছেন। পদকল্পতরুতে একটি পদে তাই দেখি কৃষ্ণ-অনুভাববিদ্ বলরাম বাহ্যত সকলকে প্রবোধ দিচ্ছেন, এইমাত্র, "সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়"[৪]।

কালিয়দমনের মূল ঘটনাও ভাগবতকে পদে পদে অনুসরণ করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় বৈষ্ণব পদাবলীর "কান্তিঃ কালিয়শাসনস্য"—

১ তরু ১৫৯০   ২ ভা° ১০।১৬।১৬   ৩ তত্রৈব ২২   ৪ তরু ১৫৯১

"ব্রজ-বাসিগণ-জীবন-শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ॥
কালিয়-ফণায় নটন-রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন সঙ্গ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান॥
ফণায় ফণায় দমন করি।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ।
উগারে অনল-সমান বিষ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি।
পূজয়ে চরণ-নখর-শশী॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি।
শুনি ব্রজ-মণি হরষ-মতি।
ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত।
শরণ লইল চরণ নীত॥
ফণি-পতিবরে অভয় করি।
জল সঞে তীরে আইলা হরি॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোরে॥
বিষ-জলে জনু তনু দাহন ভেল।
ব্রজ-প্রেমামৃতে শীতল কেল॥"[১]

এই "কালিয়বিষধর-গঞ্জন। জনরঞ্জন। যদুকুলনলিনদিনেশ" শ্রীকৃষ্ণে বর্ষিত "ব্রজ-প্রেমামৃতে"র একদিকে আছে মাতা যশোমতীর শীতল ক্রোড়, সখাগণের আলিঙ্গন, স্বজনের "গদ্গদ ভাষ," অন্যদিকে তেমনি সহচরীসহ রাধিকার "দরশ-রস-পান"। এখানে উল্লেখযোগ্য, বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণে এই কালিয়-দমনের দিনটিকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশের দিনরূপে চিহ্নিত করেছেন বৈষ্ণব রসশাস্ত্রকারগণ। বিষ্ণুপুরাণে আছে কৃষ্ণানুরাগবতী গোপীরা কালিয় হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে সর্পগ্রস্ত প্রিয়তমের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করে

১ তরু ১৫৯৩

অকস্মাৎ বললেন, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ কালিয়নাগ-পরিবেষ্টিত হয়েও সহাস্যবদনে আমাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছেন—"ভোগেন বেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজস্য পশ্যত। স্মিতশোভমুখং গোপাঃ কৃষ্ণস্যাস্মদবিলোকনে॥"[১]—এই ব্রজবধূ-বাক্য উদ্ধার করেই উক্ত প্রবক্তাগণ কৃষ্ণের পূর্বরাগের জল্পনা করে থাকেন। পদাবলীতেও পাই :

"কালিদমন দিন মাহ।
কালিন্দি-কুল কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলু জনু থির বিজুরিক মালা॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তব ধরি হাম না জানি দিন রাতি॥
তহিঁ ধনি-মণি দুই চারি।
তহিঁ পুন মনমোহিনি এক নারী॥
তহিঁ রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীঠি॥
অনুখন তহ্নিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি॥
দিনে দিনে খিন ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা॥"

কালিয়দমন দৃশ্যে যেমন কৃষ্ণের "বিরহ-বিয়াধি" বর্ণিত, গোষ্ঠগমনের কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসে গোপীগণের তেমনি "তহ্নিক সমাধি" বিশেষিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধান্তর্গত সমগ্র একবিংশ অধ্যায়টিই তো এ পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। এর বিচিত্র স্তরপরম্পরা রসিকের চিত্ত-চমৎকারকারী হয়ে উঠেছে।

একদা শারদ স্বচ্ছ সলিলে সুপূর্ণ সরোবরের তথা বৃন্দাবন-বনস্থলীর অপূর্ব নিসর্গশোভায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণ পরমানন্দে মোহন মুরলীধ্বনি করলেন। দূর থেকে সেই বংশীরব শুনে ভাববতী ব্রজরমণীরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ এককথায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে সেই বংশীতান আকুল করে তুললো তাঁদের প্রাণ। বেণুনাদমোহিতা ও প্রেমবিভাবিতা গোপীদের

---

১ বিষ্ণু° ৫।৭ ২ তরু ৫৬

অন্তরে তখন প্রতিফলিত হয় কৃষ্ণরূপ। কর্ণে কর্ণিকার, কণ্ঠে বৈজয়ন্তীমালা, পরিধানে কনককপিশ বস্ত্র ধারণে বর্হাপীড়ের সেই নটবরবপু অনবদ্য :

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥"[১]

এটি বিশুদ্ধ রূপানুরাগের পর্যায়ভুক্ত। বংশীতান—উদ্দীপক। "ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্। শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥"[২] "সর্বভূতমনোহর" বেণুনাদে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। চাপল্য ঈর্ষাদি সঞ্চারী ভাবযোগে তাঁদের কৃষ্ণরতি পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। 'নের্ষা প্রণয়ং বিনা'। তাঁদের ঈর্ষাও ভাবপরম্পরায় সূক্ষ্ম শিল্পে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁদের ঈর্ষা—প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ-বয়স্যদের প্রতি : কেননা, গোষ্ঠবিহারকালে 'নয়নোৎসব'-শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধকটাক্ষ-সমন্বিত বদনমাধুর্য পানে তাঁদের বাধা নেই : "বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষম্"[৩]। দ্বিতীয়ত, বেণুর প্রতি। ব্রজবধূর বক্তব্য, না জানি বংশী কোন্ মহাপুণ্য করেছে, যার ফলে একমাত্র গোপী-ভোগ্য কৃষ্ণ-অধরামৃত সে নিঃশেষে পান করছে! "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্। ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং"। মুহূর্তে রঘুনন্দনের পদের প্রাসঙ্গিক চরণ স্মরণ হবে :

"মুরলী হইল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া॥"

অতৃপ্ত বাসনাই এখানে তির্যক ভাষণে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তৃতীয়ত, ঈর্ষা—বৃন্দাবনভূমির প্রতি। গোপী বলেন, এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও অধিকতর সুযশ বিস্তার করেছে পৃথিবীতে, কেননা এখানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অংকিত : "বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধ-লক্ষ্মি।" পদকর্তার ভাষায় :

"ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥"

---

১ ভা° ১০।২১।৫ ২ তত্রৈব ৬ ৩ তত্রৈব।৭

চতুর্থত, হরিণীদের প্রতি। গোপী জানেন, এরা মূঢ়া ; কিন্তু তথাপি ধন্যা। কৃষ্ণ বংশীতানে মুগ্ধ হয়ে এরা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণসার সহ কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হতে পারে—আন্তরিক সমাদর সহ সপ্রেম নয়নসম্পাতেরও অধিকারিণী হয় : "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্। আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ"[১]। বলা বাহুল্য, গোপীগণের অপ্রাপ্তিজনিত উৎকণ্ঠাই এই নব নব ঈর্ষাপাত্রের সন্ধান করে ফিরেছে—মূঢ় প্রাণী হরিণী বহু দূর, এমনকি 'দারুময়' বেণু, মৃন্ময়ী ধরিত্রীর তুল্য অচেতন পদার্থেও গিয়ে পড়েছে তাঁদের ক্ষোভ। শুধু ভূলোকে নয়, দ্যুলোকেও তাঁদের ঈর্ষা লক্ষ্যবস্তু অন্বেষণ করেছে। তাঁদের বক্তব্য, "বনিতোৎসবরূপশীল" শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং "তৎকণিতবেণুবিবিক্তগীতম' শুনে "দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ"[২] বিমানচারিণী দেবীরা পর্যন্ত কামমোহিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ পতির ক্রোড়ে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন, তাঁদের কেশবন্ধ বিগলিত এবং কটির বসন স্খলিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, গোপীবৃন্দের আকাঙ্ক্ষার আভাসে পূর্ণ এ-শ্লোক।

অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। এ অংশে ব্রজগোপীগণ নিজেদের গোবিন্দমুগ্ধতার বিশ্বব্যাপী উপমা চয়ন করেছেন। এর মধ্যে স্থান লাভ করেছে গো ও গো-বৎসকুল, বৃক্ষলতাদি, নদীসমূহ, মেঘরাজি, শবরস্ত্রীগণ এবং গোবর্ধন পর্বত। এই বিচিত্র উপমাদি চয়নের মধ্য দিয়ে রূপ গোস্বামী-কথিত "লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো-মৃত্যুর্দশা দশ"[৩] অর্থাৎ পূর্বরাগের লালসাদি দশ দশা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই লক্ষণবতী নায়িকাদের পূর্বরাগ-রতি কোথাও দর্শনজা, আবার কোথাও কোথাও শ্রবণজা হয়ে উঠেছে। যেখানে দর্শনজা সেখানে গোপী কৃষ্ণের রূপাভিভূতা ; যেখানে শ্রবণজা সেখানে বংশীমোহিতা। ভাগবতের এই দর্শনশ্রবণাদিজা পূর্বরাগ-রতি পদাবলীর বিপুল পরিসরে বিচিত্র স্তরেবিলসিত, সূক্ষ্মতম কলাকৃতিতে মণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকতায় চূড়ান্ত রসলোক-স্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের উত্তরসাধকদের রূপানুরাগ-বংশীমহিমা-কীর্তনের নূতন করে পরিচয় লাভের আবশ্যক ছিল না। অজস্রধারে উৎসারিত

১ ভা' ১০।২১।১১ ২ ভা' ১০।২১।১২

৩ উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ-প্রকরণ, ১৩

এ শ্রেণীর অগণিত অত্যুৎকৃষ্ট পদই তার চরম প্রমাণ। তবে পার্থক্যও গভীর। ভাগবতে গোপীনয়নে যে-শ্যামরূপ সমুদ্ভাসিত তা প্রধানত গোষ্ঠবিহারীর— তার বর্ণনাও কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক লক্ষণের প্রকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ। পদাবলীর শ্যামরূপ অনন্ত রহস্যে ও বৈচিত্র্যে "প্রতিপদং ললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্"। ভাগবতের ধ্রুপদী-নিষ্ঠাকে স্বীকার করেও পদকর্তা রোমান্টিক-রশ্মির নবনবায়মান সৌন্দর্যশোভায় শ্রীকৃষ্ণের নব নব রূপ আবিষ্কারে তাঁর 'অনন্ত' অভিধাটিরই যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছেন। বংশী-মহিমার ক্ষেত্রেও কথাটি পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। দু' একটি উদাহরণ-যোগে বক্তব্য প্রমাণীকৃত করা যায়। প্রথমত স্মরণীয় জ্ঞানদাসের একটি বাঙ্‌লা পদ :

"চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূরপুচ্ছ
ভালে সে রমণী-মন-লোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতীমালে গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
হেন মনে অনুমানি বহিতেছে সুরধুনী
নীল-গিরি-শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঙ্গিয়া।
রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥"[১]

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" কৃষ্ণের এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ রূপকল্পনাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই জ্ঞানদাস প্রথাবদ্ধ আলংকারিক-রীতি ভেঙেছেন : "রজতের পাতে কেবা কালিন্দী পূজিল গো/জবা কুসুম তাহে দিয়া"।

---

১ 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী', ড' বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ৭২ সং পদ

এবার গোবিন্দদাসের একটি বংশী-শ্রবণ মিশ্র রূপানুরাগের ব্রজবুলি পদ উদ্ধার করা যায় :

"রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরস মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলীরবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম লবলেশ ॥
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদন না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম ॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ[১]
পূছত গোবিন্দদাস ॥"[২]

লক্ষণীয়, ভাগবতে সামাজিকের প্রশ্ন প্রবল হলেও গোপীর পরকীয়া-প্রেমের ক্ষেত্রে সমাজ বিশেষ সজাগ নয়। পক্ষান্তরে পদাবলীর নায়িকা রাধা "কুল-মরিয়াদি কপাট" উদ্‌ঘাটন করায় "স্রোতবিথার জলে"র থেকে দূরে তীরে দাঁড়িয়ে "কুলের কুকুরে" কম কোলাহল সৃষ্টি করেনি। বংশী-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধার করে আমরা এ-প্রসঙ্গের ছেদ টানতে পারি :

"মন-চোরার বাঁশি বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥
আমরা কুলের নারী হই গুরুজনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥

১ পাঠান্তর : 'যদি হয় অনুরত'
২ 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ', ড° বিমানবিহারী মজুমদার সং, ২৬৭ পদ

যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনার পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলাজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছি গোঙারের হাতে।
কানাই খুঁটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥"[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের গোপী-বিরহকে রূপ গোস্বামী কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সঙ্গে রাসান্তিক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের গোপী-বিরহানুরাগকেও আলোচনার বিষয়ীভূত করা যায়। স্মরণীয়, পূর্বরাগাখ্য বিপ্রলম্ভের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। বস্তুত, একে রসোদ্গার বলাই সংগত। কেননা এক্ষেত্রে উত্তর গোষ্ঠে প্রত্যাগত কৃষ্ণের ললিতরূপই শেষ পর্যন্ত পূর্বসংগতা অনুরাগময়ী গোপীজনের চিরবিরহ-সন্তাপ নিবৃত্তির মহৌষধ হয়ে উঠেছে। প্রমাণস্বরূপ প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করা যায়:

"বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনামুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ দেবকীজঠরভূরুডুরাজঃ॥
মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥"[২]

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের ধেনুপাল এবং আমাদের সকলের হিতকারী। তাই তিনি আমাদেরই হিতার্থে গোবর্ধনধারণ করেছিলেন। পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁর চরণবন্দনা করছেন, সহচরবৃন্দ তাঁর কীর্তি গান করছে। ওই

১ 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ ১০৫৫
২ ভা ১০।৩৫।২২-২৫

তাঁর বাঁশি বাজছে। সখি, দেবকীগর্ভজাত এই গোকুলচন্দ্র আমাদের তুল্য সুহৃদ্‌জনের মনোরথ পূর্ণ করবেন বলে দিনান্তে ধেনুচয়ন করে ফিরছেন। দেখ, তাঁর কণ্ঠমাল্য গোধূলি-পরিব্যাপ্ত। শ্রান্ত হলেও আপন কান্তিতে সর্বজনের আনন্দবর্ধন করছেন কৃষ্ণ। দিবসান্তে তিনি ব্রজে আবদ্ধ ধেনুস্বরূপ এই আমাদের দিনতাপ প্রশমিত করে আসছেন—বন্ধুবর্গের আনন্দবর্ধক তিনি ঈষৎ মদে বিহ্বললোচন এবং বনমাল্যধারী। স্বল্পপক্ব বদরীফলের তুল্য পাণ্ডুর তাঁর আনন, তদুপরি কনকময় কুণ্ডলের কান্তিতে কোমল গণ্ডস্থল সুশোভিত। গজরাজের তুল্য গমন করছেন বনমালী। চন্দ্রের মতো সুন্দর তাঁর মুখ।

একটি উত্তরগোষ্ঠের প[illegible] জ্ঞানদাসের দৃষ্টিও অংশত অনুরূপ :

"ধেনু সনে আওত নন্দদুলাল।
গোধূলি ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমাল॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণুরব শুনইতে
ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দ্বাবে দাঁড়ায়॥
চড়া ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত
বায়ই মোহন বংশ॥
ব্রজবাসিগণ বালবৃদ্ধ জন,
অনিমিখে মুখশশী হেরি॥
ভুলিল চকোর চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেবি॥"[১]

ভাগবতে গোপীগণের পূর্বরাগের পর হেমন্তে কৃষ্ণলাভমানসে কাত্যায়নী ব্রতারম্ভের উল্লেখ আছে। এরপর ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়েছে ব্রত-উদ্‌যাপন, স্নানার্থে যমুনাবতরণ, কৃষ্ণকর্তৃক বস্ত্রহরণ, গোপীগণের কৃষ্ণস্তুতি, কৃষ্ণের ফলদান। এরপর পূর্বোল্লিখিত যজ্ঞবধূ-সংবাদের উপান্তে গোবর্ধনধারণলীলার সূচনা। চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ এবং সপ্তবিংশ, মোট এই চারটি অধ্যায়

১ 'জ্ঞানদাসের পদাবলী', মজুমদার সং ১১৩ পদ

নিয়ে গোবর্ধন ধারণ ও তৎপরবর্তী অভিষেক-বার্তার বিস্তার। সংক্ষেপে শেষোক্ত ঘটনার বিবরণ এই, একদা নন্দাদি গোপগণ সাড়ম্বরে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলে কৃষ্ণ উক্ত বিপুল সমারোহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নন্দ বললেন, পৃথিবীর অন্নশস্যের প্রাণস্বরূপ পর্জন্যদেবের প্রীত্যর্থে এই যজ্ঞ-ব্যবস্থা। প্রাজ্ঞ কৃষ্ণ দর্পিত ইন্দ্রের মানহরণে দৃঢ়সংকল্প। তিনি জানালেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মানুসারেই ফললাভ হয়। এতএব স্ব স্ব বৃত্তির যথার্থ সাধনই কর্তব্য। সেক্ষেত্রে পশুপালক গোপালকদের পক্ষে মেঘবর্ষী ইন্দ্র অপেক্ষা রক্ষক গোবর্ধন পর্বতকে পূজা করাই অধিকতর সংগত। কৃষ্ণবাক্যের ভূরিভূরি প্রশংসা করে ব্রজবাসীরাও তাই করলেন। এদিকে পূজাবঞ্চিত দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে সপ্ত দিবানিশি বারিবর্ষণ করতে থাকেন। রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিয়ে কৃষ্ণও তখন একহস্তে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে সমূহ ব্রজবাসী গোপবৃন্দের তথা পশুপক্ষীর জীবনরক্ষা করলেন। হতগর্ব ইন্দ্র শেষে গোমাতা সুরভিসহ কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। কৃষ্ণের প্রসাদ-লাভে ধন্য ইন্দ্র সুরভির দুগ্ধধারায় এবং মন্দাকিনী সলিলে তাঁকে অভিষিক্ত করে তাঁর নূতন নামকরণ করেন 'গোবিন্দ'। পদাবলীতে ভাগবতীয় এই গোবর্ধনলীলা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে স্থানলাভ করেছে, শুধু বৈষম্য ঘটেছে রাধামূর্তির উপস্থাপনে :

"হেন কালে সখী মেলে রাই-কনক-গিরি
আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাড়াঞা রূপের ভরে ধরি সহচরি-করে
মুখ জিনি শশী ষোলকলা॥
রাই নব সুমেরু সুঠান।
স্মিত-সুরধুনী-ধারে রসের ঝরণা ঝরে
হেরি হেরি তৃষিত নয়ান॥
নব অনুরাগ-বাতে স্থির নাহি বান্ধে চিতে
পাসরিলা নিজ মরিষাদ।
কাঁপে তনু থরহরে পর্ব্বত ডোলয়ে করে
গোয়ালে গণিল পরমাদ॥
লগুড় লইয়া করে কেহো কেহো গিরি ধরে
উদার ব্রজের গোপগণ।

ললিতা দেবী যে হাসি দাণ্ডাইলা আগে আসি
রাইরে করিলা অদর্শন ॥
ভাব সম্বরিয়া হরি রাখিলা গোকুল-পুরী
ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয় ।
চৈতন্যদাসের বাণী ত্রিভুবনে জয়-ধ্বনি
গোবর্দ্ধন-লীলা রসময় ॥"[১]

গোবর্ধনধারণের পর নন্দমোক্ষণ। ভাগবতের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাটির নিপুণ শব্দচিত্রী উদ্ধবদাস। আমরা পূর্বেই বলেছি, রূপ গোস্বামীর অভিমত অনুসারে এপর্যায়টি 'কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসে'র লক্ষণাক্রান্ত। রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধান উক্ত শ্রেণীর প্রবাসেরই চতুর্থ উদাহরণ। অতঃপর সেই "সর্বলীলা-মুকুটায়মান" "পরমরসকদম্ব" রূপে কথিত রাসেই প্রবেশ করা যেতে পারে।

নিত্যরাস ও মহারাস ভেদে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দ্বিবিধ। আদিপুরাণে নিত্যরাস ও বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশ-ভাগবতে মহারাস বর্ণিত। শারদ ও বাসন্ত ভেদে মহারাসেরও আবার দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত। ভাগবতে শারদরাস ও গীত-গোবিন্দে বাসন্তরাস বিলসিত। পদ্মপুরাণে উভয় রাসেরই সমাবেশ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যুগপৎ সর্বকালোচিত নিত্যরাস এবং শারদ ও বাসন্ত মহারাসের রসধারা নির্বারিত। বিশেষত ভাগবতীয় ও গীতগোবিন্দীয় যথাক্রমে শরৎকালোচিত ও বসন্তবিলসিত রাসবর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। এখানে আমরা পদসাহিত্যে উচ্ছ্বসিত ভাগবতীয় শারদরাস-রহস্যেরই কেবল মর্মানুসন্ধান করবো, বাসন্ত-বাসরহস্যের নয়। আর শারদরাস-বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং পদাবলীর শারদরাস পরিক্রমা নামান্তরে গোবিন্দদাসের পদাস্বাদন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

'ভাগবত ও গীতগোবিন্দ' প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা বলেছি, ভাগবতীয় রাস ধ্রুপদী। গুরুগম্ভীর যোগবর্ষার পর অনুষ্ঠিত শারদরাসের গতি সেখানে গম্ভীর, দর্শন নিগূঢ় এবং সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক। তার প্রতিটি চরণের প্রতিটি শব্দার্থ ভারতবর্ষীয় ভক্তি-ভাবুকতার অতলান্ত সিন্ধুমথিত। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব পদাবলীর রাস রোমান্টিকতার লক্ষণে চিহ্নিত। একথা অনস্বীকার্য, ভাগবত ও বৈষ্ণব পদাবলীর এই স্বরূপ-বিবর্তনের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধরূপে

১ তরু ১২৪৭

জয়দেবের গীতগোবিন্দ অলঙ্ঘনীয়। গোবিন্দদাস তথা অন্যান্য মহাজন পদকর্তার শারদরাসমূলক প্রকৃষ্ট পদসমূহের আত্মা তাই ভাগবতীয় হলেও দেহ ও প্রাণ বিশুদ্ধ জয়দেবীয়। অর্থাৎ, দর্শন ভাগবতভাবিত, কিন্তু সংগীত জয়দেবানুসারী। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত গোবিন্দ-দাসের পদচতুষ্টয় স্মরণ করা যায়। যথা :

ক. "শরদ চন্দ পবন মন্দ"—এটি "কানড়া" রাগে গেয় "অভিসার" রূপে চিহ্নিত প্রথম পদ। অর্থাৎ, রাসরসারম্ভে সমুৎসুক কৃষ্ণের "নামসমেতং কৃতসংকেতম্" মৃদু-বেণুধ্বনি। অতঃপর "জবলোলকুণ্ডলা" গোপাদের নিভৃতে অভিসার এবং যমুনাতীরে গোবিন্দসমীপে আগমন।

খ. "বিপিনে মিলল গোপ-নারি"—মল্লার রাগে গেয় পদটি কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের প্রেমনিষ্ঠার পরীক্ষাসূচক।

গ. "ঐছন বচন কহল যব কান"—'ধানশী' রাগে গেয় এ পদে অনুরাগবতী ব্রজবধূদের সাভিমান মর্মপ্রকাশ।

ঘ. "কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল/রমণীমণ্ডল সাজ"—কামোদ রাগে গেয় এ-পদ "রাসোৎসবে সমারম্ভ" মূলক। "বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ," "কালিন্দি-তীর সুধীর সমীরণ," "ও নব-জলধর অঙ্গ" ইত্যাদি পদত্রয় এরই পরিপূরক। এর মধ্যে প্রথম পদচতুষ্টয়ে ভাগবতভাবনার নিদর্শনস্বরূপ আমরা গোবিন্দদাসের পদ ও ভাগবতের প্রাসঙ্গিক অংশ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট করলাম :

১. "শরদ-চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণি।"

তু° "তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।'[১]

২. "হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥"

তু° "দৃষ্ট্বা…বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিররঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।"[২]

১ ভা° ১০।২৯।১ ২ ভা° তত্রৈব।৩

৩. "শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।"

তু° "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ"[১]

৪ "বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥"

তু° "অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে," ফলত "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ"[২]

৫. "ততহিঁ বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি॥"

তু° "আজগ্মু বন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ।"[৩]

এবার দ্বিতীয়োক্ত পদ :

১. "বিপিনে মিলল গোপ-নারি
হেরি হসত মুরলিধারি"।

তু° "তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ"[৪]

২. "কহ কীয়ে করব প্রেম"।

তু° "প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ"[৫]

৩. "ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত"।

তু° "ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিৎ"[৬]

৪. "হেরি ঐছন রজনি ঘোর"।

"রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা"[৭]

---

১ ভা° ১০।২৯।৪ ২ তত্রৈব।
৪ ভা° তত্রৈব।১৭ ৫ ভা° তত্রৈ
৬ ভা° তত্রৈব ৭ ভা° তত্রৈ

৪. "কীয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি।"

তু° "দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥"[১]

এর পর তৃতীয় পদের আলোচনা।

১. "ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান॥
টূটল সবহুঁ মনোরথ-করণি।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি॥"

তু° "বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতং"—
অপ্রিয়-গোবিন্দভাষণ শুনে ব্রজগোপীবৃন্দ "কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যাঃ"[২]

২. "আকুল অন্তর গদগদ কহই"

তু° "সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ"[৩]

৩. "কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥"

তু° "মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান গদিতুং নৃশংসং"[৪]

৪. "তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাহাঁ যাব॥"

তু° "পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা।"[৫]

গোবিন্দ দাসের ক্ষুদ্রাকৃত পদে গোপী-ভাষণ এখানেই সমাপ্ত। ভাগবতে কিন্তু এর পরেও আরো সাতটি শ্লোক সংযোজিত; উপরন্তু রূপানুরাগ-রসোদ্গার-আক্ষেপানুরাগে মণ্ডিত হয়ে তা কৃষ্ণের 'কলপদায়ত' বেণুনাদের চেয়ে কম সুশ্রাব্য হয়ে ওঠেনি।

রাসোৎসবে সংপ্রবৃত্ত কৃষ্ণের বর্ণনাতেও গোবিন্দদাস "মিতঞ্চ সারঞ্চ" কবিভাষণের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যথা, 'মহারাস':—

১. "কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।

১ ভা° ১০।২৯।২১ ২ তত্রৈব।২৯ ৩ তত্রৈব।৩০ ৪ তত্রৈব।৩১ ৫ তত্রৈব।৩৪

মাঝহি মাঝ মহামরকত-মণি
শ্যামর নটবররাজ ॥"

তু° "তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥"[১]

২. "ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার ॥
থীর বিজুরি সঞে সঞ্চরু জলধর
রস বরিখয়ে অনিবার ॥"

তু° "তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ"[২]

৩ "কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত"।

তু° "উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥"[৩]

গোবিন্দদাসের "পদুমিনি"র তুলনায় এই "রক্তকণ্ঠীর"[৪] কল্পনা অধিকতর শিল্পরসসমৃদ্ধ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ক্ষেত্রও দুর্লভ নয় যেখানে গোবিন্দদাসই আবার কাব্যরসে ভাগবতকে অতিক্রম করে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ পূর্বোদ্ধৃত একটি পদের চরণ-বিশেষ পুনরুল্লিখিত হতে পারে: "তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলিক কললোলনি।" একান্ত বংশীমোহিতা গোপীর চলচ্ছন্দটি পর্যন্ত এখানে কাব্যচ্ছন্দে বিধৃত হয়েছে। লক্ষণীয়, বাঙ্‌লা পদ অপেক্ষা ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব কবিতায় রাসরসতরঙ্গ বহুগুণ কল্লোলিত। আসলে, পয়ার-ত্রিপদীতে রাসের গতিচ্ছন্দ রক্ষা করা অসম্ভব। অপরপক্ষে ব্রজবুলিতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দে রাসের যথার্থ প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে। রাসের আত্মা যে-নৃত্য, তা ভাগবতের চেয়ে বেশী ধরা পড়েছে নৃত্যপরা জয়দেব-ভারতীর মণিমঞ্জীরে। এক্ষেত্রে বাসন্তরাসরসিক জয়দেবই গোবিন্দদাসের দীক্ষাগুরু। যথা, গোবিন্দদাসে:

"কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহুঁ কত কত চান্দে।
কনক-লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহু তনু তনু বান্ধে ॥"

১ ভা° ১০।৩৩।৭ ২ তত্রৈব।৮ ৩ তত্রৈব।৯

৪ "নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠী"—শ্রীধরটীকা

তু° জয়দেব :

"করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥"[১]

কিন্তু ভাবহিল্লোল ও শব্দতরঙ্গ দুই মহান্ পূর্বসূরীর নিকটে প্রাপ্ত হয়েও বৈষ্ণব পদাবলীকার একাধিক স্থলে অলংকারশাস্ত্রীয় সর্ববিধ উপমাসীমাকে পরাভূত করেছেন। "কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই তিমিরহুঁ কত কত চান্দে"—এই "আঁধারের লীলা আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে" যে-রোমান্টিক রাস, তা ধ্রুপদী রাসলীলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপরূপ ব্যঞ্জনা ও প্রতীক-রহস্য সৃষ্টি করেছে।

"হেম যূথি" রাসেশ্বরী রাধার পরিকল্পনাটি পদাবলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই পার্থক্যটি ছাড়া শারদরাসমূলক পদে ভাগবত-প্রভাবই সর্বাংশে অনুভূত। গোবিন্দদাস ভিন্ন অপরাপর একাধিক পদকর্তার সাক্ষ্যই গ্রহণ করা যায়।

পদকল্পতরুতে সংগৃহীত উদ্ধবদাসের যুগলপদে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও গোপীদের কৃষ্ণান্বেষণের একান্ত ভাগবতানুসারী বর্ণনা পাই। "অত্রান্তরে অন্তর্ধানং যথা" পর্যায়ে কেদার রাগে গেয় প্রথম পদটি নিম্নরূপ :

"রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর
রসবতি রাধা বামে।
মণ্ডলি ছোড়ি রাই-কর ধরি হরি
চললি আন বন-ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহু কলাবতি আকুল ভেল অতি
হেরইতে বন মাহা গেল॥
সখিগণ মেলি সবহুঁ বন ঢুঁড়ই
পুছই তরুগণ পাশ।
কাহাঁ মঝু প্রাণ-নাথ ভেল অলখিত
না দেখিয়া জিবন নিরাশ॥
কহ কহ কুসুম-পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত
শ্যাম-ভ্রমর কাহাঁ পাই।

১ গীত° ১।৪৫

কোন উপায়ে নাহ মঝু মীলব
উদ্ধব দাস তাহাঁ যাই ॥"[১]

"ত্রিংশে বিরহসন্তপ্ত গোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্"[২] বা ভাগবতের দশম স্কন্ধান্তর্গত ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপীদের যে ব্যাকুল কৃষ্ণানুসন্ধান তাকে আশ্রয় করেই উপরি-উক্ত পদের রসপরিকল্পনা সার্থক। গোপীবিলাপের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে আছে তরু-সম্ভাষণ। ভাগবতে দেখি, কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্তা গোপীরা বৃন্দাবন-পাদপের কাছে কৃষ্ণানুসন্ধান করে ফিরছেন; তাঁদের সম্ভাষণ থেকে চূত-প্রিয়াল প্রভৃতি সহ মল্লিকা-মালতীও বাদ পড়েনি। সর্বাধিক সম্বোধন-সৌভাগ্য লাভ করেছে "গোবিন্দচরণপ্রিয়া" তুলসী। প্রমাণ-স্বরূপ উক্ত অধ্যায়ের সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্লোকত্রয় উদ্ধার করা হলো।

"কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥"

অর্থাৎ, হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দচরণপ্রিয়া তুলসি, অলিকুলে ব্যাপ্তা তোমাকে ধারণ করে থাকেন তোমার অতি-প্রিয় অচ্যুত। কোন্ পথে গেছেন তিনি, দেখেছ কি?

"মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥"

হে মালতি, মল্লিকা, জাতি; যূথিকা, পুষ্পচয়ন-ছলে করস্পর্শে তোমাদের আনন্দিত করে সর্বানন্দনিকেতন ব্রজরাজনন্দন কোথায় গেলেন, দেখেছ?

"চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥"

হে চূত, প্রিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী পরোপকারী বৃক্ষগণ! কৃষ্ণবিরহে আত্মহারা এই ব্রজরমণীদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ বলে দাও।

এরই সঙ্গে তুলনীয় পদাবলীর কৃষ্ণ-মার্গানুসন্ধান:

"পনস পিয়াল চূতবর চম্পক
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া
আওল তুলসি সমীপ ॥

১ তরু ১২৫৯ ২ শ্রীধরটীকা

জাতি যূথি নব-মল্লিকা মালতি
পূছল সজল-নয়ানে।
উতর না পাইয়া সতিনি সম মানই
দূরহিঁ করল পয়ানে॥'[১]

প্রধানা গোপীসহ কৃষ্ণের অন্তর্ধানের অন্যান্য মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিষ্ণু-পুরাণ তথা ভাগবত-বিখ্যাত পুষ্পসজ্জারও সযত্ন উল্লেখ পাই পদাবলীতে :

"ঠামহি ঠাম চরণ-চিহ্ন হেরই
রাই করল যাহাঁ কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল
সুরত-রভসে ভেল ভোর॥"[২]

ভাগবতে কৃষ্ণ যাঁর কেশে পুষ্পসজ্জা করে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনোই নাম মেলে না। কিন্তু এই অনন্যা সৌভাগ্যবতী যে রাধাই, সে বিষয়ে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব টীকাকারগণেরই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তারও সংশয় মাত্র নেই : "রাই করল যাহাঁ কোর। কুসুস তোড়ি বহু বেশ বনায়ল"।

এরপর প্রধানা গোপীকে পরিত্যাগের ভাগবতানুমোদিত দৃশ্যেও পদকর্তা রাধা-নাম অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

"সকল রমণিগণ ছোড়ি বর-নাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই
কেশ-বেশ করি দেল॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কান্ধে চড়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে বচন বহু-বল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল॥
না দেখিয়া নাহ তাহিঁ ধনি রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ-রমণীগণ না দেখিয়া মন-দুখে
ভাসল বিরহ-হিলোলে॥

---

১ তরু ১২৬০.   ২ তরু ১২৬১

উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদতি রাধা।
সখিগণ মেলি ধরণি পর লুঠই
উদ্ধবদাস চিতে বাধা ॥"[১]

ভাগবতেও কৃষ্ণ-পরিত্যক্তা প্রধানা গোপীকে "হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ। দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং"[২] বলে ক্রন্দন করতে শুনি। উদ্ধবদাসের পদে "হা প্রাণনাথ উতরোলে" অংশে সেই একই অশ্রু-উৎসের দ্বার নির্বারিত।

অতঃপর সমবেত গোপীর প্রার্থনায় কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব জ্ঞানদাসের পদে একদিকে যেমন ভাগবতসম্মত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি মৌলিক কবিত্বকল্পনাতেও হয়েছে মণ্ডিত :

"যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-বধূগণে
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহু ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন
অমিয়া-সাগরে কেলি ॥
চাতকিনীগণ হেরি নব ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে ॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়া রাশি।

১ তরু ১২৬২
২ ভা° ১০।৩০।৩৯

জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি॥"[১]

এখানে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানদাস ভাগবতের অনুসরণে[২] বলরামের রাস-বর্ণনামূলক পদও রচনা করেছেন। "বিহরতি রাসে রসিক বলরাম। রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম" ইত্যাদি পদ তারই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে। পদাবলীতে ভাগবতীয় রাসের সর্বাংশ গ্রহণের এটি একটি নির্ভুল দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের পর মূল রাস এবং রাসান্তে জলক্রীড়া। পূর্বে মূল রাসের পর্যায়ে গোবিন্দদাস-কৃত শ্রেষ্ঠ পদসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে জ্ঞানদাসের একটি পদ উদ্ধৃত হবার দাবী রাখে:

"রাসবিলাসে রসিকবর নাগর
বিলসই রসবতীমাঝে।
মনোহর বেশ বয়স বৈদগধি
অবধি করিয়া ধ'ন সাজে॥
এক অপরূপ রস এহ ক্ষিতিমণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি- দিবস রসআয়তি
শ্যামর ঘন রসপুঞ্জে॥
গুঞ্জরে অলিকুল কীর মধুর ধ্বনি
কোকিল পঞ্চম গানে।
ফিরত মনোহর ময়ূর ময়ূরী কত
মদনহাট রাতিদিনে॥
বাজত বহুবিধ যন্ত্র একতান
সঙ্গে রঙ্গে রসগীতে।
নারী পুরুষ দোঁহে ভাবে বিভোর তনু
জ্ঞান নেহারয়ে নিতে॥"[৩]

যেমন রাসবিলাসে, তেমনি রাসান্ত জলকেলিতেও পদকর্তার সর্বময়ী সর্বেশ্বরী পরদেবতা হলেন রাধা। কৃষ্ণের জলক্রীড়াও তাই শেষ পর্যন্ত যুগলরসেরই আকর হয়ে উঠেছে। পদকর্তা শ্যামদাসের পদেই তো দেখি,

১ তরু ১২৬৫ ২ দ্র° ভা° ১০।৩৪, ১০।৩৩ অধ্যায়

৩ 'বৈষ্ণব পদাবলী,' সাহিত্যসংসদ প্রকাশিত, পৃ° ৪৪১

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতে শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব স্বপ্নদর্শনের অনুরূপ স্বপ্নবিলাস হেম ও নীল যুগলকমলকে আশ্রয় করেই ভেসে চলেছে যমুনাতরঙ্গে :

"হেম-কমলিনি সঞে নীল কমল জনু
ভাসই যমুনা-তরঙ্গে ॥"

অনন্তদাসের পদে উপরি-উক্ত রূপকল্পটিরই ঈষৎ স্বতন্ত্র রূপ দেখবো :

"যৈছে যমুনাক মাঝে বিহরই
কনকময় মিরিণাল রে ॥"

এটি কৃষ্ণময় পদাবলীসাহিত্যের যমুনাজলতরঙ্গে ভাসমানা অদ্বিতীয়া "কনকময় মিরিণাল" রাধারই অদ্বিতীয় প্রতীক হয়ে উঠেছে। জয়দেবের রাসে রাধা ভিন্ন অন্য গোপীজনেরও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও রাসলীলায় রাধানুমোদিত হয়ে কৃষ্ণ অন্য গোপীসঙ্গ স্বীকার করেছিলেন। পক্ষান্তরে পদাবলীতে রাধাই কূটস্থা নায়িকা, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী 'সাধারণী', অপরাপর গোপীবৃন্দও রাধার কায়ব্যূহ সখী মাত্র। ভাগবতীয় সাধারণ গোপীপ্রেম এইভাবে বহুযুগের একাধিক কবিকল্পনার বিচিত্র স্তরপরম্পরা অতিক্রম করে এসে শেষে পদাবলীর সবিশেষ রাধাপ্রেমেই পূর্ণ বিকশিত।

'অথ সুদূরঃ প্রবাসঃ'। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন-সিন্ধু এই 'সুদূর প্রবাসে'র বাসুকি-পীড়নে মথিত হয়েই 'বিষামৃতে একত্র মিলন' রাধাপ্রেমের পূর্ণ-কলসটি উদ্ধার করেছে। ভাগবতে দেখেছি, কুচক্রী কংসের আদেশে অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরার রাজসভায় নিয়ে যেতে এসেছিলেন। অক্রূরসহ কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাপ্রস্থানই বৃন্দাবনগোপীর জীবনে অপ্রতিবিধেয় কৃষ্ণবিরহানলের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, ভাগবতে কৃষ্ণের গোপীলীলার এখানেই পরিসমাপ্তি। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ-দূত উদ্ধব ব্রজস্ত্রীদের সান্ত্বনাস্বরূপ দয়িতবাণী বহন করে এনেছিলেন। এমনকি আরো পরে প্রভাসে প্রিয়তমের সঙ্গে তাঁদের মিলনের প্রসঙ্গও পরমস্বাদু হয়ে আছে ভাগবতে : "গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বাস্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥"[১] অর্থাৎ, বহুদিন পরে চির-অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গোপীরা

১ ভা° ১০।৮২।৩৯

অনিমেষদর্শনের ব্যাঘাতকারী নয়নপল্লবের স্রষ্টা বিধাতাকে নিন্দা করে দৃষ্টির দ্বারপথে হৃদয়মন্দিরে দয়িতকে এনে তাঁকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

পদাবলীতেও কৃষ্ণ-গোপীর বিরহ চির-বিচ্ছেদের ব্যঞ্জক হয়ে ওঠেনি। তাই কৃষ্ণের মথুরাগমনের পরেও বাসন্তরাসাদি বিবিধ লীলাপর্যায়ে আমরা কৃষ্ণ-গোপীর পুনর্মিলন প্রত্যক্ষ করি। আসলে রাধা-কৃষ্ণের চিরবিচ্ছেদে বিশ্বাসী নন পদকর্তা। প্রসঙ্গত রূপের প্রতি শ্রীচৈতন্যের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ মনে পড়ে যায়:

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥"[১]

লঘুভাগবতামৃতেও শুনি অনুরূপ কথা: "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি"[২]।

শুধু চৈতন্যবর্তী ও পরবর্তী যুগের পদসাহিত্যেই নয়, প্রাক্‌চৈতন্যযুগে বিদ্যাপতির ভাবসম্মিলনের পদেও রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ পুনর্মিলন সাধিত। "সুজনক বিরহ দিবস দুই চারি" বলে বিদ্যাপতি সেই পুনর্মিলনেরই মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ণিত 'সুদূর প্রবাস'কে তাই সাময়িক বিরহ বলেই স্বীকার করতে হয়। সেইসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন, কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষের নির্বাসনদণ্ড ছিল মাত্র একবৎসরের। কিন্তু কালের হিসাবে এক বৎসর মাত্র হলেও বেদনার গভীরতায় এবং তীব্রতায় তা ছিল একান্তভাবেই সর্বগ্রাসী। বৃন্দাবনবধূদের বিরহও অনুরূপ। অর্থাৎ তা সাময়িক বিচ্ছেদ মাত্র হলেও, এ-বিচ্ছেদে তাঁরা গোবিন্দ-পরিত্যক্তারূপে প্রাবৃষায়িত নয়নে সর্বজগৎ শূন্য দেখেছিলেন। পদাবলীর পরিভাষায় সুদূর প্রবাসাখ্য এ-বিরহই 'মাথুর' নামে পরিচিত।

রূপ গোস্বামীর অভিমত অনুসারে সুদূর প্রবাস আবার ত্রিবিধ: "ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে"[৩]। উভয়ত ভাগবত ও পদাবলী থেকে উপরি-উক্ত বিরহ-পর্যায়ের ত্রিবিধ উদাহরণই সংগ্রহ করা যায়।

ভাগবতে ভাবী বিরহের আশঙ্কা অনুভূত হয়েছে অক্রূরের আগমন-সংবাদে; ভবন্ বিরহ উচ্ছ্বসিত প্রস্থানোন্মুখ কৃষ্ণের রথারোহণে এবং ভূত বিরহ পরিপ্লাবিত—উদ্ধব-সন্দেশে। গোপীচিত্তে ভাবী বিরহের আশঙ্কা সঞ্চারিত করে শুকদেব বলছেন:

১ চৈ. চ. অন্ত্য।১ ২ ৫।৪৬১ যামলবচনম্ ৩ উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ প্র° ১৫৮

"গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্॥"[১]

অক্রূর রামকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাবার জন্য আসছেন, এ সংবাদ শ্রবণে পরম ব্যথিতচিত্ত গোপীবৃন্দের বিচিত্রপ্রতিক্রিয়া ও শুকদেব-ভাষণে বিশদীভূত। "হৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ"—হৃত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় কোনো কোনো গোপীর মুখশ্রী ম্লান হয়ে গেল। "স্রংসদ্দুকূল-বলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ"—শোকাবেগ-বশত কারো কারো দুকূল-বলয় কেশগ্রন্থি স্খলিত হয়ে পড়লো। "তদনুধ্যান-নিবৃত্তাশেষ বৃত্তয়ঃ। নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব"—কারো কারো আবার কৃষ্ণানুধ্যানে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায় দেহজ্ঞান রইল না[২]। অন্যান্য গোপীদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষ্ণের বচনাবলী, কেউ কেউ কৃষ্ণের গতি-চেষ্টা-হাস্য, "গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম। শোক-পহানি নর্মাণি" চিন্তা করে বিহ্বল হলেন। তাঁরা সমবেত খেদোক্তিতে বিধাতাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। তাঁদের সেই বিধাতা-নিন্দনের মর্ম অনুধাবন করতে গিয়ে চৈতন্যদেবের পরমপ্রিয় শ্লোকটি স্মরণ করা যায়

"অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান বিযুনক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥"[৩]

কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যানুবাদে

"না জানিস্ প্রেমধর্ম্ম ব্যর্থ করিস পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস বিধান॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাইয়া সম্মিলন,
অকৃতার্থান কেনে করিস্ দূর॥"[৪]

প্রথমে আক্ষেপ 'ধাতরি'—বিধাতায়। পরে তা গিয়ে পড়ে কংসদূত 'ক্রূর' অক্রূরে: "ক্রূরস্তমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম নশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ"। শেষে আক্ষেপ কৃষ্ণের প্রতি:

---

১ ভা° ১০।৩৯।১৩ ২ "ইমং লোকং দেহমপি ন জানন্তি স্ম। মুক্তা ইবেতি" শ্রীধরটীকা

৩ ভা° ১০।৩৯।১৭ ৪ চৈ, চৈ. অন্ত্য।১৯

"ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।

বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ॥"[১]

নন্দতনয়ের সৌহৃদ্য ক্ষণভঙ্গুর এবং যাঁর জন্য গোপী গৃহ-স্বজন পতি-সুত সর্বস্ব সমর্পণ করেছে, তিনি "নবপ্রিয়ঃ" অর্থাৎ "নিতুই নতুন" চান—এই নিষ্ঠুর অভিযোগে ব্রজগোপীর অভিমান সহস্রধারে নির্বারিত।

এবার 'ভবন্ বিরহ'। কৃষ্ণ রথে আরোহণ করছেন, চারিদিকে ব্যস্ততা। এদিকে গোপীরা হৃদয়শোণিতের মূল্যে নিষ্করুণ সত্যকে অনুভব করছেন: "দৈবঞ্চ নোহদ্য প্রতিকূলমীহতে॥"[২] আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল।— এই আসন্ন কৃষ্ণবিরহ তাঁরা পার হবেন কি করে। তাঁদের অন্তরে যে রাসক্রীড়ায় কৃষ্ণের আলিঙ্গন-স্মৃতি এখনও জাগরূক!

"যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্রলীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।

নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥"[৩]

যাঁর অনুরাগ-ললিত মৃদুহাস্যে, রহঃসংলাপে, লীলায়িত কটাক্ষে এবং আলিঙ্গনে রাসক্রীড়ার রাত্রিগুলি ক্ষণমাত্রের মতো অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত দুঃসহ বিরহদুঃখ তাঁরা অতিক্রম করবেন কেমন করে?

এই "ক্ষণমিব ক্ষণদা" বা ক্ষণিকের মতো অতিবাহিত রাসরজনীর স্মৃতিতে একান্ত-সন্তাপিত গোপীদের 'আবার আসব'[৪] বলে কৃষ্ণ রথাবিষ্ট হলেন। যতক্ষণ তাঁর রথপতাকা ও চক্রধূলি দেখা গেল, ব্রজবধূরা চিত্রপুত্তলির মতো নিস্পন্দ হয়ে থাকলেন, তারপর প্রিয়চরিতগান কণ্ঠহার করে অতিকষ্টে বিরহব্রত যাপন করতে লাগলেন। এখানেই ভূত বিরহের সূচনা। উদ্ধব-সন্দেশের ভ্রমরগীতা এই ভূত বিরহেরই মর্মনিষ্ক্রান্ত অনলগীত।

অতঃপর বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবী ভবন্ ভূত বিরহের মর্মানুসন্ধান করা যাক। এ-পর্যায়ে বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের লেখনী অবিনশ্বর। ভাবী বিরহের উদাহরণ হিসাবে শেষোক্তের পদ প্রথমেই উদ্ধৃত হতে পারে:

"ঝাঁপল উতপল লোরে নয়ান।
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহিঁ রাখি।
তনু মন দুহুঁ মুঝে দেয়ত সাখী॥

১ ভা° ১০।৩৯।২২ ২ ভা° ১০।৩৯।২৭ ৩ ভা° ১০।৩৯।২৯

৪ "সপ্রেম রায়াস্ত ইতি" ভা° ১০।৩৯।৩৫

তব কাছে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ কর-তলে হোয় ॥"[১]

"বজবক বারণ কর-তলে হোয়" এই কাকূক্তি প্রয়োগে অমোঘ নিয়তিই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কেননা "ক্রূর অক্রূর" দ্বারে সমাগত :

"নামহি অক্রুব ক্রূব নাহি যা সম
সো আওল ব্রজ মাঝ।
ঘবে ঘবে ঘোষই শ্রবণ-অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ ॥
সজনি বজনি পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতব
মন্দিবে বহু বনমালী ॥
যোগিনি-চরণ শবণ কবি সাধহ
বান্ধব যামিনি-নাথে।
নখতর চাঁন্দ বেকত বহু অম্ববে
যৈছে নহত পরভাতে ॥
কালিন্দি দেবি সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কীযে শমন আনি তুবিতে "মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে ॥"[২]

অতঃপর বাধাব আক্ষেপ—"কঠিন পবাণ" কৃষ্ণে :

"যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন বঞ্জলুঁ
দুবজন কি কি নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুরী পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥"[৩]

অপর একটি পদে ভাগবতবহির্ভূত, কিন্তু করুণতম দৃশ্যের অবতারণা করেছেন পদাবলীকার :

১ তরু ১৬০১ ২ তরু ১৬০২ ৩ তরু ১৬০৪

"কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ।
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলু কানু চলব পরদেশ॥"[১]

মান-ভ্রমের অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ প্রবাস প্রসঙ্গের উত্থাপন 'মানিনী ধনি'র কাছে এসেছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই। ইতিমধ্যে দেখেছি, ভাগবতে আছে, যাত্রার পূর্বমুহূর্তে কৃষ্ণ সান্ত্বনাবাক্যে গোপীদের আশ্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। রাধানুগতা সখীভাবে বিভাসিত মহাজন পদকর্তা এ-ঘটনাটিকেই কত মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে, উদ্গত দীর্ঘশ্বাসে তার প্রমাণস্বরূপ পদকল্পতরুর একটি পদ নিম্নোদ্ধৃত হলো।

"কানু-মুখ হেরইতে ভাবিনি রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বরবিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
তব বিরহিণি ধনি পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুই কানুক হাথ।
যতনে ধরল ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহ মাথুর করব পয়ান॥
যব ধনি পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি দুহুঁ তব ছোড়ি নিশাস॥
রাই-পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥"[২]

১ তরু ১৬০৯ ২ তরু ১৬১৯

"অব নাহি মাথুর করব পয়ান"—মথুরায় এখন যাবেন না কৃষ্ণ, এই আশ্বাস দিয়ে যাঁর জীবনরক্ষা করতে হয়, তাঁকে ভবন্ বিরহের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন কেমন করে বিদ্যাপতি, তাঁর যে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, "বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি"! অথচ ব্রজনাট্যলীলায় সবচেয়ে মর্মভেদী করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে ভবন্ বিরহেই, ভাষান্তরে 'রথের আগে':

"খেনে ধনি রোই বোই খিতি লুঠত
খেণে গীরত রথ আগে।
খেনে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ
মানই করম অভাগে॥
দেখ দেখ প্রেমক রীত।
করুণা-সাগরে বিরহ-বিয়াধিনি
ডুবায়ল সবজন-চীত॥
খেণে ধনি দশনহি তৃণ ধরি কাতরে
পড়িলহিঁ রাম সমুখে।
শিবরাম দাস ভাষ নাহি ফুরয়ে
ভেল সকল মন-দুখে॥"[১]

যে চরম বেদনাবিদ্ধ মুহূর্তে ব্রজভাবানুগত পদকর্তার "ভাষ নাহি ফুরয়ে", বাক্যস্ফূর্তি ঘটে না, সেই বক্ষে শেলবিদ্ধ প্রহরে ব্রজবাসীর, বিশেষত রাধার পক্ষে মূর্ছিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। আর মূর্ছারই সুযোগে অক্রূর রথ নিয়ে করেন প্রস্থান:

"রাধামোহন পহু আগমন সঙ্কেতে
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রুর পুন সময়হি ঐছন
রথ লেই করল পয়ান॥"[২]

তারপর মূর্ছাভঙ্গে?

"না দেখিয়ে রথ আর না দেখিয়ে ধূল।
নিচয়ে জানলুঁ মোহে বিধি প্রতিকূল॥"[৩]

আমরা তো পূর্বেই দেখেছি, ভাগবতেও গোপীবৃন্দ কৃষ্ণের রথের ধূলি যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সেদিকে চেয়েছিলেন, তারপর কৃষ্ণেরই নানা

১ তরু ১৬২৬ ২ তরু ১৬২৭ ৩ তরু ১৬২৯

লীলাকথা কণ্ঠে ধারণ করে অতিকষ্টে জীবনধারণ করেছিলেন। তাঁদের সেই 'ভূত' বিরহসন্তাপ যে উদ্ধবসন্দেশে বর্ণিত হয়েছে তাও অনুল্লিখিত থাকেনি। পক্ষান্তরে পদকর্তা ভাগবত-ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করে দূতীপ্রেরণ তথা রাধাবিরহবার্তা নিবেদনের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত প্রথমেই স্মরণীয় মথুরা-নিবাসী কৃষ্ণসমীপে "সন্দেশ-প্রেষণম্"। কৃষ্ণ-বিরহিত গোপীসাধারণের উন্মাদপ্রায় আচরণের বিবরণ দূতী-রূপী পদকর্তার মুখে পাই এইভাবে :

"কুন্তল তোড়ই বসন কোই ফারই
বিধিরে দেই কেহ গারি ॥
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন
কোই কোই হরই গেয়ান।
কহ ঘনশ্যাম হাম চলি আয়লু
পুন কিয়ে ভেল না জান ॥"[১]

এদিকে গোকুল নগরে "পুন কিয়ে ভেল" তারই বিবরণে বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত পদটিই উদ্ধার করা যায় :

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুল উছলল করুণাক রোল।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিলোল ॥
শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী।
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী ॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর ॥
সহচরি সঞে যাঁহা করল ফুলধারি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তহিঁ রহু কান ॥"[২]

"শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী। শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরী"— কৃষ্ণবিরহে এই সর্বশূন্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণপরিত্যক্তা রাধার বোধকরি শেষ উপমান

---

১ তরু ১৬৩৩ ২ ১৬৩৯

'বিপথে পতিত মালতীর মালা': "হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতি-মালা॥" একমাত্র শ্যামগরবে গরবিণী হয়ে যিনি আর কিছুকেই গণ্য করেননি, সেই পরমধন শ্যামের মথুরাগমনে রাধার শুধু প্রাবৃষায়িত নয়নে পথ চেয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি! তাঁর একটি নিমেষ যে চারটি যুগ হলো! "সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি. তিল এক হয় যুগ চারি।" বলা বাহুল্য, যমুনাতীরের এই দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রতীরের গম্ভীরাবায়ুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে:

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনি পোহায়॥"

বিরহের কোজাগর রজনীতে গৌরচন্দ্রেরও নিমেষ যুগ হয়েছিল, চক্ষু হয়েছিল প্রাবৃষায়িত এবং জগৎ সর্বশূন্য। বৈষ্ণব রসিক যথার্থই বলেছিলেন, "চরিত পদাবলী দ্বারা, পদাবলী চরিত দ্বারা এবং উভয়ই শ্রীগৌরহরির লীলারস দ্বারা বুঝিতে হয়"। বস্তুত পদাবলীসাহিত্য গৌরলীলারসের সাহায্যেই একমাত্র সুপরিস্ফুট হয়ে থাকে। তারই উদাহরণস্বরূপ ভাগবতীয় ভ্রমরগীতা লীলাপর্যায়টি স্মরণ করা যেতে পারে।

উজ্জ্বলনীলমণিকার রূপ গোস্বামী চিত্রজল্পকে দিব্যোন্মাদের ভেদ-বিশেষ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রিয়জনের ঘনিষ্ঠ কোনো সুহৃদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অবহিত্থা ভাব অবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধ যখন গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য, ঔৎসুক্যসহ চরমে পৌঁছে সোৎকণ্ঠ আলাপ হয়ে ওঠে তখনই তা 'চিত্রজল্প' নামে পরিচিত হয়। এই "অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিসুদুস্তরঃ" চিত্রজল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে উজ্জ্বলনীলমণিতে ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের দ্বাদশ থেকে একবিংশ এই দশটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধবদূতের সমীপে কোনো গোপীর চিত্রজল্পাখ্য দিব্যোন্মাদের লক্ষণাক্রান্ত এই দশটি শ্লোকই ভারতীয় কাব্য-পুরাণশাস্ত্রে 'ভ্রমরগীতা' নামে সুখ্যাত। ভ্রমরগীতার দশটি শ্লোককে পৃথক্ পৃথক্ দশটি বিভাগে বিভক্ত করে কিভাবে রূপ গোস্বামী কাব্যাস্বাদন বহুগুণ বর্ধিত করেছেন এবং কিভাবেই-বা করেছেন ভাগবতার্থের মর্মানুগ্রহণ, তা তো আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে দেখা যাক ভ্রমরগীতার দিব্যোন্মাদ চৈতন্যলীলা-রসের মধ্য দিয়ে কতটা মূর্ত হয়ে উঠতে পেরেছে পদাবলীসাহিত্যে।

ভ্রমরগীতার আদিশ্লোকে চরণপ্রত্যাশী উদ্ধবকে ভ্রমরভ্রমে অবজ্ঞা করে

বলেছিলেন গোপী, হে ভ্রমর, হে কপটের বান্ধব, আমাদের পাদস্পর্শ করো না। সপত্নীর বক্ষে বিমর্দিত মালার কুঙ্কুম তোমার শ্মশ্রুতে বিলিপ্ত হয়ে আছে যে! মধুপতি সেই মানিনীদেরই প্রসন্নতা বিধান করুন। তাঁরই দূত তুমি, অথচ একী তোমার আচরণ [তুমি আমাদের চরণ স্পর্শ করতে চাইছো]! এরজন্য যে যদুসভায় তুমি উপহসিত হবে।[১]—বস্তুত অসূয়ায় ঈর্ষায় মদযুক্ত উপেক্ষায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে শ্লোকটি। চৈতন্যজীবনে অনুরূপ দিব্যোন্মাদ-দশা প্রকটিত হয়েছিল একটি ভ্রমরকে অবলম্বন করে, বাসুঘোষের পদাবলীতে উক্ত দশাও অবিস্মরণীয় :

"নিরজনে বসি ভাবে পূরব বিচ্ছেদে।
কোথা কৃষ্ণ বলি গোরা আঁখি মুদি কান্দে ॥
ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ড়ে।
চমকি চাহিয়ে কহে সুমধুর স্বরে ॥
ছেদে রে নিলাজ অলি না পরশ মোরে।
কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে ॥
মথুরা-নাগরি-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত।
কৃষ্ণ অঙ্গে বনমালা অতি সুবাসিত ॥
সো রস লাগল তোহারি বদনে।
মধুপুর যাহ অলি ছোড়ি মঝু সদনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে কান্দিয়ে কান্দিয়ে।
মুঞি পাপী মরি গোরার বালাই লইয়ে ॥"[২]

লক্ষণীয়, ভাগবতে উদ্ধবই ভ্রমর-রূপে কল্পিত। পক্ষান্তরে চৈতন্যবিরহদশায় ঈর্ষা অসূয়া মদযুক্ত অবজ্ঞার উদ্দীপক হয়েছে যথার্থই একটি ভ্রমর : "ঝঙ্কার করয়ে অলি চরণ-নিয়ড়ে"। পরমাশ্চর্যের ব্যাপার, পদাবলীসাহিত্যে রাধার অনুরূপ দশাতেও 'চমৎকৃতিসুদুস্তর ভাববৈচিত্রী'র উদ্দীপক হয়েছে উক্ত ভ্রমরই। জ্ঞানদাসের প্রাসঙ্গিক পদটি মনে পড়ছে :

"যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ-সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মন-রঞ্জনে
মীলল মধুকর-রাজ ॥

১ ভা' ১০।৪৭।১২ ২ 'বাসুঘোষের পদাবলী,' মালবিকা চাকী-সম্পাদিত, ৫১ পদ

রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিণি রাই।
সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোঁহারি॥
পুর-রঙ্গিণি-কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥"[১]

কৃষ্ণবিরহ-তাপিত চৈতন্যের চরণে যেমন করে ঝঙ্কার করে ফিরেছিল অলি, তেমনি করেই পদাবলীতে তাকে সুমধুর গুঞ্জন করে ফিরতে দেখছি কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধার পদপ্রান্তে। আবার ভাগবতে উদ্ধবদর্শনে প্রধানা গোপীর যে-ভাব, সেই ভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্য যেমন ঈর্ষা-অসূয়ায় ভ্রমরকে বলেছিলেন, "মথুরানাগরি-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত। কৃষ্ণ অঙ্গে বনমালা অতি সুবাসিত" ইত্যাদি, তেমনি করেই পদাবলীতে রাধাও বলেন, "পুর-রঙ্গিণি-কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত / কানু-কণ্ঠে.বন-মাল"। কিন্তু ভগ্ন হবার সর্বপ্রকার কারণ থাকা সত্ত্বেও যে-প্রেম কদাপি ভগ্ন হয় না, তাইতো পরমপ্রেম। সেই পরমপ্রেমেই যথা-তথা-লাম্পট্যপরায়ণ দয়িতকে চৈতন্য 'প্রাণনাথ' সম্বোধনই করেছিলেন, অন্য কোনো সম্ভাষণ নয়: "কৃষ্ণ প্রাণনাথ মোর মথুরা নগরে"। তাঁর শিক্ষাষ্টকের ভাষায়: "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম-দর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ"—তিনি তাঁর এই পাদরতা আমাকে আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্টাই করুন কিংবা দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, যত্রতত্র বিহারই করুন না কেন, তিনি আমার প্রাণনাথই, অন্য কিছু নন। আমরা তো জানি, ভাগবতীয় গোপী, কৃষ্ণের অদর্শনে মর্মহতা হয়েও তাঁকে 'আর্যপুত্র' সম্বোধন করেছিলেন। "অপিবত মধুপুর্যামার্যপুত্রঃ" শ্লোকে সেই পরমপ্রেমোত্থ সম্ভাষণই অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অর্থাৎ, ভাগবতের 'নিরবদ্য' গোপীপ্রেমে

১ তরু ১৬৫৬

বিভাবিত হয়েই শ্রীচৈতন্য তাঁর যথা-তথা-লাম্পট্য-পরায়ণ দায়িতকে 'প্রাণনাথ' বলে জেনে একান্ত আত্মনিবেদন করতে পেরেছেন। আর এই ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের নিত্যস্বরূপকে সম্মুখে রেখেই বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধাবিরহের ক্ষণকালীন পূর্বমেঘকে অতিক্রম করে উত্তরমেঘে 'জগতের নদী গিরি সকলের শেষে' কৃষ্ণমিলনের নিত্য-বৃন্দাবন-ধামকে স্পর্শ করে গেয়ে উঠেছেন :

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"[১]

তবে ভাগবতীয় পরমপ্রেমকে আদর্শ করলেও এই ভাবোল্লাসের পদে এসে বৈষ্ণব পদকর্তা ভাগবতকেও অতিক্রম করে গেছেন। ভাগবতে কুরুক্ষেত্র-মিলনে গোপীরা, তাঁদের চির-আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণদর্শনের বাধা সৃষ্টি করেছেন যিনি সেই বিধাতাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, এমনই অপূর্ব ছিল তাঁদের প্রেমৌৎসুক্য। কিন্তু শেষপর্যন্ত কৃষ্ণকর্তৃক গোপীবৃন্দের অধ্যাত্মশিক্ষণের প্রসঙ্গে ভাগবতে মাধুর্যরসের রাজ্যে অকস্মাৎ ঐশ্বর্যশিথিল জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর পদসাহিত্যে মাথুরান্ত ভাবোল্লাসে বিশুদ্ধ মাধুর্যরসের পরম নিষ্কাশন ঘটেছে বলে আমাদের অনুভব :

"আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥"[২]

বিরহিনী রাধার পক্ষে কৃষ্ণ-পুনর্মিলনের এই আনন্দোচ্ছ্বাস কত স্বাভাবিক হয়েছে—কৃষ্ণবিরহে যাঁর সর্বজগৎ শূন্য হয়েছিল, আজ তাঁরই দশদিক্ হয়েছে নির্দ্বন্দ্ব, তাঁর গৃহকে আজ গৃহ বলে মনে হচ্ছে দেহকে দেহ, সার্থক তাঁর জীবন, সফল তাঁর যৌবন। প্রিয়বিচ্ছেদের অবসরে 'পাপ বসন্ত' যত দুঃখ

১ 'বিদ্যাপতির পদাবলী,' মিত্র-মজুমদার সং, ৭৬১ পদ

২ তত্রৈব, ৭৬০ পদ

দিয়েছিল, আজ তা সুখ হয়ে ফলে ওঠার দিন, এখন কোকিল লক্ষ লক্ষবার ডাকুক, উদিত হোক লক্ষ চন্দ্র, বয়ে যাক মৃদুমন্দ মলয় পবন, মদনের পঞ্চবাণ হয়ে উঠুক লক্ষবাণ, বহু বিরহরজনী পারে আবার দয়িতের মুখদর্শন করেছেন তিনি আজ, তাঁর প্রেমের কি অল্পভাগ্য ?

"সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥"[১]

ভাগবতে কুরুক্ষেত্রমিলনে গোপীরা কৃষ্ণকে দূর থেকেই শুধু দৃষ্টিপথে এনে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আর পদসাহিত্যে রাধা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়ে দেহের দেউলেই দয়িতের অরাধনা করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদটি মনে পড়ছে :

"পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল জতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচজুগ রাখি।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলি রোপব হম গরুআ নিতম্ব।
আম-পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥
দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আস।
দুই এক পলকে মিলব তুঅ পাস॥"[২]

---

১ তত্রৈব

২ 'বিদ্যাপতির পদাবলী···৭৫৪ পদ' ইত্যাদি

যিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছায় দেহকে করেছেন দেউল, পঞ্চেন্দ্রিয়কে এক একটি মঙ্গলাচার অর্ঘ্য-পাত্র, তাঁর কাছে ভাগবতোক্ত কুরুক্ষেত্র-মিলনান্ত অধ্যাত্মশিক্ষণ বিড়ম্বনা মাত্র নয় কি? কৃষ্ণের "সংসার-কূপপতিতোদ্ধার" বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তরে গোপী-বিভাবিত শ্রীচৈতন্যের সেই গূঢ়রোষ-উপেক্ষা প্রার্থনা মনে পড়ে:

"দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাঁহা তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণে লহ তার পার॥"[১]

বস্তুত, একমাত্র চৈতন্য-চরিতের জীবন্ত রসভাষ্য সম্মুখে রেখেই বোঝা সম্ভব, অধ্যাত্মশিক্ষণে বা বৈরাগ্যকথনে নয়, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছায় রাধার অন্তিম আত্মনিবেদনেই কেন পদাবলীর শেষ-স্বর্গ বিরচিত। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন,

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।

১ চৈ, চ। মধ্য ১৩,১৩৫

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥"[১]

একদিন যিনি আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্টা করেছেন পরে তিনিই আবার অদর্শনে মর্মহতা করে চলে গিয়েছিলেন, তবু তাঁর পাদপদ্মেই রাধার একান্ত শরণাগতি : "শীতল বলিয়া শরণ লইনু / ও দুটি কমল-পায়"। রসিকজন এ-শরণাগতিকে নিশ্চয়ই অপবর্গপ্রদাতার পদে মোক্ষাভিলাষিণীর শরণাগতি বলে ভুল করবেন না। এ হলো নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্তির ভুবনে প্রেমের পরমদৈবতেরই পদাশ্রয়। আর ইহলোকে জীবনাট্যলীলায় এরূপ আত্যন্তিক পরমপ্রেমাশ্রয় যে সম্ভব, পরন্তু এ-প্রেমাশ্রয়ের দীপ্তি ও মহিমা যে মহাজন পদকর্তার মহাকবিজনোচিত কল্পনারই বস্তু মাত্র নয়, তাই প্রমাণ করেই শ্রীচৈতন্য 'অনর্পিতচরিত'। বস্তুত চৈতন্য না হলে, "বরজ-যুবতি ভাবের-ভকতি" হৃদয়ঙ্গম করে, এমন "শকতি হৈত কার"। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠিকই বলেছিলেন : "মহাপ্রভোঃ স্ফূর্তিং বিনা হরিলীলারসাস্বাদ-নানুপপত্তেঃ"। চৈতন্যচরিতের স্ফূর্তি না হলে হরিলীলারস আস্বাদনেরও উপপত্তি হতে পারে না। তাই তো গৌরচন্দ্রিকায় চৈতন্যলীলারসের অনুধ্যানে তদ্গত হয়ে তবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মধুরবৃন্দা-বিপিন-মাধুরীতে প্রবেশে সাহসী হয়েছেন। এ-পথে তাঁদের পাথেয় হয়েছে রাগানুগা সাধনভক্তি :

"হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন কাবব দোহাঁকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পুরি
যোগাইব অধর-যুগলে ॥

১ 'বৈষ্ণব পদাবলী', ক' বি' প্রকাশিত, ৭ম সং, পৃ' ৮২-৮৩

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোক-নাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥"[১]

ভাগবতে শ্রুত্যভিমানিনীরা গোপী-আনুগত্যে কৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবাধিকার প্রার্থনা করেছিলেন: "বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ"[২]। শ্রীচৈতন্যও রাগানুগা সাধনকে জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বলে নির্দেশ দিয়ে বস্তুত শ্রুত্যভিমানিনীদের গোপী-আনুগত্যকেই সমর্থন করে গেছেন। ফলত ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীপ্রেমেরই স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের পথ হয়েছে উন্মুক্ত। ভাগবতের কৃষ্ণগোপী-প্রেম চৈতন্য-আস্বাদনে এইভাবে হয়ে উঠেছে 'উন্নত' 'উজ্জ্বল' রস। আর সেই 'উন্নতোজ্জ্বল রসে'র সাধনায় পদাবলী হয়েছে শ্রবণাদি নবাঙ্গ যোগের অন্যতম 'কীর্তন', এবং পদকর্তা নিজে যুগলকেলি-কল্পতরুর 'লীলাশুক'॥

ভাগবত ও চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য

জীবনী-সাহিত্য ভারতীয় কাব্যধারায় অভিনব নয়। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' বা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বা কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' ভারতীয় ধ্রুপদী জীবনী-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পুরাণের দশলক্ষণের মধ্যে 'ঈশানুচরিত' একদা ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'ঈশানুচরিত' অর্থাৎ ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তের জীবনচরিত। ভাগবতের নারদ-শুকদেব, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-অম্বরীষ, বিদুর-উদ্ধব প্রমুখের কাহিনী এ-পর্যায়ে পড়ে। বাঙ্‌লা-দেশে জীবনী-সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত অবশ্য সংস্কৃতেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এদিক থেকে স্মরণীয়। কিন্তু অন্তঃপ্রেরণার স্বরূপ ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে বঙ্গদেশের ষোড়শ শতাব্দীর জীবনী-সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রাক্-প্রবাহের কোনো তুলনাই চলে না।

১ 'বৈষ্ণব পদাবলী', ক' বি সং, পৃঃ ১০৭ ২ ভাঃ ১০।৮৭।২৩

বাঙ্‌লাদেশে ষোড়শ শতকে চৈতন্যাবির্ভাব আকস্মিক নয়। বস্তুত তার নেপথ্যপ্রস্তুতি চলছিল অন্তত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু কালচক্রেরই অমোঘ নিয়মে অন্ধকারপটে আবির্ভূত হয়ে সূর্য যেমন নিখিল চৈতন্যলোককে সহসা উদ্বুদ্ধ করে তোলে, শ্রীচৈতন্যও তেমনি ইতিহাসের অদৃশ্য বার্ষিকগতির স্বাভাবিক নিয়মে অভ্যুদিত হয়েও বাঙালীর চিত্তকে এককালে বিস্মিত, অভিভূত, পুলকিত, এবং উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন। তিনি কলিযুগের মহিমা কীর্তন করেছেন, আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চার করতে চেয়েছেন, কর্ম-জ্ঞানেব উর্ধ্বে ভক্তির জয়গান গেয়েছেন। এ সবই "কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণ-র্কোঽধুনোদিতঃ"-ভাগবতের বিশিষ্ট ভাবনারই অঙ্গীভূত। তবে কালে লুপ্ত এই ভক্তিবার্তা বঙ্গদেশে এক নবীন ধর্মবার্তারূপেই পরিগৃহীত। বিশেষত, ভাগবতে যা ছিল প্রেমভক্তি, চৈতন্য-জীবন সাধনায় তাই হয়েছে 'উজ্জ্বলরস'। ভক্তির এই ব্যক্তিপরিচ্ছেদ-বিগলিত সাধারণীকরণই চৈতন্যের অনর্পিতচরিত। বর্ণ-জাতি-নির্বিশেষে স্বভক্তিশ্রী উজ্জ্বলরস সমর্পণে তিনি তাই ষোডশ শতকের বাঙ্‌লার নব জাগরণের প্রধানপুরুষ। বাঙালীর মানসজাগরণের "বৃহৎ রক্তাভ অরুণোদয়ে" শ্রীচৈতন্যের মানবিক ও ঐশ্বরিক জ্যোতিশ্চক্র থেকেই গৌড়ীয় ভক্ত ও সারস্বতসাধকবৃন্দ তিন শতাব্দীর সমিধ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। চৈতন্য-জীবনীসাহিত্য সেই রবিকবোজ্জ্বল নবপ্রভাতেরই পবিত্র হোমানল। একটি অভিনব মানব-আবির্ভাবেব যুগোচিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। শ্রীচৈতন্য আবাব 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ' তথা 'রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ' রূপে ভক্ত সাধারণের হৃদয়হরণ করে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁর অলৌকিক সত্তার নিগূঢ় রহস্যোন্মোচনে বৈষ্ণবীয় বিচিত্র মত ও পথাবলম্বী চরিতকারগণ লেখনীধারণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে, উক্ত চরিতকারগণ ছিলেন একান্তভাবেই চৈতন্য-রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক। ফলত, চৈতন্য-রেনেসাঁসের ভিত্তি যে ভাগবত পুরাণ-পুনরুজ্জীবন, তাতে ছিল তাঁদের নিগূঢ় মন্ত্রদীক্ষা। কাজেই চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভাগবত পুরাণের পুনরুদ্ধার এবং ঐতিহ্য স্বীকারের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণই হবে আমাদের আলোচনার একমাত্র বিষয়। আর এ-ব্যাপারে আলোচনার সুবিধার্থে অগণ্য চৈতন্যচরিতকার-দের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের নামই উল্লিখিত হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো, শ্রীচৈতন্যের আদি জীবনীকারগণ একমাত্র সংস্কৃতকেই আশ্রয় করেছিলেন। সংস্কৃতে পরিবেষিত চৈতন্যচরিত পাবো জীবনচরিতকাব্যে, নাটক-মহাকাব্যে তথা স্তব-বন্দনাবলীতে। চৈতন্যলীলার অন্তরঙ্গ পরিকরবৃন্দের রচিত এই মূল সংস্কৃত রচনাগুলিকে আশ্রয় করেই পরবর্তীকালে গৌড়ীয় ভাষায় বিপুল চৈতন্যচরিতসাহিত্য গড়ে উঠেছে। বঙ্গভাষায় চৈতন্যচরিতসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পী—বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেননি। তাঁদের সহায় ছিল চৈতন্য-পরিকর গুরুবৃন্দের পদাশ্রয় এবং গুরুবৃন্দ-রচিত পূর্বোক্ত জীবনীকাব্য, নাটক-মহাকাব্য ও স্তব-বন্দনাবলী। একটি উদাহরণযোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। বাঙ্‌লাভাষায় সর্বাদি চৈতন্যজীবনকার বৃন্দাবনদাসের মূল আকরগ্রন্থ মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য। অপরপক্ষে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মূলাশ্রয় মুরারিগুপ্তের কড়চা সহ কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর চৈতন্যবন্দনা-শ্লোকাবলী, রঘুনাথ গোস্বামীর স্তবাবলী, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত কাব্য ইত্যাদি। লক্ষণীয়, নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাস মুখ্যত নবদ্বীপগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাই তাঁর মূলাশ্রয় মুরারি গুপ্তের কড়চা। আর ষড়্‌গোস্বামীর পদানুরত কৃষ্ণদাস করেছেন মুখ্যত বৃন্দাবনের ইষ্টগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্ব, তাই তাঁর মূল সহায় ষড়্ গোস্বামীর রচনাবলী। কিন্তু সর্বোপরি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-নীলাচল-বৃন্দাবনের সকল ভক্তগোষ্ঠীর মত ও পথ মিলিত হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্যের বাল্য-জীবনলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণদাসের আশ্রয় যেমন মুরারি গুপ্ত, বিচিত্র মধ্যলীলা বর্ণনায় আশ্রয় তেমনি কবিকর্ণপূর, আবার অন্ত্যলীলার দিব্যবিরহ বর্ণনায় পরম সহায় রঘুনাথদাসাদি। কৃষ্ণদাস নিজেই তো স্বীকার করে গেছেন, চৈতন্যের এ-দিব্যলীলার সূত্রকার স্বরূপ দামোদর এবং বৃত্তিকার রঘুনাথ দাস। আসলে এই সমূহ সাধকের 'ধেয়ানের ধন'কে পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে তবেই চৈতন্যচরিতামৃত এমন অপরূপ হয়ে উঠতে পেরেছে। এদিক দিয়ে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলও ব্যতিক্রম নয়। তাঁর চৈতন্যমঙ্গলেরও প্রধান আশ্রয় মুরারি গুপ্তের কড়চা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাঙ্‌লাভাষায় তিন বিশিষ্ট চৈতন্য জীবনী-কারের চৈতন্যচরিতকাব্যের আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতে রচিত কয়েকখানি

মূল চৈতন্য-জীবনীকাব্য আলোচনা না করে উপায় নেই। এ-আলোচনার আবার সর্বাগ্রে স্থান পাবে মুরারি গুপ্তের কড়চা।

মুরারি গুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য শ্রীচৈতন্যের আদি ও প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। কাব্যখানির সূচনা চৈতন্যের জীবদ্দশাতেই হয় বলে অনুমান, সমাপ্তি তাঁর লীলাবসানের পর। মুরারি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর লোকান্তরও ঘটে শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের কিছু পরে। ফলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য রচয়িতা কবিকর্ণপূর যে মুরারিকে "আশৈশব-প্রভুচরিত্র-বিলাসবিজ্ঞ" বলেছিলেন, সেটি আর অত্যুক্তি মাত্র থাকে না, পরমসত্য বলেই প্রতিপন্ন হয়ে যায়। বিশেষত শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলার সূত্রকাররূপে মুরারির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাধুবাদ মনে পড়ে :

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥"[১]

মূলত আদিলীলার 'শুক' রূপে তাঁর প্রসিদ্ধি থাকলেও, চৈতন্যের অপরাপর লীলাও তাঁর চৈতন্যচরিত গান থেকে বাদ পড়েনি। সেই সমুদয় লীলাবর্ণনা অনুধাবন করলে, স্পষ্টই বোঝা যায়, ক্বচিৎ যুগাবতার বা হরেরংশ-রূপে বর্ণনা করলেও চৈতন্যদেবকে 'ভগবান্ স্বয়ম্' ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে বন্দনা করার প্রবণতাই তাঁর গ্রন্থে অধিকতর প্রবল। তাঁর চৈতন্যচরিত গ্রন্থের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্যও এখানেই—তিনিই সর্বপ্রথম ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুসরণে চৈতন্যজীবনলীলা পরিবেষণ করেছেন। ইতিহাসবিদের কাছে এর ফলে চৈতন্যজীবনীর ঐতিহাসিক মূল্য হয়তো কিছুটা খর্ব হয়ে গেছে, কিন্তু পুরাণ-গবেষকের নিকট একই ঘটনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্‌লাসাহিত্যে ভাগবত-প্রভাবের এটি একটি বড়ো প্রমাণ বলেই স্বীকৃতি লাভ করবে। ভাগবতের ভাবনায় চৈতন্য-জীবনভাগবতের রূপকল্পনার ক্ষেত্রে 'আদি সূত্রকার' রূপে মুরারির ভূমিকা কি, দু'একটি উদাহরণ যোগে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ভাগবতের উপক্রমণিকায় যেমন শৌণক-সূতপাঠক-সংবাদ স্থান লাভ করেছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রথম প্রক্রমের অন্তর্গত 'শ্রীনারদানুতাপ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গেও অনুরূপ প্রস্তাবনা উপস্থাপিত। এখানে

১ চৈ. চ. আদি। ১৩, ১৪

প্রশ্নকর্তা দামোদর পণ্ডিত, উত্তরদাতা মুরারি। শৌণকের মতো দামোদর পণ্ডিতেরও জিজ্ঞাসা ছিল, কলিকলুষ মোচনের পথ কোথায়। কোন্ "দিব্যামদ্ভুতাং লোকপাবনীম্" কথা শ্রবণ করলে ঘোর সংসারতাপের নিবৃত্তি ঘটে। এরই উত্তরদানে মুরারিগুপ্তের চৈতন্যচরিতামৃতরূপ নব-ভাগবতের সূচনা। এ-ভাগবত এমন এক ভাগবতপুরুষের পুণ্যচরিত কথা, যিনি রামাদি অবতারের তুল্য রাক্ষসবধাদি কায করেন না, করেন মনের দ্বারা নিখিল মানবের শুদ্ধি: "মনো নরাণাং পরিশোধয়স্ব"[১]। এই অভিনব চিত্তশুদ্ধি চৈতন্যাবতারের অন্যতম অনর্পিতচরিত-রূপে পরবর্তী সকল চরিতকারই স্বীকার করে গেছেন। চৈতন্যের জন্ম এবং কর্মাদিও মুরারির বর্ণনায় 'দিব্য' এবং 'অদ্ভুত'। ভাগবতে কৃষ্ণজন্ম যেমন অলৌকিক, মুরারির গ্রন্থে চৈতন্য-জন্মও তেমনি লোকোত্তর। তাঁর বিবরণ অনুসারে মনের দ্বারা কৃষ্ণচরণের প্রবল [illegible]যোগেই শচী-জগন্নাথের বিশুদ্ধ প্রেমার্দ্র চিত্তে নবশশিকলার তুল্য চৈতন্যস্ফূর্তি। আবার ভাগবতে দেবকী-গর্ভবন্দনার মত এখানেও শচী-গর্ভবন্দনা স্থানলাভ করেছে। চৈতন্যাবির্ভাবের পটভূমিকাও কৃষ্ণা-বির্ভাবের ভাগবতীয় প্রেক্ষাপট স্মরণ করাবে। সেই একই সর্বগুণোৎকর্ষ কাল, শুচি পুণ্যগন্ধবহ, শুদ্ধসলিলা স্বর্নদী, প্রসন্ন দেবদ্বিজ। পার্থক্য এই মাত্র, কৃষ্ণপক্ষে ছিল ভাদ্রমাস, চৈতন্যপক্ষে ফাল্গুন। মুরারির বর্ণনা শোনা যাক:

> "ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে।
> কালে সর্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে॥
> মনঃসু দেবসাধূনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে।
> স্বর্নদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥"[২]

এই "স্বয়ং হরিঃ" শ্রীচৈতন্যের 'গণে' নীলাম্বর চক্রবর্তী গর্গমুনি-স্বরূপ। তিনিই গণনা করে জগন্নাথের নবজাত শিশুটির ভগবত্তার কথা সর্বপ্রথম জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে চরিতকারের অভিমত। মুরারির গ্রন্থে নিত্যানন্দের অবতারত্বও স্বীকৃত: "বলদেবাংশতো জাতো মহাযোগী স্বয়ং প্রভুঃ"[৩]।

আমরা জানি, গৌড়বঙ্গের তিন প্রধান গৌরপারম্যবাদীর অন্যতম ছিলেন মুরারি গুপ্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন, কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মতো

---

১ মুরারি গুপ্তের কড়চা ১।৩।২১

২ মুরারি গুপ্তের কড়চা, প্রথম প্রক্রম, 'চৈতন্যাবির্ভাব,' ৫ম সর্গ, ১৬-১৭

৩ তত্রৈব ১।৩।১৩

চৈতন্যের নবদ্বীপলীলাই যথার্থত মাধুর্যদীপক, আর মথুরালীলার মতোই নীলাচললীলা 'ঐশ্বর্যশিথিল'। এই হিসাবেই মুরারির গ্রন্থে দ্বিতীয় প্রক্রমের সন্ন্যাসসূত্রাখ্য অষ্টাদশ সর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে উল্লেখযোগ্য, মুরারি বারংবার বলেছেন, লোকশিক্ষার প্রয়োজনেই "জগদ্‌গুরু"র এই "ছদ্মসন্ন্যাস''। আবার লোকশিক্ষাহেতুই গাঢ় আবেশে ব্রজভ্রমে রাঢ়-পরিক্রমা। আত্মতন্ত্র স্বাত্মরত হয়েও স্বজন-শিক্ষার জন্য তাঁর এই যে বিচিত্র লীলাতনু-ধারণ, মুরারির দৃষ্টিতে তা কখনও গোপীভাবে, কখনও দাসভাবে ধরা দিলেও প্রধানত ঈশভাবেই ধরা দিয়েছে। গুপ্তের সুরচিত উপমাগুলির মধ্যে তাঁর কবিমনের সেই বিশিষ্ট প্রবণতাই পরিস্ফুট। যেমন কেশব ভারতীর নিকট গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ শুনে নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ হয়ে ওঠেন "কৃষ্ণবিশ্লেষ-কাতরা' ব্রজললনা :

"তং শ্রুত্বা ব্যথিতাঃ সর্বে কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরাঃ।
যথা ভাবিনি মাথুরে বিক্লবা ব্রজসুভ্রুবঃ ॥''[১]

অথবা, অদ্বৈতবাটী বিহারে : "বদরিকাশ্রম ইব ঋষিমধ্যে রাজতিস্ম স নারায়ণদেবঃ''[২]। কিংবা বিরজা-দর্শনে : "লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ন্যাসিবংশ-ধরো হরিঃ''[৩]। নরেন্দ্র-সরোবরে বিহারও এক্ষেত্রে স্মরণ না করে উপায় নেই :

"গোপীভিঃ সহ গোবিন্দো যমুনায়াং যথা পুরা।
অকরোদ্ বিবিধাং ক্রীড়াং শ্রীরাসরসকৌতুকী ॥
যথা গোপীজনাঃ কৃষ্ণং জলক্রীড়াপরায়ণম্।
সুখয়ন্তি নিজপ্রেমবিলাসনববিভ্রমৈঃ ॥''[৫]

এখানে চৈতন্যের পারিষদ-সঙ্গে জলক্রীড়া মুরারির ভক্তি-অনুরঞ্জিত চিত্তে কৃষ্ণের রাসান্ত জলকেলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিভাত হয়েছে। নবদ্বীপ-পরিকরবৃন্দ চৈতন্যদেবকে যে 'স্বয়ং ভগবান্‌'-রূপেই দেখছেন, তারই আর একটি নিদর্শন পাই তাঁর নৃত্যবিলাসাখ্য দৃশ্যে :

"গোপীস্বভাবাপ্তসমস্তভক্ত্যা পশ্যংশ্চ কৃষ্ণং বনমালিনং প্রভুম্।
মদ্বল্লভোঽসৌ ভ' বান্ যথা ভবেৎ তথা কৃপাং মে কুরুতান্ মহেশ্বরঃ ॥[৪]

গোপীস্বভাব প্রাপ্ত ভক্তগণ তাঁকে নিজ বল্লভ 'বনমালী প্রভু' কৃষ্ণ বলে জেনেছিলেন, আর মুরারির গ্রন্থে তাঁর এই কৃষ্ণস্বরূপেরই প্রাধান্য। তথাপি

১ কড়চা ২।১৮।৬ ২ তত্রৈব ৩।৪।২০ ৩ তত্রৈব ৩।৭।৪
৪ ৪র্থ সর্গ, প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ, ১৮ ৫ তত্রৈব ২।১০।১৪

শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাভাবও মুরারির অজ্ঞাত ছিলনা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের গোপীভাব বর্ণনার সূচনায় 'ভক্তিযোগ' শীর্ষক পঞ্চদশ সর্গে ভাগবত-বিখ্যাত তথা উদ্ধব-নিবেদিত গোপী-বন্দনাস্তোত্র "বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং'' উৎকলিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধায়। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-প্রসিদ্ধ রাধাভাব-তাদাত্ম্যের এ হলো অনিন্দ্য মুখবন্ধ। এইভাবে মুরারি ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের আলোকে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব-বিভাবিত অন্তরের রসরহস্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, আবার শ্রীচৈতন্যের তদ্‌ভাবিত চিত্তের কৃষ্ণ-গোপালীলা আস্বাদনই ভাগবত-ভাব-সিন্ধুনীরে তাঁর অবগাহনের সহায়ক হয়ে উঠেছে। বস্তুত, শ্রীচৈতন্যদেবের 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' সম্বন্ধে যিনি সর্বাগ্রে সচেতন করে দিয়েছিলেন বলে বৈষ্ণবীয় জনশ্রুতি বর্তমান, সেই স্বরূপ দামোদরের কড়চা যে আদৌ লোকপরম্পরাগত প্রবাদ নয়, পরন্তু কড়চা-ধৃত গৌরস্বরূপ গৌড়-নীলাচল-বৃন্দাবন নির্বিশেষে সকল পরিকরবৃন্দেরই পরিচিত ছিল, সে সম্বন্ধে মুরারির গ্রন্থ থেকেই তো প্রত্যয় জন্মাতে পারে। পরমানন্দপুরী-সঙ্গোৎসবে পরমানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিটিতেই তো চৈতন্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে :

"জ্ঞাতোঽসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধৃক্।
শ্রীরাধাভাবমাপন্নো মাধুর্যরসলম্পটঃ॥''[১]

যিনি 'সাক্ষাৎ ভগবান্' রূপে বিদিত, তিনিই আবার কেন ভক্তরূপ ধারণ করেন, আবার যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কেন রাধাভাবাপন্ন হন, তার রহস্য নিশ্চয়ই এই "মাধুর্যরসলম্পট'' অভিধাটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মাধুর্য-রসাস্বাদনে ঔৎসুক্যবশতই তিনি রাধাভাব তথা ভাগবতীয় গোপীভাবে বিচিত্র বিহার করে ফিরেছেন। এই বিচিত্রলীলার বর্ণনায় রঘুনাথ দাসের মতো মুরারিও তাঁর গ্রন্থমধ্যে সূত্র সংগ্রহ করেছেন। লীলাগুলির মধ্যে আছে, বৃন্দাবনভ্রমে বনে-উপবনে কৃষ্ণান্বেষণ, যমুনাভ্রমে সমুদ্রে পতন, কৃষ্ণের পঞ্চগুণে পঞ্চেন্দ্রিয়-বিকর্ষণ, গাভীমধ্যে পতনে কূর্মাকার ধারণ, রাসলীলাস্মরণে প্রলাপাদি অনুবর্ণন, গোবর্ধন-ভ্রমে চটকগিরি দর্শন, সর্বোপরি, গোপীভাবে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণের অধরামৃতের আস্বাদ গ্রহণ: "কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদং

---

১ কড়চা, ৩য় প্রক্রম, পঞ্চদশ সর্গ, ২৩

গোপীভাবেন সর্বতঃ"[১]। ভক্তদৃষ্টিতে স্বয়ং ভগবান হয়েও "গোপীভাবেন সর্বতঃ" বা ভক্তিপ্রেমরসাত্ম গোপীভাবে বিভোর হয়ে বৃন্দাবন-স্মৃতিমাত্র আশ্রয় করে তিনি দিব্যোন্মাদনায় দিন কাটিয়েছেন। এইভাবে জীবনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শ্রীচৈতন্যকে ভাগবতীয় কৃষ্ণ-গোপীলীলার 'প্রবেশচাতুরী সার' রূপে বর্ণিত হতে দেখছি। মুরারির ভাষায় :

"যাং যাং লীলাং প্রকুর্বীত কৃষ্ণঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ।
তাং তাং কো বর্তুং শক্নোতি তৎকৃপাভাজনং বিনা ॥"[২]

সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যে যে লীলা করে গেছেন, চৈতন্যের প্রসাদ ভিন্ন কে তা হৃদয়ঙ্গম করবে ?—মুরারি গুপ্তের কড়চায় এইভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রের লীলা-মাধুরী তথা ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে চৈতন্যজীবনের, ভাগবতের সঙ্গে চৈতন্যচরিতের এই নিগূঢ় যোগ, শুধু মুরারির কড়চারই নয়, সমগ্র চৈতন্য-জীবনীসাহিত্যেরই পরমবৈশিষ্ট্য। স্মরণীয়, কবিকর্ণপূর তাঁর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্যচরিত, শ্রীচৈতন্যের প্রকটলীলারই অনুসরণে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, মুরারির মতো কৃষ্ণজীবনলীলার অনুসরণে নয়। তবু তাঁর নাটকেও কৃষ্ণজীবন ও ও চৈতন্যজীবনের মধ্যে একটি সেতু শেষ পর্যন্ত অভগ্নই রয়ে গেছে, সেটি আর কিছুই নয়—ভাগবতধর্ম। উক্ত নাটকে ভক্তিদেবীকে তাই বলতে শুনি, এই কলিতে ভাগবতধর্ম উদ্ধারের জন্য ভগবান্ পারিষদবর্গ ও ভক্তিদেবী সহ অবতীর্ণ[৩]। আমরা জানি, ভাগবতধর্মেরই নামান্তর বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ, পুরুষোত্তমে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তিতেই তা লক্ষণীভূত। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সার্বভৌম উক্ত অহৈতুকী অব্যবহিতা হরিভক্তিরই লাবণ্যবাহী সিন্ধুরূপে শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ করেছেন। আর প্রতাপরুদ্র করেছেন তাঁর হরিস্বরূপ ও হরিভক্তিসিন্ধু-স্বরূপ গোপীস্বভাবের একাঙ্গ-মূর্তি ধ্যান :

১ "বৃন্দাবনস্মারকাণি বনান্যুপবনানি চ। স্তরভীমধ্যপাতেন কূর্মাকারেণ ভাবনম্।
শ্রীকৃষ্ণান্বেষণং তত্র যমুনাস্মারকেণ চ। শ্রীরাসলীলাস্মরণাৎ প্রলাপাদ্যনুবর্ণনম ॥
সমুদ্রপতনঞ্চাপি স্বরূপাদ্যৈর্নিদর্শিতম্। গোবর্ধনভ্রমেণৈব চটকগিরিদর্শনম্।
কৃষ্ণপঞ্চগুণেনৈব পঞ্চেন্দ্রিয়বিকর্ষণম্ ॥ কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদং গোপীভাবেন সর্বতঃ ॥"
কড়চা ৪।২৪।৩-৬

২ তত্রৈব।১২ ৩ চৈতন্যচন্দ্রোদয় ২য় অঙ্ক, ১৭

"গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি স্বয়ং প্রতিফলন্ পুণ্যাত্মনাং মানসে
নীলাদ্রৌ নটতীহ সংপ্রথয়তে বৃন্দাবনীয়ং রসং।
আদ্যঃ কোঽপি পুমান্ নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথা-
স্বাদী চিত্র মহাবিচিত্রমহহো চৈতন্যলীলায়িতম্ ॥"[১]

আহা, কী বিচিত্র গৌরচন্দ্রের লীলা! তিনি পুণ্যাত্মার হৃদয়ে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রতিফলিত হয়ে মধুর বৃন্দাবনের রসবিস্তার করছেন, আবার স্বয়ং আদিপুরুষ-রূপে নবীনা ব্রজরমণীদের কৃষ্ণানুরাগজনিত অপূর্ব বেদনাও অনুভব করছেন।

অর্থাৎ, মুরারির পথ গ্রহণ না করলেও চৈতন্যাবতার সম্বন্ধে সর্বাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কবিকর্ণপূর একমত—গৌর হলেন কৃষ্ণ: "গৌরঃ কৃষ্ণ ইতি", তাঁর ভাবও গোপাভাব—"নবোৎসুকবধূকৃষ্ণানুরাগব্যথাস্বাদী" হলো সে-ভাবেরই উৎকৃষ্ট অভিধা।

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্যের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত যে-দুই বৈষ্ণবাচার্যকে কালক্রমে লুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-বিলাসবার্তার পুনঃপ্রচারক হিসাবে অভিনন্দিত হতে দেখি, সেই রূপ-সনাতনও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তরঙ্গ লীলারহস্য উন্মোচনে ভিন্নপথাবলম্বী নন। তাই দেখা যায়, "কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা" শ্রীশচীনন্দনই সনাতন গোস্বামীর নিকট যতিবেশধারী হরি, প্রেমভক্তি-প্রচারের জন্যই তাঁর গোপীভাব-অঙ্গীকার: "প্রেমভক্তি-বিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাত্তেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবোঽপি ব্যঞ্জাতে"। আর রূপ গোস্বামীও তাঁর স্বরচিত চৈতন্যস্তবে সমুদ্রতীরে উপবন-দর্শনে শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন-স্মৃতিচারণ, রথাগ্রে ভাবাবেশে নর্তনে কুরুক্ষেত্র-মিলনের স্মৃতি-মন্থন কিংবা কৃষ্ণনামগ্রহণে অশ্রুমোচনাদি অলৌকিক ভাবচেষ্টা ইত্যাদি বর্ণনায় সেই বহু-ভক্তজন-স্বীকৃত সত্যকেই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে গেছেন: "অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী-রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপ-ভোক্তুং কমপি যঃ", বা এককথায় ভাগবতীয় ব্রজবধূগণের মধুররসের আস্বাদনের লোভেই তাঁর আবির্ভাব। আর এই মধুররসের বিস্তারের জন্যও যে ভক্তরূপে তাঁর অবতরণ, তাও শ্রীজীব গোস্বামী-স্বীকৃত। বৃন্দাবনভুবির প্রকাশ মধুর উল্লাস-কল্পতরুর সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্যে তিনি তাই শুধু প্রমোদিতই হননি, উক্ত ভাবময়ী ভক্তি বিস্তার করবার জন্য যিনি আবির্ভূত, দুর্জন পর্যন্ত

১ চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১০ম অঙ্ক

সকলের আশ্রয় সেই চৈতন্যবিগ্রহের জয়ধ্বনিও করেছেন তাঁর প্রীতিসন্দর্ভের অন্তিম বাক্যে। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দও স্বীকার করেছেন, ভাগবতের পরম-তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য তথা প্রচারের জন্যই গৌরবপুতে "লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ"। সেই পরমতাৎপর্য, রঘুনাথ দাসের বর্ণনা অনুসারে আবার "শ্রুতেগূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাং" বা শ্রুতিগুহ্য ভক্তিলতিকার প্রেমোজ্জ্বল-রসফল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু চৈতন্যজীবনে ভাগবত-বাণীর স্থান যে কোথায় কত গভীরে ছিল, তার মূল সন্ধান শুধু তাঁর অন্তরঙ্গ লীলারহস্যের অন্তস্তলে করলেই চলবে না, তাঁর বহিরঙ্গ জীবনচর্যার মধ্যেও করতে হবে বৈকী। তারই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে আছে দাস রঘুনাথকে জগন্নাথের গুঞ্জাহার ও বৃন্দাবনের গোবর্ধন-শিলা দান, রঘুনাথের ভাষায়: "উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্ধনশিলাং/দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি"। চৈতন্যকৃপাপ্রাপ্ত গোপাল ভট্ট চৈতন্য-আদেশেই বৈষ্ণবীয় স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে তাই ভাগবতীয় ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম ধ্রুবপদ "অহোবত স্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্" হৃদয়ে ধারণ করে বিধান দিয়েছেন, ভাগবতপরায়ণ হলে দ্বিজ-স্ত্রী-শূদ্র নির্বিশেষে সকলেই শালগ্রাম-শিলার সেবাধিকার লাভ করতে পারেন।

এইভাবেই চৈতন্যজীবন ভক্তবৃন্দের চোখে ভাগবতের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে উঠেছে, এইভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন ভাগবতপুরুষ। চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যও তাই প্রকারান্তরে ভাগবতভাষ্য হয়ে উঠেছে। ফলত, চৈতন্যচরিত একদিকে কৃষ্ণচরিতের ভাবানুষঙ্গে হয়েছে ভাবিত, অপরদিকে ভাগবতীয় গোপীভাবে বিভাবিত। ভাগবতবাণীই চৈতন্যচরিতগুলির মর্মবাণী। চৈতন্য-যুগের কবিরা যখন চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করতে বসেছেন, তখন তাঁদের কণ্ঠে ভাগবতীয় শুকভাষণই নানারূপে নানাভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে নানা অবকাশে, নাট্যকার যখন চৈতন্যজীবননাট্য লিখতে বসেছেন, ভাগবতের অগণ্যশ্লোক তখন নির্বারিত হয়েছে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপে। কিন্তু এ তো সবই সংস্কৃতে রচিত চৈতন্যজীবনীসাহিত্য প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। বাঙ্‌লা-ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনচরিতগুলি সম্বন্ধেও এ-কথা আদৌ প্রযোজ্য কিনা বিচার করে দেখা যাক।

---

১ 'স্তবাবলী, চৈতন্যাষ্টক ৪ ২ তত্রৈব, ১১

মূলে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের 'চৈতন্যমঙ্গল'[১] নাম ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু ভাগবতীয় কৃষ্ণজীবনের অনুসরণে চৈতন্যজীবনী পরিবেষণের মুরারি-প্রদর্শিত পথে যাত্রার ফলেই বোধ করি বৃন্দাবনদাস "চৈতন্যলীলার ব্যাস"[২] রূপে ভক্তসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন তাঁর কাব্যও আর 'চৈতন্যমঙ্গল' থাকে না, কালক্রমে হয়ে ওঠে 'চৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যভাগবত-কার একদিকে ছিলেন মুরারি গুপ্তের ভাবশিষ্য, অন্যদিকে নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য। অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে যে-চৈতন্যভাবমূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করি 'তা মূলত মুরারি ও নিত্যানন্দেরই পরিদৃষ্ট ভাবরূপ। ফলে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যজীবনীকাব্যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে। প্রথমত, কৃষ্ণ-জীবন ও চৈতন্যজীবন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে ; দ্বিতীয়ত চৈতন্যের সমান প্রাধান্য লাভ করেছেন নিত্যানন্দ। এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে মুরারি বা নিত্যানন্দ কেউই শ্রীচৈতন্যের নীলাচললীলার অন্তরঙ্গ পরিকর ছিলেন না। তবু মুরারির গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপে'র আভাস পাই। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রধানত চৈতন্যের নবদ্বীপলীলার পরিকর হওয়ায় নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাসও চৈতন্যদেবের গোপীভাব বা রাধাভাবের প্রতি বিশেষ অবহিত ছিলেন না বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকারের স্পষ্ট ইংগিত চৈতন্য-ভাগবতে আশা করা বাতুলতা। ভাগবতের মতো চৈতন্যভাগবতেও রাধানাম প্রায়-অনুচ্চারিত। চৈতন্যজীবনের যে-পর্বে রাধানাম উচ্চারণ অনিবার্য, সেই অন্ত্যলীলাই তো বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে অনুপস্থিত। তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ চৈতন্যভাগবতের "আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস", "মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্তনে প্রকাশ" আর "শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি। নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি"। 'নীলাচলে স্থিতি' মাত্রই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে উল্লিখিত, তার গভীর তাৎপর্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের

১ "বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥" চৈ. চ. আদি ।৮, ৩১

২ "কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥" চৈ. চ. তত্রৈব। ৩০

লক্ষণীয়, বৃন্দাবনদাস কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতেও চৈতন্যলীলার ব্যাস-রূপে বর্ণিত : "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা"।

গ্রন্থে অলৌকিক ভাবচেষ্টাদির দ্বারা যেরূপ, সেরূপে উদাহৃত নয়। তবু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার, বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে পরিবেষিত চৈতন্যজীবন-লীলার অপরাপর পর্ব দুটিকে, অর্থাৎ আদি ও মধ্য পর্বকে ভাগবত-ভাবদিগন্তে এমনই বিস্তৃত করে দিতে পেরেছেন যে, তারই বিশাল পটভূমিকায় বসে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পক্ষে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ এক পরিপূর্ণসত্তার ধ্যানে চৈতন্য-অন্ত্যলীলাকে পরিস্ফুট করে তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য চৈতন্যভাগবতের মধ্যে এবার প্রবেশ করা যেতে পারে।

আদিখণ্ডের আদিলীলা জন্মলীলা। বৃন্দাবনদাসের দৃষ্টিতে জগন্নাথ মিশ্রবর "বসুদেব প্রায়" "তাঁর পত্নী শচী নাম" "দ্বিতীয় দৈবকী" এবং "তাঁর গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসারভূষণ॥" চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণস্বরূপ বৃন্দাবনদাস দুটি শব্দপ্রমাণ উপস্থিত করেছেন—প্রথমত, "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই গীতোক্ত প্রতিজ্ঞাবচন; দ্বিতীয়ত, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই ভাগবতীয় অবতার-কথন-প্রস্তাব। কলিযুগে সংকীর্তন-ধর্ম পালনের জন্য "চৈতন্য নারায়ণে"র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত-শিব-বিরিঞ্চি প্রমুখ বৈষ্ণবাগ্রজগণের চৈতন্য-পার্ষদরূপে আবির্ভাবও বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবনদাস, প্রসঙ্গত নবদ্বীপের তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশের অন্তঃসারশূন্যতাও চৈতন্যভাগবতকারের ভাষায় জীবন্ত:

"রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥"[১]

সেই "ব্যবহার-রসে ব্যর্থ" কালে বস্তুসর্বস্ব যুগে হরিভক্তিশূন্য জগতে অদ্বৈতকে পরম বৈষ্ণবরূপে বন্দিত হতে দেখি। বৃন্দাবনদাসের মতে, তাঁরই আকুল আহ্বানে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ গোলোক ত্যাগ করে এসেছেন মর্ত্যধামে। চৈতন্য তাই চৈতন্যভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ। নবদ্বীপে শচীমাতার ক্রোড়স্থ নবজাত শিশুর পদে বৃন্দাবনদাসের স্তুতিই প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত আছে:

"সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি।
তপোধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥...
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হয়ে যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম।

১ চৈ. ভা: আদি। ২, ৫৮

দিব্য মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদ-গোপ্য সংকীর্তন ধর্ম ॥"[১]

বৃন্দাবনদাসের ভক্তদৃষ্টিতে চৈতন্য স্বয়ং ভাগবতপুরুষ রূপে প্রতিভাত বলেই, ভাগবতের কৃষ্ণজন্মলীলা আর চৈতন্যভাগবতের চৈতন্যজন্মলীলা একাকার হয়ে যেতে কোথাও বাধা পায়নি :

"শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥"[২]

বিশেষত বৃন্দাবনদাসের বিবরণ অনুসারে, নবজাত শচীনন্দনের লক্ষণ বিচারে দৈবজ্ঞ ঘোষণা করেছিলেন : "ভাগবত-ধর্মময় ইহান শরীর"[৩]।

স্বভাবতই বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের যে বাল্যলীলা-চিত্র উপস্থিত করেছেন তাও একান্তভাবেই গোপাললীলার অনুরূপ হয়ে উঠেছে। যেমন, ননীচৌর্য্য : "বিচারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে। ঘরে সব তৈল দুগ্ধ মুদ্গ ঘোল ঘৃতে ॥"[৪] অথবা বাল্যবেশ : "সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ। কমল-নয়ান যেন গোপালের বেশ ॥"[৫] এ ছাড়াও মুরারির অনুসরণে আছে অনন্তশায়িত পদ্মনাভের ভাবানুষঙ্গে শিশু নিমাইয়ের সর্পোপরি শয়ন : "কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া ॥"[৬] এর সঙ্গে অলৌকিক অদৃশ্য নূপুরধ্বনিও যুক্ত হতে পারে। তৎসহ লোকোত্তর ঐশ্বরিক পাদপদ্মচিহ্ন : "সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন। ধ্বজ বজ্র পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন ॥"[৭] বাল্যলীলায় নলখাগড়ার শকটভঙ্গ এবং অসুরদমনের অনুরূপ চোরদমনও প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়। বাল্যলীলায় এর পর বিশিষ্ট হয়ে আছে তৈথিক ব্রাহ্মণের নিকট নিমাইয়ের আত্মপ্রকাশ : "হাসিয়া কহেন প্রভু আমি যে গোয়াল। ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল ॥" ব্রাহ্মণের ইষ্টদর্শনও অলৌকিক রসপূর্ণ :

---

১ চৈ. ভা. আদি। ২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ২ চৈ. ভা. আদি। ২, ২২২
৩ চৈ. ভা. আদি। ২, ২৫২ ৪ চৈ. ভা. আদি। ৩, ৩১ ৫ চৈ. ভা. আদি। ৩, ৫৯
৬ চৈ. ভা. আদি। ৩, ৬৮ ৭ চৈ. ভা. আদি। ৩, ১৫০

"সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অষ্টভুজ রূপ ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥"[১]

বাৎসল্যরসে বৃন্দাবনদাসের সহজাত প্রতিভার এটি একটি অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারীর সঙ্গে একাকার এই নবনীচোরা বেণুবাদকের চিত্র অভিনব রূপকল্পনা সন্দেহ নেই। বস্তুত, মন্দাকিনী-তীরবর্তী এই শিশু-লাবণ্য যমুনাতীরবর্তী বালগোপালের চাপল্যসীমাকে স্মরণ না করিয়ে পারে না। বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যনাট্যলীলার বিভিন্ন পাত্রপাত্রীও সেকথা স্বীকার করেছেন: "পূরুবে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত সব করে নিমাঞি তোমার ॥"[২] কিন্তু তবু নিমাইয়ের প্রতি তাঁদের স্নেহানুভব অক্ষুণ্ণই থাকে: "কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে। তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে ॥"[৩] বিশ্বম্ভরের প্রতি নবদ্বীপবাসীর এই অহৈতুক স্নেহানুভবের তাৎপর্য বৃন্দাবনদাস নির্ণয় করেছেন ভাগবতাশ্রয়ী পথেই। চৈতন্য-অদ্বৈত প্রথম-মিলনদৃশ্যের কথাই তো প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়:

"প্রভু ও সে আপন ভক্তের চিত্তবৃত্তি হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে ॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥"[৪]

"পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে"। প্রসঙ্গত চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত হয়েছে শুক-সমাচার—আত্মাই জীবের সর্বাধিক প্রিয়বস্তু, আর কৃষ্ণ হলেন সেই সর্বসাক্ষী সর্বাধ্যক্ষ সর্বচৈতন্যময় আত্মা, সুতরাং তাঁর প্রতি ব্রজবাসীর আকর্ষণ সর্বাতিশায়ী তো হবেই। গোপগোপীবৃন্দ তাঁদের নিজপুত্র অপেক্ষাও যে তাঁকে অধিক স্নেহ করতেন, সে-সত্যের এই হলো অন্তরতম রহস্য: "তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্‌…কৃষ্ণ মেনমবেহি ত্বমাত্মানাম-খিলাত্মনাম্‌"। বৃন্দাবনদাসের কাব্যানুবাদের ভাষায়:

"পরমাত্মা সর্ব্ব-দেহে বল্লভ বিদিত ॥
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র বন্ধুগণ।

---

১ চৈ. ভা. আদি। ৭, ২৬৯-৭০ ২ চৈ. ভা. আদি। ৪,৮০
৩ চৈ. ভা. আদি। ৪,১০৭ ৪ চৈ. ভা আদি। ৫,৪৪-৪৫

গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন ॥
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥"[১]

গৌরাঙ্গদেবের প্রতি অদ্বৈত আচার্যের তথা সমগ্র নবদ্বীপবাসীর সেই একই আকর্ষণের কারণনির্দেশে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যজীবনী-কাব্যগ্রন্থে গৌরচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র অভিন্নপ্রতীত হয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত "পৌর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়ে" বৃন্দাবনচন্দ্রের ভাবাবেশে তাঁর সেই মুরলীধ্বনির কথাও মনে পড়ছে:

"দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হৃদয় ॥
অপূর্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহো না পায় শুনিতে ॥
ত্রিভুবনমোহন মুরলী শুনি আই।
প্রথমে আনন্দে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি ॥"[২]

বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্‌স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করি গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীবাসগৃহে সাতপ্রহরিয়া ভাবাবেশে তাঁর অকুণ্ঠ আত্ম-ঘোষণায়: "মুঞি সেই মুঞি সেই বোলে বারবার"। এরপরই তাঁর বিভিন্ন অবতার-মূর্তি ধারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত। যেমন, নৃসিংহ-পূজারত শ্রীবাসের সম্মুখে বিশ্বম্ভরের চতুর্ভুজ-মূর্তি পরিগ্রহ। শ্রীবাস তখন "ব্রহ্মমোহাপনোদন" শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকেন "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসম্মুখায়। বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণুলক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশু-পাঙ্গজায় ॥"[৩] এই চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তিতে শ্রীবাসগৃহে বিহার, আর "বরাহ আকারে" মুরারিগৃহে "অপূর্ব" লীলা এখানে উল্লেখযোগ্য, চৈতন্য-জীবনের পাষণ্ডদলনলীলা কৃষ্ণজীবনের অসুরসংহারলীলারই সমার্থক। মধ্য-খণ্ডের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কাজীদলন তারই কেন্দ্রস্থ দুই ঘটনা। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণলীলায় অঘাসুরাদি বধ যেমন, চৈতন্যলীলাতেও তেমনি এই পাষণ্ডদলন 'ঐশ্বর্য' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অপরপক্ষে তাঁর মুখ্য মাধুর্যলীলা ভক্তসঙ্গে—"ভক্ত

১ চৈ, ভা, আদি। ৫, ৫৩-৫৬ ২ চৈ, ভা, আদি। ৮, ২১৫-২১৭ ৩ ভা° ১০।১৪।১

বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।" নিঃসন্দেহে এটি ভাগবত-কথিত ভক্ত মহিমাকেই স্মরণ করাবে: "আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি"[১]। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ভাষায়: "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥" লক্ষণীয়, "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড"—এই শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে তবেই বৃন্দাবনদাস তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যের পাশাপাশি নিত্যানন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গে তাঁর শাস্ত্রানুগত্যের আরো বহুবিধ উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। যথা, ভাগবতীয় ১০।২৫।৯-১৩ শ্লোকোদ্ধার করে নিত্যানন্দকে তিনি অনন্তদেবের সঙ্গে একীভূত করেছেন। দ্বিতীয়ত, সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম। যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥"—সহস্রশীর্ষ বলরাম-বিষয়ক পুরাণোক্তির সাহায্যে তিনি নিত্যানন্দের উদ্দামতা সমর্থন করেছেন। সর্বোপরি, ভাগবতীয় ১০।৬৫।১৭-২২ এবং ১০।৩৪।২০-২৩ শ্লোকোদ্ধার করে বলরামের রাসলীলা তথা নিত্যানন্দের অনুরূপ ক্রীড়াসাম্য সমর্থন করেন। অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়েও এ-প্রসঙ্গের পুনরালোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে পুরাণ-প্রমাণস্বরূপ "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ"[২] শ্লোকটি উপস্থাপিত। কিন্তু সর্বাধিক আকর্ষণীয় হয়েছে নিত্যানন্দেব প্রথম চৈতন্য-সাক্ষাৎকার। প্রথম দর্শনে নিত্যানন্দকে পরীক্ষা করতে গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস-কণ্ঠে ভাগবতীয় বিখ্যাত শ্লোক: "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্"[৩] আবৃত্তি করান। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ "পড়িলা মূর্চ্ছিতা হঞা নাহিক চেতন॥" প্রেমভক্তিবিকারের কষ্টিপাথরে স্বর্ণরেখায় মুদ্রিত হয়ে গেল নিত্যানন্দের ভক্তনাম। মুহূর্তে তিনি গৌরভক্ত-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন-ব্যবহৃত অভিধা বিস্ময়কর: "ভাগবতরস নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত"। নিরবধি ভাগবতরস পানেই 'সহস্রশীর্ষ' 'অনন্তপুরুষ' নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ স্বরূপ উদ্ঘাটিত: "নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে। ভাগবত-রস সে গায়েন অনুক্ষণে॥"[৪] চৈতন্য পরিজনবর্গের মধ্যে গদাধরের ভাগবত পাঠও সুবিখ্যাত, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরন্তু বৃন্দাবনদাস বলেছেন, গদাধরের ভাগবত পাঠে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও "মহামত্ত" হতেন:

১ ভা° ১১।১৯।২১ ২ ভা° ১০।৩৩।২৯

৩ ভা° ১০।২১।৫ ৪ চৈ. ভা° অন্ত্য। ৩, ৫২৬

"গদাধর পঢ়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামত্ত॥"[১]

বস্তুত, সমগ্র চৈতন্য-ভাবান্দোলনের কেন্দ্রে যে ছিল ভাগবত, তা একমাত্র চৈতন্যভাগবত গ্রন্থপ্রামাণ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বৃন্দাবনদাসের বিবরণ থেকে জানা যায়, নামকরণ দিবসে অতি শৈশবেই 'বিশ্বম্ভর' গৌরচন্দ্র সব কিছুর মধ্যে একমাত্র ভাগবতকেই আলিঙ্গন করেছিলেন :

"জগন্নাথ বলে শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥"[২]

চৈতন্যজীবনে এই ভাগবত-আলিঙ্গন আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবনদাস যথার্থই বলেছিলেন, "এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি। কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি"[৩]। বৃন্দাবনদাসেরই ব্যাখ্যানুসারে এই ভাগবত-রূপের দুটি তাৎপর্য : "দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র। গ্রন্থ ভাগবত আর কৃষ্ণকৃপাপাত্র"[৪]। কি গ্রন্থ-ভাগবতকে আশ্রয়ের ক্ষেত্রে, কি কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র-রূপে ভাগবতরসের আস্বাদ ও প্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যই তাঁর যুগের ভাগবতানুশীলনের কেন্দ্রীয় প্রেরণা—গদাধর-বক্রেশ্বর দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে তিনিই ভাগবতপাঠে ও ব্যাখ্যায় উদ্দীপিত করেছিলেন। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যও ছিলেন তাঁর কৃপাপাত্র। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মদর্শনে ভাগবতই সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ, তথা 'মূর্তিমন্ত ভক্তিরস'। কাজেই ভাগবতপাঠ দূরে থাকুক, গৃহে ভাগবত-গ্রন্থ রক্ষাও এ-ধর্মমতে পরম শ্রেয় ; আর পাঠে-শ্রবণে তো তৎক্ষণাৎ ভক্তিলাভ। বৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থে চৈতন্যের বক্তব্যে :

"ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি হয়॥"[৫]

বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের এই নির্দেশই হরিভক্তিবিলাসে ভাগবতপূজাদির

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৩, ২২১ ২ চৈ ভা. আদি। ৩, ৫৪ ৩ চৈ. ভা. আদি। ২, ১৭৪
৪ চৈ. ভা. অন্ত্য। ৩, ৫২২ ৫ চৈ. ভা. আদি। ৫২০-২১

বিধান দানে সার্থক হয়েছে। আর "ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান"— চৈতন্যের এই উপদেশই হয়েছে বৈষ্ণবীয় টীকাকারগণের ভাগবত-ভাষ্যের ধ্রুবপদ। ভাগবত-ব্যাখ্যায় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের জন্মগত অধিকারও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ-বিবরণে স্বীকৃত। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যগুরু গঙ্গাদাসকে এ-প্রসঙ্গে বলতে শুনি: "মাতামহ যার চক্রবর্তী নীলাম্বর। বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥ উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার। তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥"[১] নীলাচলে সার্বভৌমের অনুরোধে ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো" শ্লোকের একাদশ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা তাঁর উক্ত জন্মগত অধিকারকেই সমর্থন করছে। কিন্তু টীকা তিনি রচনা করবেন কি, ভাগবত শ্রবণেই যে ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বস্তুত শ্রীচৈতন্যলীলায় "ভাগবত আলিঙ্গন" সেখানেই সর্বাতিশায়ী যেখানে তিনি কৃষ্ণকৃপাপাত্র-রূপে ভাগবতীয় প্রেমভক্তিরসমাধুরীব শেষ আস্বাদক। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যকে এই কৃষ্ণকৃপাপাত্ররূপে ভাগবতরসের শেষ-আস্বাদকের ভূমিকায় যে একেবারে দেখিনা এমন নয়।

নবদ্বীপে তরুণ গৌরচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অত্যদ্ভুত: "এমত বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে। অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥"[২] বস্তুত "শিব-বিহি দুলহ" প্রেমভক্তিই প্রকটন করেছিলেন তিনি। "বায়ু-দেহমান্দ্য" ছলে একদিন সেই প্রেমভক্তি-বিকারেরই সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল নবদ্বীপে, গয়াভূমিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তারই বিকাশ, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ণাভিব্যক্তি। লোকশিক্ষার্থেই দাস্যাদি স্তর পরম্পরায় তা সর্বশেষে স্পর্শ করেছে মধুরের শিখরসীমা:

"গোপী গোপী গোপী মাত্র কোনদিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহাকোপে॥
কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব ভজে বা তারে কে॥...
গোকুল গোকুল মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে।
বৃন্দাবন বৃন্দাবন বোলে কোনদিনে॥
মথুরা মথুরা কোনদিন বোলে সুখে।
কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥

১ চৈ. ভা. মধ্য। ১, ২৬৬-৬৭ ২ চৈ. ভা. আদি। ৭,১৭৬

ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥...
দিবসেরে বোলে রাত্রি রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিবশ ॥"[১]

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গলীলার দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে গেছেন, এরূপ একটি অভিযোগ একমাত্র এখানে এসেই আশ্চর্যভাবে খণ্ডিত হয়ে যায়। অন্তরঙ্গলীলায় শ্রীচৈতন্য কখনও সখীভাবে রাধানুগতা গোপী, কখনও স্বয়ং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত। শ্রীচৈতন্যের সেই রাগানুগা-রাগাত্মিকা উভয় ভাবসাধনাই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে আলোচ্য অংশে ঐকান্তিক আত্মপ্রকাশ করেছে। "গোপী গোপী গোপী" নাম-জপকে কণ্ঠমালা করে তিনি যেদিন কৃষ্ণনাম শ্রবণে মহাকোপে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠেন, সেদিন তাঁর গোপী-আনুগত্যে রাগানুগা সাধনভাব বুঝতে হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর ভাবান্তর ঘটে যায় যখন তিনি কৃষ্ণকে "শঠ ধৃষ্ট কিতব" বলে ভর্ৎসনা করেন॥ "কিতব" সম্বোধন যে ভ্রমরগীতার "মধুপ কিতববন্ধো"[২] সম্ভাষণেরই স্মৃতিজাত! বিশেষত এরপরই তিনি যখন বলে ওঠেন: "স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় বৈল বালির পরাণ"[৩] তখন তো ভ্রমরগীতার প্রধানা গোপীর বৈদগ্ধ্যভণিতিই প্রতিধ্বনিত হয়: "মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা, স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্"[৪]। যেদিন "পৃথিবীতে নখে অঙ্ক" লেখেন, সেদিনও তাঁর ভাগবতীয় গোপীভাব বুঝতে হবে। রাসে সমাগতা গোপীরাও কিতব কৃষ্ণের বাক্যে প্রতারিত হয়ে এমনি করেই চরণে ভূমিলিখন করেছিলেন: "চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ"[৫]। আর যে মুহূর্তে পৃথিবীতে লেখেন ত্রিভঙ্গ আকৃতি? সে-মুহূর্তে জয়দেবের বিরহিণী রাধার সেই মদনবেশাকৃতি কৃষ্ণমূর্তি অঙ্কনের দৃশ্যটিও ওঠে ভেসে: "বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্"[৬]। কৃষ্ণ-বিরহাবেশে এদিকে আবার "দিবসেরে বোলে রাত্রি রাত্রিরে দিবস"! চণ্ডীদাসের রাধাও অনুরূপ ভাবাবেশে রাত্রিকে দিন, দিনকে রাত্রি করেছিলেন: "রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি", তবু কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ

---

১ চৈ. ভা. মধ্য। ২৪, ১৬-১৭, ২০-২২, ২৪
২ ভা° ১০।৪৭।১২
৩ চৈ. ভা° মধ্য। ২৪, ১৮
৪ ভা° ১০।৪৭।১৭
৫ ভা° ১০।২৯।২৯
৬ গীতগোবিন্দ ৪।৬

বোঝেননি রাধা, "বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি"। কৃষ্ণপ্রেমের এই অকথ্যকথন-মহিমার উপলব্ধিতে শ্রীচৈতন্য-ভাবসাধনায় এইভাবেই অঙ্গীকৃত হয়েছে ভাগবত, জয়দেব, চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা, ফলত বহুবিস্তৃত হয়ে গেছে চৈতন্যভাবদিগন্ত। এই ভাবদিগন্তের অপার বিশালতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াভিভূত বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' রূপে কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন ভাগবতেরই জপমন্ত্র—[নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিবর্গকে সূত পাঠক বলছেন], পক্ষী যেমন নিজের শক্তি অনুসারে অনন্ত আকাশে উড়ে থাকে. আমিও তেমনি অযোগ্য হয়েও সাধ্যানুসারে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে গোবিন্দলীলা বর্ণনা করবো। এই "নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ"[১] বৃন্দাবনদাসের ভাষায় হয়েছে :

"পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥"[২]

যে-"অনন্ত চৈতন্যলীলার" দিগন্তাকাশে বৃন্দাবনদাস নিজেকে "পতত্রিণস্তথা" জ্ঞান করেছেন, সেই দিগন্তপাবে চৈতন্যভাবসিন্ধুরই কণামাত্র স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নিজেকে বলেছেন "ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি" :

"আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে আমি এককণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥'[৩]

বস্তুত বৃন্দাবন দাস যে-চৈতন্যলীলা-রহস্যের আভাস মাত্র দানে নীরব হয়ে গেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রধানত তারই কলকণ্ঠ শুক। এদিক দিয়ে বলা যেতে পারে চৈতন্যভাগবতের যেখানে শেষ, চৈতন্যচরিতামৃতের সেখানেই শুরু। বৃন্দাবনদাস থেকে যাত্রা করেই কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের নব-দিগন্তে উপনীত হয়েছেন।

আমরা তো দেখেছি, কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্যলীলার আস্বাদন-রীতি কিভাবে মুরারির কড়চা থেকে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মধ্য দিয়ে বাঙ্‌লা চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতও-ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের

ভা° ১।১৮।২৩ ২ চৈ. ভা. আদি।১২, ১৪৭, মধ্য। ২৬. ২৩৯. অন্ত্য। ৪. ৫১১
৩ চৈ. চ. অন্ত্য।২০, ৮১-৮২

আদিলীলার মূল আদর্শ মুরারির কড়চা ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। ফলে কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন্যজীবন বর্ণনার ঐতিহ্য চৈতন্যচরিতামৃতেও অক্ষুণ্ণ। প্রমাণস্বরূপ কৃষ্ণদাস-বর্ণিত চৈতন্য জন্মলীলাই তো উদাহৃত হতে পারে "প্রসন্ন হৈল দশদিগ্ প্রসন্ন নদীজল। স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥"[১] এ তো প্রকারান্তরে ভাগবতেরই অনুরূপ কৃষ্ণ-আবির্ভাব পটভূমি স্মরণ করায়। নদীয়ার জন্মোৎসব-বর্ণনাও গোকুললীলার একেবারে অনুরূপ। চৈতন্যভাগবতাদির বর্ণনা থেকে জানা যায়, জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন প্রায় নিষ্কিঞ্চন জন। কিন্তু বৃন্দাবনে নন্দের আনুরূপ্যে তাঁকে প্রভূত রত্নের অধিকারী করে তুলেছেন কৃষ্ণদাস: "যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,/সব ধন বিপ্রে দিল দান।/যত নর্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,/ধন দিয়া কৈল সভায় মান॥"[২] এক্ষেত্রেও গর্গমুনির ভূমিকা নীলাম্বর চক্রবর্তীর। তদুপরি ভাগবতীয় বাল্যলীলার মাধুর্যও চৈতন্যলীলা-মাধুরীর পাত্রে পরিবেষিত। সেই এক ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পাদপদ্মের রেখাঙ্কন গৃহে-আঙিনায়, সেই তাঁর মৃত্তিকা-ভক্ষণ, ননীচৌর্য, নদীয়ার ঘরে ঘরে বাল্য চাপল্য। তবে নূতন তথ্য হিসাবে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে পাচ্ছি, ভাগীরথী তীরে স্নানার্থিনী কন্যাদের প্রতি গৌরাঙ্গের বরদান। বলা বাহুল্য, এ-বরদান কাত্যায়নী ব্রতে সমবেত গোপীদের প্রতি পরিতুষ্টচিত্ত কৃষ্ণের বরদানের সঙ্গে একেবারে এক ও অভিন্ন হয়ে গেছে: "সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি"[৩] কৃষ্ণলাভের আশায় ব্রতানুষ্ঠান করছিলেন যাঁরা, সেই গোপকন্যাদের ব্রত-উদ্‌যাপন দিনে বলছেন কৃষ্ণ, হে সাধ্বীগণ আমার অর্চনাই যে তোমাদের সংকল্প তা জেনেছি, আর তা অনুমোদনও করেছি। সত্য হোক তোমাদের সে-সংকল্প।

যেহেতু ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট চৈতন্যই কৃষ্ণস্বরূপ, তাই কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার অন্বয় চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যে সাধিত হয়েছে পদে পদে। প্রমাণ-স্বরূপ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অন্তর্গত চৈতন্য-রামানন্দ সাক্ষাৎকার দৃশ্যটিই উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এটি ভাগবতে কথিত ভগবান-ব্রহ্মা-সাক্ষাৎকারেরই অনুরূপ হয়ে উঠেছে। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে রায় রামানন্দের মুখেও এ-মন্তব্যের সমর্থন পাই: "এত তত্ত্ব মোর মুখে কৈলে প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥ অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই

১ চৈ. চ. আদি ১৩, ৯৬ ২ চৈ. চ. আদি ।১৩, ১০৮ ৩ ভা° ১০।২২।২৫

রীতি হয়ে। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে ॥"[১] স্মরণীয় ব্রহ্মাকে ভগবান্ বলেছিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ গুণকর্মাদির তিনি শুধু জ্ঞানই লাভ করবেন না, ভগবদ্-অনুগ্রহে তা সম্যক্ অনুভবও করবেন। ভগবান-প্রদত্ত সেই "তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু"[২] প্রতিশ্রুতি এবং "বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে" এই স্বীকৃতি ভক্তচিত্তে অভিন্ন ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। বস্তুত চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীচৈতন্য ভাগবতীয় পরব্রহ্ম তত্ত্বেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন। রামানন্দ সে-তত্ত্বকেই উপলব্ধি করে বলেছেন: "পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ রূপ'[৩]। শুধু কি রায় রামানন্দ, ভক্তসাধারণ তো শ্রীচৈতন্যের সেই শ্যাম-গোপ রূপই প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছিলেন নীলাচলে, রথাগ্রে। রাসলীলায় যেমন কৃষ্ণের, রথযাত্রায় তেমনি শ্রীচৈতন্যের 'প্রকাশ' মাধুর্য:

"কভু এক মূর্তি হয়—কভু বহুমূর্তি।
কার্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥
পূর্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥"[৪]

আবার এই রথাগ্রেই ভাগবতীয় কুরুক্ষেত্রমিলনের স্মৃতিচারণে শ্রীচৈতন্যের গোপী ভাবাবেশ:

"পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম ॥

---

১ চৈ, চ. মধ্য।৮,২১৮-১৯ ২ ভা° ২।৯।৩১
৩ চৈ, চ. মধ্য।৮, ২২১ ৪ চৈ. চ. মধ্য। ১৩, ৬৩-৬৬

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাথি ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই-সুখ-আস্বাদন।
৯ সে-সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥
আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥"[১]

বস্তুত রথযাত্রায় সূচিত চৈতন্যের এই রাধাভাবকান্তি-অঙ্গীকারেরই পূর্ণস্ফূর্তি অন্ত্যলীলায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, অন্ত্যলীলার দুরবগাহ রহস্যসমুদ্রে অবগাহনের প্রারম্ভেই ইষ্টবন্দনার ব্যপদেশে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীধরটীকার অনুসরণে নিজ ভাষায় বলে নিয়েছেন: "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥" লক্ষণীয়, ভাগবতের ভাবার্থদীপিকার সূচনায় শ্রীধরস্বামীর প্রার্থেয় ভগবৎকৃপাই চৈতন্যচরিতামৃত-কারের আদর্শস্থল হয়েছে। বিশেষত, অন্ত্যলীলার মুখবন্ধে এ নিবেদনের তাৎপর্য গূঢ়তর। কেননা কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবে বিলাস ভারতীয় কাব্য-পুরাণ শাস্ত্রে যেমন অভিনব, তেমনই অলৌকিক। প্রসঙ্গক্রমে—চৈতন্যচরিতামৃত থেকে "কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রান্তি"তে গৌরচন্দ্রের "মনসা বপুষা-ধিয়া" কত কিছু কিছু ঐকান্তিক ভাবচেষ্টাদিরই তো সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। যেমন, প্রথমত স্বপ্নদর্শন:

"একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে—দেখেন স্বপন॥"[২]

দ্বিতীয়ত, জগন্নাথ দর্শনে ভাবোৎকণ্ঠা:

"কুরুক্ষেত্র দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন।
কাহাঁ কুরুক্ষেত্র আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন॥"[৩]

১ চৈ, চ, মধ্য। ১৩, ১১৮-২৫

২ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৪, ১৫ ৩ তত্রৈব, ৩২

তৃতীয়ত, অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ :

"ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে॥
'পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ॥"[১]

চতুর্থত, চটক-পর্বত দর্শনে অর্ধবাহ্যে গোবর্ধনশৈল-ভ্রম ও দিব্যোন্মাদনায় ভাগবতীয় গোপীর উক্তি আবৃত্তি: "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ। মানং তনোতি সহ গোপণয়োস্তয়োর্ষৎ পানীয়সুজবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥"[২] এ শ্লোক আবৃত্তিতে শ্রীচৈতন্য গোপীদের মতোই ঈর্ষিত ও সাস্পৃহ চিত্তে গোবিন্দের পাদস্পর্শে ধন্য গোবর্ধনের সৌভাগ্য কামনা করেছেন।

পঞ্চমত, সমুদ্রতীরস্থ পুষ্পোদ্যানে গোপীজ্ঞানে ভাগবতীয় রাসলীলায় কথিত বৃক্ষসম্ভাষণ—এক্ষেত্রে "চূত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিদার-জম্বর্কবিল্ব—বকুলাম্রকদম্বনীপাঃ" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোক[৩] পুনরাবৃত্ত হয়েছে। মৃগী-সম্ভাষণে ও পুষ্পসজ্জাকথনেও ভাগবতীয় রসমাধুরী আহরিত। ভাগবতোক্ত রূপানুরাগের বিখ্যাত পদ "বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং"[৪] এবং চৈতন্যমুখে উৎসারিত তার গৌড়ীয় ভাষা বিরচিত কাব্যানুবাদও এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

ষষ্ঠত, গম্ভীরা পরিত্যাগ করে ভাবাবেশে মধ্যরাত্রে গোশালায় গমন। শেষে ভক্তগণের সন্ধান প্রাপ্তিতে চৈতন্যের স্বগতোক্তি :

"বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥"[৫]

চৈতন্যের বিরহদুঃখ এখানে এখনও রাগানুগা স্তরেই বিলাস করছে। অতঃপর তাঁর কর্ণরসায়ন হয়ে উঠেছে ভাগবতের ১০৷২৯৷৪০ শ্লোকটি। এই শ্লোকের রসবিশ্লেষণে তাঁর আক্ষেপোক্তি শেষ পর্যন্ত রাগাত্মিকায় পর্যবসান প্রাপ্ত হয়েছে।

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৪, ৫৪ ২ ভা° ১০।২১।১৮ ৩ ভা° ১০।৩০।৭
৪ ভা° ১০।২৯।৩৯ ৫ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৭, ২২

সপ্তমত উল্লেখযোগ্য শরৎ-জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে যমুনাভ্রমে কৃষ্ণবিরহরূপ সমুদ্রে ধাবিত চৈতন্যের অপূর্ব অভিজ্ঞতা। একদা শারদোৎফুল্ল রজনীতে উদ্যানে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি, "রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥" রাসলীলান্তের ভাগবতীয় জলক্রীড়া সংবাদ শুনছেন, এমন সময় ভক্তদের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রবল ভাবাবেগে যমুনাভ্রমে সমুদ্রে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন: "চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল। ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥" এদিকে "যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ করে—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥" অন্যদিকে ভক্তগণ বহুচেষ্টায় ও যত্নে তাঁকে দৈবক্রমে এক ধীবরের জাল থেকে উদ্ধার করে আনেন। অর্ধবাহ্যে উচ্চারিত চৈতন্যের তৎকালীন বিলাপ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

অষ্টমত, অক্রূরসংবাদে ভবন্-বিরহকাতরা গোপীগণের "অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া"[1] এই বিখ্যাত শ্লোকটির সঙ্গে ভাব-সাযুজ্য প্রাপ্তিতে বিধাতায় আক্ষেপ। সেই অপূর্ব আক্ষেপবাণীর অংশবিশেষ আস্বাদন করা যায়:

"না জানিস্ প্রেম-ধর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান॥
অরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্যদুর্লভ জন প্রেমে করাঞা সম্মিলন
অকৃতার্থান কেনে করিস দূর॥"

বিধিকে তিনি 'দত্তাপহার' বলে কঠিন ভর্ৎসনাও করেন। তাঁর সেই আক্ষেপমিশ্র ভর্ৎসনার ভাষা করুণরসের উৎস:

"অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্যস্থান
পাপ কৈলে দত্ত-অপহার॥"

শেষে আক্ষেপ গিয়ে পড়ে নিজেরই অদৃষ্টের ওপর।

---

১ ভা° ১০।৩৯।১৯

"কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈব দোষ
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল॥
এই মত গৌররায় বিষাদে করে 'হায় হায়',
হাহা কৃষ্ণ! তুমি গেলা কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥"[১]

এই "গোপীভাব হৃদয়" শেষ পর্যন্ত "অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদে" রূপান্তরিত হলো। চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ অনুসারে:

"কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ॥"[২]

গোপীভাবের সঙ্গে সংগতাহেতু তাঁর অন্তর তখন ভাগবতাদি বৈষ্ণব রসশাস্ত্র ও কাব্যসমূহের আস্বাদনে ছিল নিরন্তর উৎসুক:

"যেই যেই শ্লোক জয়দেবে ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥"[৩]

প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাগবতাদি বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধান্ত শাস্ত্রসমূহের এমন তন্ময়ীভূত লোকোত্তর সহৃদয় বাঙ্‌লাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেননি। বিশেষত তাঁর সমগ্র জীবন যেন ভাগবতেরই ভাষ্য। চৈতন্যচরিতও তাই ভাগবতেরই আস্বাদন হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবনদাস তারই আভাসমাত্র দিয়ে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, আর কৃষ্ণদাস গৌরচন্দ্রের "মনসা বপুষা ধিয়া" কৃত কিছু কিছু অলৌকিক ভাবচেষ্টাদির সাক্ষ্যে তাকেই করেছেন বিশদীভূত। চৈতন্যের অন্তরঙ্গলীলার রসরহস্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে উভয়ের এই যৌথভূমিকাকে মনে রেখেই আমরা বলেছি, চৈতন্যভাগবতের যেখানে শেষ, চৈতন্যচরিতামৃতের সেখানেই শুরু। আর শুধু চৈতন্যের অন্তরঙ্গলীলার ক্ষেত্রেই বা কেন, তাঁর

১ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৯, ৪৩-৪৪,৪৫,৪৯-৫০ ২ চৈ, চ, অন্ত্য। ১৪, ১১-১২ ৩ তত্রৈব। ২০,৫৮-৫৯

বহিরঙ্গলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবত-প্রচারের ইতিহাস প্রণয়নে চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতেরই পরিপূরক।

আমাদের বিশ্বাস, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত-প্রচারের কালানুক্রমে তিনটি যুগেরই পরিচয় মেলে। প্রথমত, প্রাক্‌চৈতন্য-যুগে ভাগবত প্রচারের ইতিহাস-রূপে বর্ণিত হয়েছে মাধবেন্দ্রপুরীর ভাগবত-রস বিতরণ—অনিবার্যভাবে এ-ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে মাধবেন্দ্র-শিষ্য অদ্বৈত-শ্রীনিবাস আচার্যাদিও অবিস্মরণীয়। দ্বিতীয়ত. চৈতন্যবর্তী যুগে স্বয়ং চৈতন্যদেবই কিভাবে গদাধর বক্রেশ্বর দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখকে ভাগবতানু-শীলনে প্রত্যক্ষত প্রেরণা দিয়ে বঙ্গে ভাগবত প্রচারের কেন্দ্রীয় পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন, তাও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্টীভূত। তৃতীয়ত ঈষৎ চৈতন্য-পরবর্তী যুগে তথা চৈতন্যভাগবতকার কবির সমসাময়িক কালে বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত-প্রচারের প্রসার ও প্রভাবও তো এক চৈতন্যভাগবতের ব্যাপক ভাগবত-ভাবনা থেকেই প্রমাণিত হতে পারে। অবতার-কথন-প্রস্তাবে, সাধ্যসাধন নির্দেশে, ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়, উপাখ্যান রচনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি প্রয়োগে সর্বত্র ভাগবতকে অঙ্গীকার করে তিনি চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বাঙলা-দেশে ভাগবত-প্রচারের ইতিহাসকেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অপরপক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতে নীলাচল-বৃন্দাবনে ভাগবত প্রচারের ও অনুশীলনের চৈতন্য-সমসাময়িক এবং -পরবর্তী যুগের ব্যাপক ইতিহাস পাবো। ভাগবতের অন্যতম আবির্ভাবভূমিরূপে কথিত দাক্ষিণাত্য, অদ্বৈত বেদান্তের একচ্ছত্র প্রদেশ বারাণসী এবং ভাগবতীয় লীলার আধার বৃন্দাবনভূমিতে ভাগবতচর্চার সূত্র ও সারসংগ্রহে চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা অসামান্য। এদিক দিয়ে চৈতন্যভাগবতের তুলনায় চৈতন্যচরিতামৃতের পরিপূর্ণতা অনস্বীকার্য। বৃন্দাবনদাসে চৈতন্য-পরিকর শ্রেষ্ঠ রসিক-ভাবুকবৃন্দের ভাগবতানুশীলনের কোনো দিগ্‌দর্শন লাভ সম্ভব নয়। এদিক দিয়েও কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃত কোষগ্রন্থ-স্বরূপ। তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত পাঠের ফলে ষড়্‌গোস্বামী সহ ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব মনীষী-সমাজের ভাগবতচর্চার পরিচয়লাভ সম্ভব। সর্বোপরি, শ্রীধর-টীকার সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের নানাস্থলে মূল টীকাস্বাদনের সৌভাগ্য অর্জন করবেন। তাছাড়া ভাগবতানু-বাদে বৃন্দাবনদাস যখন স্বাধীনরীতির অনুসারক, কৃষ্ণদাস তখন তুলনামূলক বিভিন্ন পাঠের মূলান্বয়ে উৎসুক। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে ভাগবত-ব্যাখ্যাতার

ভূমিকায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অবশ্য তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকৃত ভাগবত ব্যাখ্যা বলে কথিত অংশগুলিতে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে থাকতে পারে, তবে সেক্ষেত্রেও এ-অংশগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব একেবারে লোপ পেতে পারে না। কেননা এরা শেষ পর্যন্ত চৈতন্যযুগের ভাগবতচর্চার ইতিহাসেরই স্মারক হয়ে থাকবে। প্রসঙ্গত সনাতন-শিক্ষার উপসংহারে ভাগবত-বিখ্যাত "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের শ্রীচৈতন্যকৃত ব্যাখ্যা চৈতন্যচরিতামৃত থেকে উদাহৃত হতে পারে।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে আছে, সার্বভৌমের নিকট শ্রীচৈতন্য এ-শ্লোকের একাদশ অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সে সংখ্যা প্রথমত দাঁড়িয়েছে অষ্টাদশ, পরে একষষ্টি। ভাগবতের মাত্র একটি শ্লোক দোহন করেই কিভাবে বহুসংখ্যক অর্থের আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাই প্রমাণের জন্যই উক্ত একষষ্টি অর্থ কৃষ্ণদাসের বিবরণ অনুসরণে উদ্ধার করা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমেই শ্লোকটি স্মরণীয়। নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনিবৃন্দকে উদ্দেশ করে বলছেন সূতপাঠক :

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥"[১]

অর্থাৎ, ভগবানের এমনই সর্বাকর্ষণের শক্তি যে, ব্রহ্মভূত অবিদ্যাগ্রন্থিমুক্ত মুনিগণও তাঁতে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের ব্যাখ্যানুসারে এ-শ্লোকে মোট একাদশটি পদ—১ আত্মারামাঃ। ২ চ। ৩ মুনয়ঃ। ৪ নির্গ্রন্থাঃ। ৫ অপি। ৬ উরুক্রমে। ৭ কুর্বন্তি। ৮ অহৈতুকীম্। ৯ ভক্তিম্। ১০ ইত্থম্ভূতগুণঃ। ১১ হরিঃ।

এবার প্রতিটি, পদের তাৎপর্য তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে উদ্ধার করা যাক :

১. আত্মা—সাতটি অর্থ। ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব।

২. 'মুনি'—সাতটি অর্থ। মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি, মুনি।

৩. 'নির্গ্রন্থ'—অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদি-বিহীন, মূর্খ-নীচ-ম্লেচ্ছাদি-শাস্ত্ররিক্তগণ, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন।

৪. 'উরুক্রম'—"শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি, শক্ত্যে আক্রমণ / চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥"

---

১ ভা° ১।৭।১০

আর 'ক্রম' শব্দের প্রয়োগ তাৎপর্য: ১ বিভুরূপে ব্যাপ্তি, ২ শক্তিতে ধারণপোষণ, ৩ মাধুর্যশক্তিতে গোকুল, ঐশ্বর্যশক্তিতে পরব্যোম প্রকাশ, মায়াশক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃজন।

৫. 'কুর্বন্তি'—আত্মনেপদী রূপ না হয়ে পরস্মৈপদী হয়েছে। কারণ ভক্তির ফল যে-সুখ তা মুনিগণের আত্মার্থে নয়, কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্যার্থে।

৬. 'হেতু'—কৃষ্ণহেতু নয়, অন্যহেতু। অন্যহেতু: ১ ভুক্তি—স্বর্গাদি ভোগ, ২ অষ্টাদশ সিদ্ধি, ৩ পঞ্চবিধা মুক্তি।

৭. 'ভক্তি'—দশপ্রকার অর্থ। তন্মধ্যে সাধনভক্তি-প্রেমভক্তি-শান্তাদি পাঁচ প্রকারের ভক্তিও আছে।

৮. 'ইত্থম্ভূতগুণঃ'— 'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়। ব্রহ্মানন্দ এর নিকট তৃণ প্রায়। 'গুণ' অর্থাৎ কৃষ্ণের অনন্তগুণ।

৯. 'হরি'—"সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে, মন॥"

১০. 'চ'—সাতটি অর্থ: ১ একতরের প্রাধান্যে, ২ একীকরণে, ৩ পরস্পরার্থে, ৪ যত্নান্তরে, ৫ সমুচ্চয়ে ৬ পাদপূরণে, ৭ অবধারণে।

১১. 'অপি'—সাতটি অর্থ: ১ সম্ভাবনা, ২ প্রশ্ন, ৩ শঙ্কা, ৪ নিন্দা, ৫ সমুচ্চয়, ৬ যুক্তপদার্থ, ৭, কামচার [আপন ইচ্ছামত]

এ-প্রসঙ্গে আরও দু'একটি শব্দার্থের বিশদীভবন মনে পড়তে পারে। যেমন 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যায় সর্ববৃহত্তম-তত্ত্ব রূপে 'স্বয়ং ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণই উল্লিখিত। এইভাবেই আত্মা—সর্বব্যাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ শ্রীহরি। আত্মারামাশ্চ—সাধক, ব্রহ্মময়, প্রাপ্তব্রহ্মালয়, মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ —এই ছয়প্রকার আত্মারামগণ 'আত্মারাম' হয়েও (চ) কৃষ্ণভজনা করেন। আত্মারাম যোগী সগর্ভ ও নির্গর্ভ ভেদে দুই শ্রেণীর। দুই শ্রেণীর যোগীদের আবার তিনটি তিনটি করে ছয়টি ভেদ আছে।—যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি। 'আত্মা' শব্দে 'মন' অর্থ, 'যত্ন' অর্থ, 'ধৃতি' অর্থ যথাক্রমে কৃষ্ণ-বাসনায় মন, কৃষ্ণভক্তিতে যত্ন এবং কৃষ্ণসেবায় ধৈর্য ব্যঞ্জিত করছে। 'মুনি' শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ এবং 'নিগ্রন্থ' শব্দে মূর্খজনও বোঝায়। কেননা, এরাও কৃষ্ণ কৃপালাভে বঞ্চিত নয়। 'ধৃতি' শব্দে পূর্ণতাজ্ঞানও হতে পারে। কৃষ্ণ-ভক্তিতে এই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। 'আত্মা' শব্দে বুদ্ধিও হয়। বুদ্ধিত্যাগ

করে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ সম্ভব। 'আত্মা' শব্দে স্বভাবও হতে পারে: "জীবের স্বভাব—কৃষ্ণদাস অভিমান / দেহে 'আত্মা'-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥" এ পর্যন্ত উনিশটি অর্থ। 'আত্মা' শব্দে দেহ-অর্থ হলে বোঝাবে—১ দেহারাম, ২ কর্মনিষ্ঠ, ৩ তপস্বী, ৪ সর্বকাম।

এপর্যন্ত তেইশটি অর্থ। এর সঙ্গে আরও তিনটি অর্থ যোগ করা সম্ভব। যেমন, 'চ' শব্দের অর্থই ধরা যাক। "'চ'-শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয় / 'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয়॥" 'নির্গ্রন্থাঃ' হইয়া ইহাঁ 'অপি' নির্ধারণে।" কৃষ্ণমনন মুনি প্রথমাবধি কৃষ্ণভজনা করেন, গৌণার্থে, "আত্মারামা অপি ভজে"। "'চ'—এবার্থে, মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়। 'আত্মা-রামা' 'অপি'—'অপি'—গর্হা অর্থ কয়॥" 'নির্গ্রন্থ' উভয়েরই বিশেষণ হবে। পারিভাষিক প্রয়োগে "ব্যাধ নির্ধন" বা ব্যাধ হয়েও হরিভক্তিপরায়ণ হওয়া সম্ভব, এরূপ অর্থদ্যোতকও হতে পারে। এই হলো মোট ছাব্বিশটি অর্থ। আবার, "বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার॥ রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ-বিভেদ।" পূর্বের ছাব্বিশের সঙ্গে পরের বত্রিশ, মোট আটান্ন প্রকার অর্থ। অনন্তর আর এক অর্থ হলো, ইতরেতর 'চ' দিয়ে সমাস করলে দাঁড়ায়; "সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয॥" "মুনয়শ্চ' ভক্তি করে এ অর্থও সিদ্ধ এবং "নির্গ্রন্থ এব হঞা" তাও। উনষাটের পরেও আছে অন্য এক অর্থ: "আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ ভজয॥" আবার 'অপি' শব্দ অবধারণে গ্রহণ করলে দাঁড়ায়: "উরুক্রম এব, ভক্তমেব, অহৈতুকামেব, কুর্বন্ত্যেব'। অর্থ দাঁড়ালো ষাট। পুনশ্চ, "আত্মাশব্দে কহে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ। ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥" এই 'জীব' যদি সাধুসঙ্গ পায়, "সভে সব ত্যজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয॥" এই ভাবেই পূর্ণ হলো একষট্টি অর্থ।

বঙ্গদেশে চৈতন্য-প্রবর্তিত গৌড়ীয় দর্শনে ভাগবত-চর্চার সূক্ষ্মতা যে কোন্ তুঙ্গশিখর স্পর্শ করেছিল উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাই তার একটি অনন্য উদাহরণ। 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোকের অর্থ একাদশ, অষ্টাদশ, নাকি একষট্টি, তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ বিচারবিতর্ক করুন। কিন্তু রসিকের কাছে এর মধ্যে একটি সত্যই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নবদ্বীপ-বৃন্দাবন নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণব সমাজেই শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শুধু 'লোকোত্তর আস্বাদক' রূপেই নন, অদ্বিতীয় ভাষ্যকার রূপেও স্বীকৃত। অন্ত্যলীলায় গোপীভাবে বিভাবিত অন্তরে শ্রীচৈতন্য যেমন লোকোত্তর আস্বাদক রূপে স্বয়ং ভাগবত-

রসভাষ্য হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে তেমনি রূপানুগ্রহে-সনাতনশিক্ষায় করেছেন ভাগবতের অবিস্মরণীয় ভাষ্যরচনা। প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্য-প্রকাশানন্দ-সংবাদও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে উল্লিখিত হতে পারে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদা প্রখ্যাত বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ জনৈক শিষ্য প্রমুখাৎ চৈতন্যদেবের কথা ও তাঁর বাণী শুনে কৌতূহলী হন। ঘটনাচক্রে ভাবাবিষ্ট কীর্তনপর চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ঘটে। প্রকাশানন্দেরই আগ্রহবশে শ্রীচৈতন্য তাঁর সমীপে নিগূঢ় ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। ফলত কাশীবাসী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও শ্রীচৈতন্যের এই ভাগবতসার-সংগ্রহে চমৎকৃত হলেন, স্বয়ং প্রকাশানন্দের কথা তো বলাই বাহুল্য। প্রকাশানন্দের চৈতন্য-পদাশ্রয়ের ইংগিতেই এ ঘটনাবিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতে পরিসমাপ্ত। এ-গ্রন্থে ভাগবতের বিখ্যাত টীকাকার বল্লভাচার্যকেও চৈতন্য-উপদেশে শ্রীধর-প্রদর্শিত পথে যাত্রা করতে দেখি। বস্তুত পূর্বভারতের সার্বভৌম বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতের বল্লভাচার্য ও উত্তর ভারতের প্রকাশানন্দ-বিজয়ের দ্বারা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমগ্র উত্তরাপথে ভাগবতীয় তথা চৈতন্য-প্রেমধর্ম প্রচারের বিপুল ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন বলেই মনে হবে। এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে ভাগবতধর্ম প্রচারের ইতিহাসও। তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্য গোপাল ভট্টাদি এবং ভাগবত ধর্ম-প্রচারের বৈশিষ্ট্যে ও ভাগবতধর্ম-প্রচারক শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ভক্তিগুণে সমাকৃষ্ট হয়েই তাঁর শরণাগত হন বলে জানা যায়।

স্থানের দিক থেকে যেমন বিপুল ভারত, কালের দিক থেকে তেমনি বিরাট চৈতন্য-যুগ চৈতন্যচরিতামৃতের পটভূমিকায় প্রতিফলিত। এই বিরাট যুগের ভাগবতচর্চার উজ্জ্বল ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাগবত-ভাবনাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এ-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভাগবতের বাঙালী টীকাকার' অনুচ্ছেদে আমরা তো বলেছি, ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত গৌড়ীয় মনীষার ক্ষীরসংগ্রহে কৃষ্ণদাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। সর্বোপরি তিনি নিজেও একজন মৌলিক টীকাকার-রূপে পরিচিত হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য। শুধু সূক্ষ্মতায় নয়, সরলতাতেও গৌড়ীয় ভাষায় পরিবেষিত তাঁর ভাগবত-ভাষ্য মনোগ্রাহী। উদাহরণস্বরূপ ভাগবতের "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ" শ্লোকটির "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"

অংশের পদান্ত "ভবেৎ" ক্রিয়াপদটির ব্যাখ্যা মনে পড়ছে: "ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়। কর্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়॥" ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মনুষ্য দেহধারণে ভগবান রাসাদি যে-সব লীলা করেছেন, তা শুনে "তৎপরো ভবেৎ" বা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হতেই হবে, "অন্যথা প্রত্যবায়" বলে কৃষ্ণদাস নিজ সম্প্রদায়ের অভিমত প্রকাশে ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক রূপে শ্রীধর স্বামীর ভাগবতটীকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। "শ্রীধর স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি" এই চৈতন্য-বাণীকে অন্তরে অঙ্গীকার করে তিনিও ভাগবত-ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবতের "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকটির তৎকৃত বিশ্লেষণ মনে পড়ছে:

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামি-চরণৈঃ—

উজ্ঝিত-কৈতবঃ ফলানুসন্ধান-রহিতঃ
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ॥"[১]

ভাগবতশাস্ত্রে এরূপ পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী-রূপে কৃষ্ণদাসের ভাগবতানুবাদ মূলানুগ অথচ প্রায়-মৌলিক কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ "কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত" শ্লোকটির চৈতন্য-কৃত আস্বাদন কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে কী স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করেছে স্মরণ করা যায়:

"নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়॥
এই ত্রিজগত ভরি আছে যত যোগ্য নারী
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়॥
কৈল যত বেণু ধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন॥
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া আর্যপথ ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায়।

১ চৈ. চ. আদি। ১, ৫১

এবে আমায় করি রোষ কহি পতিত্যাগ দোষ
ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখায়॥
অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ
এই সব শঠ-পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস হয় নারীর সর্ব্বনাশ
ছাড় এই সব কুটিনাটী॥"[১]

বেণুগীতে সম্মোহিতা করে ব্রজবধূদের কৃষ্ণই এনেছেন আর্যপথ থেকে সরিয়ে বহু দূরে বৃন্দাবনের বনস্থলীতে, এখন আবার তাঁরই মুখে কিনা আর্যমার্গ-অনুসরণের উপদেশ! এই 'শঠ-ধৃষ্ট' মাধবের ছলচাতুরীর উত্তরে ভাগবতীয় গোপীর অসূয়া-রোষ উপরি-উক্ত চরণসমূহে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রার্থনা-অনুনয়ের শান্তিবারিও স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়েছে তীব্র মনঃক্ষোভে রোষে :

"বেণুনাদ অমৃতঘোলে অমৃতসমান মিঠাবোলে
অমৃতসমান ভূষণ শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ হরে মন হরে প্রাণ
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥"[২]

চৈতন্যচরিতের পরিবেষণে কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে চৈতন্য-আস্বাদিত ভাগবতামৃত এইভাবে বিতরিত হয়েছে একটি-দুটি ক্ষেত্রে নয়, অগণ্যবার অগণিত ক্ষেত্রে। চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে ভাগবত যখন শতকরা একচল্লিশ ভাগ,[৩] তখন আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, চৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবত ও চৈতন্যচরিত গৌড়ীয় রসাস্বাদনে তুল্যমূল্য।

অনেকেই অবশ্য মনে করতে পারেন, চৈতন্যভাগবতকার এবং চৈতন্য চরিতামৃতকার উভয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুই বিশিষ্ট ইষ্টগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বলেই তাঁদের অনুধ্যানে চৈতন্যজীবনী এইভাবে কৃষ্ণজীবনলীলার সঙ্গে সংগতিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে, ফলত চৈতন্যচরিতে ও ভাগবতে হয়েছে একাকার। কিন্তু চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপেই যে চৈতন্যজীবন ও কৃষ্ণজীবন, চৈতন্যচরিত ও ভাগবতের এই 'অপূর্ব অদ্ভুত' মেশামেশি আত্মপ্রকাশ করেছে, তা প্রমাণের জন্যই সম্পূর্ণ পৃথক্ এক

১ চৈ. চ. অন্ত্য। ১৭, ৩২-৩৫ ২ তত্রৈব, ৩৬

৩ দ্র° 'চৈতন্যচরিতের উপাদান', ড° বিমানবিহারী মজুমদার, পৃ° ৩৬৩

বৈষ্ণবীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে আমরা এখানে দুচার কথা বলে নিতে পারি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বৃন্দাবনদাস যেমন নবদ্বীপের এবং কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের, লোচনদাস তেমনি বাঙ্‌লার একটি নিজস্ব ভাবসাধনা ও ভক্তসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। বস্তুত গৌরনাগরীভাবের সাধক-কবি রূপে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ভাগবতের স্থান কতটুকু থাকা সম্ভব তা নিতান্ত কম কৌতূহলের বিষয় নয়। চৈতন্য-রেনেসাঁসের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হিসাবেও তাঁর কাব্যে ভাগবতপুরাণ-ভাবনা আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

রচনাকালের দিক থেকে চৈতন্যভাগবতের পরবর্তী এবং চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ববর্তী চৈতন্যমঙ্গল বাঙলার চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সাধারণ ঐতিহ্যকেই বরণ করে নিয়েছে। অর্থাৎ বৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো লোচনদাসেরও পরমসহায় মুরারির কড়চা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কড়চার প্রথম প্রক্রমের অন্তর্গত 'শ্রীনারদানুতাপ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গের কলিকলুষাদির বিবরণ লোচনদাসের গ্রন্থারম্ভে হুবহু অঙ্গীকৃত। কিন্তু আমরা তো জানি, মুরারি-কৃত পথে যাত্রার অর্থই হলো পদে পদে ভাগবতানুসরণ, এককথায় কৃষ্ণজীবনের অনুষঙ্গে চৈতন্যজীবনের অনুধ্যান। এই বিশিষ্ট লক্ষণ বৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের যেমন, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেরও তেমনি অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাই দেখি, চৈতন্যমঙ্গলেও স্থান পেয়েছে অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক শচীগর্ভবন্দনা, দেবগণের গৌরাঙ্গবন্দনা, শূন্যচরণে নূপুরনিক্বণ, গৌরাঙ্গের বাল্যলীলাচাপল্য ইত্যাদি। লক্ষণীয়, বালক বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত অলৌকিক লীলাদর্শনে শচীর বিশুদ্ধ বাৎসল্য-রসাশ্রয়ী উৎকণ্ঠাদিও হুবহু ভাগবতের যশোদা-সাক্ষিক। চৈতন্যমঙ্গলের বিবরণ অনুসারে শচী আপন পুত্রের মঙ্গল কামনায় নিমাইয়ের এক এক অঙ্গকে এক এক দেবতার নামে রক্ষাবন্ধন করেছিলেন .

> "এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া।
> জনার্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥
> শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন।
> চক্ষু নাসিকা মুখ রাখুক নারায়ণ ॥
> বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
> ভুজ তোর রক্ষা করু দেব গিরিধর ॥

উদর-রক্ষণ তোর করু দামোদর।
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥
জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম।
রক্ষা করু ধরাধর তোর দু' চরণ ॥
সব অঙ্গে ফুৎকৃতি দেই শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা ॥"

মুহূর্তে মনে পড়ে, পুতনাবধের অব্যবহিত প'রেই যশোদা-কর্তৃক বাৎসল্যবতী গোপীগণসহ নন্দনন্দনের অঙ্গ-বীজন্যাস :

"অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তবজান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥"[১]

অর্থাৎ, অজ তোমার চরণদ্বয়, মণিমান তোমার জানুদ্বয়, যজ্ঞ তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন। অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, কেশব তোমার হৃদয়, ঈশ তোমার বক্ষঃস্থল, ইন তোমার কণ্ঠ, বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

স্মরণীয়, চৈতন্যমঙ্গলকারের দৃষ্টিতেও শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠায় মুরারির গ্রন্থের মতো তাঁর গ্রন্থেও গৌর-জায়া লক্ষ্মী হয়ে উঠেছেন নারায়ণ-পদাশ্রিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। তবে সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে লোচনদাসের কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিপ্রলম্ভাখ্য বিরহও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গোপীভাবে তথা রাধাভাবে বিলাপের পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণভাবে বিলাপও বিশেষ উল্লেখনীয় হয়ে আছে। অবশ্য শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্যরূপে নদীয়ানাগরীভাবের পোষক কবির কাছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠবেন, এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ ঘটে সেখানেই যেখানে ভাগবতাশ্রয়ে চৈতন্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় শ্রীজীব প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন প্রমাতাবর্গের সঙ্গে লোচনদাসের গভীর অন্বয় সাধিত হয়ে যায়। ভাগবতে অবতার-কথন-প্রস্তাবের "কৃষ্ণবর্ণং

১ ভা° ১০।৬।২২

ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে লোচনদাস তাই কলিযুগের অবতার প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্তেরই অনুকূলতা করে বলেন :

" 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' সেই শুন সর্বজন।
গোরা গোরা বলি গাই এই সে কারণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর।
সভার সহিত প্রভু কৈলা অবতার॥
অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঞি সে 'উপাঙ্গ'॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র—যত পারিষদ।
সংহতি আইলা সভে প্রহ্লাদ নারদ॥ ···
সংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞ—ধর্ম পরকাশ।
সুমেধা যে জন—তাতে পরম উল্লাস॥ ···
কান্তি কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ—দুই হৈল এক।
আর দুই-যুগের বর্ণ—ইহায় না দেখ॥
কলি দ্বাপর দুইযুগে এক বর্ণ।
দুইযুগে বরণ এক—এই তার মর্ম॥"

গর্গমুনির বাক্যকে ক্রমভঙ্গ-দোষদুষ্ট মনে করে যারা, সেই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে তাঁর বক্তব্য রূপ গোস্বামীরই অনুরূপ :

"ভূত ভবিষ্য বর্তমান কহিবার তরে।
তিন-কাল কহে চারি-যুগের ভিতরে॥
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্তমান।
দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতার কৃষ্ণ-নাম॥
'ইদানী' বলিয়া তেঞি বোলে গর্গমুনি।
ভূতকাল-ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি॥···
···ভবিষ্যৎ—অর্থে ভূত প্রমাণে পণ্ডিত।
নিশ্চয়তা আছে তার—এইত ইঙ্গিত॥
তথাপি তাহাতে 'তথা' শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল রক্ত বলি 'তথা' কি কাজ কাহিনী।

'তথা' শব্দে পূর্ব-উক্ত শুক্ল রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥"

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের এই চৈতন্যতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর সর্বসংবাদিনী মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, 'সাধন'তত্ত্বে গৌরনাগরী-ভাবাবলম্বী তথা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তের মধ্যে পথের তারতম্য যতই থাক, 'সাধ্য' গৌরচন্দ্রের অবতার-তত্ত্ব ভাগবতপুরাণ থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে উভয়েরই অত্যাশ্চর্য মতৈক্য।

উভয় গোত্রের আর একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাগবতেরই পরতত্ত্ব ব্যাখ্যায়। ভাগবতের "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্লোক ব্যাখ্যায় লোচনদাস তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেরই অনুকূলতা করে বলেন:

"বৃন্দাবনচন্দ্র যুগ-অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥"

তবে যে গর্গমুনি চারিযুগে চারিবর্ণের কথা বলেছেন! সংশয়ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে লোচনদাস পুনরপি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে বলেন

"আপনেহি ভগবান্ জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥
বিশেষ্য-বিশেষণ করি বাখানহ মনে।
এই সে সন্দেহ ইথে—দ্বিধা তেকারণে ॥...
...ধর্ম সংস্থাপন-অধর্ম্মবিনাশ-নিমিত্তে।
প্রতিযুগে অংশ-অবতার হয় তাথে ॥
আপনেই দ্বাপরে ভগবান্ হরি।
অবতারশিরোমণি সভার উপরি ॥"

আবার দ্বাপরে যেমন কৃষ্ণ, কলিতে গৌরচন্দ্রই তেমনি গৌরভক্ত-সাধারণের দৃষ্টিতে "পূর্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম":

"যেন দ্বাপরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র।
কলি-দ্বাপর যুগে এ-দুই স্বতন্ত্র ॥"

"স্বয়ং ভগবান্" শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব তাই কলিযুগেরই শ্রেষ্ঠতাসূচক বলে মনে করেছেন চৈতন্যজীবনীকার:

"ঐছন করুণা কহ কোন্ যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম দেই কোন্ অবতার ॥
পাপ নাশহেতু আছে ধর্ম কর্ম তীর্থ।
কি জানহ ধর্মশীল পায় হেন অর্থ ॥
এতেকে জানিল—কলিযুগ যুগসার।
সংকীর্তন ধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥"

ভাগবতেও কলিযুগ-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলা হয়েছে, দোষনিধি-কলির একটি মহান্ গুণ এই যে, কৃষ্ণসংকীর্তনেই এযুগে জীব সংসারমুক্ত হয়ে পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। আসলে সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে-ফল, ত্রেতায় বিষ্ণুর যজ্ঞ-নিষ্পাদনে, দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্যায়, কলিতে একমাত্র হরিসংকীর্তনেই সেই ফললাভ সম্ভব।[১] কৃষ্ণচরিতমঙ্গল-পুরাণ ভাগবতের সঙ্গে এইভাবেই চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের নিগূঢ় যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে কলির উপাসনাতত্ত্বের মর্মপ্রকাশে—"কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ" তথা "কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ" এই ভাগবত-বাণীই চৈতন্যমঙ্গলের বাণী: "সংকীর্তনধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর।" শ্রীচৈতন্য 'সর্বযুগসার' কলিযুগের এই অভিনব সংকীর্তন ধর্ম প্রচারের জন্যই "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-ত্বিষাকৃষ্ণমূর্তিতে আবির্ভূত বলে চৈতন্যমঙ্গলকার পুনরপি ভাগবত-কথিত কলি উপাসনাতত্ত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। "ত্বিষাকৃষ্ণ' অর্থাৎ অকৃষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে এ হলো চৈতন্যের রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকারেরই ইংগিত। গৌরনাগরীভাবে বিভাবিত চৈতন্য-মঙ্গলকারের অভিমতও অন্যরূপ নয়:

"রাধাভাব অন্তরে রাধাবর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হঞা।
সঙ্গে সখা-সখী-বৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
ব্রজভাবে অখিল মাতাঞা ॥"

ভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি প্রকাশিত বিচিত্র বৃন্দাবন-পরিকরদের বিচিত্রভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা হয়ে আছে। আর লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে সেই পরম-

১ "কালের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" ভা° ১২।৩।৫১-৫২

ভাব ব্রজভাবকে 'দেশে দেশে' 'ঘরে ঘরে' প্রচারের মূর্তিমান্ বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হতে দেখছি শ্রীচৈতন্যদেবকে :

"দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে।
ব্রজভাব—দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে॥"

অনর্পিতচরিত শ্রীচৈতন্যের ব্রজভাব প্রচারের সুফল নিশ্চয়ই সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৃন্দাবনদাস লোচনদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজে অঙ্গীকৃত হয়েছিল, নতুবা তাঁদের প্রত্যেকেরই চৈতন্যজীবনী কাব্যে কিভাবেই বা ভাগবতের ব্যক্তি-সাক্ষিক কৃষ্ণ-গোপীপ্রেম ব্যক্তিপরিচ্ছেদ বিগলিত হয়ে উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরস রূপে সাধারণীকৃত হতে পারতো। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে প্রবোধানন্দ সরস্বতী যথার্থই বলেছিলেন : "পূর্বং সংপ্রতি গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ।" বস্তুত চৈতন্যাবির্ভাবে কিভাবে প্রেম সাধারণীকৃত হলো কিভাবেই বা হলো উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরসের জনে জনে বিতরণ-সাধন, তার অন্তরঙ্গ ইতিহাস পরিবেষণেই বাঙ্লা চৈতন্যচরিত সাহিত্যের সর্বোপরি বৈশিষ্ট্য।

ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

চৈতন্যজীবনীকারগণের অভিমত অনুসারে ভাগবত-তত্ত্বরস প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি নিজে ভাগবতের পরমতত্ত্ব আস্বাদন করে রসরূপে তা জনে জনে বিতরণ করেছেন। ফলত উৎসারিত হয়েছে পদাবলী সাহিত্য, জীবনীকাব্য। প্রণীত হয়েছে ভাগবতের বিভিন্ন টীকাভাষ্য। আবার তাঁরই প্রেরণায় ভাগবতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রস-তত্ত্বশাস্ত্র। সেই সঙ্গে অনিবার্য হয়েছে ভাগবতের অনুবাদ। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সহস্র সহস্র বঙ্গবাসীর দ্বারে ভাগবতের তত্ত্বরস-নিঝরিণীকে পৌঁছে দেবার এছাড়া প্রশস্ত পথ আর কি থাকতে পারে? আমরা তো পূর্বেই দেখেছি, মালাধর বসুই ভাগবত অনুবাদের পথিকৃৎ পুরুষ। "সুধন্য তাহার ভবে নর-কুলধন" ভগীরথব্রতীর মতোই কৃত্তিবাস যেমন সংস্কৃত-হ্রদে আবদ্ধ রামায়ণকে গৌড়ীয় ভাষায় জাহ্নবীরূপে প্রবাহিত করে দিয়েছেন, মালাধর বসুও তেমনি শুক-আস্বাদিত ভাগবতীয় অমৃত রসফলটি তুলে ধরেছেন অগণ্য রসপিপাসু বাঙালীর ওষ্ঠপ্রান্তে। "নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি"। গৌড়-ভূমিরই অবিসংবাদিত প্রতিনিধিরূপে শ্রীচৈতন্যের মালাধর বন্দনা তো চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে আমরা পূর্বেই উদ্ধার করেছি। চৈতন্যের আপন যুগেই

আর এক ভাগরত অনুবাদক তাঁর পরম অনুগ্রহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীকার রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে যেমন মালাধর বসুই একমাত্র, চৈতন্যযুগে তেমনি রঘুনাথ ভাগবতাচার্যই একমাত্র ভাগবত-অনুবাদক নন। তবু তাঁকেই আমরা চৈতন্যযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাগবত-অনুবাদক হিসাবে গ্রহণ করে এ অনুচ্ছেদে শুধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীরই আলোচনা করবো।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গুরু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের আবাল্য অভিন্নহৃদয় সহচর গদাধর পণ্ডিত। রঘুনাথের ভাষায়:

"বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য-মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তেঁহ, সহজে শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ-মন-বাক্যে মোর সেই সে শরণ॥"[১]

গদাধরের নূতন করে পরিচয় দান নিরর্থক। তাঁর ভাগবত পাঠে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও যে "মহামত্ত" হতেন তা তো বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আলোচনাকালে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। গদাধর পণ্ডিতেরই যোগ্য শিষ্যরূপে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের তুল্য লোকোত্তর ভক্তকেও গৌড়ীয় ভাষায় ভাগবত রসপরিবেষণে তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে রঘুনাথের ভাগবতানুবাদ শ্রবণে শ্রীচৈতন্যের ভাববিকারসমূহ চৈতন্যভাগবত থেকে উদ্ধৃত হতে পারে:

"শুনিঞা তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্টা হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বোল বোল বোলে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
হুঙ্কার গর্জন প্রভু করেন সদায়॥
সেই বিপ্র পঢ়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুন আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ত্রাস॥

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ১।১।১৬-১৭

এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণনিধি ॥[১]

অতঃপর বাহ্যলাভ করে শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে পরমসন্তোষে আলিঙ্গন করে তাঁকে বললেন, এরূপ ভাগবত পাঠ তিনি আর কখনও কারো মুখে শোনেন নি—সেইজন্যেই আজ থেকে তাঁর নাম হবে 'ভাগবতাচার্য।' রঘুনাথকে পদবীটির যোগ্যতম ব্যক্তি জেনেই সমবেত সকলে 'হরি হরি'ধ্বনি করে উঠল। এখন প্রশ্ন, রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর কি সেই বৈশিষ্ট্য যা আর কোনো অনুবাদকর্মে নেই ; দ্বিতীয়ত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রতি শ্রীচৈতন্যের যতই শ্রদ্ধা থাকুক, শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুনে তাঁর সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয়েছে এরূপ ঘটনা কোথাও মেলে না, অথচ রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রবণে তাঁর সেই ভাবোদয়ই চৈতন্যভাগবতের বিবরণে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মালাধরে অনুপস্থিত রঘুনাথের এই বিশেষ গুণটিই আমাদের আলোচনার সব শেষের লক্ষ্য হবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী অন্যান্য ভাগবত অনুবাদের মতোই পয়ার-ত্রিপদীতে নিবদ্ধ একখানি কাব্য। এর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে অন্যত্র। ভাগবতের তুল্য দুরূহ ভক্তিশাস্ত্র তথা তত্ত্বসিন্ধু তাঁর সরল অথচ সরস-সুষমাপূর্ণ পরিবেষণরীতিতে সর্বত্র মনোহারী হয়ে উঠেছে, ভাষান্তরকারীর পক্ষে আমরা তো এটিকেই প্রথম ও প্রধান গুণ বলে মনে করি। বিষয়সূচী-বিন্যাসেও তাঁর অনুবাদকর্মের পারিপাট্যে মুগ্ধ হতেই হবে। বারোটি স্কন্ধে তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠারো হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ ভাগবতের আক্ষারক অনুবাদ প্রায় অসম্ভব ; আর যদিও বা সম্ভব ছিল, সেই বিপুল গ্রন্থ আপামর জনসাধারণ কতদূর আত্মস্থ করতো বলা কঠিন। সুতরাং সে পথে না গিয়ে রঘুনাথ সংক্ষেপকরণের সংগত পন্থাই অবলম্বন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে তাই দেখি প্রথম ন'টি স্কন্ধের শুধু মর্মানুবাদই স্থান পেয়েছে, আর শেষের তিনটি স্কন্ধের, অর্থাৎ দশম একাদশ দ্বাদশের স্থান পেয়েছে আক্ষরিক অনুবাদ। এই শেষ তিনটি স্কন্ধের কাব্যানুবাদে অনুবাদকের নিষ্ঠা এমনই প্রবল যে পয়ারানুবাদের পাশাপাশি এমন কি মূল শ্লোকের সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত। প্রথম ন'টি স্কন্ধের মর্মানুবাদ মাত্র করলেও তাতে ভাগবতের মূল বক্তব্যসমূহ, অর্থাৎ জীবের ঐকান্তিক শ্রেয় এবং

১। চৈ, ভা° অন্ত্য। ৫, ১১১-১৬

পরমধর্ম, ভগবানের অবতারত্বের হেতু, বিবিধ ভক্তচরিত্র-পরিক্রমা, ভক্তি-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, সাধুসঙ্গের মহিমা, সর্বোপরি ভগবানের নামকীর্তন-মাহাত্ম্য ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়েনি। এককথায় পরিচ্ছন্ন তাঁর প্রকাশভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন তাঁর পরিবেষণরীতি।

রঘুনাথের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্রবহির্ভূত প্রসঙ্গ তিনি যথাসাধ্য বর্জন করেছেন। শুধু শাস্ত্রবহির্ভূতই নয়, ভাগবত শাস্ত্র-বহির্ভূত কথা যথাসম্ভব না বলবারই চেষ্টা করেছেন। এখানেই রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কালের অন্যান্য ভাগবত-অনুবাদকের 'বহুত অন্তর' ঘটে গেছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মাধবাচার্য; সন্দেহ নেই, তিনি মালাধর-গোত্রের কবি, কেননা ভাগবত-অনুবাদ নয়, কৃষ্ণচরিত-প্রণয়নই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, আর সেইজন্যই তিনি ভাগবতের সঙ্গে সঙ্গে হরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণের উপাদানও অসংকোচে গ্রহণ করেছেন। আবার 'কৃষ্ণমঙ্গল'কাব্যের কবি গোবিন্দ আচার্য ভাগবত বহির্ভূত, এমনকি লৌকিক দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড লীলাপর্যায় পরিবেষণেও কুণ্ঠিত নন। 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যের দুঃখী শ্যামদাস তো শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অনুসরণে রাধাকে কৃষ্ণের মাতুলানীই করে তুলেছেন! পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে রাধানাম রাসলীলার সুখ্যাত শ্লোক 'অনয়ারাধিতো' শ্লোকের অনুবাদেই একবার মাত্র উচ্চারিত। বাঙালী কবির পক্ষে, বিশেষত চৈতন্যাবির্ভাবের পরে, এ প্রলোভন দমন সত্যই অসামান্য সংযমের পরিচায়ক। এই হিসাবেই তাঁর সংকল্প সার্থক: "মহাভাগবতে না কহিব অন্যকথা"। "মহাভাগবতে" তিনি যতই "অন্যকথা" কম বলেছেন, ততই যে অনুবাদকর্মটির নিষ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অনুবাদক হিসাবে রঘুনাথের এই নিষ্ঠারই পরিচয়-স্বরূপ দু'চারটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী:

"কহিল পরমধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতে।
মুক্তিপদ পর্যন্ত কপট নাহি যাথে॥
নির্মৎসর শান্ত জন যাঁরা অধিকারী।
হেন মহাভাগবত ধর্ম্ম-অবতারী॥"[১]

তু° ভাগবত—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং"।[২]

---

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ১।২।১১—১২

২ ভা° ১।১।২

২ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী :

"নিগম কল্পতরু-বিগলিত-ফল।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর ॥
ক্ষিতিতলে নিপতিত ভাগবত-নাম।
পিয় রে ভাবুক ভাই রসিক সুজান ॥"[১]

তু° ভাগবত :

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"[২]

৩ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী :

"যত যত অবতার করেন মুরারি।
কেহ অংশ কেহ কলা বুঝহ বিচার ॥
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-শিরোমণি।
অন্য-অবতার-অবতারী যদুমণি ॥"[৩]

তু° ভাগবত :

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃডয়ন্তি যুগে যুগে ॥"[৪]

৪ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী :

"গর্ত তুল্য তার দুই শ্রবণ-বিবর।
কেশবচরিত্র যার নহিল গোচর ॥
যে জিহ্বায় গোবিন্দ-মহিমা নাহি গায়।
ভেকজিহ্বা-সদৃশ সে কিবা গুণ তায় ॥"[৫]

তু° ভাগবত :

"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥"[৬]

অবশ্য সর্বত্রই যে ধ্রুপদী ভাষার প্রগাঢ় ধ্বনিসম্পদ রক্ষিত হয়েছে এমন নয়। "বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে"—যে-নয়ন বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ না করে, ময়ূরপুচ্ছে অংকিত নয়নের তুল্য তা নিষ্ফল—এই

---

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১।২।১৬-১৭ ২ ভা° ১।১।৩ ৩ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ১।৩।৫০-৫১
৪ ভা° ১।৩।২৮ ৫ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ২।১।৩৫-৩৬ ৬ ভা° ২।৩।২০

"বর্হায়িত নয়নে'র নৈষ্ফল্য "ময়ূর-পাখার চক্ষু জানিহ সমানে"[১] অনুবাদে সমস্পর্ধী শব্দশিল্পে সার্থক নয়। তবে লক্ষণীয়, পদাবলীর মুক্ত গতিহিল্লোল অনুবাদের বদ্ধ পয়ারে স্থানে স্থানে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ব্রহ্মার ভগবৎদর্শনই প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় :

"দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যাম বরণা ॥"[২]

অনুবাদকের ভূমিকা এখানে নিঃসন্দেহে সুরস্রষ্টা বেণুবাদকেরও। প্রসঙ্গক্রমে ষষ্ঠ স্কন্ধের অজামিলোপাখ্যানও মনে পড়বে। অনুবাদক এ-আখ্যানের উপক্রমণিকা হিসাবে মঙ্গলাচরণে পদ্যাবলীর নামমাহাত্ম্যমূলক বিংশ শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের অবিসংবাদিত প্রভাবের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কিন্তু উক্ত প্রভাবের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান দশমেই দ্রষ্টব্য। বিস্ময়ের ব্যাপার এই, দশম স্কন্ধে নূতনভাবে মঙ্গলাচরণ স্তুতি-বন্দনাদি স্থান লাভ করেছে। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের অসামান্য গুরুত্বই এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে।

মালাধর এবং রঘুনাথ, উভয়ে সেই তো এক ভাগবতেরই অনুবাদ করেছেন, তবু তাঁদের অনুবাদকর্মে কী বিরাট পার্থক্য ঘটে গেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কেউ যেন এই পার্থক্যের মূলীভূত কারণরূপে বহিঃ-প্রেরণার বৈষম্য নির্দেশ না করেন। কেননা উভয়ত শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, মম্মট ভট্টের 'শিবেতরক্ষতয়ে' সারস্বতনীতি, ভাষান্তরে সামাজিক অশুভ বিনাশের হিতব্রতেরই পরিপোষক। রঘুনাথ স্পষ্টতই বলেছেন,

"তবে কহি শুন লোক কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র ॥"[৩]

আর মালাধরও তো বলেছিলেন, "লোক নিস্তারিতে" তাঁর ভাগবত-পাঁচালি-প্রবন্ধের অবতারণা। আসলে উভয়ের পার্থক্য বহিঃপ্রেরণার বৈষম্যে নয়, অন্তঃপ্রেরণার 'বহুত অন্তরে'। মালাধর বসু এবং রঘু পণ্ডিতের যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যই সাক্ষাৎ পরমপ্রেমের প্রতিমূর্তি রূপে তাঁর যুগের প্রতিটি কবিশিল্পী রসিকভাবুককে অনুপ্রাণিত করেছেন। এ-দিব্য প্রেরণা মালাধর লাভ করবেন কোথা থেকে? মালাধরের

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' ২।১।৩৯ ২ শ্রীকৃপ্রেম' ২।২।৪৫ ৩ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম: ১০।১।৩২

যুগে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে ভাগবত ছিল অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম পুরাণ মাত্র, আর চৈতন্যযুগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভাগবত "শাস্ত্র"। স্বভাবতই অনুবাদকর্মে রঘুনাথের যে নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া সম্ভব, মালাধরে কি তা আশা সম্ভব? উদাহরণ যোগে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। ভাগবতে কৃষ্ণাবির্ভাবের বর্ণনায় শুকদেবের শ্লোকাষ্টক বিখ্যাত হয়ে আছে :

"অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি ॥
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা ॥
মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্ ॥
নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥"[১]

মালাধর ইতস্তত অসংলগ্নভাবে এ অংশের ভাবানুবাদ করেছেন। তৎসহ ভাগবত-বহির্ভূত কথাও যুক্ত হয়েছে :

"ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমি স্নভতিথি।
স্নভক্ষন সুভযোগ রোহিনি নাপতি ॥
দিন অস্ত গেল নিশি প্রথম প্রহর।
মেঘে আৎসাদিত হৈল গগন মণ্ডল ॥

১ ভা° ১০।৩।১-৮

দুয়ারি প্রহরি তারা সভে নিদ্রা গেল।
ঘোরতর মহানিসি অন্ধকার হৈল ॥
দুইত প্রহর গেল চাঁদের উদয়।
নগরেত সুরগুরু মিথুনে অর্দ্ধকায় ॥
প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন জামিনি।
প্রসন্নত নিসাপতি আর দিনমণি ॥
প্রসন্নত দসদিগ প্রসন্ন সাগর।
দেবগণ লৈয়া দেখে দেব পুরন্দর ॥
হেনই সমএ ক্ষেন মাহেন্দ্র হইল।
সুন্দরি দৈবকী দেবি পুত্র প্রসবিল ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দবিজয় গুনরাজখাঁন ভনে ॥"[১]

পক্ষান্তরে রঘুনাথ শুধু ভাগবতীয় স্কন্ধ ও অধ্যায়ই চিহ্নিত করেননি, শুকদেবের কৃষ্ণজন্ম-শ্লোকাষ্টকের প্রতিটি শ্লোকেরও সংখ্যা-পরম্পরায় অনুবাদ করেছেন :

"১ সর্বগুণযুত কাল পরমসুন্দর।
পৃথিবী পুরিয়া হৈল আনন্দমংগল ॥
শুভ বার তিথি যোগ নক্ষত্র করণ।
পুণ্যগুণ পুণ্যযোগ—সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
২ দশ দিগ্‌ পরসন্ন গগনমণ্ডল।
উদিত তারকাবলী দেখি মনোহর।
৩ নদ-নদী-সরোবর বিমলিত জল।
বিকসিত উতপল কুমুদ-কমল ॥
খগ-ভৃঙ্গ-নিনাদিত স্তবকিত বন।
৪ সুললিত পুণ্যগন্ধ সুমন্দ পবন ॥
শান্ত হৈয়া জ্বলিল দ্বিজের হুতাশন।
৫ উত্তম জনের চিত্ত হৈল পরসন্ন ॥
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দভি-বাজন।
সুরমুনিগণে করে পুষ্প-বরিষণ ॥

---

[১] শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৭০-১৭৭

৬ গন্ধর্ব-কিন্নর গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধ-বিদ্যাধর স্তুতি করয়ে প্রচুর ॥
সুর-বিদ্যাধরী নৃত্য করে সুললিত।
৭ মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত ॥
৮ ভরা নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর।
হেনকালে জনম লভিলা গদাধর ॥
অন্তর্যামী ভগবান্ অচিন্ত্যপ্রভাব।
দৈবকী-উদরে আসি কৈলা আবির্ভাব ॥"[১]

শেষোক্ত অনুবাদকের অসীম গুণপনা লক্ষ্য না করে উপায় নেই—"অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত" ভাষান্তরে হয়েছে, "শান্ত হৈয়া জলিল দ্বিজের হুতাশন"। পুনরপি, "মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্" হয়েছে "মন্দ মন্দ জলধর ঘন গরজিত"। অনুবাদের ক্ষেত্রে এই শব্দসাম্যরক্ষার প্রয়াস আধুনিক যুগের পক্ষেও বিস্ময়কর। অবশ্য "নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে" দেবভাষার এই ভাবে-সপুর্মীর প্রায়-নিরলংকৃত অথচ মহিমময় প্রকাশভঙ্গি বাঙলাবুলিতে ধরা দেয়নি—"ভরা নিশি রজনী-তিমির ঘোরতর। হেনকালে জনম লভিলা গদাধর ॥" তবু মালাধর অপেক্ষা রঘুনাথের অনুবাদ যে এক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতর হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। রঘুনাথের একমাত্র ত্রুটি, তিনি অনুবাদকের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও অতিভাষণের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সেক্ষেত্রে মালাধর বসু অপেক্ষাকৃত মিতভাষী ও যথাযথ। • কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের ভূমিকায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত উদাহরণটিই তো উদ্ধার করা চলে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ে বৃন্দাবনের বর্ষাবর্ণনায় একটি সুন্দর উপমা ব্যবহৃত হয়েছে :

"মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥"[২]

মালাধর ক্ষিপ্রহস্তে চমৎকার অনুবাদ করেছেন :

"দুই দিগে বন বাড়ি পথ আৎসাদিল।
বেদ না জানিঞা যেন দ্বিজ নষ্ট হৈল ॥"[৩]

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ১০।৩।২-১২ ২ ভা° ১০।২০।১৪ ৩ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৭৪৮

রঘুনাথ অতিনিষ্ঠাবশত ধীর হস্তে সতর্ক ভঙ্গিমায় বাগ্‌বহুল ভাষান্তর করেছেন, অথচ উপমার যাথার্থ্য স্পষ্ট হয় নি, অর্থও জটিল হয়ে পড়েছে :

"কদম দেখিয়া পথে কেহ নাহি হাঁটে।
তৃণজল পঙ্কে কৈল অধিক সঙ্কটে ॥
দুষ্ট কলিযুগে যেন দুষ্ট ব্যবহার।
ব্রাহ্মণে না পড়ে বেদ না ধর্মপ্রচার ॥"[১]

এই ধরণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়, রঘুনাথের ভাগবত অনুবাদ শুধু একনিষ্ঠই নয়, কাব্যরসসিদ্ধও বটে। মূর্তিমান প্রেরণা-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় রঘুনাথের রসনায় স্বভাবকবিত্ব যেন স্বচ্ছন্দ-বিহার করে ফিরেছে। তাঁর রচনা কোথাও কোথাও এমন কি মৌলিক কাব্যের প্রতিস্পর্ধীও হয়ে ওঠে, এই বড়ো আশ্চর্য। এ-গুণ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও যে নেই, এমন নয়। তবে মালাধরে যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা-নৈকট্য লক্ষ্য করি, রঘুনাথে তখন অনুভব করি, বৈষ্ণব পদাবলীর মূর্ছনা। উদাহরণস্বরূপ ভাগবতের একবিংশ অধ্যায়ে গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে গৃহে আবদ্ধা গোপীদের পূর্বরাগ-পর্যায়টি রঘুনাথের কাব্যানুবাদে লক্ষ্য করা যায়। সন্দেহ নেই, এ-অংশে রঘুনাথের কণ্ঠে বেজে উঠেছে কাব্যলক্ষ্মীর বীণাধ্বনি। স্থানে স্থানে উদ্ধার করে তারই কিঞ্চিৎ মাত্র আস্বাদন করা যেতে পারে :

"৭ 'ইথে ধিক্ নাহি আর নয়ন সফল তার
যে যে দেখে কৃষ্ণমুখ-জ্যোতি।
চন্দ্র-কোটি-পরকাশ মন্দ মধু সুধা-হাস
কি সখি কহিব নারীজাতি ॥

৮ নব চূতপল্লব ময়ূরচন্দ্রিকা নব
উতপল-কমলে রচিত।
আজানু কুসুম-মালে মাঝে মাঝে শোভা করে
পরিধান বিচিত্র-ভূষিত ॥
বলদেব-দামোদর, দিব্য-বেশ মনোহর,
শোভে ব্রজ-বালকের মাঝে।
ভুবন-মোহন-লীলা খেলে নৃত্য-গীত-খেলা
রাম-কৃষ্ণ-নটবর-রাজে ॥

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' ১০।২০।২৪

৯ ওহে সখি হের বল বেণু কোন্ তপ কৈল
সব গোপী করিয়া নৈরাশে।
হরিমুখ-সুধানিধি পান করে নিরবধি
ধন্য বেণু জন্ম যেবা বংশে॥
প্রফুল্ল কমলযুতা সব নদী পুলকিতা
জনমিল ভকততনয়।
'নিবসে আমার বনে, পুত্র বেণু এই—মনে
মুক্তি দিব এ কোন্ সংশয়॥'
মধুরূপ অশ্রুধারে সকল বৃক্ষের ক্ষরে
পুত্রপ্রেম হৈল তরুগণে।
'জনমিল এই কুলে আমরা তরিব হেলে
এ সব অদ্ভুত বৃন্দাবনে॥
যেন কোন ধন্য কুলে বৈষ্ণব জনম নিলে
আনন্দ বাঢ়য়ে বৃদ্ধগণে।
অচেতন ধর্ম যার জীবধর্ম হয় তার
কি কহিব বৃন্দাবন-গুণে॥"[১]

যার অচেতন-ধর্ম, সে কিনা পালন করছে জীবধর্ম! বৃন্দাবনের এই অদ্ভুত গুণের কেন্দ্রে অবস্থান করে যিনি গোপবেশে ধেনু চরান, তাঁর কথারসে মগ্ন রঘুনাথ গোপরমণীর পূর্বরাগ বর্ণনায় সবশেষে তাই বলেন :

"১৯ যতেক বালক মেলি রাম সঙ্গে বনমালী
গোধন চরায় যদি বনে।
চরের স্থাবর-ধর্ম স্থাবরের চর-ধর্ম
হেন চিত্র দেখিল নয়নে॥'
২০ এইরূপে বাল্যকেলি কৈলা যত বনমালী
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কুতূহলে।
গোকুল-নগর-নারী সভে হঞা এক মেলি
বর্ণিতে থাকয়ে নিরন্তরে॥
প্রেম-রভস-রসে আনন্দ-মানস-রসে
কৃষ্ণময়ী ভেল ব্রজরামা।"[২]

১ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ১০।২১।৭,১৩ ২ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ১০।২১।২৭-২৯

"প্রেম-রভস-রসে" "আনন্দ-মানস-রসে" "কৃষ্ণময়ী" হলেন যে ব্রজরামারা, তাঁদের অনবদ্য পূর্বরাগ প্রসঙ্গে মালাধরের লেখনী যে কত দুর্বল, তা আলোচ্য পর্যায়ে তাঁর অনুবাদকর্ম থেকেই প্রমাণিত হয়:

"স্থনিঞা কৃষ্ণের বেনু অদ্ভুত চরিত।
স্থনিঞা বংসির নাদ জুবতি মোহিত॥
মাথাএ মউর পুৎস কর্ন্নে পুষ্প কুঁড়ি।
নর্ত্তকের বেস কৃষ্ণ পরি পিত ধড়ি॥
ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ জাএ।
দেখিয়া সুন্দর কৃষ্ণ প্রান স্থির নএ॥"[১]

"প্রান স্থির নএ" বলেই মালাধর গোপীদের পূর্বরাগ-প্রসঙ্গের যবনিকাপাত করেছেন। বস্তুত মালাধর ও রঘুনাথের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্যও ঘটে গেছে এই গোপীপ্রসঙ্গে এসে, ভাষান্তরে ভাগবতীয় পরমপ্রেমের পরিবেষণায়। মালাধর মূলত ঐশ্বর্যরসের উপাসক, বৃন্দাবন অপেক্ষা মথুরা-দ্বারকাই তাই তাঁর মনোহরণ করেছে বেশী। যে-উৎসাহে তিনি কুব্জাকেলি বর্ণনা করেন, অন্তত সেটুকু উৎসাহেও গোপীপ্রেম বর্ণনা করেন না। অপরপক্ষে রঘুনাথ এমন এক দিব্যপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য, যাঁর আবির্ভাব ভাগবতীয় গোপীপ্রেমের আস্বাদনেরই লোভবশত। ফলে, নানা পুরাণের উপাদান সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণচরিত প্রণয়নই যখন মালাধরের লক্ষ্য, একমাত্র ভাগবতের একনিষ্ঠ অনুসরণে গোপীপ্রেমের পূর্ণ অমৃতকলসটি উদ্ধার করাই তখন রঘুনাথের উদ্দেশ্য। রঘুনাথের ভাগবত-অনুবাদ শ্রবণ করে শ্রীচৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাবোদয় হতো, বৃন্দাবনদাসের এ-বিবরণ পাঠে এরপর আর বিস্ময় বোধ হয় না। ভাগবত অনুবাদের প্রারম্ভিক ইষ্টবন্দনা ও গ্রন্থোদ্দেশ্য বর্ণনার পর রঘুনাথ যথার্থই বলেছিলেন:

"শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীতয়ে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতম্॥"

এখানে "প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে" পদটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত প্রেমভক্তি-বর্ধনই তাঁর ভাগবতানুবাদের মূলমন্ত্র। মনে পড়ছে তাঁর প্রতিজ্ঞা বচন:

"ভাষায় রচিব কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে গোবিন্দপ্রেম হয় হেন জানি॥"[২]

---

১ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৭৫৯-৭৬১ ২ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ১।১।২৫

লক্ষণীর, মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', আর রঘুনাথের ভাগবতানুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা অন্তরে বহন করে তাঁকে কলিযুগের পরমোপাস্যরূপে[১] জেনে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবতের যে অনুবাদ করলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গিণী ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব? রঘুনাথের গ্রন্থ তাই অনুবাদ হয়েও শুধুই অনুবাদ নয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী একান্তভাবে চৈতন্য-যুগসাহিত্যেরই লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ তা অনুবাদ হয়েও ভাষ্য; আবার ভাষ্য হয়েই তা ভাগবত-বাণীর শ্রেষ্ঠ মর্মানুবাদক। ভাগবতেই ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বলা হয়েছে, এ-পুরাণ শ্রবণে বাসুদেবে রতি জন্মায়[২]। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর লক্ষ্যও অভিন্ন; "শুনিলে গোবিন্দপ্রেম হয় হেন জানি"। পরমপ্রেমের শাস্ত্র ভাগবত থেকে এই গোবিন্দপ্রেমের তরঙ্গিণী প্রবাহিত করে চৈতন্যকৃপাধন্য রঘুনাথ ভাগবতাচার্য চৈতন্য-যুগসাহিত্যের অপরিহার্য অধ্যায়॥

১ "ত্বিষাকৃষ্ণ—অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান॥" শ্রীকৃষ্ণপ্রেম° ১১।৫।৭২

২ "নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥" ভা° ১।২।১৮
তাৎপর্য, নিত্য ভাগবত শ্রবণে কামনা বাসনা ক্ষীণ হয়ে উত্তমশ্লোক ভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মায়।

সপ্তম অধ্যায়

ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য

ভাগবত ও বৈষ্ণবেতর সাহিত্য

"যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম
লিখন নিগমের সার।
প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত
সভাকার করিল উদ্ধার ॥
শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর না দিল তাকে
তপোবনে প্রবেশ করিয়া ॥"[১]

মঙ্গলকাব্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, এ হলো চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থারম্ভে শুকদেব-বন্দনার অংশ বিশেষ। মুকুন্দরামের ইষ্টদেবী "বিঘ্ন-বিনাশিনী ভৈরবী ভবানী/নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী", পরন্তু "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি কথ্যতে" শ্রীকৃষ্ণ নন; তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ও কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ" শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তার নয়। তবু মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যারম্ভে কেন ভাগবত-বক্তা শুকদেবের চরণবন্দনা করলেন, এ বড়ো বিস্ময়কর ঘটনা। বস্তুত এই আপাত-বিস্ময়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মধ্যযুগে চৈতন্য-রেনেসাঁসের এক অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শন। মধ্যযুগের চৈতন্য-রেনেসাঁসকে বারংবার আমরা যে ভাগবত-ভাবান্দোলন বলেছি, এখানে এসে তা আর অত্যুক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আসলে মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রেরণা শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না এবং ভাগবতবাণীর আবেদনও ছিল না মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মধ্যেই নিঃশেষিত। শ্রীচৈতন্য ও ভাগবত একই সঙ্গে সমগ্র বাঙ্‌লাদেশ ও বাঙ্‌লা সাহিত্যকে প্লাবিত করেই যুগসত্যের লক্ষণান্বিত। 'ভাগবত ও বাঙ্‌লা সাহিত্য' সম্বন্ধীয় প্রস্তাবেরও তাই সম্পূর্ণতা সাধিত হতে পারে বৈষ্ণবেতর সাহিত্যের আলোচনাক্রমেই। মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যই বাঙ্‌লা সাহিত্যের একমাত্র ধারা ছিল না—যদিও বৈষ্ণব সাহিত্য ধারাই উক্ত যুগের সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী সর্বশ্রেষ্ঠ ধারা, তবু অপরাপর পুষ্ট ধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য, লোকসাহিত্যের ধারাও

---

১ 'কবিকঙ্কণচণ্ডী', প্রথম ভাগ; ক° বি° স°, পৃঃ ১৭

তো ছিল। সুতরাং শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনাতেই ভাগবত ও বাঙ্‌লাসাহিত্য সংক্রান্ত সকল আলোচনাই শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমাদের পরিসর স্বল্প, তাই সেই অসমাপ্ত অথচ অনিবার্য আলোচনার কেবল সূত্রমাত্রই উল্লিখিত হচ্ছে। আর তারই মুখবন্ধ-স্বরূপ মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার প্রসঙ্গটিই সর্বাগ্র-স্থানাধিকারী।

লক্ষণীয়, এ অধ্যায়ের প্রথমেই উদ্ধৃত মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার স্তবক দুটি একান্তভাবেই ভাগবতীয় শুক-প্রণামের ভাবানুবাদ মাত্র। মুকুন্দরাম বলেছেন :

> "যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম
> লিখন নিগমের পার।
> প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত
> সভাকার করিল উদ্ধার॥"

আর ভাগবতে সূতপাঠক বলেছেন :

> "যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
> সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥"[১]

অর্থাৎ, তমোময় অন্ধকার সংসার পার হতে ইচ্ছুক জীবগণের ওপর করুণা-বশত যিনি পরমপ্রভাবশালী, সর্ববেদসার, পরতত্ত্ব-প্রকাশক, অনুপম, গূঢ়পুরাণ ভাগবত প্রচার করেছেন, সেই মুনিদেরও উপদেষ্টা ব্যাসপুত্র শুকদেবের শরণ গ্রহণ করি।

ভাগবতের অভিধা 'অধ্যাত্মদীপম্' মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনায় হয়েছে 'জ্ঞান-দীপের সম', আবার 'অখিলশ্রুতিসারম্'—'নিগমের সার', শেষে 'সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং'-'প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত / সভাকার করিল উদ্ধার'।

পুনশ্চ মুকুন্দরাম বলেছেন :

> "শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ
> উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
> পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর না দিল তাকে
> তপোবনে প্রবেশ করিয়া॥"

---

১ ভা° ১।২।৩

আজন্ম নির্গ্রন্থ ব্রহ্মচারী শুকদেবের জীবনের এ অবিস্মরণীয় ঘটনা তো ভাগবতে প্রদত্ত বিবরণ থেকেই সরাসরি গৃহীত :

"যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।

পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদুস্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥"[১]

অর্থাৎ, যে-শুকদেব উপনয়নাদির অপেক্ষা না রেখেই সর্বত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন,—পিতা ব্যাস নিকটস্থ যে-পুত্রকে পাচ্ছেন না বলে বিরহকাতর হয়ে 'পুত্র পুত্র' সম্বোধনে ডাকছেন, আর বনস্থ বৃক্ষরাজি শুকরূপে প্রতিধ্বনিচ্ছলে তার উত্তর দিচ্ছে,—সেই সর্বভূত-হৃদয়-প্রবিষ্ট শুকদেবকে প্রণাম।

মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনার "শিশুকালে বনবাস......উপনয়ন আদি ছাড়িয়া" ভাগবতের "প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং" ইত্যাদি ঘটনারই ভাষান্তর মাত্র, সন্দেহ নেই। "পুত্র বলি ব্যাস ডাকে" প্রভৃতি ঘটনা বিবরণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এর দ্বারা প্রত্যক্ষত ভাগবতের সঙ্গে মুকুন্দরামের ঘনিষ্ঠ যোগই প্রমাণিত হচ্ছে। আর শুধু মূল ভাগবতের সঙ্গেই বা কেন, শ্রীধরটীকার সঙ্গেও যে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, তা তাঁর এই স্বল্পাক্ষর শুকদেব-বন্দনা পদটি থেকেই স্পষ্ট হয়। ভাগবত সম্বন্ধে সূতপাঠক যে যে অভিধা প্রয়োগ করেছিলেন, তার মধ্যে পরম লক্ষণীয় হয়ে আছে 'একম্' পদটি : "শ্রুতিসারমেকম্"। শ্রীধর এই 'একম্' ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, "অদ্বিতীয়ম্ অনুপমমিত্যর্থঃ"। ভাগবতের এই অদ্বিতীয় গুণ-বাচক 'অনুপম' বিশেষণপদটি মুকুন্দরামে হয়েছে 'নিরুপম', অর্থ একই দাঁড়াচ্ছে।

সবশেষ উল্লেখযোগ্য পদটির অন্তে ভনিতায় কবির নিবেদন :

"গোবিন্দ-পদারবিন্দ বিগলিত-মকরন্দ

অলি কবিকঙ্কণে গাহে॥"

এ-পদাংশ একদিকে যেমন মনে করায় ভাগবতের উদ্ধবোক্তি : "কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্ ন পুনর্বিসৃষ্টমায়াগুণেষু রমতে"[২] কৃষ্ণের পাদপদ্মের মধু একবার যিনি আস্বাদন করেছেন, মায়াগুণে তিনি কি আর বিহার করেন? অপরদিকে তেমনি মনে করায় গৌরপদাবলীর অনুরূপ ভণিতা-ভঙ্গিমা :

"পদপঙ্কজ পর গোবিন্দদাস চিত

ভ্রমরী কি পাওব মাধুরিলাভ॥"[৩]

১ ভা° ১।২।২ ২ ভা° ৬।৩।৩৩

৩ গোবিন্দ আচার্য-কৃত পদ, দ্র 'বৈষ্ণব পদাবলী', সা° স° প্রকাশিত, পৃ° ২৯০

মুকুন্দরামের শুকদেব-বন্দনা-পদে ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের এই যে মিলনসাধিত হয়েছে, একে আমরা ইতোপূর্বে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যেরই সাধারণ লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছি। এখানে দেখছি, বৈষ্ণবেতর সাহিত্যের একজন প্রতিনিধিস্থানায় শক্তিপূজক কবিও এ-মিলনকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছেন। সূতপাঠকের কাছে "অতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্" বা তমোন্ধকার পার হবার জন্যই অধ্যাত্মদীপ ভাগবতের আবির্ভাব, আর মধ্যযুগের কবির কাছে ভাগবতপুরুষ শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং সেই অধ্যাত্মদীপ :

"ঘোর কলি অন্ধকার শ্রীচৈতন্য অবতার
প্রকাশিল হরিনাম-গীত ॥"[১]

ভাগবতের মতো তিনিও "প্রেম-ভক্তি-কল্পতরু", তথা "অখিল জীবের গুরু"।

মধ্যযুগে ভাগবতাশ্রয়ী এই প্রায়-সর্বগ্রাসী বৈষ্ণবতার প্রভাববশতই হয়তো কলিঙ্গরাজ সমীপে কোটালের গুজরাট-বর্ণনায় অতি স্বাভাবিক হয়েছে সেই বিশিষ্ট ভাষাচিত্র-অঙ্কন : "প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল/ দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্তন"। কিন্তু এহো বাহ্য। চণ্ডীমঙ্গলের অন্তরঙ্গ স্বরূপে উক্ত বৈষ্ণবীয় প্রভাবের কোনো নিদর্শন আছে কিনা তাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট দুই কবি—দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরামের প্রগাঢ় জীবনরসরসিকতার মূলেই রয়েছে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলশ্রুতি সঞ্চিত। প্রসঙ্গক্রমে ড° শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত উদ্ধারযোগ্য :

"চণ্ডীমঙ্গলের কবি বৈষ্ণব-ভাবরসসিক্ত মন লইয়া শক্তিপূজার কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহার সমস্ত রূঢ় সংঘর্ষ, স্থূল বৈষয়িকতায় ক্লিন্ন জীবনযাত্রার উপরে অপার্থিব মাধুর্যরস সেচন করিয়া ইহাকে কাব্য-লোকের উন্নততর স্তরে উঠাইতে ও ইহার মধ্যে ভাবসৌকুমার্য সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[২]

একইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর মনসামঙ্গলকাব্যেও ভাগবতকেন্দ্রিক চৈতন্য-ভাবান্দোলনের ঋদ্ধি সমর্পিত হয়েছে বলে মনে হবে। এযুগের মনসামঙ্গল-কাব্যকার দ্বিজ বংশীর ওপর বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শের জয় সম্বন্ধে ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

"দ্বিজ বংশী যখন আবির্ভূত হন, তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব সমস্ত বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।...দ্বিজ বংশীর মধ্যে সেই

১ 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' প্রথম ভাগ ক° বি° স°, পৃ° ১৯ ২ তত্রৈব, ভূমিকা, পৃ° ১।°

বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে। তিনি স্বয়ং সংকীর্তনের দল বাঁধিয়া মৃদঙ্গ-মন্দিরা সহযোগে মনসামঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে যেখানেই জীব-প্রেম কিংবা অহিংসার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার আন্তরিকতা যেন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়।"[১]

প্রসঙ্গত তিনি দ্বিজবংশীর মনসামঙ্গল কাব্যের উপক্রম অংশের সেই বিশেষ ঘটনাটিরই উল্লেখ করেছেন, দুটি পক্ষিশাবকের প্রাণরক্ষার জন্য তপস্বী জলাঞ্জলি দিচ্ছেন তপস্যা। প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধারযোগ্য :

"পক্ষী ছাও দুই গুটী স্রোতে লৈয়া যায় ভাটী।
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত ॥
দেখিয়া আকুল হিয়া ছাও আনে সাঁতারিয়া
আশ্রমে তপস্বী অনুদিন।
বৃক্ষের কোটরে থুয়্যা নিজকর্ম উপেক্ষিয়া
পুষি ছাও করিল প্রবীণ ॥
অনাথ পক্ষীর ছাও তাকে ডাকে বাপ-মাও
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে।
ভ্রমিয়া গহন-বনে পাইয়া নির্জন স্থানে
ছাও খাইল মনসার নাগে ॥
তপস্বী আশ্রমে গিয়া দুই ছাও না দেখিয়া
শোকানলে কাতর জীবন।"[২]

ভাগবত-পাঠকের মনে হতে পারে, এ-কাহিনী পশুসখা রাজার কাহিনী নয়, দ্বিতীয় ভরতরাজার উপাখ্যান। সেই একই ভাবে "ধর্মেত রাখিয়া মন সদাকাল প্রজাগণ/পুত্রবৎ পালি সর্ব অংশে", পরে একে একে "ধন-জন পুত্র নারী শেষে সব পরিহরি / একেবারে ছাড়ি রাজ্য আশা" বনবাসে গিয়ে কঠোর তপস্যাচরণ। তারপর ভরতরাজার ক্ষেত্রে স্রোতে পতিত মৃগশিশুর রক্ষণাবেক্ষণ, পশুসখার ক্ষেত্রে পক্ষিশাবকদ্বয়ের। পরে একইভাবে আবার তাঁদের "শোকানলে কাতর জীবন", ভাষান্তরে "বিরহ-বিহ্বল-সন্তাপ-

১ 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল', ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ° ২॥৶০-২৸০

স্তমেবানুশোচন্"[১]। তবে ভাগবত—পুরাণ, মনসামঙ্গল—কাব্য। কাজেই হরিণশিশুর প্রতি ভরতের আসক্তি যখন তাঁকে মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধিতে বৈরাগ্য সাধনের পথে নিয়ে গেছে, পক্ষিশাবকের প্রতি অনুকম্পা তখন পশুসখাকে মৃত্যুবিচ্ছেদ বেদনার মধ্য দিয়ে মর্ত্যমুখিতার পথে চাঁদ সদাগরের পৌরুষ-কঠোর অথচ স্নেহদুর্বল জীবনাট্যলীলাচক্রে আবর্তিত করে তুলেছে। ভক্তিশাস্ত্রোত্থ ভাবান্দোলন থেকে জীবনচারী কাব্যের এই স্বরান্তরটুকু সর্বাংশেই স্বীকার্য। যেমন স্বীকার্য অন্নদামঙ্গলের ক্ষেত্রে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাগবত-অঙ্গীকারের নিজস্ব রীতিপদ্ধতি। মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সে-রীতিপদ্ধতি এমনই জটিল মনস্তাত্ত্বিক যে তা স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে আলোচিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। তাই এ-অনুচ্ছেদে আমরা আপাতত অন্নদামঙ্গলের থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে এনে মধ্যযুগীয় মহাকাব্য-স্রোতের দিকে একবার নিবদ্ধ করতে চাই।

মধ্যযুগে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ বাঙ্‌লাসাহিত্যের বিশিষ্ট ধারা হয়ে আছে। একেই আমরা মহাকাব্যের ধারা বলতে চাই। এরই যুগলবেণী কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত রূপে বাঙালী মানসকে দীর্ঘকাল ধরে পরিপ্লাবিত করে আসছে। এখন প্রশ্ন, উক্ত যুগলবেণী ভাগবতরসের সংযোগে কোথাও কোথাও কি ত্রিবেণীসংগম হয়ে উঠতে পেরেছে? প্রসঙ্গক্রমে প্রথমত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথাই বিবেচ্য।

আমাদের বিশ্বাস, মালাধরের ভাগবতানুবাদে যেমন কৃত্তিবাসের রামভক্তির প্রভাব পড়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রক্ষেপাংশে তেমনি আবার কালক্রমে ভাগবতেরও প্রভাব পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। এ-প্রভাবকে অবশ্য 'ভাগবতীয় প্রভাব' না বলে 'বৈষ্ণবীয়' তথা 'শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবান্দোলনের প্রভাব' বলে চিহ্নিত করেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সচিত্র সংস্করণে এ বিষয়ে বলেন :

"রামায়ণে সর্বত্রই বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। কোন কোন প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুঁথিতে রাক্ষসগণ কৃত রামস্তব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং কোন কোন পুঁথিতে ঐ সকল কথার কোন কোন অংশ কবিচন্দ্র নামক কবির ভণিতাযুক্ত পাওয়া যায়। এজন্য মনে হয়, হয়ত কৃত্তিবাস সেগুলি লিখেন নাই। বিশেষতঃ কোন কোন রাক্ষসবীরের উপর জগাই-মাধাই

১ ভা° ৫।৮।১৫

প্রভৃতি দুর্বৃত্তের ছায়া এরূপ গাঢ়রূপে পড়িয়াছে, যে মনে হয় যেন সেই সকল কথা চৈতন্যদেবের পরে রচিত হইয়াছে।"[১]

প্রসঙ্গত তিনি তরণীসেন,[২] বীরবাহু,[৩] এবং রাবণরাজের[৪] সঙ্গে শ্রীরামের সম্মুখসমর দৃশ্যের ওপরই সে-প্রভাবের সর্বাপেক্ষা প্রগাঢ়রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, এ-সব বর্ণনায় "রণক্ষেত্রের ধূলি কীর্তনভূমির রেণুর মত পবিত্র" হয়ে গেছে এবং "দামামা দগড়ার কাঠি" যত উচ্চ রবে বেজে উঠেছে, ততই যেন তাদের বাদ্যে "মৃদঙ্গের মধুর নিনাদের ঝাঁজ"ও উঠেছে। কিন্তু এ কি শুধুই বৈষ্ণবীয় প্রভাব, ভাগবতীয় প্রভাব আদৌ নয়? আমাদের মতে, স্থানে স্থানে একে এমন কি ভাগবতীয় প্রভাব বলেও চিহ্নিত করা সম্ভব। যেমন তরণীসেনের রামস্তোত্রে আছে: "ব্রহ্মাণ্ড একৈক লোমকূপের ভিতর"[৫]। মুহূর্তে মনে পড়বে ভাগবতে ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি: "ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরমাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্"[৬]। অথবা তরণীসেন যখন শ্রীরামের বিশ্বরূপ দর্শন করেন, "পর্বত কন্দর দেখে কত নদ-নদী। জনলোক তপলোক ব্রহ্ম লোক আদি" তখন মনে পড়বে পুত্রমুখে যশোদার অনুরূপ বিশ্বরূপ দর্শন: "খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ। দ্বীপান্ নগাং স্তদ্দুহিতৄর্বনানি ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি"[৭]। তরণীসেন শ্রীরামকে বলেছিলেন, "মায়াতে মনুষ্যলীলা গোলোকের পতি", ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও মায়ামনুষ্যরূপে অতিলৌকিক লীলারত দেখি: "কৃতবান্ অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ"[৮]। আর রামায়ণে রামকে যেমন দেখি ভক্তবৎসল, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভক্তপরাধীন। ভক্ত তরণীসেনকে কি করে বধ করবেন ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত হয়েছিল অতিশয় করুণার্দ্র,কেন না তাঁর

১ 'সচিত্র রামায়ণ', দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রকাশিত, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ভূমিকা পৃ° ৶

২ "তরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রামনামের ছাপ মারিয়া রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাঁহার রথের পতাকায়ও সেই রামনামের ছাপ পড়িয়াছে এবং তাঁহার রণবাদ্য "রামজয়" শব্দ বাজাইয়া রামের সঙ্গে আশ্চর্য বিপক্ষতার সূচনা করিতেছে।" তত্রৈব

৩ "বীরবাহু রামকে "রাক্ষস বিনাশকারী ভুবনমোহন" বলিয়া স্তব পড়িতেছেন, রাক্ষস বধ করিয়া রামচন্দ্র রাক্ষসের প্রশংসা লাভ করিতেছেন।" তত্রৈব

৪ "এই রণক্ষেত্র, প্রেমক্ষেত্র বা অনুতাপক্ষেত্রে রাবণ দাঁড়াইয়া "জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার / করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার" বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ও তাঁহার কুড়ি চক্ষু হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া জল পড়িয়া রাজ-পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছে।" তত্রৈব

৫ 'লঙ্কাকাণ্ড' পৃ° ৩৮৭ ৬ ভা° ১০।১৪।১১ ৭ ভা° ১০।৭।৩৬ ৮ ভা° ১।১।২০

ভাষায়, "ভক্ত মোর পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ"। এ যেন ভাগবতীয় তথা বৈষ্ণবীয় মহিমারই প্রতিধ্বনি: "আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনং। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতি"[১]। এক কথায় "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড।" আবার তরণীসেনের মতো বীরবাহুও আর এক ভক্ত: "নিরবধি বিষ্ণু বিনা অন্যে নাহি মন"। বীরবাহু যেন দ্বিতীয় বৃত্রাসুর—তেমনি আপাত বিষ্ণু-অরি, একান্তই বিষ্ণু-ভক্ত! শ্রীরামপদে তাঁর মিনতি ছিল: "চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার। বৈষ্ণবাস্ত্রেতে আমায় কর হে সংহার॥" আর হরি-প্রেরিত, ভাগবতের ভাষায় "বিষ্ণুযন্ত্রিতো" ইন্দ্রকে বলেছিলেন বৃত্র: "নত্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচেস্তপসা চ তেজিতঃ। তেনৈব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়শ্রীর্গুণাস্ততঃ"[২]। অর্থাৎ, 'ইন্দ্র, তোমার বজ্র শ্রীহরির তেজে দধীচির তপস্যায় শাণিত হয়েছে, তা দিয়ে সংহার করো তোমার শত্রু। স্বয়ং হরি কর্তৃক প্রেরিত তুমি, সন্দেহ কি যেখানে হরি সেখানেই তো বিজয়, শ্রী এবং সদ্‌গুণের অবস্থান।' তরণীসেনের ক্ষেত্রে যেমন, বীরবাহুর ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপভাবেই শ্রীরাম ভক্তবৎসল: "যাউক জানকী মোর রাজ্য যাউক বয়ে। পুনঃ বনে যাই আমি তোবে লঙ্কা দিয়ে।"[৩] আসলে রামায়ণ-মহাকাব্য বা ভাগবত-পুরাণ—মধ্যযুগীয় বাঙালী যাই পরিবেষণ করুক না কেন, ভক্তিই তার মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে, বিশেষত চৈতন্যাবির্ভাবের পরে 'নামে রুচি জীবে দয়া ভক্তি ভগবানে' মন্ত্রেই বাঙালীর মানসদীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। ভক্তিই মধ্যযুগীয় কাব্যের ধ্রুবপদ। কথাটি অংশত কাশীদাসী মহাভারত সম্বন্ধেও সত্য। কাশীদাসের মহাভারতে এই ভক্তি-প্রবণতা, ভক্তবৎসলতার দিকটি আচার্য দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করেছিলেন:

"যদি এক কথায় কেহ শুনিতে চান, কাশীদাসী মহাভারতের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা হইলে আমরা কবির ভক্তিপ্রবণতাকেই নির্দেশ করিব। এই ভক্তির সরস প্রবাহ তৎরচিত মহাভারতের বিশেষত্ব।"[৪]

প্রসঙ্গক্রমে তিনি মহাভারতের সভাপর্বের অন্তর্গত 'বিভীষণের অপমান' শীর্ষক প্রস্তাবটি স্মরণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য:

"উহা মূল মহাভারতে নাই, কাশীদাস এই প্রসঙ্গ লইয়া যে সরস ভক্তির ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠকহৃদয়কে পবিত্র করে।"[৫]

---

১ ভা° ১১।১৯।২১ ২ ভা° ৬।১১।২০ ৩ 'লঙ্কাকাণ্ড', পৃ°৩৯৭

৪ 'কাশীদাসী মহাভারত', দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ভূ° ।৵০ ৫ তত্রৈব, পৃ° ।৶০

"সরস ভক্তির ধারা প্রবাহিত" করে দিয়েছে কাশীদাসের "মূল মহাভারত"-বহির্ভূত যে-প্রস্তাব, সেই 'বিভীষণের অপমান'-এ গোবিন্দপদে বিভীষণের অপূর্ব প্রণতিবাক্য মনে পড়ে: "তোমার কোমল অঙ্গ দৃঢ় আলিঙ্গন।… লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিলা প্রসাদ"[১]। মুহূর্তে মনে পড়ে ভাগবতে শুকদেবের অবিস্মরণীয় উক্তি, রাসে ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা গোপীরা যে প্রসাদ পেয়েছিলেন, পদ্মিনী স্বর্কন্যারা দূরে থাক্ স্বয়ং লক্ষ্মীও সে প্রসাদ লাভ করেননি: "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্"[২]। গোবিন্দের কোমল অঙ্গের দৃঢ় আলিঙ্গনকে কাশীদাসও বলেছেন "লক্ষ্মীর দুর্লভ প্রসাদ"। কাশীদাস এ-উক্তি ভাগবত থেকে সরাসরি আহরণ করে থাকতে পারেন, নাও পারেন। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের সঙ্গে পরিচিত থাকুন অথবা নাই থাকুন, চৈতন্যাবির্ভাবের পরে ভাগবত-সংস্কৃতি অন্নজলের মতোই বাঙালীর প্রাণসত্তায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তা থেকে ছোট বড়ো কোনো প্রতিভারই বোধকরি অব্যাহতি ছিল না।

বস্তুত মধ্যযুগে ভাগবত যে বাঙালার অন্তরঙ্গ জীবনের কতখানি অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণস্বরূপ প্রবাদ প্রবচন বা লোকসংগীতের ধারাই তো বর্তমান। 'বাংলায় পুরাণ চর্চা' নিবন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী যথার্থই বলেছিলেন, "বাঙালার সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার প্রভূত উল্লেখ দেখা যায়।"[৩] উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, "ষণ্ডামর্ক নামে উল্লিখিত শুক্রের পুত্র প্রহ্লাদের গুরু শণ্ড ও অমর্ক (ভাগবত ৭।৫।১)।"[৪] এরূপই আর একটি প্রবাদ বাক্যাংশ বলে মনে হয় "সাঙ্গোপাঙ্গ" শব্দটি। সদলবলে কারো আগমন বোঝাতে "সাঙ্গোপাঙ্গ"র ব্যবহার কলিযুগাবতারের "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-আবির্ভাববাচক পদটিরই তির্যক ভগ্নাংশ নয় তো? ভাগবত সম্বন্ধীয় সকল প্রবাদ প্রবচনের সর্বোপরি স্থান অধিকার করে আছে অবশ্য ড° সুশীলকুমার দে সংগৃহীত সেই বিস্ময়কর প্রবচন-বাক্যটি: "যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান"[৫]। কথাটি বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় সমাজের প্রাণের কথা হলেও, সমগ্র বঙ্গসমাজের পক্ষেও একেবারে

---

১ 'সভাপর্ব, পৃ° ২৯৭ ২ ভা° ১০।৪৭।৬০

৩ দ্র° বিশ্বভারতী পত্রিকা. শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০

৪ তত্রৈব ৫ 'বাংলা প্রবাদ', পৃ° ৬৫৬, স° ৬৯৬৭

অবজ্ঞেয় নয়। বাঙ্‌লাদেশে রামায়ণ-মহাভারতের পাশাপাশি ভাগবতও আপামর জনসাধারণের গৃহে সমাদৃত হয়েছিল। এ পুরাণের অতি দুর্ভেদ্য দেবভাষার কঠিন বাধা অসংখ্য অনুবাদকই ক্রমশ অপসারিত করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথক পাঁচালিকার কবিগানের গায়করাও নিশ্চয়ই ভাগবতীয় ঘটনা ও চরিত্র এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব জনগণমনে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। বিশেষত শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনবাণী জীবন্ত ভাগবত-ভাষ্য হওয়ায় মধ্যযুগের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমূহ বাঙালী-চিত্তে ভাগবতের স্থান অভ্রান্তরূপে সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে বাঙলার তথাকথিত অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সমাজের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। পটুয়াদের প্রসঙ্গে ড° আশুতোষ ভটাচার্যের উক্তি মনে পড়ছে :

"...যে ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদর্শনের ভিত্তি, তাহার মধ্য হইতে নিরক্ষর পটুয়াগণ আধ্যাত্মিকতা কিংবা ভক্তিবাদের কোন সন্ধান করিবার পরিবর্তে কেবল মাত্র বাৎসল্য রসটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের কাব্য রচনা করিয়া থাকে।"[১]

উদাহরণস্বরূপ বীরভূম থেকে সংগৃহীত একটি লোকসংগীত এখানে উল্লিখিত হতে পারে। 'আখ্যানগীতি'র অন্তর্গত গানটি বালকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণ লীলাবিষয়ক। কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করছেন শুনে যশোদা ছুটে এসে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন, উত্তরে গোপাল বলছেন :

"মৃত্তিকা নাহি খাই গালি দেহ অকারণ ॥
শুন গো, মা, যশোমতী, করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে দেখ মেলিব বদন ॥
মায়া করি মুখ যে মেলিএ চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী ॥"[২]

এ-পর্যন্ত হুবহু ভাগবতীয় ঘটনাবিবরণ গৃহীত। অধিকন্তু ভাগবতে এরপরও আছে, কৃষ্ণকর্তৃক বৈষ্ণবী মায়াবিস্তার এবং ফলত যশোদার পুনরায় পুত্র-বৎসলতা-প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে লোকসংগীতকার ভাগবতীয় তত্ত্বরাজ্যের এ-সকল সূক্ষ্মতা বা জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে মূল ঘটনাটিকেই তাঁর শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গোপালের গোষ্ঠলীলাদি পরিবেষণের

১ 'বাংলার লোকসাহিত্য', ১ম খণ্ড, আলোচনা পৃ° ৮১
২ 'লোকসঙ্গীত রত্নাকর' ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ° ৫১

ক্ষেত্রেও একইভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সরলতা এবং মর্মস্পর্শিতা। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমাদের সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হবে, তথাকথিত নিরক্ষর শ্রোতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের যুগ যুগ সঞ্চিত অধ্যাত্মরসে আদৌ বঞ্চিত নন। তাই পল্লীগ্রামের অবজ্ঞাত কোণে অখ্যাত গায়কের কণ্ঠেও তত্ত্বচিন্তার গভীর সুর লাগতে বিলম্ব ঘটে না, মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত একটি কাওয়ালী গান প্রসঙ্গত উদাহৃত হতে পারে :

"হরি বল রে মন।
বিষম বিষে দহে জীবন।
নামামৃত পান করিলে জুড়াবে জীবন।
হরি হরি বল, পাবে প্রেমধন,
হরি ভ'জে গেল ব্রজে শ্রীরূপ-সনাতন ॥···

হরি হরি হরি বল, ওরে আমার মন,
হরি বলে অজামিলের বৈকুণ্ঠে গমন,
প্রহ্লাদ জপে এই হরিনাম, বিষঅগ্নিতে পায় পরিত্রাণ,
জগাই মাধাই তাহার প্রমাণ, হল উদ্ধারণ ॥"[১]

অধ্যাত্মরসপিপাসু লোকসংগীত-গায়কের কণ্ঠে এখানে একই সঙ্গে ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-নামান্দোলনের শরিক অজামিল এবং জগাই-মাধাই বাঁধা পড়েছে : "হরি বলে অজামিলের বৈকুণ্ঠে গমন···জগাই-মাধাই তাহার প্রমাণ, হল উদ্ধারণ।"

লোকসংগীতের বিশিষ্ট ধারা বাউলসংগীতেও অনুরূপভাবে ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের মিলন সাধিত হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে এসে মিশেছেন বঙ্গদেশে চৈতন্য-ভাগবত-ভাবান্দোলনের অন্যতম ধারক-বাহক নিত্যানন্দ :

"চল দেখি মন গৌরাঙ্গের টোলে।
হয় ভাগবত, গীতা, হরিকথা প্রেমদাতা নিতাই বলে ॥

আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুরাগ,
রাগ বৃদ্ধি হলে পরে দেয় রে বৈরাগ,
তাতে হলে বৈরাগ্য দেয় দেগে দাগ,
সেই দাগে দাগে বুলালে প্রেমের বিদ্যা মিলে ॥

১ 'লোকসঙ্গীত রত্নাকর', পৃ' ২১৩

পরে স্বভাবের সাধন, পাবি রূপে দরশন,
স্বভাব-দোষ থাকিলে হবে স্বভাব-সংশোধন।
পাবি গুরুর করণ, ধরণ-ধারণ, পাবি জীব-রতি ঘুচে গেলে।

যদি পড়তে যাবি মন,
দাস নবদ্বীপের কথা শোন,
গুরু বলাইচাঁদের চরণ আগে কর সাধন।
হবে সাধন-সিদ্ধ-প্রেমের বৃদ্ধি, যুগল মন্ত্রেতে সিদ্ধ হলে॥"[১]

লক্ষণীয়, "আগে ধরান প্রথম ভাগ, যাতে হয় রে অনুরাগ।" কিন্তু বাউল সাধক জানেন:

"কৃষ্ণের অধীন হওয়া মুখের কথা নয়॥
কেবল রসিক অনুরাগীর কর্ম,
রাগের গুণে সুলভ হয়॥"[২]

কঠিন সে অনুরাগের পথ, অতিগূঢ় অনুরাগীর লক্ষণ:

"অনুরাগীর এই লক্ষণ—
ভাবে মগন তনু মন,
বাতুলের প্রায় দরশন,
বোবা ন্যাকার ভঙ্গী তায়।"[৩]

এ তো ভাগবতের সেই ভক্তলক্ষণেরই ভাষান্তর মাত্র: "নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।"[৪] আর সেই সঙ্গে অনুস্যূত হয়েছে চৈতন্য-অঙ্গীকৃত ভক্তলক্ষণ:

"তৃণাদপি সুনীচ জন।
সর্বত্র যার সমজ্ঞান,
কৃষ্ণময় যার দ্বিনয়ন,
তার ধ্যানে সদাই কৃষ্ণ রয়॥"[৫]

এহেন যে-পরমধ্যেয় পরমপুরুষ রসিকোত্তম কৃষ্ণ, তাঁরও ঋণ একমাত্র গোপীপ্রেমের কাছে। বাউল সাধকের ভাষায়:

১ 'বাংলার বাউল গান', ড° উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ২য় খ°, পৃ° ৩৮৩-৮৪
২ তত্রৈব ৩ তত্রৈব ৪ ভা° ১১।৩।৩২
৫ 'বাংলার বাউল গান', ২য় খণ্ড, পৃ° ৩১৭

"অপ্রাকৃত গোবিন্দ কয়,
সদাচার-কদাচারে নয়,
কেবল গোপী-প্রেমে ঋণী হয়,
শ্রীভাগবতে ব্যাসদেবে কয়॥"[১]

লক্ষণীয়, "কেবল গোপী-প্রেমে ঋণী হয়,/শ্রীভাগবতে ব্যাসদেবে কয়"। প্রাসঙ্গিকতায় উল্লেখযোগ্য, রাসে অন্তর্ধানের পর পুনরাবির্ভাবে ব্রজবধূগণ-জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপদেশের চরমকোটিতে দাঁড়িয়ে ব্রজবধূ-প্রেমের বন্দনা করে বলেছিলেন :

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"[২]

তাৎপর্য, দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল মোচন করে তোমরা যে নিষ্কপট পরম-অনুরাগে আমার ভজনা করেছ, যদি দেবতাদের তুল্য আয়ুও লাভ করি, তবু তাতেও তোমাদের সেই সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হবো না।

একমাত্র গোপীপ্রেমের কাছেই কৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণ যেমন ভাগবত-স্বীকৃত, তেমনি আবার গোপীপ্রেমের আস্বাদন লোভে তাঁর 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর'রূপে আবির্ভাব রসিকজন-অভিনন্দিত। বস্তুত চৈতন্য-রেনেসাঁস তথা মধ্যযুগের ভাগবত-ভাবান্দোলনের সর্বোপরি দান-রূপে বাঙালী মরমী সাধক এই গোপীপ্রেমের অর্চন-বন্দন-কীর্তন তথা অনুগতিকেও স্বীকার করে নিয়েছে :

"গোপী-ভাব নিষ্কামী বলে,
তা ঘটে সহজ সাধন-বলে,
রামানন্দ-গৌর মিলে
সাধ্যবস্তু-নিরূপণ,
ধনের সন্ধান দৈবজ্ঞ-গণন
শ্রীমহাপ্রভু সনাতনে কয়॥"[৩]

প্রশ্ন উঠবে, বাঙলার অবজ্ঞাত পল্লীকোণে-কোণে অনাদরে অবহেলায় প্রস্ফুটিত

১ তত্রৈব ২ ভা° ১০।৩২।২২
৩ 'বাংলার বাউল গান, ড° উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-প্রণীত, ২য় খণ্ড ৩১৯ পৃ°

এই কুসুমগুলির গোপীপ্রেম-সৌরভ মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারের ছায়াতপে লালিত ভাবজাগরণের কোনো গূঢ় বাণী, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যুক্তিরুক্ষ বুদ্ধি-প্রখর রাজপথে, অন্তত ক্ষীণভাবেও, বহন করে আনতে পেরেছে কিনা। এ-প্রশ্নের উত্তরদানে মাঝখানে আর একটি ব্যাসকূটের সমাধান করতে হয়। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভাগবত-পাঠের স্বাক্ষর কতদূর সমর্থনযোগ্য? কৃষ্ণগোপীর অলৌকিক প্রেমলীলার পবিত্র অনুষঙ্গ কেন অনুসৃত হলো বিদ্যাসুন্দরের প্রাকৃত মদনমহোৎসবলীলায়? আমরা পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রের ভাগবত-গ্রহণ পদ্ধতি জটিল, মনস্তাত্ত্বিক। এবার বিদ্যাসুন্দরের রহঃকেলিকাব্যের আলোচনায় সেই জটিলতারই উন্মোচন ঘটুক।

ভাগবত ও ভারতচন্দ্র

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য-মালঞ্চের অদ্বিতীয় মালাকর। তাঁর কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভার অন্নদামঙ্গল পলাশির যুদ্ধের মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে [১৭৫২] সম্পূর্ণ হয়। সহজেই অনুমান করা চলে, কী বিচিত্র তাঁর যুগপ্রকৃতি, কী বিচিত্র সংস্কৃতি-সমাবেশ। একদিকে বঙ্গের মুসলিম শাসন অন্তঃসারশূন্য হয়ে এসেছে, "যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা।" অন্যদিকে সুযোগসন্ধানী বণিকের বেশে নবযুগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বিজ্ঞান-দীক্ষিত আধুনিক প্রতীচ্য। একদিকে মুর্শিদাবাদ, অন্যদিকে ফরাসডাঙা, এরই মাঝখানে কৃষ্ণনগরে আর একটি সংস্কৃতি-কেন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক পক্ষচ্ছায়ায় পরিবর্ধিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণনাগরিক সভারুচির প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায় অন্নদামঙ্গলের পরিসরে বিদ্যাসুন্দরের রসকেলি বিলসিত। এই বর্ণাঢ্য মছলন্দের তলদেশেই অবশ্য বাঙ্‌লাদেশের সনাতন অর্থনৈতিক চিতাকাষ্ঠ সুপ্রকট—"অন্ন বিনা কলেবর অস্থি-চর্ম্মসার"। বর্গী-হাঙ্গামার পরবর্তী জঠরাগ্নিজ্বলিত বাঙ্‌লাদেশে অন্নদামঙ্গল গানের আয়োজন যথাযোগ্য সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বাঙ্‌লাসাহিত্যেও এ এক বিরাট যুগসন্ধি। বিচিত্র, এমনকি বিপরীত রুচি ও রীতির সম্মিলনে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য তথা সংস্কৃতি মিশ্র ও জটিল। উক্ত যুগপরিবেশে একপ্রান্তে প্রবাহিত ছিল চন্দ্রশেখর-দীনবন্ধুদাসের পদাবলী, ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস,

প্রেমদাসের চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী; তৎসহ শচীনন্দন বিদ্যানিধি ও দ্বারকাদাসের যথাক্রমে উজ্জ্বলনীলমণির ও ভাগবতের অনুবাদ। অপর-প্রান্তে রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়ন, দুর্গাদাস মুখটির গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্লভ মল্লিকের মীননাথ গোরক্ষনাথ, গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী গাথাকাব্য। এই বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-নাথ সাহিত্যের পাশাপাশি একই সঙ্গে জনরুচির তোষণ করে চলছিল 'নদে শান্তিপুরে'র খেঁড়ু [< খেউড]। মহৎ সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল সমগ্র যুগ-সাহিত্যের বিভক্ত বিচ্ছিন্ন সর্ববিধ প্রবণতাকেই অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। ইতিহাস ও ধর্ম, সমাজ ও দর্শন, রাজনীতি ও প্রেমের সংগমে স্থাপিত হয়ে ভারতচন্দ্রীয় কাব্য তাই সামগ্রিক জীবনের প্রতিনিধি। তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, বাঙলাদেশের মধ্যযুগীয় শাক্ত সাহিত্যের ধারক ও বাহকরূপে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতির ভূমিকা থাকা আদৌ সম্ভব কিনা। প্রসঙ্গত ড° মদনমোহন গোস্বামীর উক্তি উদ্ধারযোগ্য :

"বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে-সুরতের কথা পাওয়া যায় তাহা চৌরী-সুরত [= Stoler Love]। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সহিত চৌরপঞ্চাশিকার এই জন্যই এত সহজ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে।....

"আদিতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের লীলাক্ষেত্র উজ্জয়িনী কিংবা যেখানেই হউক্ না কেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সম্পূর্ণ বাঙ্গালা দেশের বিদ্যাসুন্দর হইয়া গিয়াছে।...বিদ্যা ও সুন্দরের আদিরসপ্রধান জীবনযাত্রা বাঙ্গালার আদি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতে সুরু করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন'-এর মধ্য দিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যের পটভূমিকায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।"[১]

পটভূমিকাগত এই বৈষ্ণবীয় প্রভাব বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অন্তরঙ্গ স্বরূপে সঞ্চারিত হয়েছিল কিনা, এখন সেই জিজ্ঞাসা। এ-জিজ্ঞাসার উত্তরদানে একবার ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানাস্থানে অন্বেষণ করে রায়গুণাকরের যে-পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন, তারই বিবরণ থেকে জানা যায়, তাঁর মধ্যজীবনের দীর্ঘ অজ্ঞাতবাস-পর্ব অতিবাহিত হয়েছিল শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবসঙ্গে ও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পাঠে।

---

১ 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র' পৃ° ১২০-২৩, ১ম° স°

পরমাশ্চর্যের বিষয়, এ-সময়ে তাঁর অধীত বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের পুরোভাগে ছিল ভাগবত :

"ভারত পুরুষোত্তমে গিয়া রাজপ্রসাদে প্রসাদভোগ ভোগ করত শ্রীশ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্যের মঠে বাসপূর্ব্বক শ্রীভাগবত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়-দিগের গ্রন্থসকল পাঠ করেন, সর্ব্বদাই বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন।"[১]

ফলত বেশপরিবর্তন করে তিনি বৈরাগীর গেরুয়া বস্ত্র পর্যন্ত ধারণ করে-ছিলেন। এ-বেশেই একদিন বৃন্দাবনের পথে পদযাত্রায় বহির্গতও হন। কিন্তু মধ্যস্থলে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে গোপীনাথজীর মন্দিরে "মনোহর-সাহী" কীর্তনের আসর থেকে কৌশলে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সংসারী করলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। ব্রজের তীর্থাভিসারী চিত্ত এইভাবেই গৃহগুক হয়ে পড়লো—ভাগবতরসিক হলেন বিদ্যাসুন্দর বার্তাজীবী। কিন্তু তাই বলে দীর্ঘজীবনের বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন কি কবিজীবনে সমূহ ব্যর্থ হয়ে গেল? মনস্তত্ত্বের সূত্র অনুসারে দীর্ঘকালের সংস্কারের সহজে অন্তর্ধান সম্ভব নয়। বস্তুত ভারতচন্দ্রের কাব্যে জয়দেব-বিদ্যাপতির কবিভাষার স্বীকরণ বা ব্রজবুলিতে রচিত একাধিক পদের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হতে পারে না। ভারতচন্দ্রের জীবনে ভাগবত-পাঠের ফল তথা বৈষ্ণবতার মূল আরো গভীরে অন্বেষিতব্য।

অন্নদামঙ্গলের নান্দীপাঠে ভারতচন্দ্র গণেশ-শিবাদি দেবতার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুবন্দনাও করেছেন। এই গতানুগতিক স্তবগানে বিষ্ণুর নামাবলী লাভ ভিন্ন কাব্যরসলাভের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, বিষ্ণুবন্দনায় শারদ রাসলীলার দূরস্মৃতি সঞ্চার :

"কদম্বের কুঞ্জবনে বিহর সানন্দ মনে
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর বসন্ত কুসুমশর
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায়॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব কুহরে কোকিল সব
পূর্ণ চন্দ্র শরদযামিনী।

---

১ দ্র° ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প°, ভূমিকা, পৃ° ২৮

বীণা বাঁশী আদিযন্ত্রে গান করে কামতন্ত্রে
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥

শেষে শ্রীনিবাস-পদে তাঁর নিবেদন :

"উর প্রভু শ্রীনিবাস নায়কের পূর আশ
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদআশে নূতন মঙ্গল ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥"

"ভারত ও পদ আশে নূতন মঙ্গল ভাষে" কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণমঙ্গলে মিশে গিয়ে ভারতচন্দ্রের যে অভিনব কাব্য-খানি গড়ে উঠেছে তা 'নূতন মঙ্গল' ছাড়া আর কী। চণ্ডীমঙ্গলগানে শুকদেব-বন্দনা যেমন মুকুন্দরামের বিচিত্র কীর্তি, অন্নদামঙ্গলে হরিপদাশ্রয় তেমনি ভারতচন্দ্রের। প্রথম খণ্ডে 'ঋষিগণের কাশীযাত্রা'য় শিবপদে তাঁর প্রার্থনা যখন :

"জয় পুর্নীহি ভারত মহীশভারত
উমেশ·পর্বতসুতাবর ॥"

তখন হরিপদে :

"জয় সবতোজয় সজ্জনোদয়
ভারতাশ্রয় জীবন ॥"

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর ভাগবত-ভাবান্দোলনের দায়ভাগ যে কিভাবে ভারতচন্দ্রেও বর্তেছিল, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে "ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ"। পদটির প্রথমাংশ যেমন জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্যদেবের বেঢ়াকীর্তন তথা রথযাত্রায় তাঁর বিখ্যাত সংকীর্তনযজ্ঞ স্মরণ করায়, আবার দ্বিতীয়াংশ বিশেষ করে আস্বাদন করায় ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক ও নরোত্তমদাসের পদমাধুরী, শেষাংশ তেমনিই ভাগবতীয় লীলানির্যাস। শেষোক্ত ভাগবতীয় লীলাসংগ্রহের মধ্যে আছে কংস-কারাগারে ভগবানের আবির্ভাব, বসুদেব-বাহিত হয়ে ব্রজে-আগমন, পুতনাবধ, শকটভঞ্জন, যমলার্জুনভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ, মৃত্তিকাভক্ষণ ছলে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ননীচৌর্য, দামবন্ধন, বক-অঘাদি বধ, সেই সঙ্গে বৎস-কেশী-প্রলম্ব বধ, পক্ষান্তরে গোবর্ধনধারণ, দাবানলপান, কালিয়দমন, যজ্ঞঅন্নগ্রহণ, ব্রহ্মমোহন। এ-সবই প্রধানত তাঁর ঐশ্বর্যলীলার অন্তর্গত। মাধুর্যলীলার মধ্যে পড়েছে বসনচৌর্য, রাস। তারপর ব্রজলীলান্তে

মথুরায় অক্রুরসহ গমন, রজককে বধ করে বস্ত্রসমূহ পরিধান, কুব্জাকে গ্রহণ, কুবলয়-হস্তী সংহার, চাণূরাদি বধ,কংস নিধন এবং বসুদেব-দৈবকীর পদবন্দনা, অবশেষে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে দ্বারকায় গমন। মোটামুটিভাবে এই হলো ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলার সারসংক্ষেপ। ভারতচন্দ্রের ভক্তচিত্তে এই "অপার"[১] কৃষ্ণলীলার মধ্যেও আবার রাসই নিত্যকাল-অনুষ্ঠিত সর্বমুকুটায়মানালীলা :

"ব্রজাঙ্গনাগণ সঙ্গে সদা রাসরসরঙ্গে
নৃত্য গীত বাদ্য নানামত ॥"

আমাদের বিশ্বাস, ভারতচন্দ্রে ভাগবত-স্বীকারের শেষ সুধা সঞ্চিত হয়েছে রাসলীলা-পরিকল্পনাকে ঘিরে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের নায়িকা "রাস বিনোদ বিনোদিনী"[২]। ফলত এ-কাব্যের নায়কও রাসরসশেখর "মদনমোহন"। প্রমাণস্বরূপ 'সুন্দরের পরিচয়' স্মরণীয় :

"যাকে সব ঠাঁই কেহ দেখে নাই
বেদেতে কহে অনূপ।
ভারতের নিধি মিলাইল বিধি
না কহিও চুপ চুপ ॥"

জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক, কোন্ গূঢ়রহস্যকে আড়াল করে রাখতে কবি এমন সতর্ক ভঙ্গিতে তর্জনী ওষ্ঠে তুলে ধরেছেন : "না কহিও চুপ চুপ"। যথার্থই সুন্দরের পরিচয় দানে কবি-উল্লিখিত "বেদেতে কহে অনূপ" নিরতিশয় চমকপ্রদ। বিদ্যা ও সুন্দরের প্রাকৃত পরিচয়কে অতিক্রম করে তার চারিপার্শ্বে আর এক অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত পরিচয়ের জ্যোতির্বলয় এমন ঘনীভূত ও বহুদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে যে ভারতচন্দ্রের কাব্য অধিকাংশস্থলেই ভাগবত-ভাবিত বৈষ্ণব পদাবলীর বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'রাজসভায় চোর আনয়ন' বর্ণনাটি :

১ "অপার এ পারাবার কতেক কহিব তার
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥"

২ "কোকিলনাদিনী গীঃপরিবাদিনী
স্ত্রীপরিবাদবিধায়িনী।
ভারতমানস মানসসারস
রাস বিনোদ বিনোদিনী ॥"

"কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায় ॥
কংসের গায়ন যারা যে বীণা বাজায় তারা
বাণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত বলে কংস ঠৌক হত
হেন জনে বধিবারে চায় ॥
ধীরগণ মনে ভাবে পাপ তাপ আজি যাবে
লুটিব এ চরণধূলায়।
ভারত কহিছে কংস কৃষ্ণের প্রধান অংশ
শক্রভাবে মিত্রপদ পায় ॥"

শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের এই অভিন্নতা প্রতিপাদন, একা কাব্যলংকারেরই একটি প্রকৃষ্ট চাতুর্য মাত্র, পরন্তু যথাসত্য নয়? বিদ্যাসুন্দরের প্রতীকাবরণভঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা অবশ্য অনায়াসেই মন্তব্য করতে পারেন, কৃষ্ণগোপীর প্রেমলীলার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমবিলাস সমান্তরাল সরলরেখায় বেশীদূর টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বিদ্যাসুন্দরের পার্থিব মিলনের বাস্তব পরিণাম ভাগবতের ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীকেই স্মরণ করায়[১], অনিরুদ্ধের পিতামহ কৃষ্ণের কন্দর্পজয়ী রাসলীলাকে কদাপি নয়। সন্দেহ নেই, এখানেই ভাগবতীয় কৃষ্ণগোপীলীলার সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর-প্রেমবিলাসের একটি বড়ো পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ পার্থক্য আমাদের মতে আসন্ন আধুনিক জীবন-মননেরই অমোঘ অঙ্গুলি সংকেত। এতাবৎকাল কৃষ্ণ ও গোপী বা কৃষ্ণ ও রাধা ছিলেন একান্তভাবেই অতীন্দ্রিয়লোকের অধিষ্ঠাত-অধিষ্ঠাত্রা—মানস-বৃন্দাবন বা সনাতন গোলোক-বিহারী-বিহারিণী। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপিত, সামাজিক কাঠামোয় সংযোজিত, অবশ্য এতৎসত্ত্বেও অন্তর্লীন প্রেমসৌন্দর্যে আধ্যাত্মিক। ইতিহাস-মনস্কতায় এবং সমাজভাবনায় পূর্ববর্তী অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার ঐতিহ্যবাদের সঙ্গে এর বেশ কিছুটা স্বরান্তর ঘটে গেলেও, প্রেমের উত্তুঙ্গ

১ স্বয়ং বীরসিংহ নৃপতিও সুন্দর চোরের সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন :
"এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল ॥"
ভাগবতে এই ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দশম স্কন্ধে দ্বিষষ্টি ও ত্রিষষ্টি অধ্যায়ে। ঊষার অনিরুদ্ধ-ধ্যান স্মরণীয়: "সা চ সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা"।

অধ্যাত্মসাধনায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ভারতবর্ষীয় সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যকেই শেষ পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ' সাধক চণ্ডীদাসের লেখনী-সম্ভূত হলেও হতে পারতো :

"মোর পরাণপুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার আমি সে রাধার
আর যত সব ধাঁধা॥
রাধা সে ধেয়ান রাধা সে গেয়ান
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা॥"

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, "রাধা সে আমার আমি সে রাধার/আর যত সব ধাঁধা"। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাসমতে, ভাগবতের ক্ষেত্রে যেমন কৃষ্ণগোপীর সর্বকালজয়ী এক অমর প্রেমের আদর্শ স্থাপিত হয়েছে, বিদ্যাসুন্দরের ক্ষেত্রেও তেমনি একটি অনন্ত প্রেমদাম্পত্যের আদর্শ স্থাপনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকাব্যের রতিরসের আলম্বন বিভাব বিদ্যা ও সুন্দর সর্বরূপগুণের আকর যুগল মায়ামূর্তি। এ-মূর্তি নির্মাণে বৈষ্ণব অলংকার-শাস্ত্রের সিন্ধুমথিত অনুপম রাধামাধবের বিগ্রহ অনুক্ষণ তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এ-প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের কবিমানসের অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করবে তাঁর 'রসমঞ্জরী'র নান্দীপাঠ :

"জয় জয় রাধা শ্যাম নিত্য নব রসধাম
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্বসুলক্ষণধারী সর্ব্ব রস বশকারী
সর্ব্ব'প্রতি প্রণয় কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে রাগ রাগিণীর তানে
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপীগণ সঙ্গে সদা রাস রসরঙ্গে
ভারতের ভক্তিপ্রদায়ক॥"

আমাদের বিশ্বাস, একদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নিরন্ন বঙ্গদেশে "হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান," অন্যদিকে শক্তিভক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—এই দুই বাহ্য প্রেরণাবশেই রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গলের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু তাঁর গভীরতর অন্তঃপ্রেরণা ছিল অন্যত্র নিহিত। তাই মহৎ কবির সুতীব্র মানবতাবোধ, অপরপক্ষে পরভৃতকের প্রভু- আজ্ঞা শিরোধার্যের মধ্যেও তিনি অন্তঃসলিলা বিদ্যাসুন্দর-প্রেমগীতিকায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন "ভারত ভূতলে কভু নাহি টলে/রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা।" এইজন্যই, ভাগবতীয় কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপীদের ইষ্টলাভার্থ উদ্‌যাপিত কাত্যায়নী ব্রতবর্ণনার মতোই 'সন্ধিখননে' নিযুক্ত সুন্দরের বর্ণনায় ভারতচন্দ্রও চামুণ্ডার উচ্চ-জয়নাদের মধ্যেই ধ্রুবপদে ভাগবতকারের তথা গীতগোবিন্দকারের পদাঙ্কানুসরণে ঘোষণা করেন :

"কলিমলমথনং হরিগুণকথনং
বিরচয় ভারতকবিবরতুণ্ডে ॥"

বস্তুত, যুগসন্ধির কবি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের কবিপুরুষ মধুসূদনের কটূক্তি[১] কতদূর স্বীকার্য, এখানে এসে বারংবার সে-প্রশ্ন জাগে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে পবিত্র ভাগবতকথাকে বলা হয়েছে : "নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্" বা আসন্নমৃত্যু মনীষীদের কাছে কথিত। ভাগবতীয় রাসলীলা যে কামকেলিসর্বস্ব নয়, বরং আসন্নমৃত্যু মনীষীদের কাছে কথিত অধ্যাত্মবাণী, উক্তির দ্বারা তাই প্রমাণিত হচ্ছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও ম্রিয়মাণ মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছিল এবং তারও কামসর্বস্বতার অন্তরালে নিগূঢ় অভিপ্রায় অন্বেষণ করাই মনীষার পরিচয়। বিদ্যাসুন্দরের আপাত-কামকেলিসর্বস্বতার মধ্যে আমরা তো ভারতবর্ষীয় নিত্যকালের এক প্রেমচ্ছবিকেই স্বতন্ত্র বেশে প্রত্যক্ষ করি মাত্র। ভাগবতীয় কৃষ্ণগোপী-প্রেমই পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মধ্য দিয়ে ভারত-কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের প্রেম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—ফলত ঐতিহ্যবরণের মহৎ অঙ্গীকার ভারতচন্দ্র তাঁর নিজের কালে তথা পরবর্তী কালের হাতেও

১ "...The man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry"

দ্র° ২৪ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প°, তিলোত্তমাসম্ভব, ভূ° ॥৶০

গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী সেই ঐতিহ্যাগত পরম-প্রেমের মূল্যায়ন কিভাবে করেছে সে-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তরদানেই অবশেষে অনিবার্য হয়ে উঠবে ভাগবত ও বাঙ্‌লাসাহিত্য বিষয়ক সর্বশেষ আলোচনা—উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চা॥

অষ্টম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাগবত চর্চা

উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চা

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চা বিষয়ক আলোচনার উপক্রমেই মনে পড়ে ভাগবত ও ভাগবতীয় গোপীপ্রেম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সেই তীব্র শ্লেষোক্তি :

"…শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অবধি। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্তসূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণস্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক। তদ্‌যথা। দশম স্কন্ধে…২২ অধ্যায়ে। ভগবানুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। [১৯] অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ। ১২ শ্লোক॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং। গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং। ১৪ শ্লোক। …শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণপূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্যবদনে আমার নিকট ঐরূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। ১২। নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডলদ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন [২০] গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন॥ ১৪॥ বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞ লোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন॥"[১]

রামমোহনের এ-উক্তিরই ঠিক বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন :

এ প্রেমের মহিমা কি আর বলব! এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, গোপীপ্রেম উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। আমাদের মধ্যেও এমন নির্বোধের অভাব নাই, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। আমি আবার বলিতেছি, আমাদেরই স্বজাতি এমন অনেক

১ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, বং সাং পং, পৃং ৫১-৫২

অশুদ্ধচিত্ত নির্বোধ আছে, যাহারা গোপীপ্রেমের নাম শুনিলে উহা অতি অপবিত্র ব্যাপার ভাবিয়া ভয়ে দশহাত পিছাইয়া যায়। তাহাদিগকে শুধু এইটুকু বলিতে চাই—আগে নিজের মন শুদ্ধ কর; আর তোমাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যিনি এই অদ্ভুত গোপীপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, তিনি সেই চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুক।"[১]

"চিরপবিত্র ব্যাসতনয় শুকে"র মতোই "শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই অতি অপূর্ব অংশের তাৎপর্য" উদ্ধার করে, তথা গোপীপ্রেমের মহিমা কীর্তন করে একই বক্তৃতায় বিবেকানন্দ পূর্বেই বলেছিলেন :

"কে গোপীদের সেই প্রেম-জনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ—যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক-পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে।"[২]

' রাজা রামমোহনের পূর্বোদ্ধৃত 'গোস্বামীর সহিত বিচার'-এর সন ১৮১৮ আর মাদ্রাজে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'The Sages of India' বা

১ 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ,' স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, ৫ম খং, ১৫১-৫২ পৃ। মূল ইংরেজী-বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক স্থল নিম্নোদ্ধৃত হলো :

"And what a love! I have told you just now that it is very difficult to understand the love of the Gopis. There are not wanting fools, even in the midst of us, who cannot understand the marvellous significane of that most marvellous of all episodes. There are, let me repeat, impure fools, even born of our blood, who try to shrink from that as if from something impure. To them I have only to say, first make yourselves pure; and you must remember that he who tells the history of the love of the Gopis is none else but Shuka Deb. The historian who records this marvellous love of the Gopis is one who was born pure, the eternally, pure Shuka, the son of Vyasa." 'The sages ot India,' The complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, Volume III, p. 258

২ তত্রৈব, পৃ ১৫০। মূল ইংরেজী বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক স্থল নিম্নোদ্ধৃত হলো :

"Who can understand the throes of the love ot the Gopis—the very ideal of love, that wants nothing, love that even does not care for heaven, love that does not care for anything in this world, or the world to come? And here, my friends, through this love of the Gopis has been found the only solution of the conflict between the Personal and Impersonal God" Ibid, p. 257

'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' বক্তৃতার তারিখ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান উনআশী বৎসর বা কিঞ্চিৎন্যূন এক শতাব্দী। বঙ্গদেশে এই এক শতাব্দীতে ভাগবতের চর্চা যে কি ভাবে শুরু হয়ে কোথায় কোন্ শিখরসীমায় উপনীত হয়েছিল, তার একটি অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত রূপেই রামমোহন ও বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি পাশাপাশি স্থাপন করা হলো। রামমোহনের জিজ্ঞাসা ছিল চিরকালের সামাজিক মানুষের জিজ্ঞাসা। ভাগবতে পরীক্ষিতও শুকদেবকে একই প্রশ্ন করে বলেছিলেন :

"স কথং ধর্মসেতূনা বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥"[১]

ধর্মসেতুর বক্তা কর্তা ও অভিরক্ষক হয়ে কি করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরদার-গমনের এই বিরুদ্ধ আচরণ করতে পারলেন? রামমোহনের ভাষায় "বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ হয়"? পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের উপলব্ধি চিরকালের রসিক ভাবুকের উপলব্ধি। ভাগবতে উদ্ধবও অনুরূপভাবে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপীদের পদবন্দনাগান গেয়ে উঠেছিলেন :

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"[২]

যাঁরা যুগপৎ স্বজনবর্গ এবং আর্যপথ পরিত্যাগ করে শ্রুতি-অন্বিষ্ট শ্রীকৃষ্ণপদবী প্রাপ্ত হবেন বলেই শুধু সভক্তি সেবন করেছেন, সেই বৃন্দাবনগোপীদের চরণরেণু-সংলগ্ন গুল্মলতাদির কোনো একটি হয়ে ব্রজে জন্মলাভ করলে ধন্য হই। আমরা জানি, এই পরম প্রার্থনাকারী উদ্ধবই গোপীবৃন্দের কৃষ্ণ-বিরহব্যথা দর্শন করে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, আপনাদের কৃষ্ণবিরহ আমার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ : "বিরহেন মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ"[৩]। আর বিবেকানন্দের ভাষায়, "Who can understand the throes of the love of the Gopis—the very ideal of love, love that wants nothing, love that even does not care for heaven,

১ ভা° ১০।৩৩।২৮ ২ ভা° ১০।৪৭।৬১ ৩ ভা° ১০।৪৭।২৭

love that does not care for anything in this world, or the world to come."

বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীরই প্রথম পাদে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা ভাগবতীয় তত্ত্ব তথা গোপীপ্রেমকে বাঙালী কিভাবে কষ্টিপাথরে কঠিন পরীক্ষায় যাচাই করে নিয়ে উত্তরপাদে আবার তারই 'নিকষিত হেম' স্বরূপদর্শনে তাকে মস্তকোপরি ধারণ করে নিয়েছে সে-ইতিহাস যেমন চমকৃপ্রদ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আর সে-ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনাক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-কৃত ভাগবতচর্চাকে আমরা প্রথমেই দুটি গোত্রে বিভক্ত করে নিতে পারি। প্রথমত দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগবতচর্চা, দ্বিতীয়ত অদীক্ষিত সমাজের ভাগবতানুশীলন। আমরা মনে করি, বাঙ্‌লাদেশে দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহর চৈতন্যযুগের সঙ্গেই অবসিত, আর সেই ভাগবতচর্চার সুবর্ণ প্রহরের বিবরণ আমরা 'ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য,' 'ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন' এবং 'ভাগবত ও চৈতন্য-যুগসাহিত্য' অধ্যায়ত্রয়ে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই লিপিবদ্ধ করেছি। কাজেই এ-অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীকৃত ভাগবতচর্চার প্রসঙ্গে শুধু অদীক্ষিত সমাজের ভাগবতানুশীলন বিষয়ক আলোচনারই অবকাশ আছে। উক্ত সমাজের ভাগবতানুশীলনকে আবার কালানুসারে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্বটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'রামমোহন-যুগ,' দ্বিতীয় পর্বটির নাম 'বঙ্কিম-যুগ,' তৃতীয় বা শেষ পর্বটির নাম 'বঙ্কিমোত্তর যুগ'।

আমরা জানি, ১৮১৪ সনে রামমোহন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। এই বৎসরটিকেই তাঁর পরিণত শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্মচর্চার সুফলপ্রসূ সময় বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। এর পূর্বেও অবশ্য তাঁর ধর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য অন্যত্র প্রকাশিত। কিন্তু তা বঙ্গভাষায় লিখিত বা অনুশীলিত নয়। ১৮১৫ সনেই রামমোহনের প্রথম বাঙ্‌লাভাষায় রচিত গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ—'বেদান্তগ্রন্থ'। এ-গ্রন্থে গৌড়ীয় ভাষায় তাঁর যে শাস্ত্রচর্চার সূত্রপাত, ১৮৩৩ সনে তাঁর দেহান্তের দু-চার বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তার আর বিরাম ঘটেনি। এর ঠিক পাঁচ বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব—১৮৩৮ সনে। একই বৎসরে কেশবচন্দ্রের জন্ম। হেমচন্দ্রও আটত্রিশের সন্তান। নবীনচন্দ্রের উদয় শতাব্দীর মধ্যসন্ধির আরো কিছু সন্নিকটে—১৮৪৭ সনে। বাঙ্‌লা কৃষ্ণায়ন সাহিত্যে এই চারি-চন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে

উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্‌লাসাহিত্যে কৃষ্ণভাবনার ক্ষেত্রে তিনি একাধারে শিল্পী ও গবেষক। রামমোহনের গবেষণামূলক তুলনাত্মক ধর্মচিন্তার বিশিষ্ট পদ্ধতিকে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় অলোকসামান্য প্রতিভা-বলে বাঙ্‌লাদেশে কৃষ্ণায়ন সাহিত্যের এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। রামমোহনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তাঁর মনীষা। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রে শুধুই মনীষা নয়, সঙ্গে ছিল শিল্পীর বিশুদ্ধ সৃষ্টিপ্রেরণা, রসিকচিত্তের উদ্বোধন। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণে ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মার্জিত আবেগের মণিকাঞ্চন যোগ প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন শাস্ত্রবাক্যের আশ্রয়ে কৃষ্ণচরিত্রকে কেবল খণ্ডবিখণ্ড করতেই চেয়েছেন; বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের এই নেতিবাদ-মূলক কৃষ্ণভাবনার ভিত্তির ওপর অস্ত্যর্থক কৃষ্ণচরিত্রের প্রেম-ভক্তি-আদর্শের অপূর্ব ভাস্কর্য রচনা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্র মূল্যায়নের এই বঙ্কিমচন্দ্রীয় বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ভাগবতানুশীলনে অনুসৃত হয়েছে। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' [১৮৮০] এবং 'ধর্মতত্ত্ব' [১৮৮৮] এ-পর্বের শ্রেষ্ঠ সারস্বত ফসল। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' [১৮৭৫] এবং নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্যও ['রৈবতক' ১৮৮৭, 'কুরুক্ষেত্র' ১৮৯৩, 'প্রভাস' ১৮৯৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও কেশবচন্দ্র তাঁর দলমতনিরপেক্ষ উদার ধর্মচেতনার জন্য প্রণম্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র যদি হন কৃষ্ণায়ন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, তবে কেশবচন্দ্র হবেন সবচেয়ে কৃষ্ণ-ভাবিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভাগবতচর্চাও তাই শতাব্দীর গৌরবের স্থল।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই ভাগবতকে রূপকার্থে গ্রহণের একটি প্রবণতা বাঙ্‌লা-সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ভাগবতের এই ধ্রুবপদে তথা মূল-বিশ্বাসে অবিচল থাকলেও ভাগবতের সমুদয় অলৌকিক উপাদানকে 'রূপক' হিসাবে ব্যাখ্যা করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উক্ত প্রবণতার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন। তাই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরিদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগবত-বিশ্লেষণে রূপকবাদী। এঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার যুক্তিভিত্তিক রূপকবাদের বাইরে আবেগাত্মক বিশ্বাসবাদের প্রাবল্যে ভাগবতীয় ভক্তিধর্মকে স্বীকার ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ ছিল না। প্রসঙ্গত ঊনবিংশ শতাব্দীর 'ভক্তিরত্নাকর' রূপে খ্যাত নাটক 'জনা'র নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কথা মনে পড়বে।

গিরিশচন্দ্র যাঁর শিষ্য ছিলেন, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই প্রিয়তম

উত্তরসাধক বিবেকানন্দেই এ-শতাব্দীর ভাগবতচর্চার দুই পৃথক্ ধারার, রূপকবাদ ও বিশ্বাসবাদের বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বিবেকানন্দ ভাগবতকে যে কোথাও কোথাও রূপকার্থে গ্রহণ না করেছেন, এমন নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে রামমোহনের যুক্তিশাসন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার বিচার বিশ্লেষণকে পরাস্ত করেই জয়ী হয়েছে গুরু রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাসবাদ, ভক্তিধর্ম। বঙ্কিমোত্তর যুগের আর কোনো বিশ্লেষকই বিবেকানন্দের মতো ভাগবতের মর্মস্থলে এমন করে প্রবেশ লাভ করতে পারেননি। বঙ্কিমোত্তর যুগের আলোচনায় তাই বিশেষ করে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হবে। আর সে-পর্বেরই সম্যক্ অনুধাবনে আদিপর্ব 'রামমোহন যুগ-'এর আলোচনাই সর্বাগ্রে কাম্য।

নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এবং তিরোধানের ২৪১ বৎসর পরে ১৭৭৪ সনে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগরে রামমোহন রায়ের জন্ম। উভয়ের মধ্যে প্রায় আড়াইশো বৎসরের কাল-ব্যবধান বর্তমান। মানস-ব্যবধান আরও অধিক। এ-ব্যবধান মুখ্যত পরিবর্তমান যুগের, গৌণত নবাগত পাশ্চাত্যের ইহবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলজাত। বাঙ্‌লাদেশে তখন চৈতন্যযুগ তার ভাবসমৃদ্ধ প্রহরের পরিপূর্ণ জোয়ারের কালকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ প্রেরণা হারিয়ে ক্রমে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সীমায় নানা ভ্রষ্টাচারের ঘূর্ণাবর্তে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব-যুগের এই প্রেরণাহীন ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি ও চারিত্রশূন্য অবক্ষয়ের প্রত্যন্তভাগেই রামমোহনের আবির্ভাব। বৈষ্ণব ধর্মেতিহাসে যে-যুগপ্রয়োজন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তারই যেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন মধ্যযুগের মধ্যমণি শ্রীচৈতন্য এবং আধুনিক যুগের প্রবর্তক রামমোহন। বঙ্গসংস্কৃতি সাধনায় চৈতন্যের যুগপ্রয়োজন যেমন ছিল আচারসর্বস্ব অন্ধ-তামসিকতার নৈরাজ্যে অহৈতুকী নিঃশ্রেয়স প্রেমভক্তি প্রচার, রামমোহনের তেমনি ফেনসর্বস্ব ভাবতারল্যের গড্ডলিকা-প্রবাহে মননদীপ্ত যুক্তিযোগ-সাধনা তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার নব-নবোন্মেষণা। বস্তুত যুগপ্রয়োজনেরই অমোঘ নিয়মে রামমোহন পরিণত বয়সের স্থিরপ্রজ্ঞায় ও যুক্তি-পারঙ্গমতায় বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর খনিত্রে যে ফসল উঠেছে, তা বুদ্ধিজাত। শ্রীচৈতন্যের ভাবসমৃদ্ধ রসঘন পরিমণ্ডলের সঙ্গে এই বুদ্ধিজাত তত্ত্বজ্ঞানরাজ্যের পার্থক্য গভীর।

অথচ রামমোহন বৈষ্ণবপরিবারেরই সন্তান ছিলেন। এ-পরিবারের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। উল্লেখযোগ্য, গৃহদেবতার সেবার ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হয়ে তবেই তিনি ১৭৯৬ সনে ডিসেম্বর মাসে পৈতৃক সম্পত্তির অংশলাভ করেন। এই ব্যয় তিনি নিয়মিতভাবেই বহন করেছিলেন। তবে ১৮১৪ সনে রংপুর থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন কালে রামমোহন তাঁর ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে পৈতৃক গৃহের অর্ধাংশ দান করে বিগ্রহসেবার দায়মুক্ত হন।[১] এই বিগ্রহেরই সেবায় জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন রামমোহন-জননী তারিণী দেবী। শাক্তবংশের কন্যা হয়েও শ্বশুরকুলের ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পদাশ্রয়ে তিনি ছিলেন একান্তভাবেই শরণাগতা। তাঁর এ-শরণাগতি এমনই দৃঢ়মূল ছিল যে তা আপন বিরুদ্ধাচারী পুত্রকেও কোনোদিন ক্ষমা করেনি। মাতা-পুত্রের সেই মর্মান্তিক মকদ্দমায় রামমোহনের পক্ষ থেকে তারিণী দেবীকে যে-জেরা করা হয়, তারই অংশবিশেষ উদ্ধারযোগ্য :

"আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করে, তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই?"

"এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু [illegible]ম চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা-পূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?"[২]

উল্লেখযোগ্য, রামমোহন-প্রদত্ত অর্থে বৃদ্ধবয়সে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করার সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে পদব্রজে একাকী তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে প্রতিদিন জগন্নাথদেবের আঙিনা মার্জনা করে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর প্রাণবায়ুও এই শ্রীক্ষেত্রেই ভক্ত-

১ দ্র° সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খ°, পৃ° ৪৫

২ দ্র° সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খ°, পৃ° ৯-৫০

বৈষ্ণবাকাঙ্ক্ষিত ধামেই বিলীন হয়েছিল। অর্থাৎ রামমোহনের বংশগত বৈষ্ণবতার ঐতিহ্য উভয়ত তাঁর পিতামাতা থেকে আগত। জনৈক 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'র সেই ধিক্কারপূর্ণ উক্তি স্মরণ করা যায়:

"কি আশ্চর্য্য, সুরাচার্য্য সুবাসঙ্গে পরম রঙ্গে অচৈতন্য হইয়া শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত অবতারকে এবং তদুপাসক সকলকে অমান্য ও জঘন্য জ্ঞানে অম্লানবদনে অতি সামান্যের ন্যায় ব্যঙ্গ ও নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও মাতা চিরকাল যে গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্‌ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন, সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমূষলের ন্যায় উক্তি করিয়াছেন, ধিক্ ২ এ নরাধমের কি গতি হইবেক, পিতামাতার বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপুঞ্জপুঞ্জের ফলেই এতাদৃশ সুসন্তান জন্মিয়া কুল উদ্ধার করে।"[১]

লক্ষণীয়, "তাঁহার পিতা ও মাতা চিরকাল…গৌরাঙ্গাবতারাদির সাধন ও তদ্‌ভক্তগণের অধরামৃত পান করিয়া উদ্ধার হইয়াছেন"। তবু রামমোহন কেন যে "সেই আপন কুলদেবতাকে কুলমূষলের ন্যায় উক্তি" করেছেন, তার সংগত কারণ বলা বাহুল্য নিহিত আছে তাঁর যুগে এবং তাঁর প্রাতিস্বিক ধর্ম-চেতনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে, রামমোহনের জন্ম ইতিহাস ও রাজনীতি-সচেতন ঘটনাবহুল যুগে। এ হলো পলাশির যুদ্ধের মাত্র সতেরো বছর পরের এবং মহারাজা নন্দকুমারের বিচার ও ফাঁসির ঠিক এক বছর পূর্বের কথা। একই বৎসরে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। আবার ১৭৬৯-৭০ সনের বা বাঙ্‌লা ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরও সমসাময়িক অভূতপূর্ব ঘটনা। পলাশির যুদ্ধ [১৭৫৭] থেকে চুক্তিনামা [১৮১৩] পর্যন্ত বিস্তৃত কালটিকে বাঙ্‌লা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় পটপরিবর্তনের জন্য চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে রামমোহনের অবিসংবাদিত ভূমিকাটি স্বীকার করে ড° সুশীলকুমার দে যথার্থই বলেছিলেন, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে যাত্রার পথে দেশ যে বিশাল ও জীবন্ত পরিবর্তন সমূহের মধ্য দিয়ে চলেছিল, রামমোহন রায়

১। 'পাষণ্ডপীড়ন', "কোনো ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্তৃক কোন পণ্ডিতের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ" প্রস্তুত পত্রের "উন্মত্ত প্রলাপ-খণ্ডনো নাম প্রথমোল্লাস", রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প° প্রকাশিত, পৃ° ৫১

ছিলেন তারই অন্যতম অগ্রদূত[১]। তবে ভুললে চলবে না, এ-নব্যতন্ত্র পুরাতন পথ ও মতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নয়। রামমোহন-জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কোলেটের অনুসরণে বলা যায়, প্রাচীন বর্ণধর্মের সঙ্গে আধুনিক মানবতার, পুরাতন কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের, অচল আচারবিচারের সঙ্গে সংরক্ষণশীল প্রগতির তথা অনেকেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের মধ্যবর্তী ব্যবধানের যোগস্থাপনকারী খিলানস্বরূপ ছিলেন রামমোহন। তাই দেখি, রামমোহন তৎকাল-প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন করেননি যেমন, তেমনি স্বীকার করেননি ডিরোজিও-দীক্ষিত হিন্দুকলেজ-লালিত ইয়ং বেঙ্গলদের আমূল ঐতিহ্য বিরোধও। তিনি যে কোনো নবলব্ধ ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন, এমনও নয়। বরং সত্যসন্ধিৎসার প্রেরণায় তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষেরই পদপ্রান্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সে-ভারতবর্ষ মূলত বৈদান্তিক ভারতবর্ষ। তবে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র নির্বিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের সমুদয় তত্ত্বসাধনাই একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনুকূলে তাঁর সহায়ক হয়েছে। আবার একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় শুধু হিন্দু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রই নয়, কোরান পাঠের ফলশ্রুতি তথা খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবও যে তাঁতে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই। তাঁর জীবন-চর্যাতেও মুসলিম সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক আচারের বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর শৈববিবাহ, মদ্য-মাংসাদি সেবন, মুসলমানী পোষাক-প্রীতি ইত্যাদি সেই মিশ্রণেরই প্রত্যক্ষ ফল। হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের দ্বারা তিনি তন্ত্র-প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ তো সর্বজনবিদিত। তাই একদিকে যেমন তিনি 'তান্ত্রিক ব্রাহ্ম অবধূত' নামে পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 'Mouluvee Rama Mohuna Raya' নামেও খ্যাত হন। বীরাচার গোত্রীয় তাঁর এই মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনধারার জন্য তিনি সমসাময়িক বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বৈষ্ণব সমাজ ও ধর্মের প্রতি রামমোহনের বিজাতীয় ক্রোধ ও অপরিসীম অবজ্ঞার এও হয়তো একটি বড়ো কারণ। বিশেষত বৈষ্ণবতার নামে প্রচলিত কিছু কিছু ভণ্ডামি তাঁকে

১ "The country was passing through vast and vital changes, from what may be called the mediaeval to the modern age, and Rammohan Ray was one of the important Heralds of the new spirit." Bengali Literature In the Nineteenth Century, p. 501

অসহিষ্ণু করেছে। 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী'র 'চারি প্রশ্নের' প্রত্যুত্তরে তাঁর সেই মর্মভেদী শ্লেষ মনে পড়ে :

"নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শের বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ [১৭] পর্য্যন্তেরও নিন্দা এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না।"[১]

তাছাড়া কবিওয়ালার গানে, যাত্রায় এবং সঙ্ শোভাযাত্রায় বিপথগামী বৈষ্ণবতার বিকৃতিও তাঁর ক্রোধাগ্নির ইন্ধন যুগিয়েছে :

"যুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুর্জ্জয় মানভঙ্গ ও সুবলসম্বাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয় তাহাকে পরমার্থসাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে সম্মুখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রতি গড্ডরিকাবলিকা শব্দের প্রয়োগ উচিত হয়"[২]।

সমসাময়িক কালে কতিপয় অধোগামী আদর্শচ্যুত "গড্ডরিকাবলিকা"বৎ বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণাই রামমোহনকে প্রকারান্তরে বৈষ্ণবের 'অমল শাস্ত্র' ভাগবত, ভাগবতের পরমোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের ক্বচিৎ উপায় ক্বচিৎ উপেয় শ্রীচৈতন্য এবং চৈতন্য-প্রবর্তিত বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতি নস্যাৎ করতে প্রোৎসাহিত করেছে। রামমোহন একেশ্বর "সক্রপ পরব্রহ্মে" বিশ্বাসী ছিলেন বলে কৃষ্ণ-শিব-দুর্গাদি কোনো দেবদেবীর অস্তিত্বেই তাঁর আস্থা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সাকার ব্রহ্ম উপাসক অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙলার বৈষ্ণবদের তিনি যেভাবে আক্রমণ করেছেন, তা সত্যই তুলনারহিত। রামমোহন সর্বপ্রকার ভাবাবেগ-বর্জিত যুক্তিমনস্ক শাস্ত্রবিবেকে সাকার উপাসনা বর্জনীয় জ্ঞান করেছিলেন। কাজেই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" বা কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, এই সাকার পরব্রহ্মবাদী ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব-প্রস্থান তাঁর মনোভিরঞ্জক হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগবতের প্রতি

১ 'চারি প্রশ্নের উত্তর', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সা॰ প॰ স॰, পৃ॰ ১৫

২ তত্রৈব, পৃ॰ ১২

তাঁর সুগভীর অবজ্ঞা শুধু মত-পার্থক্যের সূত্রেই যেন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারি, তাঁর পরিদৃষ্ট বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধাই তাঁকে ভাগবতীয় পরমতত্ত্বের প্রতি অধিক অবজ্ঞাশীল করে তুলেছে। নতুবা কোনো দীক্ষিত বৈষ্ণবের চেয়ে কোনো অংশে কম ভাগবত পাঠ তিনি করেননি। রামমোহনের পুস্তকাবলীর বহুস্থলেই ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ অংশের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে-সবই তাঁর মতবাদের অনুকূলতা সাধনেই একমাত্র গৃহীত। এ-বিষয়ে তাঁর অভিমত ছিল, বিতর্কের দ্বারাই শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা কর্তব্য "...বৃহস্পতি। কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রা [৩৪] র্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি॥"[১] রামমোহনের ভাগবতচর্চার এইটিই মূলসূত্র। দু'একটি উদাহরণ যোগে বক্তব্য বিশদীভূত করা যায়।

প্রতিমাপূজা নিরাকরণে তথা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় রামমোহন ভাগবতের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। যেমন বলা যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বেদান্তচন্দ্রিকাস্থ সাকার পরব্রহ্মবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি ভগবদ্গীতা ও মুণ্ডকোপনিষদের উদ্ধৃতির পরেই ভাগবত স্মরণ করেছেন: "অহং যূয়মসাবর্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেব যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ ২১॥ হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সংসার জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান॥২১॥"[২] এর দ্বারা রামমোহন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন, "আমাদের শরীরে" অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমে তথা সমূহ দ্বারকাবাসীসহ রামকৃষ্ণ-শরীরে ব্রহ্মস্বরূপের কিছুমাত্র ন্যূনাধিক্য নেই।

প্রতিমাপূজার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়েও রামমোহন ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ভাগবতেরই দশম স্কন্ধের চুরাশি অধ্যায়ের ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্যের সহায়তা গ্রহণ করেছেন: "কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥ ভগবান্ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যাবুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে

১ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সা° প° স°, পৃ° ৫৭

২ 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প°, পৃ° ১৮০

দেবতাজ্ঞান যাহাদের এমতরূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনে [ষ]ষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থবোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়॥"[১]

এই মূর্তিপূজার বিপক্ষে তথা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার স্বপক্ষে রামমোহনের অধিকতর সহায়ক হয়েছে ভাগবতীয় কপিলবাক্য। রামমোহন মাণ্ডুক্যোপ-নিষদের ভূমিকায় লিখছেন: "শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য॥ যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২॥ সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।"[২] এ থেকেই রামমোহনের সিদ্ধান্ত, "যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনায় এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপী করিয়া পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন"[৩]। বিশেষ লক্ষণীয়, যে সকল শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার তথা প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তার ফল দেওয়া হয়েছে, রামমোহনের অভিমত অনুসারে সেগুলি অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। রামমোহন ভাগবত থেকে প্রতিমাপূজার নিষেধবাক্য উদ্ধার করেছেন, আবার এর পূর্বে বসুদেবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন এ-শাস্ত্রের "ব্রহ্মতত্ত্বে মতি", অতএব বলতেই হয়, ভাগবতকে তিনি অন্তত 'অপরাবিদ্যার শাস্ত্র' বলেননি। কিন্তু তাই বলে তিনি এ-শাস্ত্রকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতো 'বেদান্তসূত্র' বলেও গ্রহণ করেননি, অথবা "সর্ব-প্রমাণাং চক্রবর্তিভূতম্" বা সর্বপ্রমাণের চক্রবর্তিভূত বলেও করেননি অভিনন্দিত। আসলে ভাগবতকে তিনি একখানি সাধারণ পুরাণ হিসাবেই

---

১ 'ঈশোপনিষৎ', ভূমিকা, রামমোহন-গ্রন্থাবলী

২ 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ', ভূমিকা, পৃ° ২৪৩

৩ তত্রৈব, পৃ° ২৪৩-৪৪

গ্রহণ করেছেন। আর এ-কথা আমাদের কারো অবিদিত নয়, পুরাণ সম্বন্ধে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কোনোকালেই ছিল না।

ভাগবতাদি ভারতীয় পুরাণ সম্বন্ধে রামমোহনের চিন্তাধারার সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে হলে তাঁর 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নিবন্ধটি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' নিবন্ধের 'গোস্বামী' ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী, রামমোহনের ভাষায়, "ভগবদ্গৌরাঙ্গ-পরায়ণ গোস্বামিজী"। কাজেই এঁর সঙ্গে রামমোহনের বাদানুবাদের আলোচনাক্রমে ভাগবতের প্রতি তো বটেই, ভাগবত সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিও রামমোহনের অভিমত জানা যাবে। গোস্বামিজীর প্রশ্ন ছিল "পরিপূর্ণ ১১ পত্রে"। তারই একস্থানে পুরাণ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য-করেছিলেন, "বেদার্থনির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে।" উত্তরে রামমোহন প্রথমেই বলেন, "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" সূত্রবলে ইতিহাস-পুরাণেই ইতিহাস-পুরাণের সর্বোপরি মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, নতুবা "পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ নহেন"[১]। দ্বিতীয়ত স্ত্রী-শূদ্র-পতিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বেদাধিকার-বঞ্চিত সমাজের জন্যই পুরাণাদির পরিকল্পনা। অতএব যাঁদের "বেদ ও বেদ-শিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে" অধিকার আছে, তাঁরা কেন পুরাণাদিতে গুরুত্ব দেবেন?[২] গোস্বামী যে গরুড়পুরাণের প্রামাণ্যবলে বলতে চেয়েছেন,

১ "...পুরাণ ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ নহেন...তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন ও তন্ত্র আগমে আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন এ ব্রত [১০] অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন"। 'গোস্বামীর সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রন্থাবলী', ব° সা° প°, পৃ° ৪৬-৪৭

২ "পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ। স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারেন না এ নিমিত্ত ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ব্ব [১১] বেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং শুভং। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং। সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস করিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন।" 'গোস্বামীর সহিত বিচার' পৃ° ৪৭

"পুরাণের মধ্যে যে ২ স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্ত্বিক আর ব্রহ্মাদির মাহাত্ম্য যে পুরাণে আছে সে তামস," এ বিষয়েও রামমোহনের বক্তব্য, গরুড়পুরাণের উদ্ধৃতি কোনো প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের দ্বারা ধৃত না হওয়ায়, তার প্রামাণ্যে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া "যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ" বা 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' বলে যার খ্যাতি সেই মহাভারতে তো কোথাও শিবমাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে তামস বলা হয়নি, বরং মহাভারতীয় দানধর্মে শিবের প্রতি "সদাশিবাখ্যা যা মূর্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা" এই বিষ্ণুবাক্যে সদাশিবাখ্য মূর্তি তমোরহিতই বলা হয়েছে।[১] গোস্বামিজী আরও বলেছিলেন, "বেদান্তসূত্র অতি কঠিন ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থস্বরূপ পুরাণচক্রবর্ত্তী শ্রীভাগবত মহাপুরাণ কহিয়াছেন।" উত্তরে রামমোহনের বক্তব্য দুটি অংশে পৃথক্ করে আলোচনা করা যায়। প্রথমত, "ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া" ভাগবত প্রণয়ন করেন, এ বিষয়ে রামমোহনের অভিমত। দ্বিতীয়ত, "ভাগবত বেদান্তসূত্র" এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় অভিমত সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য। স্মরণীয়, পুরাণ এবং ইতিহাস রচনা করেও চিত্তের পরিতোষ প্রাপ্ত না হয়ে বেদব্যাস ভাগবত পুরাণ প্রণয়ন করেছিলেন, এ বিষয়ে রামমোহনের কিছুমাত্র সমর্থন নেই। তিনি বলেন, "ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনো ঋষিবাক্য নাই"।[২] তাছাড়া, "পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তি দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহ তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন। শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। ব্রাহ্মং দশসহস্রানি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ। শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি। বিষ্ণুপুরাণে। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা। ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন॥"[৩] এবার অনুধাবনযোগ্য "ভাগবত বেদান্তসূত্র" এ-সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত।

---

১ তত্রৈব, ৪৯ ২ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', পৃ৽৪৩ ৩ তত্রৈব

তিনি প্রথমেই বলে নিয়েছেন, "শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চয় আছে"[১]। ভাগবত পুরাণ নয়, "এমৎ বিবাদ" না করলেও, তার কিঞ্চিৎ আভাস যে না দিয়েছেন, এমন নয়। বিশেষত তিনি যখন বলেছেন, শাক্তরা দেবীভাগবতকেই পুরাণ বলেন, ভাগবতকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মনে করেন না। আর বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ পুরাণ ভাগবত নয়, এর অনুকূলে তাঁর বক্তব্য তো স্পষ্টতর, বিশদীভূত। তাঁর মতে, গরুড়পুরাণের যে-উক্তিবলে[২] গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলেন, আগেই বলা হয়েছে তা কোনো প্রাচীন 'গ্রন্থকারের ধৃত" না হওয়ায় তার প্রামাণ্যে আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। গরুড়পুরাণের এত স্পষ্ট বচনই যদি থাকতো, তাহলে শ্রীধরস্বামী কতকগুলি "অস্পষ্ট বচন" উদ্ধার করে ভাগবত পুরাণকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন না। আবার, সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মহাভারত, এবং বেদার্থনির্ণায়ক যে-বেদান্তসূত্র, ভাগবত যদি গরুড়পুরাণ-মতে তাদেরই ভাষ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ পুরাণকে কি করে একই সঙ্গে 'সাক্ষাৎ বেদ'ও বলা যাবে? বিশেষত, গরুড়পুরাণ-মতে ভাগবতকে যেমন পুরাণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করতে চান গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তেমনি শাক্তরাও কালীপুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান স্কন্দপুরাণের প্রামাণ্য-বলে[৩]। ফলত, "পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এইরূপ শাক্তের কথিত বচন এ দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং [১৮] অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালে

---

১ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প°, পৃ° ৪৯

২ "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥"

৩ "ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে। নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥"
রামমোহনের অনুবাদে অন্তার্থ—"যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না কহিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক।" গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ° ৫০। "কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ" বাগ্‌ভঙ্গিটি ভারতবর্ষের শাক্ত-বৈষ্ণবের বহু কালব্যাপী বিরোধের সূচক।

হইয়া উঠে।"[১] অতঃপর রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, "যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্বসম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না।"[২] বলা বাহুল্য, পুরাণ বিষয়ক আধুনিক গবেষণার এটি একটি সূত্রবাক্যরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। তবে শুধু যে এই সূত্রবলেই তিনি ভাগবতকে বেদান্ত-ভাষ্য বলতে চাননি, তা নয়। তাঁর মতে, কৃষ্ণের ব্রজলীলার "সর্বলোকবিরুদ্ধ" ননীচৌর্য পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি আচরণের সঙ্গে বেদান্তসূত্র সম্পূর্ণ যোগসূত্রহীন। কেবল তাই নয়, বেদান্ত-সূত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ-নাম বা কৃষ্ণের কোনো প্রসিদ্ধ নামেরই লেশমাত্র উল্লেখ নেই। "অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্তসূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই।"[৩] বিশেষ করে, বেদান্তের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে গোতম কণাদ জৈমিনি শঙ্কর অদ্বৈত-বাদকেই প্রচার করেছেন, কিন্তু ভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজনবল্লভ। এমনকি, ভগবান মনুও বেদের অধ্যাত্মকাণ্ডের অর্থ নিরূপণে বেদান্তসম্মত অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেছেন, বিগ্রহ বা প্রতিমাকে নয়। অবশ্য এক এক অঙ্গের এক এক অধিষ্ঠাতা দেবতার বর্ণনাদানে তিনি বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলে বন্দনা করেছেন, এইমাত্র।

লক্ষণীয়, ভাগবতকে 'বেদান্তসূত্র'রূপে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-প্রতিপাদ্য সাকার 'গোপীজনবল্লভ' শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলে স্বীকার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই "ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণমূর্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয়" গোস্বামিজীর এ-উক্তিও রামমোহনের নিকট উপহাস্যাস্পদ, "পৃথিব্যাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্রাকৃত আকার আছে কিন্তু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার উত্তর। শ্রুতি স্মৃতি এবং অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকার এ কথা সেইরূপ হয় যেমন বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শৃঙ্গ ইহারো একটি২ [৩২] অপ্রাকৃত রূপ আছে কিন্তু তাহা কেবল সিদ্ধপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশপুষ্পেরো অপ্রাকৃত এক প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের ঘ্রাণগোচর হয়। বস্তুত আনন্দের হস্ত পাদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এ সকল রূপক করিয়া বর্ণনা হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস

১ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', পৃ ৫০ ২ তত্রৈব ৩ তত্রৈব, ৫১

এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্তপাদাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তুত আনন্দের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড হয় অথচ আনন্দের কিম্বা ক্রোধাদির ব্রহ্মাণ্ড দেখা দূরে থাকুক অদ্যাপি কেহো আনন্দাদি রচিত কণিকাও দেখিতে পাইলেন না।"[১] এ থেকেই তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অস্থায়ী পরিমিত সাকার রূপ তাকে ব্যাপক ও নিত্যস্থায়ী পরমেশ্বর কোনোক্রমেই বলা যায় না। প্রসঙ্গত তিনি সাকার উপাসনার গুরুতর ত্রুটি দেখাতে চেয়ে বলেছেন, সাকার উপাসনাবিধির প্রমাণস্বরূপ গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগবতকে প্রমাণ করে গোস্বামিজী যেমন "কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন", শাক্ত ও শৈবরাও তেমনি আবার অনুরূপভাবেই যথাক্রমে দেবীসূক্ত-কৈবল্যোপনিষৎ এবং শতরুদ্রী-শিবপুরাণের উক্তি উদ্ধার করে ভগবতী শক্তি ও ভগবান শিবকে স্বয়ং ব্রহ্ম বলে থাকেন। কিন্তু সমস্যা এই, "অবয়ববিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নে নানাস্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ হয়।"[২] তাছাড়া "সাকার ব্রহ্মে"র কল্পনায় নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যেরও বিরুদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ৪ অধ্যায়। ১ পাদ। ৬ সূত্র॥" অর্থাৎ নাম-রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মে নাম-রূপের আরোপ সম্ভব নয়, কেননা, ব্রহ্মই সর্বোৎকৃষ্ট। তাই শেষ পর্যন্ত রামমোহনের অভিমত, রূপরহিতের রূপকল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্তই কথিত হয়, যেহেতু কাল্পনিক রূপের আরাধনায় চিত্তশুদ্ধি হয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় ঘটে। তবে একবার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয়ে কাল্পনিক রূপের উপাসনার আর কোনরূপ প্রয়োজনই থাকেনা।

পরিশেষে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে রামমোহনের অভিমত অনুসন্ধান করা চলে। গোস্বামিজী বলেছিলেন,"ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" শ্রুতিবাক্যের "বিদিত্বা" শব্দের পর এব-কার নেই, এতেই বোধ হচ্ছে—জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয়, আবার ভক্তির দ্বারাও সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ সম্ভব। উত্তরে রামমোহন ভগবদ্গীতার উক্তি উদ্ধার করে বলেন, "জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি না।"[৩]

১ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', পৃ° ৫৬-৫৭ ২ তত্রৈব ৫৯

৩ 'গোস্বামীর সহিত বিচার', পৃ° ৬৩

ভগবদ্‌গীতায় আছে, যে-সকল ভক্ত এইরূপ আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক ভজনা করে তাদের আমি জ্ঞানরূপ উপায় দান করি যাতে তারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়[১]। আবার কঠবল্লী উপনিষদেও জ্ঞানযোগের সাধুবাদ প্রচারিত—যে-সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁদের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয়, তদিতরের হয় না।[২] মনুস্মৃতিতেও বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞানই-পরম-ধর্ম, তাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানবে, যেহেতু আত্ম-জ্ঞানেই মুক্তি।[৩]

এইভাবে ভাগবত পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে চেয়ে রামমোহন প্রকারান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধর্মদর্শনকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রতি তাঁর সেই বিদ্রূপ স্মরণীয় :

"প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্বাদি স্মৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগূঢ় হউক কি অনিগূঢ় হউক ইহারি প্রমাণে তাঁহারা ["ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা"] জ্ঞানাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়েন কিন্তু বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও দুটি ভাই ও তিন প্রভু এই সকলের সাধকেরা কোন্ শাস্ত্রপ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাসনা করি।"[৪]

অন্যত্র তাঁর অসহিষ্ণুতা অধিকতর তীব্র : "গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ···কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়"[৫]।

রামমোহন নির্মম কৌতুকে 'তন্ত্ররত্নাকরে'র প্রমাণবলে গৌরাঙ্গ ও তাঁর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে অগ্রসর হয়েছেন। এ-গ্রন্থে গণেশ বলেছেন, "ত্রিপুরাসুর মহাদেবের দ্বারা নিহত হইয়া শিবধর্ম্ম নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে

---

১ "তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

২ "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

৩ "সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্রং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥"

৪ 'চারি প্রশ্নের উত্তর', রামমোহন-গ্রন্থাবলী, ব° সা° প°, পৃ° ১২

৫ 'পথ্য প্রদান', পৃ°, ১৩৪

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণসঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক"[১]।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ২৮৮ বৎসর পরে এই বাঙলাদেশেই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করে যিনি একমাত্র "সদ্রূপ পরব্রহ্মে" বিশ্বাস স্থাপন করে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এরূপ অভূতপূর্ব কৌতুক করতে পারেন, শ্রীচৈতন্য-সাধনার ধন গোপী-প্রসঙ্গ তাঁর কাছে কৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণের সর্বলোকবিরুদ্ধ ইতিবৃত্ত ভিন্ন আর কি! অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাগবত পুরাণের তথা কৃষ্ণতত্ত্ব-গোপীতত্ত্ব-ভক্তিতত্ত্বের বিরোধিতা করে রামমোহন যে তর্কজাল বিস্তার করেছিলেন তা শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ বিচারে খণ্ডন করা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। উদাহরণত বলা যায়, ভাগবত পুরাণের বিপক্ষে এবং নিরাকার ব্রহ্মের স্বপক্ষে রামমোহন যে যে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তার প্রত্যেকটি খণ্ডন করে তবেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ভাগবতসন্দর্ভে ও অনুব্যাখ্যা সর্বসংবাদিনীতে ভাগবততত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। আসলে ভারতবর্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উষাকাল থেকেই সাকার-নিরাকার তথা ভক্তি-জ্ঞান নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলে আসছে; কোনোদিনই তার নিবৃত্তি ঘটবে না। তবে রামমোহনের দুর্ভাগ্য, তাঁর সমসাময়িক কালে শ্রীজীব গোস্বামীর তুল্য বৈষ্ণব মনীষী তো দূরে থাক্‌, তাঁর শিষ্যানুশিষ্যের শিষ্যানুশিষ্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতই রামমোহনের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্কে যোগদান করেননি। তাহলে অনুমান করা যায়, ভাগবত ও ভাগবতাশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের বিরুদ্ধ বক্তব্য আরও যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর সূচাগ্র হয়ে উঠতে পারতো—শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আত্মরক্ষাতেই তাঁর মতো শাস্ত্র-যোদ্ধার রণকৌশল অপব্যয়িত হয়ে যাওয়া ক্ষোভের বৈকী। তবু বলা যায়, দুর্বলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও রামমোহনের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীশিক্ষিত নব্যভাবধারায় দীক্ষিত বাঙালীর সম্মুখে ভাগবত, কৃষ্ণগোপী ও চৈতন্যদেবকে অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড করিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "বিরোধ ও বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না। সত্যের পরীক্ষা যে কোনো এক প্রাচীনকালে এক দল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের

১ 'পথ্য প্রদান', পৃ° ১৩৪

মতো চুকেবুকে যায় তা নয়, প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নূতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে।"[১] এও তাই। আর সেই অগ্নিপরীক্ষায় ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিমনস্ক মানুষের "বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে" ভাগবত তার কৃষ্ণ-গোপীতত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠ রসিকভাবুক শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে জয়ী হতে পারলো কিনা, একমাত্র সেই আলোচনাতেই বাঙ্‌লাদেশে ভাগবতচর্চার সত্যরূপ স্বীকৃত হওয়া সম্ভব। এ সত্যের সন্ধানে কোথায় কবে বিদ্যাসাগর বহুবিতর্কিত 'বাসুদেবচরিত' লিখলেন কিনা, বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্যতাহেতু ভাগবত পুঁথি দ্রাবিড়াদি দেশ থেকে আনিয়ে শ্রীধরটীকাসহ দুইখণ্ডে প্রকাশ করলেন [১৮৩০] কিনা, কেন ঈশ্বর গুপ্ত শেষ বয়সে ভাগবতের অনুবাদ শুরু করেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন না, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। বস্তুত রামমোহনের পরে বাঙ্‌লাসাহিত্যের পূর্বোল্লিখিত 'চারিচন্দ্রে'র আলোচনাক্রমেই একমাত্র ভাগবতচর্চার সত্যরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব। এঁদের মধ্যে আবার বঙ্কিমচন্দ্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনের শাস্ত্রচর্চার মূলসূত্র ছিল বৃহস্পতি-বচন, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥" অর্থাৎ, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে অর্থের নিরূপণ করবে না, কেননা তর্ক ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করলে ধর্মহানি ঘটে। আমরা বলেছি, রামমোহনের ভাগবতচর্চার এইটিই মূলসূত্র। পরমাশ্চর্যের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল একেবারে অনুরূপ বিচারসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, অভিন্ন মূলসূত্র আশ্রয়। 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু তাই শিষ্যকে এই সূত্রটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন: "বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম্ম এবং দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্ত্তব্য নহে।…নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।"[২]

বস্তুত তিনিও শাস্ত্রকে "প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন" সেবা করেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুভাষণটি মনে পড়বে: "যাহা বিশ্বাস্য তাহাই

---

১ দ্র° 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবুর উক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বি° ভা°, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ° ৫০৭

২ 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স° পৃ° ৬৬৫

শাস্ত্র, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে"[১] ॥ অবশ্য রামমোহনের বিচারবুদ্ধি অঙ্গীকার করলেও, মনে রাখা দরকার, ভারতীয় ভক্তিধর্মের সনাতন বিশ্বাসবাদই বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্রয়ভূমি। প্রমাণস্বরূপ কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমণিকায় তাঁর সেই বিখ্যাত ঘোষণাবাক্যই উপস্থিত আছে :

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং···আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"[২]

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন; একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতের এই ধ্রুবপদ আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর ভাষায় :

"কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন ; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ ?"[৩]

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।"[৪]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে কৃষ্ণের যে-ব্রজলীলার শ্রবণ-কীর্তন-অনুস্মরণ পরম-পাপহারী, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তাই "পাপোপাখ্যান," এবং পুরাণাদি বিচার করে তিনি জানতে পেরেছেন, তা সবই "অমূলক"। বস্তুত এইখানেই তাঁর ওপর জয়ী হয়েছে খ্রীষ্টীয় নীতিশাসিত যুগমানস, এখানেই জয়ী হয়েছেন রামমোহন রায়। নতুবা রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বঙ্গীয় ধর্মসংস্কৃতির ধারাবদল হয়ে গেছে আমূল। তাই দেখি, রামমোহনের লক্ষ্য যখন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম, বঙ্কিমচন্দ্রের তখন অনুশীলন তত্ত্ব। একজন ঔপনিষদিক আবেষ্টনে ভারতাত্মার পুনর্জন্ম অনুধ্যান করেছিলেন, অন্যজন পৌরাণিক

১ 'কৃষ্ণচরিত্র', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড খ, পৃ ৪৪৭

২ 'কৃষ্ণচরিত্র' ১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা, বঙ্কিমরচনাবলী, সা° স°, পৃ° ৪০৭

৩ 'কৃষ্ণচরিত্র', ১ম খণ্ড, সা° স°, পৃ° ৪০৭ ৪ তত্রৈব

প্রতিবেশে ভারতধর্মের করেছিলেন পুনরুজ্জীবন সাধন। একজনের তন্ত্রপ্রীতি ও অন্যজনের কৃষ্ণপ্রীতি পরস্পর বিপরীতকোটিতে অবস্থান করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। রামমোহন তাই যখন সাকারব্রহ্মকে উচ্ছেদ করতে উৎসুক, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ঘোষণা করেন, "আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি"। কৃষ্ণ এবং চৈতন্যকে উপহাস করে প্রকারান্তরে বাঙ্‌লার বৈষ্ণবীয় ধর্মদর্শনকে যখন রামমোহন নস্যাৎ করতে চান, বঙ্কিমচন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের নবমূল্যায়ন করে বঙ্গভূমিতে তাঁদের শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসান। বিস্ময়ের কথা, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্‌লাদেশে চৈতন্য-ভাবান্দোলনের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই আকর্ষণ করে বলেছিলেন :

"আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গ্যালিলিও, কাল বেকন, ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপর-গামিগণ; আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?"[১]

শুধু মধ্যযুগীয় বাঙ্‌লার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পটভূমিকাতেই নয়, ভারত-ইতিহাসের বিপুল পরিপ্রেক্ষিতেও চৈতন্যদেবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নির্ণয় করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, পক্ষান্তরে উন্মুক্ত রণস্থলে রামমোহনকে করেছেন মুক্ত-কৃপাণবিদ্ধ :

"...কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ় বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি,

১ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খ°, পৃ° ৩৩৯, সা° স°

রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছে। কিন্তু লোকে তো শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।"[১]

প্রকৃতপ্রস্তাবে, রামমোহনের জীবনবোধ বাঙালীর বিশিষ্ট ধর্মসংস্কৃতির প্রায় সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যের কিঞ্চিৎ বিরোধী হওয়ায়, বিশ্ববোধের মহৎ চৈতন্যে উদ্রিক্ত হয়েও সর্বাংশে জনগণের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শন আধুনিক প্রতীচ্যের আরোহপদ্ধতির প্রগতি-লক্ষণাক্রান্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঙালীর মানস-প্রবণতারই একান্ত অনুকূল হয়ে উঠেছে। ফলত, রামমোহনের আবেদন যখন "একঘরে" মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ থাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বান তখন কোটি কম্বুকণ্ঠে নববিশ্বাসের সংগীত হয়ে ওঠে। রামমোহনের সুদৃঢ় কৃষ্ণ-নেতিবাদের সৌধমূল চূর্ণ করে এত সহজে তাই বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-অস্তিবাদের বিরাট ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পেরেছেন—রামমোহন-আদর্শবাদ। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই অপূর্ব নির্মিতির দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, "বিচারের লৌহাস্ত্রদ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া কাটিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতা-গঠনকার্য"[২]। মনে পড়ে, একেবারে প্রথম যৌবনে এই রবীন্দ্রনাথই মধুসূদনের বিরুদ্ধে 'মহৎ চরিত্র বিনাশে'র অভিযোগ এনেছিলেন[৩]। রামমোহনের বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ আনা সম্ভব। তিনিও এদেশে "সর্বব্যাপক"[৪] কৃষ্ণ ও সকল

১ 'লোকশিক্ষা,' তত্রৈব, ৩৭৭

২ 'বঙ্কিমচন্দ্র', রবীন্দ্ররচনাবলী, বি° ভা°, ৯ম খ° পৃ° ৪০৫

৩ "সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্যকিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রারা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে।......কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন; I despise Ram and his rabble। সেটা বড়ো যশের কথা নহে"। 'মেঘনাদবধ কাব্য,' সমালোচনা, অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বি° ভা°, পৃ°৭৭-৮০

৪ "বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে

বাঙালীর পরম "আপনার"[১] শ্রীচৈতন্যকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীকে আবার তার কৃষ্ণচরিত্র চৈতন্যচরিত ফিরিয়ে দিয়েছেন। মুহূর্তে প্রশ্ন উঠবে, সেইসঙ্গে ভাগবতীয় গোপীপ্রেমকেও কি তিনি নবমূল্যে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন? প্রশ্নটির উত্তরদানে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসাধনার গভীরে একবার প্রবেশ করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসাধনাকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্ব শিল্পীর ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্ব সাধকের ইতিবৃত্ত। ১৮৬৫ সনে দুর্গেশনন্দিনীর সহযাত্রায় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। দশ বৎসরের একটানা ইতিহাসের পর কমলাকান্তের পত্রাংশের শেষাংশ থেকেই শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত রূপাবয়বের মধ্যে আর এক নূতন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম প্রত্যক্ষ করি। বস্তুত কমলাকান্তেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসন্ধির সংকট তীব্র। 'বুড়া বয়সের কথা'য় তারই ইংগিত: "আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে?"[২] আবার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ তথা ভাগবত-বিখ্যাত কালিয়দমনের রূপকার্থ বিশ্লেষণে লেখক যেন তাঁর আত্মমানসের এই সংকট মোচনেরই অন্তরঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন, "এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ-বিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের

কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ"! বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখি পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।" কৃষ্ণচরিত্র, ১ম খং, উপক্রমণিকা, সা° স°, পৃ° ৪০৭

১ "আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।" 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্র-রচনাবলী, বি° ভা°, ২য় খণ্ড, পৃ° ৫২৮

২ 'বুড়া বয়সের কথা', সা° স°, পৃ° ১০০

ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপা পরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিবিকাশ-পূর্ব্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?"[১]

"কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর" কৃষ্ণমূর্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনগ্রন্থের এক অলিখিতপূর্ব অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বঙ্কিম-মানসের এই উৎক্রান্তি শুধু অনায়াস আত্মসমর্পণেই সম্ভব হয়নি, এর অন্তরালে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সারাজীবনের অবিরাম বিক্ষত অন্বেষণ। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে 'গুরু'-ছদ্মবেশী বঙ্কিমচন্দ্র তারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দান করে বলেছেন: " "এ জীবন লইয়া কি কবিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।...জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের জন্য এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব।" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ।"[২]

বঙ্কিম-জীবনবেদের সারাৎসার এই 'অনুশীলন ধর্ম'। আবার শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্যে যে-অনুশীলন ধর্ম তত্ত্বরূপে প্রতিফলিত, কৃষ্ণচরিত্রে তাই দেহ-বিশিষ্ট[৩]। স্মরণীয়, এই অনুশীলন ধর্মেরই তত্ত্বালোকে বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলা

---

১ 'কৃষ্ণচরিত্র', ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত স°, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ° ৪৫২

২ 'ঈশ্বরে ভক্তি', ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স° পৃ° ৬২২

৩ "...'অনুশীলন ধর্ম্মে' যাহা তত্ত্বমাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে

ও গোপীপ্রেম ব্যাখ্যা করে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে ভাগবতচর্চার ইতিহাসে এক নব দিগন্ত উদঘাটিত করেছিলেন। তাঁর মতে, "তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা"। সেই তত্ত্ব আর কিছু নয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই বিকাশ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য ছিল, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীদের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গও কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি হলো ঈশ্বরে পরানুরক্তি। এই পরানুরক্তি বা অনুরাগ নানা কারণে জন্মাতে পারে, কিন্তু "সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ" তাই "মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্"। আর সেই সৌন্দর্যের মোহঘটিত সর্বাপেক্ষা বলবান্ অনুরাগই রাসে প্রকটিত, কেননা "অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রী জাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা।" স্মরণ করা যায়, রাসলীলার 'তত্ত্বাত্মক রূপক" বিশ্লেষণে তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন, "মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"[১] বলা বাহুল্য, এ-তত্ত্ব তিলমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্মতি লাভ করবে না। এমন কি, রাসলীলায় বঙ্কিমচন্দ্র যে-মূর্তিমান অনন্ত-সৌন্দর্য ও অনন্ত-সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তির বিশুদ্ধ বিকাশ লক্ষ্য করেছেন, তা অদীক্ষিত সম্প্রদায়েও রূপকপ্রিয় আধুনিক মনের একান্তই কাব্যরসবিলাস ছাড়া আর কিছু বলে পরিগণিত হবে না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করার বিষয় এই, রাসলীলা যখন রামমোহনের জ্ঞানবিশ্বাসমতে "সর্বলোকবিরুদ্ধ পরদারাভিমর্ষণ," বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তখন তা "ঈশ্বরোপাসনা"। বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা ঈশ্বরোপাসনা মাত্র"[২]। অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ খাঁ অনুশীলন-ধর্মের আরোপ যাই করুন না কেন,

---

উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ।" 'কৃষ্ণচরিত্র', ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত 'প্রথম ভাগ'-এর বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য

১ 'ধর্মতত্ত্ব', ২৭ শ অধ্যায় ২ তত্রৈব

বঙ্কিমচন্দ্র রাসলীলাকে 'উপাসনা'ই জ্ঞান করেছেন, 'সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ' নয়। এইখানেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মানসে গোপীপ্রেমের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়েছে। অবশ্য এটি পুনরুদ্ধারের একেবারেই প্রথম পর্ব বলে, তাতে সামাজিক মানুষের দ্বিধা-দৌর্বল্যও কম নেই। কৃষ্ণজীবনে গোপীপর্বকে নিয়ে বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের সংকটের প্রশ্নটিও উত্থাপন না করলে সত্যরক্ষা হবে না। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন বটে, কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীর সম্বন্ধ "অতিশয় গুরুতর" তত্ত্ব, কিন্তু সে-তত্ত্বের গভীরে প্রবেশে সর্বদা যে সমান সাহসী হয়েছেন, এমন নয়। তাই দেখি, মহাভারতের সভাপর্বে দ্রৌপদী-কৃত কৃষ্ণস্তবের কোনো কোনো পাঠে যে "গোপীজনপ্রিয়" কথাটি আছে, তার ব্যাখ্যায় তাঁকে বলতে হয়, "গোপ থাকলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপগোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ...অতএব এই "গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।"[১] অথবা রাসবর্ণনায় 'রতি' শব্দটিকে সর্বদাই ক্রীড়ার্থে ব্যবহার করতে হয়, এবং বলতে হয় বিষ্ণুপুরাণেই প্রথম রাসলীলার যে-উল্লেখ পাই, তা "নির্দোষ ক্রীড়া", যুবক-যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় "ধর্মতঃ" কোনো দোষ ঘটে না, সেই সঙ্গে এও জানাতে হয়, "ভাগবতোক্ত রাস বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দ্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জ্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।"[২] বলা বাহুল্য, ভাগবতীয় রাসে অনঙ্গদীপনের এই বঙ্কিম-উত্থাপিত প্রসঙ্গ টীকাকার শ্রীধরস্বামীর "কন্দর্পবিজয়' কাব্যরূপে ভাগবত-বর্ণনার একেবারেই বিপরীতকোটিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়, অন্যত্র। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত রাস কি শুধুই তথাকথিত "নির্দোষ" নৃত্যক্রীড়া? বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদে বিষ্ণুপুরাণের প্রাসঙ্গিক তিনটি শ্লোক স্মরণ করা যায়: "এক গোপী নর্ত্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপন করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তুতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয়

১ 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স°, পৃ° ৪৫৪ ২ তত্রৈব, পৃ° ৪৬৪

কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল।"[১] এ কি যুবক-যুবতীর মণ্ডলাকারে "নির্দোষ" নৃত্যক্রীড়া মাত্র? বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই"? আসলে সমাজশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে দেহগেহবিস্মারী সমাজ-শৃঙ্খলছিন্নকারী নিরুপাধি গোপীপ্রেমকে স্বরূপে অবিকৃত রেখে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই কোথাও রূপকের অন্তরাল রচনা করতে হয়েছে, কোথাও তথ্যকে সরলীকৃত করতে হয়েছে; আবার যা তাঁর আরোপিত-তত্ত্বের বিরুদ্ধ তাকে সরাসরি অস্বীকারও করতে হয়েছে কোনো না কোনো ছলে। কিন্তু সমাজশিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র যাই বলুন, শিল্পী তথা রসিক-ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুভব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই ভাগবতের দশম স্কন্ধে একবিংশতি অধ্যায়ে প্রকাশিত গোপীদের পূর্বরাগ প্রসঙ্গে শেষোক্ত বঙ্কিম-চন্দ্রই বলতে পারেন, "পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।"[২] বস্ত্রহরণের তুল্য "আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ" বিষয়েরও উল্লেখে বলতে পারেন তিনি: "অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা দোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় ও অতিশয় বিশুদ্ধ।"[৩] অভিপ্রায় আর কিছু নয়, "গোপীগণের কৃষ্ণে সর্বার্পণ": "স্ত্রীলোক, যখন সকল পবিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ...এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ!"[৪] সমাজ শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর রসিক-ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্রের জয় এইভাবেই সুনিশ্চিত হয়েছে। আর কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধনে গোপীপ্রেমের মূল্যও হয়েছে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগবতচর্চারও এটিই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সুফল বলে আমাদের বিশ্বাস। নতুবা ভাগবতে কৃষ্ণের অন্যান্য ব্রজলীলা

---

১ "পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজনিপুণামধুসূদনম্॥
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাংগতৌ॥" বিষ্ণু° ৫।১৩।৫২—৫৪

২ 'কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স°, পৃ° ৪৬১

৩ তত্রৈব, পৃ° ৪৬২ ৪ তত্রৈব, পৃ° ৪৬৩

সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মূলত লঘুচপল দ্রুত মন্তব্যগুলিতে আমাদের বিশেষ আস্থা নেই।

আমরা জানি, কৃষ্ণচরিত্রের সর্বাদি 'ঐতিহাসিক সমালোচক' হিসাবে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির তিনটি প্রধান সূত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সারস্বত-অভিজ্ঞার অঙ্গীভূত করেছেন:

"১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"[১]

ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের বিভিন্ন ব্রজলীলাও এই তিনটি সূত্রবলে পরীক্ষিত। তারই কিছু কিছু উদাহরণ 'কৃষ্ণচরিত্র' থেকে সংকলিত হলো:

১ পূতনাবধ: "আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।"

২ শকটভঙ্গ: "ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কার মাত্র হইতে পারে।"

৩ মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্তি-ধারণ—"ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।"

৪ তৃণাবর্ত: "চক্রবায়ু মাত্র।"

৫ মৃত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বরূপদর্শন: "...কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।"

৬ ননীচুরি: "কথাটাই অমূলক।"

৭ যমলার্জ্জুন ভঙ্গ: "অর্জ্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। ...যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙিয়া যাইতে পারে।"

৮ দামোদরলীলা বা রজ্জুবন্ধন: "দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। ...কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। ...গোরুর

১ 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স°, পৃ° ৪৩৬

দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?"[১]

৯ বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুর বধ : "ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমনকি হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।"[২]

১০ ব্রহ্মমোহনলীলার তাৎপর্য : "ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম।"

১১ অনন্তর কালিয়দমনলীলা : "কেবল উপন্যাস নহে - রূপক। রূপকও অতি মনোহর।" এই "মনোহর রূপকে"র সঙ্গে বঙ্কিম-মানসের অন্তরঙ্গ যোগটিকে আমরা পূর্বেই পরিস্ফুট করে তুলেছি। সেখানে দেখেছি, কালিন্দী হয়েছে 'কালস্রোতস্বতী', তার 'ভয়ানকাবর্ত' হয়েছে কালস্রোতেরই দুঃসময়ের বা বিপৎকালেব আবর্ত. কালিয় 'অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু', তার সহস্র ফণা 'অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ', আর কৃষ্ণ—অমঙ্গল-পদদলনকারী 'জগদীশ্বর'।

১২ গোবর্ধনধারণ তথা ইন্দ্রপূজার তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য : "এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে. তাহাব পর রক্‌ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, বিধাতা; তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না।"[৩]

বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত লীলাপর্যায়ের আলোচনায় স্থানে স্থানে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার মূল্যবান সূত্রনির্দেশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই দ্রুত মন্তব্যের অবশ্যম্ভাবী বিপদসম্ভাবনাও রয়েই গেছে। প্রসঙ্গত একটি মাত্র উদাহরণযোগে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হতে পারে। ইতিহাসাদির পৌর্বাপর্য আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যথাক্রমে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতের পুতনা-বৃত্তান্তের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে, "মহাভারতে পূতনা শকুনি", বিষ্ণুপুরাণেও "পূতনা শকুনি", আবার হরিবংশে "পূতনা মানবী বটে," কিন্তু "সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া

১ তত্রৈব, ৪৪৯-৫০

২ 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, সা° স°., পৃ° ৪৫১

৩ তত্রৈব, পৃ° ৪৫৩

ব্রজে আসিল”। পরিশেষে ভাগবতে “পূতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী।” বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত এই পৌর্বাপর্য একমাত্র সূক্ষ্ম ইতিহাসচেতনারই ফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু মহাভারতের পূতনা-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি যে আমাদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারেননি, এই সঙ্গে সে-কথাও বলা দরকার। মহাভারতের সভাপর্বে চত্বারিংশ অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোকে শিশুপাল কৃষ্ণের পূতনাবধের উল্লেখ করে ধিক্কার দিচ্ছেন: “গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নশ্চ সন্ ভীষ্ম তদ্বাক্যাদ্‌যদি পূজ্যতে। এবম্ভূতশ্চ যো ভীষ্ম কথং সংস্তবমর্হতি”—হে ভীষ্ম, আমার ধারণা তোমার উপদেশেই পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের পূজা করছে। কিন্তু যে-কৃষ্ণ গো-হত্যা ও স্ত্রী-বধ করেছে সে কি সাধুসংসর্গ লাভের যোগ্য?—বলা বাহুল্য, পূতনা এখানে শকুনি মাত্র নয়। উপরন্তু বৎসাসুর প্রসঙ্গ মহাভারতে নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। অতএব ভাগবত-ব্যাখ্যায় তাঁর অস্থিরতা, কটুকাটব্যজনিত চপলতা বা যুক্তির যথাযোগ্যতার অভাব ঘটেছে, আমাদের এরূপ মন্তব্যের কারণ আর অস্পষ্ট থাকছে না। বস্তুত আমাদের বিশ্বাস, ভাগবতব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৃষ্ণবাল্যলীলা সংক্রান্ত অধিকাংশ ঘটনা বর্জনের প্রবণতার মূলে আছে বঙ্কিমযুগের পুরাণগ্রহণ-পদ্ধতিরই বৈশিষ্ট্য। তারই পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের ‘পঞ্চভূত’ গ্রন্থে সমীরের জবানবন্দীতে:

“সমীর কহিল—ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্বে কৃষ্ণকে নির্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা-কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে, দেবতার কোনো কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন; তিনি পূজাবিতরণের পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।”[১]

“দেবতার কোনো কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়”—সমীরের, নামান্তরে স্বয়ং পঞ্চভূত-গ্রন্থপ্রণেতার এ-উক্তি ভাগবত-বিখ্যাত

১ ‘সৌন্দর্য সম্বন্ধে অসন্তোষ’, পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২য় খ°, বি° ভা°, ৬৩১ পৃ°

শুকবচনকেই স্মরণ করায়। ভাগবতোক্ত রাসলীলা বর্ণনার পরে রাজা পরীক্ষিতের সামাজিক প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলেছিলেন :

"ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥"[১]

অর্থাৎ, ঈশ্বরগণের তথা তেজস্বীদের দুঃসাহসিক ধর্মব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু সর্বভুক্ হয়েও অগ্নি যেমন অপবিত্র হয় না, ধর্মব্যতিক্রমে এঁদেরও তেমনি দোষস্পর্শ ঘটে না।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, ভারতবর্ষের পুরাণিকযুগের সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশের পুরাণ-নবীকরণ যুগের পার্থক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এ-অঙ্গুলিনির্দেশ অভ্রান্ত। প্রাচীন পুরাণিকযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল অসংশয়ী দেবমহিমাবাদে। দেবতার অতিলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী সেযুগের শুকদেবের তাই ধ্রুবপদই ছিল "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।" আর আধুনিক পুরাণ-নবীকরণ যুগের বৈশিষ্ট্য মানববাদে—মানবীয় চরিত্রনীতি ও সমাজতত্ত্বের আলোকে দেবতার পুনর্বিচারে। এক্ষেত্রে মানবীয় জ্ঞানের দ্বারা দৈবমহিমা বহুলাংশে খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বভাবতই দেবতা এখন আর সর্বসন্দেহাতীত লোকে নিজস্ব মহিমার উচ্চচূড়ায় বসে নিত্যপূজা পান না, মানুষের নবজাগ্রত তর্কবুদ্ধির কাছে তাঁকেও ক্রমাগতই অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বুদ্ধিবাদের অগ্নিপরীক্ষায় রামমোহনের হস্তে ভাগবত এবং কৃষ্ণ-গোপী কিভাবে অনুত্তীর্ণ প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, সে তো আমরা পূর্বেই দেখেছি, এখন দেখলাম সে অগ্নিপরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের নানা অনৈসর্গিক ও লোকবিরুদ্ধ দিক নানাভাবে বর্জন ও খণ্ডন করার চেষ্টা করে এ-চরিত্রকেই "সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল"[২] "মহামহিমায়"[৩] অতুলনীয় বলে বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণ-জীবনের অপরিহার্য অধ্যায় গোপীপ্রেমও বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারকঠিন অগ্নিপরীক্ষায় যে অংশত দহনোত্তীর্ণ তাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। কৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণতা সাধন এইভাবেই সর্বাংশে সার্থক। আর এখানেই, সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তি ও মহিমা পূর্বসূরী রামমোহনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই সর্বোচ্চ শ্রেয়োবোধ ছিল চিরন্তন মানবধর্মে উদ্দীপিত—কেবল হিন্দুশাস্ত্রবিধিতে সীমায়িত নয়। এই সাধারণ ধর্মেই

---

১ ভাঃ ১০।৩৩।৯৯ ২ 'কৃষ্ণচরিত্র', পৃঃ ৪০৮ ৩ তত্রৈব ৫৮৩

বেদান্ত-প্রতিপাদ্যের বিশ্বজনীন ধ্যানলোক কৃষ্ণচরিত্রে হয়ে উঠেছে সর্বজনীন জ্ঞান, কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শলোক।

উল্লেখনীয়, এই বিশ্বজনীন ধ্যানলোক এবং জ্ঞান কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার আদর্শলোকের মাঝখানেই নিত্যকালের ভক্তের এক বিশ্বাসলোক রচনাই কেশবচন্দ্রের অবিস্মরণীয় অবদান। বাঙ্‌লাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাগবতচর্চার ইতিহাসে যুক্তিবুদ্ধি বিচারবিতর্কের রাজ্যে কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎ হৃদয়ধর্মা, ভক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব। ভাগবতের কাছে শিক্ষার্থী-রূপে ভক্তিশিক্ষা গ্রহণে কিংবা কৃষ্ণ-গোপী-চৈতন্যবন্দনায় তাঁকে কোথাও যুক্তিবুদ্ধির পদে নতি স্বীকার করতে হয়নি অথবা বিচারবিতর্কের দ্বারা তিল-মাত্র বর্জনও করতে হয়নি, কোনো স্বরচিত তত্ত্ব-আরোপের মধ্য দিয়ে সত্যকে সর্বসমাজ-মান্য করার চেষ্টাও করতে হয়নি কোথাও। তিনি পুরাণের ভক্তি-বিশ্বাসের সবকিছুই গ্রহণ করেছেন, সবকিছুই স্বীকার করেছেন।

পরমাশ্চর্যের বিষয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্মের পথিকৃৎ প্রবক্তা মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তিনজনই ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। রাধানগরের বিখ্যাত রায় পরিবারের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথের কুলদেবতা ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দন। আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল এবং পিতা প্যারীচরণ উভয়েই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের ত্রয়ী পথিকৃৎ প্রবক্তাই কুলধর্ম বৈষ্ণবধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। 'গোস্বামীর সহিত বিচারে' প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন কিভাবে তাঁর কুলধর্মকে চূর্ণবিচূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-কেন্দ্রিক বাঙ্‌লার বৈষ্ণবধর্মকে বিপুল উৎসাহে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন, সে তো আমরা পূর্বেই দেখেছি। আমরা এও জানি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিক জ্ঞানে কৌলিকধর্ম বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পূর্বরাত্রে মাতৃদেবীকে স্বপ্নে দর্শন করে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, "কুলং পবিত্রং জননী চ কৃতার্থা"। অর্থাৎ, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি রামমোহনকে যদি সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু বলা চলে, তবে দেবেন্দ্রনাথকে বলতে হবে উপেক্ষাসহিত উদাসীন। কেশবচন্দ্রও ১৮৫৭ সনে গোপনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার পর ১৮৫৮ সনে জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহনের নিকট ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের নির্দিষ্ট দিনে সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থা

অনুসারে দেবেন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষাসভা শেষ হলে বহুরাত্রে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের ভক্তিসাধনার ইতিহাস বিচারে এ-ঘটনার তাৎপর্য অপরিসীম। দীক্ষিত বৈষ্ণবের মতো তাঁর জীবনের অন্তর্লীন ভক্তিধর্ম যে কোনোদিনই কোনো সাম্প্রদায়িক আরোপিত নিয়মনিষ্ঠাকে স্বীকার করেনি, এ ঘটনা তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। কিন্তু তথাপি বাল্যের মধুর বৈষ্ণবীয় ভাবসংস্কার তাঁর মধ্যে যেভাবে জয়ী হয়েছে, কোনো দীক্ষিত বৈষ্ণবের মধ্যেও তা তেমনভাবে জয়ী হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার। ধর্মজগতে রামমোহনের পৌত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পুত্র হয়েও কেশবচন্দ্র মনেপ্রাণে স্বভাব-বৈষ্ণব, স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভক্ত, সমুৎসুক গৌরাঙ্গপরায়ণ। 'নববিধানে'র প্রবর্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিদেবের দক্ষিণহস্ত এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা হয়েও এইভাবেই মত ও পথে পিতা-পিতামহ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। 'মহাত্মা রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে তিনি ব্রাহ্মধর্মের এই দুই মহান্ পথপ্রদর্শকের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেও গৌরাঙ্গাদি সাধু-স্বজনের হননকারীরূপে তাঁদের প্রত্যক্ষত দায়ী করেছেন। পূর্বসূরীর সঙ্গে উত্তরসূরীর এই মত-বৈষম্য পথ-পার্থক্যের বিষয়টি উক্ত প্রবন্ধে সবিনয়ে স্বীকার করে ১৮৮১ সনে পয়লা জানুয়ারিতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে' কেশবচন্দ্র বলছেন :

"বিধানদ্বীপে আমরা বাস করি, আমাদিগের সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। সকলেই প্রায় সাধুদিগের বিচার করে। এক ধর্ম্মের লোক অপর ধর্ম্মের সাধুকে বিচার করে, নিন্দা করে, কটু কথা বলে, বিষ খাওয়াইয়া কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ড করে।···

"ধর্ম্মে সুপণ্ডিত বিচারপতির আসনে বসিয়া ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক প্রভৃতিকে যৎপরোনাস্তি কঠোর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করে।··· সাবধান, রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর।··· আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রতি।"[১]

লক্ষণীয়, "সাবধান, রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর।···আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে"। এই মহাজন-বিচার থেকেই নিরস্ত হয়ে ভক্তচরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একই বৎসর নয়ই জানুয়ারিতে কেশবচন্দ্র বেদনার্ত কণ্ঠে বলছেন

১ 'মাঘোৎসব', পৃ° ১-২,

"ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বী ব্রাহ্ম বলিতেছে, জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন? হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা ও নীচ ভাবকে স্থান দিও না।"[১]

'ধর্মপিতা' এবং 'ধর্মপিতামহে'র সঙ্গে এই মতানৈক্য প্রদর্শন করে তথা 'নববিধানে'র মতাদর্শ পরিস্ফুট করে ইতোমধ্যে দোসরা জানুয়ারিতে প্রদত্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

"পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাই নববিধান।... নববিধান সমুদায় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন।"[২]

স্মরণীয়, নববিধান পৃথিবীর "সমুদয় ধর্মের সার"সংগ্রহে বৈষ্ণবীয় ভক্তি-ধর্মকে, "সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত" করতে গিয়ে ভাগবত-শাস্ত্রকে এবং "সমুদয় মহাপুরুষ-ভক্তযোগীদের" এক আসনে সাদরে বসাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে পরমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছে। বস্তুত, সন্ধিলগ্নের বাউল-কবি লালন ফকির এবং মধ্য-উনিশ শতকের সাধক রামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের মহৎ আদর্শের পাশে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'ও আর এক উদার মতাদর্শের দৃষ্টান্ত। এই সর্বধর্মসমন্বয়-মূলক উদার মতাদর্শে ভাগবত ও ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মূল্যায়ন তাই আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করবে।

কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয় 'শ্লোক-সংগ্রহ' বা পৃথিবীর নানা ধর্মশাস্ত্র থেকে সংগৃহীত শ্লোকের সংকলনগ্রন্থ। ১৮৬৬-১৯৫৬ সন পর্যন্ত এ-গ্রন্থের মোট আটটি সংস্করণ সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় কেশবচন্দ্রের জীবিতকালেই প্রকাশিত। তৃতীয় পরিবর্ধিততর সংস্করণটি ১৮৮৬ সনে কেশবচন্দ্রের তিরোধানের মাত্র দু'বৎসর পরে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্করণগুলির ক্রমশ স্ফীতাকার কৌতূহলের

---

১ 'মহাজনগণ,' মাঘোৎসব, পৃ° ৩১-৩২ ২ 'নববিধান,' মাঘোৎসব, পৃ° ৭-৮

বিষয়। এটি কেশব-মানসে নব নব উপলব্ধিরই সূচক। 'শ্লোকসংগ্রহে' সংগৃহীত শ্লোকাবলীর মধ্যে হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থরূপে বেদ-উপনিষৎ, মনুসংহিতা-যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত-ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-ভাগবত-পুরাণ এবং মহানির্বাণতন্ত্রকে স্বীকার করা হয়েছে। এর মধ্যে আবার ভাগবতের স্থান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। 'শ্লোক-সংগ্রহে'র দুটি তাৎপর্য বাক্যের প্রথমটিই শ্রীমদ্ভাগবত থকে সযত্নে আহরিত: ভৃঙ্গ যেমন সকল পুষ্প থেকে সার গ্রহণ করে, ধীর ব্যক্তিও তেমনি ক্ষুদ্র-মহৎ সব শাস্ত্র থেকেই সার-সংগ্রহ করবেন[১]। কিন্তু '-হোওম'। শ্লোক সংগ্রহে সংগৃহীত কয়েকটি ভাগবতীয় শ্লোক কেশবচন্দ্রের ধর্মচেতনায় কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ভাষান্তরে কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে ভাগবতীয় যে-শ্লোকগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে শ্লোক-সংগ্রহে সেগুলিই যে সাদরে গৃহীত, এই আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সে-আলোচনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তামূলক কিছু কিছু ভাষণ তাঁর মৌলিক রচনা হিসাবেই অনুধাবনীয়।

'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ,' 'জীবনবেদ' এবং 'মাঘোৎসব'—কেশবচন্দ্রের সুবিপুল মৌলিক রচনার মধ্যে এই তিনখানি বাঙ্‌লা গ্রন্থ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মসাধনার এরাই অন্তরঙ্গ ইতিহাস, তাঁর জীবনচর্যার এরাই 'ত্রিপিটক'। এর মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ১৮৭৬-৮০ সনের মধ্যে প্রদত্ত যোগ ও ভক্তি বিষয়ক ধারাবাহিক উপদেশাবলীর অনুলিখিত সংকলন, দ্বিতীয়োক্তটি ১৮৮০-৮২ সনে বিবৃত আত্মসমীক্ষা এবং শেষোক্তটি ১৮৬৯ জানুয়ারী থেকে ১৮৮৪ জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন মাঘোৎসবে পরিবেষিত আধ্যাত্মিক অনুভূতি-মূলক বক্তৃতার অনুলিখন। বস্তুত, ১৮৭৬ সনে 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে'ই যোগ-ভক্তির বিধিপূর্বক সাধন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রচলিত হলো। ব্রহ্মে ভক্তি অভিনব ব্যাপার, সন্দেহ নেই। রামমোহনের ব্রহ্ম ছিলেন জ্ঞানে অধিরূঢ়, দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম জ্ঞানসহিত হৃদয়ানুভূতিতে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের উত্তরসাধক কেশবচন্দ্র আবার ব্রহ্ম-উপাসনার এক নূতন পথ প্রস্তুত করলেন। উপনিষদের জ্ঞান ও ভগবদ্গীতার যোগভক্তিকে সম্মিলিত করে আবির্ভূত হলো ব্রহ্মগীতোপনিষৎ। কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদে'র ভাষায়: "জীবনযন্ত্রে এক সুর বাজিতে লাগিল। এইটি ভক্তির সুর, যোগের স্বর। দুই এক হইলে

---

১ "অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥" ভা° ১১।৮।১০

আনন্দময় ব্রহ্মকে পাওয়া যায়”[১]। এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে বিধিপূর্বক যোগভক্তি শিক্ষাদানের প্রয়োজনও অনুভূত হলো। ব্রাহ্মসমাজে তখন কেশব-অনুসারী যে-সাধকেরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অঘোরনাথ গুপ্তকে যোগশিক্ষার্থী-রূপে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ভক্তিশিক্ষার্থী-রূপে, গৌরগোবিন্দ রায়কে জ্ঞান-শিক্ষার্থীরূপে, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে ভক্তিশিক্ষার্থীরই অনুগামী-রূপে এবং পরে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও উমানাথ গুপ্তকে সেবাশিক্ষার্থী-রূপে নির্বাচিত করা হয়। কেশবচন্দ্র এঁদের ভক্তি, যোগ, সেবার শিক্ষা দিতেন নিয়মিতভাবে। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে তিন ঘটিকায় উপদেশ আরম্ভ হতো, উপদেশের পর প্রার্থনা, শেষে সংকীর্তন। কেশবচন্দ্রের সমূহ উপদেশই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু ভাগবতীয় ভক্তিবাদই আমাদের আলোচ্য সেইজন্য ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশাবলীই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য।

‘ব্রহ্মগীতোপনিষদে’ দেখি, ভক্তিশিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশিত “সংযমবিধির’ মধ্যে “নামশ্রবণ” ‘নামগান’ “ভক্তসেবা” “কীর্তন” প্রভৃতিই প্রধান। ভক্তির সাধনাঙ্গ হিসাবে আবার পাই “সাধুসঙ্গ” “চিত্তশুদ্ধি”। এগুলি সবই ভাগবত থেকে আহরিত। বিশেষত উল্লেখযোগ্য ‘সাধুসঙ্গ’। ভাগবতে পুনঃপুন সাধুসঙ্গের গুণগান করা হয়েছে। এর মধ্যে কেশবচন্দ্রের ‘শ্লোক-সংগ্রহে’ উৎকলিত প্রসিদ্ধ ভাগবত-সূক্তটিই তো স্মরণ করা যায়: যাঁরা ভক্তসঙ্গে পরমাত্মার কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁরা নিজেদের বিষয়-কলুষিত চিত্তকেই পবিত্র করে ভগবদ্-চরণারবিন্দ লাভ করেন।[২] ‘ভক্তি কি’—এই মূল প্রশ্নের উত্তরে কেশবচন্দ্রের ব্যাখ্যাও ভাগবত-অনভিলষিত [illegible]: “ভক্তি ভাব-বিশেষ”। উল্লেখযোগ্য, ভাগবতেও ভক্তি ‘ভাব’ রূপে কোথাও কোথাও চিহ্নিত। এ-পুরাণে ভক্তিযোগ তাই ভাবযোগ: “এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে সর্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্”[৩]। অবশ্য ভক্তির স্বরূপের সঙ্গে সত্য-শিব-সুন্দরের সম্বন্ধ স্থাপন একান্তভাবেই কেশবচন্দ্রের নিজস্ব উপলব্ধিগত। ভক্তিকে “অহৈতুকী” রূপে ব্যাখ্যা করে যদিও তিনি ভাগবত-সিদ্ধান্তেই পুনরাবর্তিত হয়েছেন। আবার কেশবচন্দ্রের অভিমত, যোগীর

---

১ ‘জীবনবেদ,’ ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, পৃ° ৮৪

২ “পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥” ভা° ২।২,২১

৩ ভা° ৬,৩।২৬

বৈরাগ্য এবং ভক্তের প্রেম একই বস্তু। তাঁর সমর্থনে উপস্থিত আছে 'শ্লোক-সংগ্রহে' সংগৃহীত ভাগবত-উক্তি: অতএব গাঢ় ভক্তিযোগে ও বৈরাগ্যসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করবে।[১] বস্তুত 'ভক্তিযোগ' শব্দটির জন্যও কেশবচন্দ্র যুগপৎ ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবতের কাছে সমভাবে ঋণী। শেষোক্ত ভক্তিশাস্ত্র থেকে সংগৃহীত 'শ্লোক-সংগ্রহে'র প্রাসঙ্গিক শ্লোকটিই স্মরণ করা যায়: পরমেশ্বরের নাম-গ্রহণাদির দ্বারা তাঁতে ভক্তিযোগই এ-সংসারে মনুষ্যদের একমাত্র পরমধর্ম।[২] "ভক্তিযোগো ভগবতি"রই সাধনাঙ্গ "তন্নামগ্রহণ" কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মগীতোপনিষদের মূলাশ্রয়। 'শ্লোক-সংগ্রহে' সংগৃহীত ভাগবতের উক্তিই কেশব-চন্দ্রের প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে: যাতে উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তাই মনোরম, রুচির, নিত্যনূতন, নিত্য মনোমহোৎসব তথা মনুষ্যের শোকার্ণবশোষক।[৩]

আমরা জানি, চৈতন্য-দর্শনেরও এই ছিল ধ্রুবপদ। "নামে রুচি জীবে দয়া ভক্তি ভগবানে"র মধ্যে "নামে রুচি"কেই তিনি "রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্" বা শাশ্বত মনোমহোৎসব রূপে গ্রহণ করে-ছিলেন। "চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং"—শিক্ষাষ্টকের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকেই তাঁর জীবনব্যাপী নামসাধনার সংহিতা সংহত। ঘটনা-বিবরণে প্রকাশ কেশবচন্দ্রকে শান্তিপুর-নদীয়াবাসিগণ এই চৈতন্য-ভক্তিবাদ পুনরুজ্জীবনেরই প্রধান প্রবর্তকরূপে অভিনন্দিত করেছিলেন ১৮৬৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বাঙ্‌লার বৈষ্ণবীয় ধর্মসংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র শান্তিপুর দর্শনকালে ভক্তি ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধীয় তাঁর একটি আলোচনার শেষে।[৪] বস্তুত, ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের উত্তরাধিকার লাভ করে আধুনিক

১ "অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্ বশম্॥" ভা' ৩।২৭।৫

২ "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" ভা° ৬।৩।-২

৩ "তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥" ভা° ১২।১২।৪৯

৪ "Keshav here delivered a lecture on Bhakti and Shri Chaitanya which so impressed the leaders of that faith that he was hailed as the chief

কালে বাঙলাদেশে কেশবচন্দ্রই নামকীর্তন ও নামশ্রবণের নব-প্রবর্তক। এক্ষেত্রে তাঁর অধ্যাত্মজীবনে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবও অবশ্য একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। চৈতন্যদেবের মতো রামকৃষ্ণদেবেরও নির্দেশ ছিল, "কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তি যোগই যুগধর্ম"।[২] ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের অন্তঃপ্রেরণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা যুক্ত হয়ে কেশবচন্দ্রের "নামগুণগান ও প্রার্থনা" শতধারে উৎসারিত, সর্ব-পরিপ্লাবী। প্রকৃত প্রস্তাবে হরিনাম-সংকীর্তনযজ্ঞ পুনরুজ্জাবনের তিনি যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যেই পৌঁছতে পেরেছিলেন, তারই সাক্ষ্য উপস্থিত আছে তাঁর 'জয়লাভ' অধ্যায়ে :

"কে জানিত, দেশের লোকে ইংরাজী শিখিয়া, মৃদঙ্গ বাজাইয়া, ছোট লোকের মতন কীর্তন করিয়া বেড়াইবে? ·· হরিনাম কি প্রবলই হইয়াছে! পঁচিশ বৎসরে দেশের মুখ ভিন্ন লক্ষণ ধারণ করিয়াছে। ···হরি ধন্য, হরি ধন্য, হরি ধন্য। আমার কেবলই লাভ হইতেছে। ···এই যে দেখিতেছি, শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের দলে আসিয়া নাচিতেছেন। সমস্তই চক্ষে দেখিয়াছি; অবিশ্বাস করি কিরূপে? এ ভক্ত হারিল না, কিছুতেই হারিল না; কেবলই জয়লাভ করিল; আর কি সংবাদ চাও? জয়ী হইয়া হরিনামের নিশান পথে পথে উড়াইয়াছি"[৩] ॥

নিঃসন্দেহে এটি মহাকালের একটি বিচিত্র কৌতুক বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রহ্ম-প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রবক্তা রামমোহন যখন কালের গতিতেই ভাগবত, ভক্তিধর্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 'সদ্রূপ পরব্রহ্মে'র উপাসনাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্ম-সমাজেরই অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র যুগ-প্রয়োজনে সেই উপেক্ষিত ভাগবত-ভক্তিধর্ম-শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্যকেই আবার সাদরে বঙ্গ-ধর্মসংস্কৃতির প্রাঙ্গনে বরণ করে নিলেন। শুধু শ্লোক-সংগ্রহের সংগ্রহশালায় সযত্নে স্থান দিয়েই নয়, তাঁর নাম-ভক্তি-আন্দোলনে ভাগবত-বাণীকে আশ্রয় করে তিনি এ-পুরাণের

---

agency for the revival of bhakti cult in Bengal." 'Life and works of Brahmananda Keshav'; Dr. Premsundar Bose, p. 141.

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, ৯ম পরিচ্ছেদ, পৃ' ৫৯-৬০

৩ 'জয়লাভ', জীবনবেদ, পৃ' ১০১

মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন। ভাগবতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিও 'সেবকের নিবেদন' 'একাধারে নর-নারী প্রকৃতি' প্রভৃতি বাঙলা প্রবন্ধে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার ইতিহাস প্রণয়নে কেশবচন্দ্রকে কেন যে আমরা সবচেয়ে কৃষ্ণ-ভাবিত ব্যক্তিত্ব বলেছি, উক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠে তা যে-কেউ অনুধাবন করতে পারবেন। উল্লেখযোগ্য, কেশবচন্দ্রেরই প্রেরণায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম' গ্রন্থটি রচনা করেন। কৃষ্ণের জীবনের যে-বৃন্দাবনপর্ব রামমোহনের অভিমত অনুসারে 'সর্বলোকবিরুদ্ধ', এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতেও কিছুটা 'অনৈসর্গিক', 'অমূলক উপন্যাস', সেই বৃন্দাবনপর্বেই বিশ্বাসের নিত্যধামে কেশবচন্দ্রের ভক্তহৃদয়ের স্বপ্নপ্রয়াণ: "বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ।"[১] বিস্ময়কর রামমোহনের শাস্ত্রবিবেকে যা 'পরদারাভিমর্ষণ' বলে পীড়া দেয়, কেশবচন্দ্রের ভক্তিযোগসিদ্ধ দৃষ্টিতে তাই নয়নাভিরাম: "আমি বলিলাম, 'হরি হে! এজন্য কি আমি কাঁদি নাই?' অমনিই হরি কলিকাতায় বৃন্দাবন দেখাইলেন; সেই যমুনা, সেই প্রেমের ব্যাপার দেখাইলেন।'[২] ব্রহ্ম-প্রতিপাদ্য ধর্মের বিবর্তন বাঙলাদেশের সর্বগ্রাসী সর্বজয়ী হৃদয়াবেগমূলক মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে এইভাবেই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান্' আন্দোলন। প্রসঙ্গত রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যটি রামকৃষ্ণদেবের ভাষ্যে উপস্থাপিত এইভাবে: "আমি বললাম, যিনিই ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তোমরা বলো ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। কেশব বললে, আর শিষ্যেরাও সব একসঙ্গে বললে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। যখন বললাম, 'বলো গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব', তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অত দূর নয়; তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে।"[৩] কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ে উপাসনান্তে এই 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' বন্দিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বহুস্থলে বিদ্যমান। তবে সেই সঙ্গে কেশবচন্দ্রের উক্তির দ্বিতীয়াংশও মনে রাখতে হবে, "মহাশয় এখন অতদূর নয়; তা হলে লোকে গোঁড়া বলবে"।

১ 'নিত্যবৃন্দাবন', মাঘোৎসব

২ 'ভক্তিসঞ্চার', জীবনবেদ, পৃ ১০৮

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীম-কথিত, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ১১১ পৃ

বস্তুত, শুধু লোকাপেক্ষাতেই নয়, স্বভাবধর্মেই কেশবচন্দ্র কোনোক্রমেই কোনো গোঁড়ামির দাসত্ব করতে কোনকালেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর ভাগবতধর্ম তথা চৈতন্য-প্রেমধর্ম অঙ্গীকারের এখানেই বৈশিষ্ট্য। গৌরাঙ্গের সঙ্গে খ্রীষ্টের, কৃষ্ণের সঙ্গে কালীর নাম উচ্চারণে তাই তাঁর দ্বিধা ছিল না। "কালী কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসিলেন। কালীকে কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে কালী দেখিতেছেন ভক্ত।"[১] কিংবা "খ্রীষ্টানে হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইতেছে। কৃষ্ণে খ্রীষ্টে মিলন হইতেছে।"[২] অথবা, "এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম।"[৩] প্রভৃতি উক্তি আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত আছে। তবে রামমোহন 'এক পৃথিবী' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন অদ্বৈতবাদে, কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদে। তাই সকল ধর্মের সকল সাধকের ধেয়ানের ধনকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে 'নববিধান' রচনা করলেও তার ভিত্তি রয়ে গেছে ভাগবতধর্মে তথা চৈতন্য-প্রেমধর্মে নিহিত। তাঁর প্রার্থনা মনে পড়ে:

"দাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণের নিশান দাও, মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছাপালনের নিশান দাও; মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের নিশান দাও; শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে প্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও।"[৪]

মূলে এ-প্রেমোন্মত্ততা ভাগবতধর্মেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভাগবতধর্ম বিচারে আমাদের বক্তব্য ছিল, "ভাগবতধর্ম, শেষ বিচারে তাই প্রেমধর্ম। আর প্রেমধর্ম বলেই ভাগবতধর্ম 'নিত্যধর্ম', কাজেই তার আবেদনও বিশ্বজনীন।"[৫] উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের উত্তরসাধক কেশবচন্দ্রের সাধনায় এই 'নিত্যধর্ম' প্রেমধর্মেরই দিগন্তবিস্তার "শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক।"[৬] এই "প্রেমেতে হিতৈষণা" উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেরই অন্যতম মর্মবাণী। সেই মর্মবাণীকে উদ্ধার করে কেশবচন্দ্র বাঙলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়ে পরিণত। আর হেমচন্দ্রের 'দধীচি' সেই মর্মবাণীরই বেদীমূলে বিশ্বহিতে আত্মসর্জনের যুগোচিত প্রতীকে পরিণত।

১ জীবনবেদ, পৃ° ১০৫ ২ তত্রৈব, ১০৮ ৩ মাঘোৎসব, ১৭৩
৪ মাঘোৎসব, পৃ° ৩৭ ৫ দ্র° এ-গ্রন্থের পৃ° ৬২ ৬ মাঘোৎসব, পৃ° ৪০

আশ্চর্যের বিষয়, হেমচন্দ্রের দধীচি পরমবৈষ্ণব। প্রমাণস্বরূপ ইন্দ্রের প্রতি শিবের সেই আদেশ স্মরণীয় :

"বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"[১]

লক্ষণীয়, "তপস্যা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা ধরি"। দধীচির মহাপ্রয়াণও বৈষ্ণবাকাঙ্ক্ষিত হরিসংকীর্তনের উচ্চরোলে, "উচ্চে হরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর" তারই মধ্যে,

"বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। রাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ ;"[২]

বৃত্রসংহারকাব্যে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব যাঁরা নির্দেশ করেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, উক্ত মহাভারতে দধীচি কোথাও বৈষ্ণবরূপে উল্লিখিত হন নি। দধীচিকে বৈষ্ণবরূপে বন্দনা ভাগবতেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, বৃত্রাসুরবধের জন্য ভাগবতের যেরূপ প্রসিদ্ধি, অন্য আর কোনো পুরাণ-ইতিহাসেরই সেরূপ প্রসিদ্ধি নেই। মৎস্যপুরাণের পুরাণদান-প্রস্তাবে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে, যে-পুরাণের প্রারম্ভে গায়ত্রীর অর্থ সূচিত হয়েছে এবং যাতে বৃত্রাসুরবধ ও অন্যান্য নানা ধর্মবর্ণনা আছে, তাই ভাগবত বলে জানবে। এখন জিজ্ঞাসা, ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত দ্বিশতাধিক শ্লোকে বহুবিস্তৃত এ-কাহিনীর সঙ্গে হেমচন্দ্রের পরিচয় ছিল কি? স্বীকারোক্তি অনুসারে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আদৌ প্রগাঢ় নয়। বৃত্রসংহার কাব্যের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি তাই সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বাল্যাবধি তিনি শুধু ইংরেজী ভাষারই চর্চা করে এসেছেন, সংস্কৃত ভাষা তাঁর অনধিগম্য। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব উনবিংশ শতাব্দীর পুরাণ-পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের ভূমিকাকে অপ্রধান করে তোলেনি। বিশেষ করে আত্মজীবনী অনুসারে নবীনচন্দ্রও যখন ভাগবত পুরাণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বঙ্গানুবাদেরই মাধ্যমে।

১ বৃত্রসংহার, ১ম খ', ১০ম সর্গ ২ বৃত্রসংহার, ১ম খ' ১৩শ সর্গ

আসলে এ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন ও বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে-তর্কবিতর্কের সূত্রপাত, দ্বিতীয়ার্ধে তা উপশমিত না হয়ে নানা শিবিরে ছড়িয়ে পড়ায় উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বাহক পুরাণগুলি সম্বন্ধে কিছু না কিছু অবহিত হয়েই ছিলেন। হেমচন্দ্রকে তার ব্যতিক্রম ভাবার কারণ নেই। হেম-জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষেরই তো বিবরণ অনুসারে ১৮৫৭ সনে হিন্দু কলেজে কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত তর্কসভায় হেমচন্দ্র 'Life of Srikrishna' বা শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বিষয়ক এক প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন[১]। উনবিংশ বৎসরের নবযুবকের এই কৃষ্ণ-জীবন সমীক্ষা পরবর্তীকালের পরিণত সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমতুল্য কোনো চিরস্থায়ী সৃষ্টিতে সমাহিত হতে পারে নি বটে, তবে কৃষ্ণলীলার প্রতি কবির আগ্রহ যে তিরোহিত হয়েছে, তা নয়। বরং এ আগ্রহ জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে পরিণত বয়সে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দুর হরিভক্তিতেই রূপান্তরিত হয়ে নারায়ণ-চরণ শরণ করেছে। তাঁর 'কবিতাবলী'তে নারদ-বিতরিত হরিনামামৃতে তারই ইংগিত স্পষ্ট :

"কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস
অলকা আমরা নাহিক চাই ;
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"[২]

বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উদার ধর্মীয় মতাদর্শের মুক্ত পরিবেশে লালিত কবির পক্ষে একই সঙ্গে 'দশমহাবিদ্যা'র বিচিত্র রূপবর্ণনার পাশাপাশি কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র আস্বাভাবিক নয় :

"...হেন কাল রূপ আর কি আছে,
এখন (ও) নাচিছে নয়ন কাছে,
প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে,
যার হৃদি পূর্ণ হয় আলোকে,
এ মুরতি যার মনে উদয়,
সে জন কখন মানুষ নয়।"[৩]

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, "প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে।" মুহূর্তে মনে পড়বে

---

১ 'হেমচন্দ্র', ১ম', পৃ° ৯৮-৯৯

২ 'গঙ্গার উৎপত্তি', কবিতাবলী, ১ম খ° ; ৩ 'ব্রজবালক', তত্রৈব

কৃষ্ণের আবির্ভাবহেতু-নির্দেশে ভাগবতে কুন্তীর সেই অপূর্ব অনুভব : "ভক্তি-যোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ"—ভক্তিযোগ-বিধানের জন্যই তাঁর আবির্ভাব, এ ছাড়া তো অন্য কোনো আবির্ভাব-হেতু স্ত্রীবুদ্ধিতে আর দেখতে পাইনা। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়, "যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥···রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।" হেমচন্দ্রের কবিতাতেও কৃষ্ণের অনুরূপ কারণেই অবতারত্ব : "প্রেম ভক্তি পথ শিখাতে লোকে।" এরপর আর কি বলা যায়, ভাগবতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন হেমচন্দ্র? ভাগবতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই বোধকবি তাঁর কাব্যেব কেন্দ্রস্থ পুরুষ দধীচিকে ভাগবতধর্ম-পরায়ণ করে তুলতে প্রেরণা দিয়েছে। ভাগবতে এই মহান বিষ্ণু-ভক্ত ভাগবতধর্মেই অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলেন, এ-দেহ আমার যত প্রিয়ই হোক, একদিন তা অবশ্যই আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। অতএব আপনারা যখন ভিক্ষা করছেন, তখন আপনাদের নিমিত্ত এ-দেহ আমি এখনই পরিত্যাগ করবো : "ধর্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ। এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহং"[১]। এই "পরমনির্মৎসরাণাং সতাং," পরমনির্মৎসব অহিংস মানবপ্রমীব আচরিত হিতব্রত উদ্‌যাপনেই হেমচন্দ্রের দধীচি ভাগবতধর্মেব মূর্ত বিগ্রহ। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের প্রশস্তিতে তারই স্বীকৃতি :

"কর্তব্য নবের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন।
পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম যে পরম।
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।"[২]

ভাগবতধর্মের বিশ্বজনীন আবেদন এইভাবেই কালান্তরের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আধুনিক যুগমানসে নিত্যধর্ম বলে অভিনন্দিত। তাই দেখি, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'-প্রণেতা নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যের শেষার্ধে কৃষ্ণের এই বিশিষ্ট প্রেমধর্মের পূতমন্ত্র নিয়ে 'হরিকুলেশ' বা হারকিউলিস চলেছেন গ্রীসে, পাণ্ডবগণ যদুবংশের অন্যতম 'কুকুর' শাখা নিয়ে চলেছেন লোহিত সাগরের কূলে। পরে তাঁরা লবণসমুদ্রের তীরেও পৌঁছেছিলেন বলে নবীনচন্দ্র জানিয়েছেন। এ-দুটি কেন্দ্র যথাক্রমে মহম্মদ ও যীশুর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং মুসলিম ও খ্রীষ্ট-ধর্মের সঙ্গে ভাগবতধর্মের আন্তর যোগাযোগ

১ ভা° ৬।১০।৭ ২ বৃত্রসংহার, ২য় খ°- ১৩শ সর্গ

স্থাপনের কল্পনায় এ-ধর্ম নবীনচন্দ্রের কাব্যে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক। ভাগবতধর্মে আর্য-অনার্যের মিলনস্বপ্ন তারই ভিত্তিরচনা করেছে। আমরা জানি, শৈলজাকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, "বাসুকি ও জরৎকারু!—ইহাদের সম/ভক্ত মম নাহি শৈল! এই ধরাতলে"[১]। বস্তুত, নবীনচন্দ্রের কাব্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ অনার্য কৃষ্ণভক্তই ভাগবতীয় ভক্তিতত্ত্বের প্রতিমূর্তি। অনার্যা শৈলজাও ভাগবতীয় প্রেমধর্মের বিগ্রহ-প্রতিমা। যদিও বাসুকি, জরৎকারু বা শৈলজা, এই তিনটি ভক্তচরিত্রের একটিও ভাগবত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং পুরাণিক নামের সাদৃশ্যে একান্তভাবেই কবির স্বকপোলকল্পনা-সম্ভব, তথাপি ভক্তি-মার্গের উচ্চাঙ্গ আলাপে নবীনচন্দ্রের 'ঊনবিংশ শতকীয় মহাভারত' নিঃসংশয়ে ভাগবত-ভাবিত। ভক্তের লক্ষণ বিচার করে ভাগবত যে বলেছিল, প্রিয়ের নামকীর্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত হয়ে তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকেন, কখনও হাসেন, কখনও আবার লোকবাহ্য হয়ে নৃত্য করেন, অলৌকিক বাক্য বলেন, গান করেন, কখনও পরমবস্তু লাভে নির্বৃত হয়ে তূষ্ণীভাবও ধারণ করেন, নবীনচন্দ্রের প্রভাস কাব্যে বাসুকি তারই জীবন্ত ভাষ্য। সেইসঙ্গে সে স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্র সর্বব্যাপী পরমাত্মা হরির উপলব্ধিতে 'ভাগবতোত্তম'[২] বলেও প্রতিপন্ন হবে :

> "কোথা কৃষ্ণ?" —উচ্চহাসি বাসুকি উঠিল হাসি,
> সে হাসিতে কি আনন্দ, কিবা প্রেমসুধারাশি।
> "কোথা কৃষ্ণ? —দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা, ধনঞ্জয়?
> বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময়!
> কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে।
> অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
> মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ দীপ্ত চপলায় ;
> কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়। ···
> কৃষ্ণ মম রক্তে, মাংসে, অস্থিতে, কৃষ্ণ মজ্জায়।
> কৃষ্ণ মম এ হৃদয়ে, এ ক্ষতে দেখ না, হায়!"[২]

জরৎকারুও অনুরূপ ভক্তিবারিতে স্নাতা, প্রেমানন্দে বিহ্বলা। অপরপক্ষে

---

১ প্রভাস, ৮ম সর্গ

২ "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" ভা' ১১।২।৪৫

সুভদ্রা-পার্থও পরম হরিভক্ত। শৈলজার প্রয়াণদৃশ্যে হরিনাম-গর্জনসিন্ধুতীরেই তাই নবীনচন্দ্রের আর্য-অনার্য মিলনতীর্থ রচিত। বস্তুত হরিনাম-সংকীর্তন মন্ত্রকে এ-কবি তাঁর ত্রয়ীকাব্যের মূলসূত্র-রূপে নির্বাচন করেছেন। সংকীর্তন-এইভাবেই ভাগবতশাস্ত্র থেকে চৈতন্যজীবন-সাধনায় বহুগুণিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর অদীক্ষিত সমাজের ভক্তিসাধনার ধারাপথে। ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সম্পূর্ণ আধুনিক তাৎপর্যদানে নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুরাণের যতই রূপান্তর ঘটুক, কীর্তন-মহিমার তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি। যে-আত্যন্তিক আবেগ, আন্তরিক বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম আগ্রহ নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র একদিন ভাগবতপাঠ শুরু করেছিলেন, তার মর্যাদা ত্রয়ীকাব্যে এভাবেই সুরক্ষিত।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'-এর ঘটনাবিবরণ অনুসারে, 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের রচয়িতাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ১৮৭৭ সনে এক বৎসরের জন্য অন্যায়ভাবে পুরীতে বদলি হয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়। সেই সময়েই রথযাত্রার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কবি এক বৃদ্ধা ও এক বালিকার জগন্নাথদর্শনের ব্যগ্রতা দেখে জীবনে এই প্রথম গভীরতর আকূতির সম্মুখীন হলেন। ত্রিশ বৎসরের পূর্ণযুবক কবির একটানা বায়রনিক ফেনিল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে এসে পৌঁছলো অভাবনীয় জগৎ থেকে লোকোত্তরের আহ্বান। বঙ্গানুবাদের সাহায্যে শুরু করলেন তিনি ভাগবতপাঠ। 'রৈবতকে'র বহুপূর্বেই 'রঙ্গমতী' কাব্যে উপ্ত হলো ত্রয়ীকাব্যের বীজ। ১৮৮৩ সনে 'রাজগৃহে' বাসকালে মহাভারত-পাঠে পুষ্ট হলো সে-বীজ। তাই দেখি ত্রয়ীকাব্যের দেহ মহাভারতীয়, আত্মা ভাগবতীয়—ঘটনার বিস্তার মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী-সংযোগে, দর্শনের বিকাশ ভাগবতের অন্তর্লীন ভক্তিযোগে। কাঠামো-রচনায় ভাগবতের কাহিনী-অংশ কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, সত্য। কিন্তু তার আমূল স্বরান্তর বড়ো কম ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ রৈবতকের সপ্তম সর্গটি স্মরণীয়। এ-সর্গটি কৃষ্ণের অতীত স্মৃতিচারণমূলক। সন্দেহ নেই, পাঠককে ব্রজলীলামাধুরীর সঙ্গে পরিচিত করার এটি একটি চমৎকার কৌশল। এ-অংশে নবীনচন্দ্রের কবিত্বও একইসঙ্গে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু ঘটনা-বিবরণ আদৌ ভাগবতকে পদে পদে অনুসরণ করেনি। বিশেষ করে কালিয়দমন-লীলা হয়ে উঠেছে "অনার্য-তস্কর"-শাসন, বিপ্রবধূ-উপাখ্যান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সংঘাতের পটভূমি! কিন্তু

নবীনচন্দ্র ভাগবতীয় সিদ্ধরসের সর্বাপেক্ষা অন্যথা ঘটিয়েছেন শারদরাস-বর্ণনায় :

"নরনারী শিশু বৃদ্ধ নাচি সংকীর্তনে
গাহিতেছে 'হরিনাম' আনন্দে মধুরে।"[১]

বলা বাহুল্য, যমুনাতীরে অনুষ্ঠিত ভাগবতীয় রাস এ নয়, এ হলো ভাগীরথীতীরে শ্রীগৌরাঙ্গের "বহিরঙ্গসনে" উচ্চ-হরিনাম-সংকীর্তন। অবশ্য 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের অভিমন্যুর স্বগতোক্তিতে কৃষ্ণের যে-রাসলীলা উল্লিখিত তা ভাগবতীয় রাসই, সংকীর্তনযজ্ঞ নয় :

"ভক্তিতে বিহ্বল গোপাঙ্গনাগণ
দেবভাবে আকর্ষণ
করিতেছে প্রাণমন,
পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান,
ছুটিছে পশ্চাতে ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণ"[২]

লক্ষণীয়, "পত্নী পতি ছাড়ি, মাতা কোলের সন্তান"। ভাগবতীয় রাস এখানে সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে[৩] আধুনিক মনের কাছে তুলে ধরতে সাহসী হয়েছেন কবি, পরন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তাঁকে কোনো রূপকার্থের আবরণ সৃষ্টি করতে হয় নি। আর এখানেই নবীনচন্দ্র ভাগবতীয় তাৎপর্যের নানা অন্যথা ঘটানো সত্ত্বেও, এ-পুরাণের দুই প্রধান সত্যের অঙ্গীকারে অবিচল। তাঁর 'কুরুক্ষেত্রে' কল্পিত ধর্মরাজ্যের "অক্ষয় মৃণাল কৃষ্ণনাম"[৪]—যে নাম "ভাসাইল ব্রজ-ভূমি/শৈশবে কৈশোরে"[৫]। দ্বিতীয়ত, ভাগবত ও ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণলীলা তাঁর কাছে 'রূপক' নয়, 'সত্য'। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের আলোচনার অংশবিশেষ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে :

"...রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে

---

১ 'রৈবতক', ৭ম সর্গ   ২ 'কুরুক্ষেত্র', ১২শ সর্গ

৩ ভাগবতীয় রাসে, গোপীদের দুগ্ধপানরত শিশু পরিত্যাগ করেই "ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা" হয়ে কৃষ্ণের বংশীধ্বনির অনুসরণ করতে দেখি। এ-শিশুরা যে গোপীদের আপন আত্মজ, একথা স্বীকার করেন না গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তাঁদের মতে এরা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। ভাগবতেরও অনুরূপ অভিপ্রায় থাকলে বলা যাবে না "সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে"।

৪ প্রভাস, ২য় সর্গ   ৫ প্রভাস, ৪র্থ সর্গ

একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" আমি বলিলাম—"উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কালো পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।"[১]

ভাগবত ও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এই আবেগাত্মক বিশ্বাসই উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চায় নবীনচন্দ্রের বিশিষ্ট দান। এ বিশ্বাস রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনব্যাপী সাধনায় কালান্তরের যুগমানস-বদলের দিনেও পুনরুদ্ধার লাভ করেছিল। কেশবচন্দ্রের অশ্রুজলে তার পুষ্টি, নবীনচন্দ্রের কাব্যে বা গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই পল্লবিত শাখা-বিস্তার। "যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না"—নবীনচন্দ্রের এই উক্তি অকপট বিশ্বাসবাদেরই অশ্রুনিবেদিত স্বীকৃতি। অপরপক্ষে "ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি"—রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তি উনবিংশ শতাব্দীর ভাগবতচর্চার রূপকবাদী শিবিরেরই ঐকান্তিক অভিমতের সূচক। বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতীয় বিভিন্ন কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যায় এর সূত্রপাত ঘটান, পরে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে তারই বিশেষ প্রসার। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি[২] তো উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাগবত-বিচারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিটিও উল্লিখিত হওয়ার দাবী রাখে। 'রাসলীলা' গ্রন্থে "ইতিহাস নয় রূপক" অধ্যায়ে তিনি মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত ও পদ্মপুরাণের তথ্যাদি যোগে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ভাগবতীয় রাস রূপক মাত্র, ইতিহাস বা যথাসত্য নয়। তাঁর ভাষায় :

১ 'আমার জীবন', 'চতুর্থভাগের শেষাংশ', নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ব' সা' প', ৩য় খণ্ড, পৃ' ৬৩-৬৪

২ প্রকৃতপ্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রচলিত ব্রাহ্মমতানুসারে ভাগবতকে 'পরদারাভিমর্ষণে'র কলুষিত-কথাজ্ঞান করেননি, এমনকি মানবীয় প্রেমনাট্যরূপেও নয়, বরং অধ্যাত্মদর্শন এবং তত্ত্বশাস্ত্ররূপেই গ্রহণ করেছিলেন, তারই একটি আপাতলঘু নিদর্শন সংগ্রহ করা যায় 'ক্ষণিকা' কাব্য থেকে: "ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ, পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম, /আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—। বন্ধ করো শ্রীমদ্ভাগবত। শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে। গীতগোবিন্দ খোলা হোক্-না তবে।" 'যুগল', ক্ষণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৭ম খ', পৃ' ১১১-১২

"...শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের সেতু—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহার অবতার। তিনি পরদারাভিমর্ষণ-রূপ বিপরীত আচরণ কিরূপে করিলেন?

"শুকদেবের ঐ উত্তরের ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ পারমার্থিক নহে, প্রাতিভাসিক—এ রাসক্রীড়াও প্রাকৃত ব্যাপার নহে, অপ্রাকৃত লীলামাত্র। শুকদেব আরও বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের পতিগণ কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া স্ব স্ব বনিতাকে শয্যাপার্শ্বেই অবলোকন করিতেন—সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়া হইত না। তাহাই যদি হয়, তবে রাসলীলাকে ইতিহাস বলা যায় কিরূপে?"[১]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এ-শিবিরের ভিত্তি যুক্তিবাদ, এবং অন্বিষ্ট ইতিহাস। পদ্ধতিও যে বিচারমূলক, তা বলাই বাহুল্য।

অপরপক্ষে গিরিশচন্দ্রের মূলমন্ত্র: "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। তাঁর নিজস্ব ভাষায়, "বিশ্বাসই Sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।"[২] বস্তুত, "বিশ্বাসই প্রমাণ" এই ধ্রুবপদকে আশ্রয় করেই গিরিশচন্দ্র ভাগবতীয় 'ঈশানুচরিত' বা ঈশ্বরানুগৃহীত ভক্তচরিত পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তাঁর বিভিন্ন ভক্তচরিত্র-আশ্রয়ী নাটকের আবির্ভাব, যেমন, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি। আমরা জানি, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদলাভই গিরিশ-চন্দ্রের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ-ঘটনা তাঁর নাটকের চরিত্রকেই একেবারে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। 'চৈতন্যলীলা'য় তারই প্রথম আভাস, 'জনা'য় পূর্ণ অভিব্যক্তি। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর ভক্তিরত্নাকর' বলে প্রসিদ্ধ এই পৌরাণিক নাটকে ভক্তির বিচিত্র ধারা এসে মিশেছে। তার মধ্যে আবার উজ্জ্বলতম ধারা "প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ" বিদূষকের কৃষ্ণভক্তি। বিদূষকের ব্যাজস্তুতিমূলক দু'একটি উক্তি স্মরণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে: "একবার নাম ক'র্‌লে তরে যায়"[৩], "কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভালাই কারুর কখন হয় নি"[৪]। ভাগবত-পাঠকের এখানে মনে পড়তে পারে, 'একবার নাম করলে তরে' যাওয়ার উদাহরণ অজামিল; অপরপক্ষে 'কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের' কিছু ভালো না হওয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানা গোপী বিখ্যাত ভ্রমরগীতায়,—তাঁর বক্তব্য ছিল, কৃষ্ণনাম যে-একবার কানে

১ 'রাসলীলা,' পৃ' ৬২ ২ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,' শ্রীম-কথিত, ৩য় ভাগ, পৃ' ২০১

৩ 'জনা', ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ৪ তত্রৈব, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক

শুনেছে, তার তো সংসার পরিত্যাগ ভিন্ন অন্য গতি নেই! এবার ভাগবতীয় ঐশ্বর্য-মাধুর্যলীলা সম্বন্ধে বিদূষকের সরস মন্তব্য শোনা যেতে পারে :

> "নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত ক'রে এই কথা ব'ল্লেই স্তব হ'তো। মুনিরা যে মন্তর আওড়ায়, তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তার মানে একজনের না একজনের সর্বনাশ ক'রেছেন। নাম কি না, মুরারি, নাম কি না ধনুর্ধারি, নাম কি না কংসারি, দানবারি অরিরী একেবারে কেয়ারি! নাম কি না ননীচোর, নাম কি না বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রেমের কাজের ভেতর।"[১]

বিদূষকের এই অন্তঃসলিলা ভক্তি-ফল্গুধারা বাঞ্ছিতের পদপল্লব লাভ করেছে—পাণ্ডবসখা-ভারাবতরণকারীর নয়—মুরলীধারী রাধারমণেরই দর্শনলাভে : "মুরলীধারী হও তো হও নইলে সোজা পথ আছে—চ'লে যাও। আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে।"[২] স্মরণীয়, রূপ গোস্বামীর শ্লোকে আমরা চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে নারায়ণজ্ঞানে গোপীদের প্রণাম করতে দেখি। সেই কৃষ্ণই আবার কোনোমতে দ্বিভুজ না হয়ে থাকতে পারেন না রাধার আবির্ভাবে। গিরিশচন্দ্রের বিদূষকও রাধাপ্রেম-পরীক্ষিত দ্বিভুজ মাধুর্যমূর্তির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন। "চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি? কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছি নে"—ভাগবত-পুরুষের সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যলীলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধু তাঁর মাধুর্যলীলা-ধ্যানের এই চৈতন্য-সম্প্রদায়ানুগত প্রবণতা বাঙ্‌লাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার উদ্ধার করে বাঙালীর বিশিষ্ট মানসগঠনের দিকেই যেন অভ্রান্ত অঙ্গুলিনির্দেশ করে গেলেন গিরিশচন্দ্র। আর বিবেকানন্দ তারই পটভূমিকায় এ-শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ষিত গুরু-অপমানভার থেকে গৌরবের সঙ্গে উদ্ধার করলেন ভাগবতীয় গোপীপ্রেম :

"কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এমন কি দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। কারণ গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-

---

১ তত্রৈব ২ তত্রৈব, ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের মতো দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের এতাদৃশ মহিমা!...

"...কৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া কথিত এই নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব জগতে অভিনব মৌলিক ভাব নহে—ইহা প্রমাণ কর দেখি।...ভগবান্ কৃষ্ণই ইহার প্রথম প্রচারক, তাঁহার শিষ্য বেদব্যাস ঐ তত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না।"[১]

"কৃষ্ণ-অবতারে। মুখ্য উদ্দেশ্য...গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া" তথা "নিষ্কাম প্রেমতত্ত্ব" প্রচার—"The love of the gopis! That is the very essence of the Krishna Incarnation" বা "love for love's sake,... the Lord Krishna was the first preacher of this"—বস্তুত গৌরাঙ্গ পরিকরবৃন্দ ভিন্ন অদ্যাবধি আর কোনো মহাজনই এরূপ উপলব্ধি করতে

---

১ 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ,' স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধনী কার্যালয় প্রকাশিত ৫ম খণ্ড, পৃ ১৫২-৫৩। মূল ইংরেজী বক্তৃতার প্রাসঙ্গিক স্থল নিম্নোদ্ধৃত হলো:

"...the love of the gopis! That is the very essence of the Krishna Incarnation, Even the Gita, the great philosophy itself, does not compare with that madness, for in the Gita the disciple is taught slowly how to walk towards the goal, but here is the madness of enjoyment, the drunkenness of love, where disciples and teachers and teachings and books and all these things have become one, even the ideas of fear, and God, and heaven. Everything has been thrown away. What remains is the madness of love. It is forgetfulness of everything, and the lover sees nothing in the world except that Krishna, and Krishna alone, when the face of every being becomes a Krishna, when his own face looks like Krishna, when his own soul has become tinged with the Krishna colour. That was the great Krishna! ... I challenge any one to show whether these things, these ideals—work for work's sake, love for love's sake, duty for duty's sake were not original ideas with Krishna . the Lord Krishna was the first preacher of this; his disciple, Vyasa took it up and preached it unto mankind, This is the highest idea to picture. The highest thing we can get out of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the gopis of Vrindaban." 'The Sages of India', Swami Vivekananda's Works, Vol., III, p. 259

পারেননি। মহাভারতের মহাসূত্রধার কৃষ্ণকে বিশ্বরণাঙ্গনের ভীষ্মপর্বে প্রতিষ্ঠিত করতে যখন আধুনিককালের মহারথগণ ব্যস্ত, তখন স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা সম্পূর্ণ বিপরীতকোটিতে ভাবের গভীরে অবগাহন করেছে: "আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাইনা।"—"The highet thing we can get out of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the Gopis of Vrindaban." গোপীপ্রেমের তন্ময়ীভূত সহৃদয়ের পক্ষেই একমাত্র এর যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব। বিবেকানন্দও একজন লোকোত্তর সহৃদয়ের সংস্পর্শে এসেই গোপীপ্রেমের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আর কেউ নন, তাঁরই মহান্ গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিবানন্দকে লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন, প্রথমে রামকৃষ্ণদেবকে অনুধাবন না করে কেউ কখনও বেদ-বেদান্ত ভাগবত এবং অপরাপর পুরাণের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হবে না[১]। বেদ-বেদান্ত বা অন্যান্য পুরাণের কথা থাক্, এখানে শুধু ভাগবতের প্রসঙ্গেই দেখতে হবে, বিবেকানন্দের উক্তিটি কতদূর গ্রহণযোগ্য।

পরতত্ত্ব উপলব্ধিতে রামকৃষ্ণদেব ভাগবত-প্রসিদ্ধ তত্ত্বেই উপনীত হয়েছিলেন: 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভাগবানিতি শব্দ্যতে'। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়: "একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তাব নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন।...নাম ভেদমাত্র। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান।"[২] তবে ভাগবতের ক্ষেত্রে এই অভিন্ন তত্ত্ববস্তু 'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণ, আর রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।" কিন্তু শাক্তসাধকই তো তাঁর শেষ পরিচয় বা একমাত্র পরিচয় ছিল না—তিনি বৈষ্ণবীয় সাধন-মার্গে ভজনা করেও সিদ্ধি লাভ করেছিলেন জানা যায়। স্বভাবতই ভাগবত ছিল তাঁর পরম-কর্ণরসায়ন। তাঁর সিদ্ধি-কালীন আবেগ-আগ্রহের প্রসঙ্গে তিনি তাই বলতেন, "আমার এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্যে ব্যাকুলতা হ'তো। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতাম।"[৩] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভক্তসঙ্গে

---

১ Epistles, The Complete Works of Swami Vivekandnda, vol. vll, p. 473

২ কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃ° ২০১ ৩ তত্রৈব, ২য় ভাগ, পৃ° ১

তিনি ভাগবতের নানা তত্ত্বকথা গল্পচ্ছলে শোনাতেন। শিষ্যদের ভাগবত-পাঠের উপদেশ দিতেও ভুলতেন না। ভাগবতের মতো তাঁর অভিমতও ছিল "ভক্তিযোগ যুগধর্ম।"[১] 'এহোত্তম'। ভাগবতীয় লীলাস্থলী দর্শনে তাঁর ব্রজভাবের উদ্দীপন হতো, বৃন্দাবন থেকে তিনি ফিরতেও চাননি। নরেন্দ্রনাথ যে তাঁর মধ্যে বীরভাবের পাশাপাশি সখীভাবকেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা মিথ্যা নয়। সংকীর্তন-মধ্যে তাঁর অভাবনীয় ভাবোন্মাদ-দর্শনে কেশবাদি ভক্তগণও তাঁকে 'Nineteenth century-র চৈতন্য' বলতেন, এর তাৎপর্যও নিতান্ত সামান্য নয়। যুগপৎ গোপীপ্রেমে ও চৈতন্যপ্রেমে তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রবেশ আমাদের বিস্মিত করে। উভয় প্রেমের আস্বাদনে তাঁর সেই উক্তি অবিস্মরণীয়: "আহা, গোপীদের কি অনুরাগ!...সেই প্রেমের যদি একবিন্দু কারু হয়! কি অনুরাগ। কি ভালবাসা! শুধু ষোলআনা অনুরাগ নয়, পাঁচ সিকা পাঁচ আনা! এরই নাম প্রেমোন্মাদ।"[২] প্রেমোন্মাদের লক্ষণস্বরূপ সর্বভূতে তাঁদের কৃষ্ণদর্শন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি: "প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছে। তৃণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে।"[৩] দিব্যোন্মাদ যার চরমাবস্থা, সেই গোপীপ্রেমকে তিনি "প্রেমাভক্তি" বলেই বর্ণনা করেছেন, এতে কোনো কামনা-বাসনার লবলেশ মাত্র নেই। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কামক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ।"[৪] ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনবদ্য গোপীপ্রেম-ভাষ্য প্রণয়নের পর উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণদেব এ-প্রেমের আর এক বিচিত্র ভাষ্য রচনা করেছিলেন, সন্দেহ কী! তাই দেখি, এই অভিনব ভাষ্যকেই সম্মুখে রেখে বিবেকানন্দ গোপীপ্রেমের মহিমাগানে এমন উচ্চকণ্ঠ। আমরা জানি, রামকৃষ্ণদেব তাঁকে প্রায়ই বলতেন, 'নরেন আমার শুকদেব'। বস্তুত 'উনবিংশ শতাব্দীর শুকদেব' গোপীপ্রেমের মর্মানুসন্ধানে যে-গভীরে প্রবেশ করেছেন

---

১ তত্রৈব, ১ম ভাগ, পৃ° ১৭২ ২ তত্রৈব, ১ম ভাগ, পৃ° ১৫০-১৫১
৩ তত্রৈব, ২য় ভাগ, পৃ° ২৪৬ ৪ তত্রৈব, ২য় ভাগ, পৃ° ৪০

তা প্রায় তুলনারহিত। তাঁর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ থেকে মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা বিষয়ক অপূর্ব আলোচনাটির অংশবিশেষ উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায় :

"দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনও ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে ? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন। যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে, তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়।'[১]...ভগবান যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হয়—তাঁহার পক্ষে সূর্য-চন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্তার চরম অবস্থা।"[২]

গোপীদের এই অপূর্ব অদ্ভুত "প্রেমোন্মত্ততা"র চরমাবস্থায় 'অনুরাগ বাঘে' ষড়রিপু গ্রাস করেছিল বলে জানিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। বিবেকানন্দও বলেন, এ-প্রেমে কাম বা কামনার স্পর্শমাত্র নেই, থাকতে পারে না :

"সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সবকিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

১ "সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতরবীর নস্তেঽধরামৃতম্॥" ভাগবতীয় রাসে কৃষ্ণের অন্তর্ধানে শোকসন্তপ্তা গোপীদের বিখ্যাত গীতের অংশ, দ্র° ভা° ১০।৩১।১৪

২ "Often it so happens that divine lovers who sing of this divine love accept the language of human love in all its aspects as adequate to describe it. Fools do not understand this, they never will. They look at it only with the physical eye. They do not understand the mad throes of this spiritual love. How can they ? "For one kiss of thy lips, O Beloved ! One who has been kissed by Thee, has his thirst for thee increasing for ever, all his sorrows vanish, and he forgets all things except Thee alone." ...To him who has been blessed with such a kiss, the whole of nature changes, worlds vanish, suns and moons die out, and the universe itself melts away into that one infinite ocean of love. That is the perfection of the madness of love." 'Human Represntations of the Divine Ideal of Love', Swami Vivekanand's Works, III, p. 98

করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বলো, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পারো; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনও একসঙ্গে থাকে না।"[১]

"জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহী, জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম। দুহুঁ মিলত নহী রব রজনী নহী মিলত একঠাম॥"—গোপীপ্রেমের অনবদ্য নির্মলস্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ-ব্যবহৃত তুলসীদাসী দোহাঁ মুহূর্তে মধ্যযুগের বাঙালী সাধকের চরণ স্মরণ করাবে :

"কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে হেন নাহি কোন দাগ॥

১ "... the ever-blessed Gopis rushed out to meet him, forgetting, every thing forgetting this world and its ties, its duties, its joys, and its sorrows. Man, o man, you speak of divine love and at the same time are able to attend to all the vanities of this world—are you sincere? "Where Rama is, there is no room for desire—where desire is, there is no room for Rama; these never coexist—like light and darkness they are never together." Human Representation of the Divine Ideal of Love. The complete works of Swami Vivekananda, Vol. III. p. 99

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥"[১]

"কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর", ভাষান্তরে, "তুহু মিলত নহী রব রজনী নহী মিলত একঠাম।" বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভাগবতীয় প্রেম ওই "দিবসে"রই "নির্মল ভাস্কর"। তা "নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়"। চৈতন্যসাক্ষিক সমগ্র মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাধনার শেষ-ঋদ্ধি গোপীপ্রেম এইভাবেই আধুনিকযুগের সকল বিরুদ্ধগতি, আঘাত ও বাধার মধ্যেও তার নিত্যকালের সত্যরূপকে উদ্ঘাটিত করে সর্বজয়ী।

আমরা জানি, একদা সমতটের ভোজবর্মের শাসনে উৎকীর্ণ "গোপীশত-কেলিকার" শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ বৃহৎ-বঙ্গের আপামর জনগণের মানস-প্রবণতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। জয়দেবযুগের সাধনাও গোপীশতকেলিকারের বিচিত্র লীলাস্বাদনে নিরলস। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর রাগাত্মিকাভজনে এবং তাঁর অনুবর্তীদের রাগানুগাসাধনে উক্ত গোপীজনবল্লভ তাঁর গোপীশতযূথ নিয়েই বাঙালীর চেতনজলে সহস্রদলে বিকশিত। উনবিংশ শতাব্দীর নব-মূল্যায়নের সংকটাবর্তে সেই রাখালরাজ নিন্দিত, বৃন্দাবন-গোপী হতাদরা। বাঙ্‌লা দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অভিলাষ অপূর্ব! শুকদেবের তুল্যই এক পরম-নিগ্রন্থ আত্মারাম সন্ন্যাসীর হস্তেই বাঙালী-সাধকের বহু বাঞ্ছিত 'লুপ্ততীর্থ' উদ্ধার হলো। গোপীপ্রেমের বনমালাটি কণ্ঠে ধারণ করে বাঙালীমানসে রাখালরাজের এ হলো পুনঃ প্রত্যাবর্তন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর পদে বাঙালী নিবেদন করলো: "মানবভাষায় এরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই। আমরা তাঁহার গ্রন্থে গোপীজনবল্লভ সেই বৃন্দাবনের রাখালরাজ অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর আদর্শ পাই না"—"This is the Hightest idea to picture. The highest thing we can get out of him is Gopijanavallabha, the Beloved of the Gopis of Vrindaban."

বাঙ্‌লাদেশের সহস্রাধিক বৎসরের কৃষ্ণ-গোপীপ্রেম-সাধনার ইতিহাসে ভাগবতচর্চা এখানে এসেই এক পূর্ণবৃত্ত কালপরিক্রমা শেষে ভবিষ্যগর্ভে নিহিত পূর্ণতর সফলতর নব-নব সম্ভাবনায় ভাস্বর॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য ।৪, ১৪০—৪৮

সংশোধন ও সংযোজন

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা পংক্তি

৩ ২-৩ "আমোক্ষকাল" : ভাগবতের "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" শ্লোকের "আলয়ং" অংশের "আমোক্ষ"-ব্যাখ্যা শ্রীধর-কৃত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকৃত। তবে কি বলতে হবে, 'ভাগবত-রসফল আমোক্ষকাল পেয়' এ-বাক্যে এই বলা হচ্ছে, মোক্ষলাভের পূর্ব পর্যন্ত পেয়? শ্রীধর বলছেন, না, ভাগবতামৃতপান মোক্ষেও ত্যাজ্য নয়, "ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ"। কি করে? তারই উত্তরদানে তিনি আরো বলেন, "আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য"। 'লয়'—'মোক্ষ'। 'আ'—'অভি'। অর্থাৎ এককথায়, 'আলয়'—লয়কে বা মোক্ষকে "অভিব্যাপ্য"। শেষ পর্যন্ত বুঝতে হবে, মোক্ষেও ভাগবত-রসফল পেয়। প্রমাণ "আত্মারামাশ্চ" শ্লোক।

আর একটি কথা। "তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান" ঠিকই। কিন্তু ভক্ত মোক্ষ বাঞ্ছা না করলেও ভগবান তাঁকে মোক্ষ-অপবর্গ দিয়ে থাকেন. বস্তুত ভক্তি সাক্ষাৎভাবেই জীবের দেহাভিমান বিনষ্ট করে। ভাগবতে ঋষভদেব-বাক্য থেকেই জানা যায়, "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ" [ভা° ৫।৫।৬]। শ্রীরূপ গোস্বামীও তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাগবতের বিভিন্ন ভক্ত-প্রার্থনা তুলে ধরে তাই বলেছিলেন, উক্ত প্রার্থনা-শ্লোকমালায় "ত্যাজ্যতৈয়বোক্তা মুক্তিঃ" [পূর্ববিভাগ, ২।২৮]—মুক্তিকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে, "সর্ববিধাপি চেৎ" সর্বভাবেই, তবু "সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে"—সালোক্যাদি মুক্তি ভক্তির অতিবিরুদ্ধতা করে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শন মুক্তির পরমপুরুষার্থতা স্বীকার না করলেও পারমার্থিকতা স্বীকার করেছে, এ তো সুনিশ্চিত।

"তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়": ভাগবতের সব পাঠেই অধ্যায়-সংখ্যা এক নয়। কোথাও বত্রিশ, কোথাও পঁয়ত্রিশ, আবার কোথাও ছত্রিশ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	২৪	ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গের তুলনা : প্রথম-দ্বিতীয় স্কন্ধ—দুই চরণ, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ—দুই জানু, পঞ্চম স্কন্ধ—নাভি, ষষ্ঠ-সপ্তম স্কন্ধ—দুই বাহু, অষ্টম স্কন্ধ—বক্ষ, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রফুল্লমুখারবিন্দ, একাদশ স্কন্ধ—ললাট-পট্ট, দ্বাদশ স্কন্ধ—মস্তক।	
	২৯	তেনেহয়ং	তেনেয়ং
	১	'ব্রহ্মসম্মিত পুরাণ' : 'সর্ববেদতুল্যাম্' [দ্র° ভাবার্থদীপিকা. ১।৩।৪০	
	১৫	দ্বিজ-বন্দু	দ্বিজবন্ধু
	৩-৪	বাক্যটির অংশবিশেষ বাদ পড়েছে। পুরো বাক্যটি এই হবে "তাই দেখি এর বংশানুচরিতে প্রাক্-ঋগ্বেদীয় যুগের কয়েকজন রাজার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম কয়েকজন বিখ্যাত রাজারও নাম পাওয়া যাচ্ছে"।	
	১২	'অষ্টাদশ পুরাণ' : চোদ্দটির নাম ছাপা হয়েছে। বাকী চারটি —অগ্নি, গরুড, ব্রহ্মবৈবর্ত ও ভবিষ্যপুরাণ। উল্লেখনীয়, ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে বায়ুপুরাণের নাম নেই, শিবপুরাণের আছে। স্কন্দপুরাণে আবার পদ্মপুরাণের পরিবর্তে শিবপরাণের নাম পাই।	
	১৬	'কালিকাপুরাণ' : ঐতিহাসিক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থে লিখেছেন, "কালিকাপুরাণ বাংলা-দেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহার রচনাকাল কৃত্তিবাসের পূর্বে' [পৃ° ২৮১]। একই সঙ্গে উদ্ধারযোগ্য দেবীভাগবত সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ইহা মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনেক পরে রচিত'' [তত্রৈব, পৃ° ৩৬১]। দেবীভাগবতে 'ভাগবত' সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্তা বৈষ্ণবমানিনঃ। অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥" অর্থাৎ, কলিকালে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত দুরাত্মারা [ভগবতী	

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		কালিকার মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলে] অন্য ভাগবতের কল্পনা করবে।	
৬	২৯	"দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ এই বারোটি শ্লোক" : শুদ্ধপাঠ "দ্বাদশ থেকে ত্রয়োবিংশ এই বারোটি শ্লোক"।	
৮	২৮	উদগীত	উদ্‌গীত
১২	২০	"অহো অমীষাং" : পাঠান্তর "অহো বতৈষাং"।	
১৫	৯	চতুর্ব্যুহ	চতুর্ব্যূহ
১৭	১৪	প্রবৃত্তেইয়ং	প্রবৃত্তেয়ং
,,	২৫	স্ফূরিত	স্ফুরিত
১৮	২৯	'আনন্দতীর্থ' : মধ্বাচার্য। এঁর জন্মকাল ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ বলে ঐতিহাসিকগণের অভিমত।	
১৯	২৭	"কলৌ খলু" : পাঠান্তর "কলৌ বহু"।	
২০	২০	'ভাগবত-তাৎপর্য'-প্রণেতা : শুদ্ধপাঠ 'ভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয়'-প্রণেতা।	
২১	১০	ভাষাগত প্রাচীন প্রয়োগ বা আর্ষ-প্রয়োগ : হরিদাস দাস বাবাজী সংকলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' থেকে এর দু'একটি উদাহরণ উদ্ধৃত হতে পারে। যেমন, "(৩।৫।৪৭) প্রতিহর্তবে তুমর্থে তবেন্ প্রত্যয়।...(১০।২৯।৮০) 'পুলকান্ত-বিভ্রন্', 'অবিভক্তঃ' স্থলে আর্ষ। ...'বয়ং দশুঃ (১০।৪৭।১৯) দদৃশিম'।" [দ্র° শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান, ৩খ, ১৭১১]	
২২	৩	"ছন্দোবিষয়ে...ব্যতিক্রম" : যেমন, "(ভা ১।২।৩) 'অধ্যাত্মদীপ-মতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্'—এইস্থলে ৮ম ও ৯ম অক্ষর যথাক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হইলে বসন্ততিলক হইত।" আবার একই শ্লোকের "দ্বিতীয় চরণটি—'চেলাঞ্চল'-বৃত্তঘটিত" [দ্র° শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান, ৩খ, ১৭০৯]।	
২৬	৬	পরমানন্দচিন্মুর্তি	পরমানন্দচিন্মূর্তি
,,	২৭	পুত্রভ্যাং	পুত্রাভ্যাং
,,	৩১	তত্রৈব ১।৫	তত্রৈব ২।৫
২৮	১৮	স্বকর্মভিরুশত্তমঃ	স্বকর্মভিরুশত্তম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮	২২	অহ্বান	আহ্বান
২৯	২৭	চাংসকলাঃ	চাংশকলাঃ
,,	২৮	"অবতারাহ্যহসংখোয়াঃ" শুদ্ধ পাঠ "অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ" ॥	
৩১	৫	তীর্থস্থান	তীর্থস্নান
,,	৮	কুবলয়পীড	কুবলয়াপীড
৩২	৩	"কুন্তী ছিলেন বাসুদেবের ভগিনী", হবে "বসুদেবের ভগিনী"	
,,	২৭	"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্য" : শুদ্ধপাঠ "সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং"। এ-শ্লোকেব "নিহিতঞ্চ সত্যে" এবং "সত্যাস্য" এই দুটি অংশের অনুবাদ বাদ পড়েছে। হবে যথাক্রমে, "তিনি পঞ্চভূতে অন্তর্যামী-রূপে নিহিত" এবং সত্যবাক্য ও সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তক সেই "পরমার্থতত্ত্ব" সত্যস্বরূপেরই শরণ নিয়েছেন দেবতারা।	
৩৫	৮	'পুণ্ডক' বাসুদেব	'পুণ্ড্রক' বাসুদেব
৪২	১৯	'Song of Solomon' : সলোমনের সংগীতে উদ্‌গীত "I am black" ইত্যাদি চরণ দয়িতার নিজের বলেই বিদ্বৎ-সমাজ-স্বীকৃত। ফাদার দ্যতিয়েন ও অমলকান্তি ভট্টাচার্য এ-অংশের অনুবাদ করেছেন এইভাবে :	

"দয়িতা'। জেরুজালেমনন্দিনীগণ, শ্যামা আমি, তবু

"চেয়ে থেকো না অমন অপলক, আমি কৃষ্ণা ব'লে।"

[দ্র° 'গানের সেরা গান', কবি ও কবিতা, ৩ বর্ষ, ২ সংখ্যা]

সুতরাং "জেরুসালেমের এই কৃষ্ণসুন্দর পুরুষটি কে" বলা বিভ্রান্তিকর। তাছাড়া সলোমন-গীতির দয়িত পুরুষ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না। প্রমাণ দয়িতার উক্তি :

"My beloved is white and ruddy"

['The Holy Bible', The British & Foreign Bible Society]

পূর্বোক্ত অনুবাদকদ্বয়ের ভাষায় : "প্রিয়তম আমার শুভ্রবর্ণ, রক্তিম"।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	১০-১১	"এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে কৃষ্ণোপাসনার সেই ভাগবত-উচ্চারিত মন্ত্র": "শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্‌ রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত- তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্‌॥" [ভা° ১২।১১।২৫]	
,,	১৫	গোপীগীত-তীর্থীভূত	গোপীগীত-তীর্থভূত
৪৮	১	পদ্মযোনি বিষ্ণুর	পদ্মনাভ বিষ্ণুর
৪৯	২৭	ভা° ১৯।২৮।১৬	ভা° ১০।২৮।১৬
৫০	১৯	উদ্ভুতে	উদ্ভূতে
৫২	১৫	সর্বভূত[illegible]ত্ম	সর্বভূতাত্মা
৫৮	১৭	"সম্বন্ধানুগা নয়, রাগানুগা" হবে "সম্বন্ধানুগা নয়, প্রেমানুগা"।	
,,	২৯	ভা° ৪।১৪।২৪	ভা° ৪।১৪।২৫
৫৯	২০	ভা° ৪।২২৩।৯	ভা° ৪।২২।৩৯
৬০	৫	"নিখিল প্রাণীর অন্তঃস্থিত সমূহ ব্যথাবেদনাকে নিজে ভোগ করবো" হবে "নিখিল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের সমূহ ব্যথাবেদনাকে ভোগ করবো"।	
৬০	১২	মৃতুর	মৃত্যুর
,,	৩০	ভা° ৬।১৬।৪১	ভা° ৬।১৬।৪১-৪২
৭১	৪	"গৌতম-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যের" হবে "কপিল-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যের"। ইনি ভাগবতের দেবহূতি-তনয় কপিল নন; মহাভারত-কথিত অগ্নিবংশজ কপিল।	
,,	১১	"এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার": বঙ্কিমচন্দ্র অনবধানতাবশত সাংখ্যের পুরুষতত্ত্বকে "জাগতিক পদার্থ" বলেছেন। সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব চৈতন্যতত্ত্ব, তাই সাংখ্যের পুরুষ "জাগতিক পদার্থ" হতে পারেন না।	
,,	২৮	সৃষ্টিতত্ত্ব	সৃষ্টিতত্ত্ব
৭২	৯	সত্ত্ব	সত্ত্ব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৮	১৪-১৫	যদমোঘপামন্তরুপ্তং	যদমোঘমপামন্তরুপ্তং
৮৫	৪	উপনিষদ	উপনিষদ
৮৭	১৯	মহাদ্রিভিঃ	সহাদ্রিভিঃ
৮৮	২৮	তৈলাভ্যঙ্গে	তৈলাভ্যঙ্গো
৯৪	২৩	আব্রহ্মস্তম্ভ	আব্রহ্মস্তম্ব

৯৯ "পঞ্চদশ শতাব্দের আগে বাঙ্গালাদেশে ভাগবত-পুরাণ জানা ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।" ড° সুকুমার সেন মহাশয়ের উপরিউক্ত অভিমত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ' গ্রন্থে [প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা, ১৩৭৮]। অধ্যাপক চক্রবর্তী উদাহরণ-যোগে প্রমাণ করেছেন, আর্যার 'বিভিন্ন শ্লোকে কৃষ্ণের শকটভঞ্জনাদি যে যে লীলাকথা পরিবেষিত হয়েছে, তাতে অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ভাগবত পুরাণের প্রভাবই সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত গোপীপ্রেমের পরিবেষণায় আর্যাসপ্তশতী ভাগবতায় গোপীপ্রেমেরই একান্ত অনুবর্তিতা করেছে। প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক চক্রবর্তী-প্রদত্ত বিশিষ্ট উদাহরণটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

"আর্যার আর একটি মুক্তকে পাওয়া যায়—কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে মদন-শরবিদ্ধা কোন গোপীর মর্মবেদনার কথা,

মধুমথনবদনবিনিহিতবংশীসুষিরানুসারিণো রাগাঃ।
হন্ত হরন্তি মনো মম নলিকাবিশিখাঃ স্মরস্যেব ॥ ৪৩৭ ॥

এই বেদনার অভিব্যক্তি ভাগবতবর্ণিত বংশীধ্বনি শ্রবণে স্মরবেগে বিক্ষিপ্তমনা গোপীর গভীর আর্তির প্রতিধ্বনি। সেখানেও কৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে ব্রজস্ত্রীগণ এমনই করিয়াই স্ব-সখীদের নিকট স্মরোদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন,

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥
তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ (ভাগ ১০.২১)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		তাহাছাড়া, কৃষ্ণকে স্ববশে আনিবার গৌরবে 'সৌভাগ্যমদ' প্রকাশ ভাগবতীয় গোপীদেরই বিশিষ্টতা। রাসপঞ্চাধ্যায়ে তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—'আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি' (ভাগ. ১০. ২৯)। আর্যার শ্লোকেও মানগর্বিতা গোপীর এই চিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে (৩৭৯)।" [তত্রৈব ৮৮]	
১০৪	৬	"কথকতা" : সাম্প্রতিক গবেষণায় কেউ কেউ দেখিয়েছেন, কথকতা বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি, তার প্রচলন খুব বেশীদিনের নয়। অভিমতটি যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, মালাধরের অনুবাদের পূর্বে ভাগবত পাঁচালি-গানের আকারেই প্রচলিত থাকা সম্ভব, কথকতার আকারে নয়।	
	২৫-২৭	পৌণ্ডক, পৌণ্ড	পৌণ্ড্রক, পৌণ্ড্র
১০৫	১-১৬	পৌণ্ড	পৌণ্ড্র
১০৬	১৪	"স্ত্রীমূর্তিটিকে রাধার বলে ভুল করেননি মনে হয়" : পাহাড়পুরের যুগলমূর্তিটির বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণ-সঙ্গিনী এখানে কৃষ্ণের স্কন্ধে বামবাহু স্থাপন করে আছেন। প্রসঙ্গত প্রধানা গোপীসহ কৃষ্ণের অন্তর্ধানে পদচিহ্নানুসারিণী অন্যান্যা গোপকদের উক্তি মনে পড়ে : "কস্য পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা। অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা" [ভা° ১০।৩০।২৭] রাসান্তেও পরিশ্রান্তা এক গোপীকে [দ্র° ভা° ১০।৩৩।১১] আলস্যবিমণ্ডিত বাহু কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পণ করতে দেখি। স্বাধীনভর্তৃকাত্ব দেখে সনাতন এঁকে রাধারূপে চিহ্নিতা করেছেন।	
১১৫	২১	নৃত্যতি	নৃত্যতী
১১৮	৫	কেন্দ্রস্থ	কেন্দ্রস্থা
১১৯	২১	পুত্র	বান্ধব
১২৯	১৯-২০	গোবিন্দাঙ্ঘ্রজরেণবঃ	গোবিন্দাঙঘ্রজরেণবঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		ব্রহ্মশৌ	ব্রহ্মেশৌ
		দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যাঘমুত্তয়ে	দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে
১৩১	২১	"হরভ্রমে" শব্দটি বাদ পড়েছে। হবে, "তবে কেন হে অনঙ্গ, হরভ্রমে আমাকে প্রহারের জন্য ছুটে আসছো ?"	
১৩১	২২	ভারতীয়	ভারতীয়
১৩৩	২	তর্থাৎ	অর্থাৎ
"	১৯	তর্করত্ন	বিদ্যারত্ন
১৩৫	৪	অনুরাগিনী	অনুরাগিণী
১৩৮	১৭	শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়া	শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ী
১৪০	২৬	তাম্বুল	তাম্বূল
১৪১	৫	সর্বোত্তমলীলা	সর্বোত্তমালীলা
১৪৫	১	শক্রোমামশ্বরাঃ	শক্রোমামরেশ্বরাঃ
"	২০	ববষুর্নন্দগোকুলে	ববর্ষুর্নন্দগোকুলে
১৪৬	২	ব্যবর্ষান্তে	ব্যবর্ষান্ত
"	"	তমোরবেঃ	তমো রবেঃ
"	৩	উপাংশু গর্জিতঃ	উপাংশু-গর্জিতঃ
"	৪	'গম্ভীরতোয়ৌঘ জবোর্মি ফেনিলা' হবে 'গম্ভীরতোয়ৌঘ-জবোর্মি-ফেনিলা'।	
"	৩০	শ্লোকসংখ্যা হবে ভা° ১০।৩।৪৯-৫০।	
১৪৮	২৬	'কাল মধুমাস বৈশাখ' হবে 'কাল মাধবমাস বৈশাখ'।	
১৬০	২১	'হরে যান' হবে 'হয়ে যান'।	
১৬২	৩	বাসালব্ধকৃষ্ণদীক্ষো	ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো
১৭০	২০	'রুক্মিনী-স্বয়ম্বর'	'রুক্মিণী-স্বয়ম্বর'
১৭৩	৮	প্রহণ	গ্রহণ
১৭৬	১	হুসের	হুসেন
১৮০	২২	"বংশানুচরিতের মাত্র বাসুদেব-লীলাকেই গ্রহণ করেছে" : ভাগবতের মহাপুরাণিক দশলক্ষণ অনুসারে বাসুদেব হলেন দশম পদার্থ 'আশ্রয়'। সুতরাং পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে : "এ-কাব্য ভাগবত-কথিত 'দশম পদার্থ' 'আশ্রয়'-রূপী বাসুদেবেরই লীলাকথাকে অঙ্গীকার করেছে"।	

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮২	৮	তাঁর	তাঁরা
১৮৩		কূজন্তমনুকূজতি	কূজন্তমনুকূজতি
১৮৫	১০	ছাওল	ছাওাল
”	২৬	মথাতীং	মথ্নন্তীং
১৮৬	১	ধাবিত	ধাবিতা
১৮৭	৩	আঙুল	অঙ্গুলী
১৮৮	১৩	গাত্র	গাত্র
১৮৯	২৬	অপার্থির	অপার্থিব
১৯০	৫	শ্রবণাদিজা	শ্রবণাদিজ
২০৭	১৬	পরাণূচর্যা	পরমাণূচর্যা
২০৯	৯-১০	বিসসর্জাঙ্ঘিকুট্টনৈঃ	বিসসর্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ
২১২	২৭	কচ্চিদ্ভূতাগমনকারণম্	কচ্চিদ্ভূতাগমনকারণম্
২২০	২৮	পারিজাত-হরণ : ভাগবতে পারিজাত-হরণের উল্লেখ পাই কুরুনারীদের পরস্পরালাপে [ভা° ১।১০।৩০], নারদের কৃষ্ণস্তুতিতে : "পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্" [ভা° ১০।৩৭।১৭]। দ্বাদশ স্কন্ধেও স্মরণীয় : "আদানং পারিজাতস্য" [১২।১২।৩৭]।	
২২৮	১৩	তদহমর্জুন	তদহমর্জুন
২২৯	৩-৪	"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কালগত ব্যবধান সামান্য নয়"—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য দুখানিকে যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে উভয়ের কালগত ব্যবধান "সামান্য নয়" বলা যাবে না।	
২৩৩	২৩	কষ্ণবর্ণং	কৃষ্ণবর্ণং
”	২৪	টীকাকারেবই	টীকাকারেরই
২৩৫	২৬	সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং	সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং
২৩৮	১৬	ব্রজগোপীকুলেও	ব্রজগোপীকুলেও
২৪২	৭	"চিরাৎ" পদের নিত্যকালার্থেও ব্যবহার : চিরাৎ-পদটি নিত্যকালার্থে গ্রহণ করেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী "অনর্পিতচরীং" পদের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : "কথম্ভূতাম্ অনর্পিতচরীম্? কেনাপি ন অর্পিতপূর্বাম্।"	

পৃষ্ঠা পংক্তি

২৪২ ২১ অনর্পিত-চরিত : শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্লোকে উন্নত-উজ্জ্বল-স্বভক্তিশ্রীর বিশেষণ-রূপেই 'অনর্পিতচরী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই অনর্পিতচরী-ভক্তির প্রচার আবার গৌরচন্দ্রেরই 'অনর্পিত-চরিত' বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে 'অনর্পিত-চরিত' শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে, গৌর-চরিতের সেই বৈশিষ্ট্য যা অপর আর কোনো অবতারে অর্পিত হয়নি। সে বৈশিষ্ট্যটি কি? ভক্তরূপে গৌরাঙ্গ-অবতার নিজে সাধন করে জনে জনে মধুরাশ্রিতা রাগানুগা বা কামানুগা সাধনেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁব কামানুগা আবার মঞ্জরী ভাবেরই সাধনা। আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও কৃষ্ণমিলনে সখীর বাধা নেই। কিন্তু মঞ্জরীভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন বারিত। ব্রজেব নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীবা ব্রজের নিত্যসিদ্ধা রাগানুগা-সেবা-প্রাপ্তা গোপীদেরই আনুগত্যে বাধাকৃষ্ণসেবা সার করেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত মঞ্জরীভাবের সাধনায় ব্রজের উক্ত নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীদের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণ সেবা বিধেয়। স্মরণীয়, শ্রীরূপ গোস্বামী এই সাধনভক্তিকেই "তত্তদ্-ভাবেচ্ছাত্মিকা কামানুগা" বলেছেন। প্রার্থনার পদে নবোত্তমদাস এই কামানুগারই আনুগত্যে গেয়েছেন :

"ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট-করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব অধর-যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন-উপায়।"

অর্থাৎ, এ-সাধনা রাধারূপে কৃষ্ণরতি আস্বাদন নয়, রাধার সেবিকা রূপে রাধাকৃষ্ণাশ্রিত মধুররস-পান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে মধুররসই উজ্জ্বলরসরূপে স্বীকৃত। এ-রস সর্বাপেক্ষা 'উন্নত রস' বলেও এ-শাস্ত্রে কীর্তিত। কাজেই চৈতন্য-অবতারে নির্দেশিত কামানুগাভক্তি-সাধনায় যে-রস

আস্বাদ্য হয়ে উঠলো, তা 'উন্নতোজ্জ্বল রস' ছাড়া আর কি? 'এহোত্তম'। চৈতন্য প্রবর্তিত কামানুগাভক্তি-সাধনা সখীভাবের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ মঞ্জরীভাবে বিহিত হওয়াতেও এ-রস উন্নতোজ্জ্বল বলে আখ্যাত হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চৈতন্য-অবতারেই কৃষ্ণরতি রসরূপে ভক্ত-রসিকের আস্বাদ্য হয়ে উঠলো, এ সিদ্ধান্ত কি আদৌ যুক্তি-সংগত? কেননা, উদাহরণত বলা যায়, রাধার চিত্তে কৃষ্ণরতি তো গৌড়ীয় মতে স্থায়িভাব এবং বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে তা রসরূপে পরিণতও হয়, আর সে-রস তিনি আস্বাদনও করতে পারেন। তাহলে কৃষ্ণরতির রসরূপতা-প্রাপ্তি গৌরাঙ্গ-অবতারের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য-সূচক বলা যাবে কোন্ যুক্তিবলে?

উত্তরে বলা যায়, সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদ্য হয়ে ওঠার পথে রসনিষ্পত্তির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া 'সাধারণীকৃতি' উক্ত উদাহরণে অনুপস্থিত। প্রীতিসন্দর্ভকার জীব গোস্বামী বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে বলেছিলেন, যে-প্রীতি-রসিক ভক্তগণ ভগবানের 'লীলান্তঃপাতী' বা নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁদের রসাস্বাদন "স্বত এব সিদ্ধো রসঃ" [প্রীতি° ১১১]। সেখানে সাধারণীকরণের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যাঁরা 'লীলান্তঃপাতিতাভিমানী,' অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরী-দেহে নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণসেবা করছেন বলে মনে করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বা ভক্তসামাজিকের ক্ষেত্রেও রসাস্বাদন সমানবাসনাযুক্ত পরিকর-বিশেষের বিভাবাদির সাধারণীকরণের মুখাপেক্ষী। শ্রীজীবের ভাষায়- "যদি সমানবাসনস্তল্লীলান্তঃপাতী ভবেৎ, তদা স্বয়ং সদৃশো ভাবএব তস্য তল্লীলান্তঃপাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদৃশত্বাভিমানিনি সাধারণী-করোতি" [তত্রৈব]। মনে রাখতে হবে, রাগাত্মিকাশ্রিত মধুররসের আস্বাদন একমাত্র নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণ-প্রেয়সীতেই সীমবদ্ধ থাকতো, যদি সে-রস ভক্ত-সামাজিকের পক্ষেও আস্বাদনের পথ চৈতন্যদেব খুলে না

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		দিতেন। বস্তুত, উন্নত-উজ্জ্বল-রসপ্রধানা রাগানুগা ভক্তি-সাধনার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই "গৌরচন্দ্র উদিতে প্রেমাপি সাধারণঃ" হয়েছিল। কৃষ্ণপ্রেমের সাধারণীকৃতিই চৈতন্য-অবতারের অপূর্ব অনর্পিত বৈশিষ্ট্য।	
২৪৭	২৭	দর্শনাদিজ্ঞা	দর্শনজ্ঞ
২৪৮	২৫	প্রার্থনাতেও 'চরিত'	প্রার্থনাতেও তেমনি 'চরিত'
২৫৪	৩	বিরহ ও বিপ্রলম্ভের	বিরহ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের
২৫৬	২১	সর্বাপর্ণের	সর্বার্পণের
২৬৩	২৬	স্থিতধূলিসদৃশং	স্থিতধূলীসদৃশং
২৬৭	২৫	নিকৃষ্ট	অতিনিকৃষ্ট
২৬৮	২	যুগপৎ	যুগপৎ
২৬৯	২	শ্রীচৈতন্যেদেবের	শ্রীচৈতন্যদেবের
২৭০	২৪	পন্থা	পন্থাঃ
২৯৬	৫	বলেননি	বলেনি
২৯৭	৪	দেখবার	দেখাবার
৩০১	১১	অঙ্গীভুত	অঙ্গীভূত
৩০২	৬	সৃষ্টিতন্ত্বে	সৃষ্টিতত্ত্বে
৩০৩	৪	অদ্ধকার	অন্ধকার
”	২৮	এতাষদেবজিজ্ঞাস্যং	এতাবদেব্‌জিজ্ঞাস্যং
৩০৪	১৬	শিবঃ পন্থা	শিবঃ পন্থাঃ
৩১৫	২৪	ভেদাভদ	ভেদাভেদ
৩১৭	২১	জীবর্ষ্য	জীবস্য
৩১৯	৫	শোৌণক	শৌনক
৩২৩	২৩	অথগুস্ব	অথগুশ্চ
৩২৪	১৩	'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম'	'বাংলার বৈষ্ণব দর্শন'
”	৩০	‘	
৩২৫	১১	"প্রেয়োরস বা প্রেমরসের স্থায়ী ভাব স্নেহ": ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু সখ্যভক্তিরসকেই নামান্তরে 'প্রেয়োরস' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, সখ্যরূপ	

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
		স্থায়িভাব আস্বোচিত বিভাবাদির দ্বারা সাধুদের চিত্তে পরিপুষ্টি লাভ করলেই তা হয়ে ওঠে প্রেয়োরস : “স্থায়ী ভাবো বিভাবাদৈঃ সখ্যমাস্বোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সত্যাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ান্নুদীর্যতে॥” [ভ° র° সি°, পশ্চিম, ৩।১] তবে এই সখ্যরতি বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমে ক্রমে প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, রাগ ভেদ-প্রাপ্ত হয়।	
৩২৬	১০	ব্যাপারের	ব্যাপারে
৩২৮	১৪	উল্লিখিত	উল্লিখিত
৩৩১	২১	রসের’র	রসের’
৩৩৩	৫	“পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে” : পাঠান্তর “পূর্ণানন্দ পূর্ণরস-স্বরূপ কহে মোরে”।	
”	২৮	বিস্মৃত	বিস্মিত
৩৩৪	৩	“অন্যাভিল’ষতাশূন্য”	“অন্যাভিলাষতাশূন্য”
৩৩৬	১৮	যাক	থাক
৩৩৭	১৫	নবাবনচ্যুতস্য	নব্যবদচ্যুতস্য
৩৪০	১	‘অনর্পিতচরিত’ : এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত ‘অনর্পিতচরিত’ শব্দের সংযোজনী।	
৩৪১	২০	‘ত্রয়োদশ’ : চৈতন্যভাগবতে সার্বভৌমকে ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ করতে দেখি। তারপর শ্রীচৈতন্য অর্থ করলেন, তবে কয়প্রকার বলা হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে অষ্টাদশ প্রকার।	
৩৪২	১৫	সৌধনির্মাণকারীরূপে	সৌধনির্মাণকারী-রূপে
৩৪৮	১১	আংশানাং	অংশানাং
৩৫৬	৪	হয়েছে	হয়েছেন
৩৫৯	৪	কেশ-প্রসাদন	কেশ-প্রসাধন
৩৬১	৪	বর্ণিত	বর্ণিতা
”	৭	কচিৎ	কাচিৎ
”	”	শ্যামা	শ্যামলা

পৃষ্ঠা	পংক্তি		
৩৬৩	৩	স্বীকৃত	স্বীকৃতা
৩৭৩	৭	চলেত্রিলোক্যাং	চলেৎত্রিলোক্যাং
৩৮৩	১৯	অক্রুর	অক্রূর
৩৮৪	২১	দানকেলিকৌমুদী	দানকেলিকৌমুদী
৩৯১	৭	সহাত্মনমবাপ	সহাত্মানমবাপ
„	১৫	প্রতায়তে	প্রতীয়তে
৩৯৪	১৭	করি	কার
৪০০	২৭	ছিলেন	দিলেন
„	৩১	রাধামোহন	রাধাবিনোদ
৪০৮	৫	বেণুরিভিতং	বেণুরিফিতং
৪১০	১	'বংশী-শ্রবণ মিশ্র'	হবে বংশী-শ্রবণ তথা ঘ্রাণাদি সংবেদন মিশ্র।
	২০	কুল-মরিয়াদি	কুল-মরিয়াদ
৪১১	২৪	মুদিতবক্ত	মুদিতবক্ত্র
৪১২	১৮	চড়া	চূড়া
৪২৩	১৬	রস আয়তি	রস আরতি
৪২৪	১৩	প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী 'সাধারণী': চন্দ্রাবলী সমর্থারতির নায়িকা, তাই 'সাধারণী' হতে পারেন না। সুতরাং এই পংক্তিটির শুদ্ধপাঠ হবে, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী মহাভাববতী বটেন, কিন্তু সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী হ্লাদিনী-সার মাদন একমাত্র রাধাতেই সর্বদা বিরাজমান [দ্র° উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়ী-ভাব প্রকরণ, ১০৩]।	
৪২৬	১০	রচনাবলী	বচনাবলী
৪৩৩	৫	অসূযায়	অসূয়ায়
৪৩৮	১৫	'অনর্পিতচরিত': এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত 'অনর্পিতচরিত' শব্দের সংযোজনী।	
৪৪০	১২	'অনর্পিতচরিত':	ঐ
৪৪২	২৭	শৌণক	শৌনক
৪৪৩	১		

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪৩	৮	'অনর্পিতচরিত' : দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত 'অনর্পিত-চরিত' শব্দের সংযোজনী।	
৪৪৮	৫	ভক্তিলতিকাং''	ভক্তিলতিকাং''[১]
,,	১২	মদয়ন্তি''	মদয়ন্তি''[২]
৪৫৫	৩	বস্তুত	বস্তুত
৪৫৬	৮	একাদশ	অষ্টাদশ
৪৬২	৮	গোপণয়োস্তয়োর্ষৎ	গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
,,	৯	সুজবস	সূযবস
৪৬৬	১০	'একাদশ' : ৩৪১ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিধৃত সংযোজনী দ্রষ্টব্য।	
৪৬৮	১৩	ষেডশ	ষোড়শ
,,	২৫	একাদশ	ত্রয়োদশাধিক
৪৭১	৭-৮	আর্ষপথ	আর্যপথ
৪৭২	২১	অলোলিক	অলৌকিক
৪৭৭	৫	'অনর্পিতচরিত' : দ্রষ্টব্য ২৪২ পৃষ্ঠার ২১ পংক্তি-ধৃত 'অনর্পিত-চরিত' শব্দের সংযোজনী।	
৪৮২	১৯	সারস্বতনাতি	সারস্বতনীতির
৪৮৬	৩	কদম	কর্দম
৪৯৪	১০	পার	সার
,,	১৪	মতিতিত্তার্যতাং	মাতা তত্তার্যৎ
,,	১৬	'ওপর' : হবে 'প্রতি'।	
৪৯৫	২০	সবশেষ	সবশেষে
৪৯৯	১৮	কৃতবান্ অতিমর্ত্যানি	কৃতবান্ · অতিমর্ত্যানি
৫০২	৪	'কথক...কবিগানের গায়করাও' : সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়, কথকতা কবিগানের প্রচলন নিতান্তই অর্বাচীনকালে। যদি তাই হয়, তবে বলতেই হবে, মধ্যযুগে কথকতা বা কবি-গানের মাধ্যমে নয়, পাঁচালিগানের মাধ্যমেই ভাগবতকথা জনগণমনে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব।	
৫০৭	১৬	Stoler	Stolen
৫১১	৩০	দ্বিষ্টি	দ্বিষষ্টি

৫২৭	২৬	নণামর্চায়াং	নৃণামর্চায়াং
৫৪৫	২৯	কিশু	কিন্তু
৫৪৬	২১	উক্ত	উক্ত
৫৫২	৬	থকে	থেকে
৫৬০	১৫	মানবপ্রমীর	মানবপ্রেমীর
৫৬৪	৩০	বসন্তে	বসন্তে
৫৬৭	১৩	উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১ বৈদিক গ্রন্থাবলী

ঋগ্বেদ : মোক্ষমূলর সম্পাদিত, চৌখাম্বা প্রকাশিত
রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

গোপালতাপনী : কেদারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি সম্পাদিত

ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর-ভাষ্যসহ, শাস্ত্রী সম্পাদিত

২ মহাকাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রাবলী

রামায়ণ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর 'আর্যশাস্ত্রে' প্রকাশিত, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত

মহাভারত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত

বায়ুপুরাণ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

বিষ্ণুপুরাণ আর্যশাস্ত্রে প্রকাশিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত

ভাগবত ত্রিপুরা-মহারাজ প্রকাশিত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত

" ভাবার্থদীপিকা-বৈষ্ণবতোষণী-সারার্থদর্শিনী টীকাসহ রাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত, তৎকৃত ভাগবতামৃত-বর্ষিণী টীকাসহ

শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকা ড° রাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীমদ্ভাগবত, ম ও ২য় স্কন্ধ ড রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, তৎকৃত গৌর-মন্দাকিনী টীকাসহ

ভাগবত 'আর্যশাস্ত্রে' প্রকাশিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত

Le Bhagavata Purana : Burnouf

মৎস্যপুরাণ : বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত

হরিবংশ :

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার : পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত
পাতাল ও উত্তর খণ্ড : কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত

ব্রহ্মপুরাণ :

গরুড়পুরাণ

স্কন্দপুরাণ : নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ; পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

গর্গসংহিতা : পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

ব্রহ্মসংহিতা : ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত, শ্রীজীব-টীকাসহ

ভগবদ্‌গীতা : কাশী যোগাশ্রম প্রকাশিত, শাঙ্করভাষ্য-শ্রীধরটীকা-সংবলিত, কৃষ্ণানন্দস্বামী-কৃত গীতার্থসন্দীপনী সহ

শ্রীশ্রীচণ্ডী : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত

তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন, প্রথম খণ্ড : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

৩ ব্যাকরণ-দর্শন-অলংকার-স্মৃতিশাস্ত্রাবলী

The Ashtadhyayi of Panini, Vol I, II :
শ্রীশচন্দ্র বসু সম্পাদিত

The Vyakarana-Mahabhasya of Patanjali :
F Kielhorn সম্পাদিত ও মহামহোপাধ্যায় K. V. Abhyankar-এর টীকাসহ

পাতঞ্জল যোগদর্শন : হরিহরানন্দ আরণ্য সম্পাদিত

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

Indian Philosophy, I, II : ড° সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

The Cultural Heritage of India, IV, :
হরিদাস ভট্টাচার্য সম্পাদিত

The Philosophy of the Srimad-Bhagavata, I, II :
ড° সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

মনুসংহিতা : 'আর্যশাস্ত্রে' প্রকাশিত, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত

৪ পুঁথি বিষয়ক গ্রন্থাবলী

Catalogus Catalogorum : Theodor Aufrecht

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society of Bengal, Vol V, edited by MM. Haraprasad Sastri.

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ : [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত] : তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত

৫ কোষগ্রন্থ

শব্দকল্পদ্রুম : রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত

বাচস্পত্যম্ : তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পাদিত

Encyclopaedia Britannica

ভারতকোষ : ১-৪ খণ্ড : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত

৬ ভারত-ইতিহাস তথা সাহিত্যের ইতিহাস-মূলক গ্রন্থাবলী

Ancient Indian Historical Tradition : F. E. Pargiter

Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems : S. Bhāndārkar

Materials for the Study of the Early History of Vaishnava Sect : ড° হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

Early History of the Vaisnava Faith & Movement in Bengal : ড° সুশীলকুমার দে

An Outline of the Religious Literature of India : Farquhar

A History of Indian Literature, Vol I : Winternitz

History of Sanskrit Literature, Vol I : ড° সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ড° সুশীলকুমার দে

৭ সংস্কৃত কাব্যনাটকাদি

কালিদাসের গ্রন্থাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত

মুক্তাফল : বোপদেব-কৃত, ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী ও হরিদাস বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত

বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত : ড° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

সদুক্তিকর্ণামৃত : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত

আর্যাসপ্তশতী : গোবর্ধনাচার্য-কৃত : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত

৮ অবহট্‌ঠে প্রাকৃতে রচিত গ্রন্থ

সহস্রগীতি [তিরুবায়্‌ মোড়ি] : যতীন্দ্র রামানুজদাস সম্পাদিত
কীর্তিলতা : বিদ্যাপতির মূল রচনাসহ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুবাদ
গাথাসপ্তশতী : হাল-সংকলিত, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের বঙ্গানুবাদ সহ

৯ গৌড়ীয় মহাজন গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য

বৃহদ্ভাগবতামৃত : সনাতন গোস্বামী-কৃত, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত
হরিভক্তিবিলাস : গোপাল ভট্ট প্রণীত, সনাতন-কৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকাসহ, নবেন্দ্রকৃষ্ণ শিরোমণি সম্পাদিত

হংসদূত : রূপ গোস্বামী-কৃত
উদ্ধবসন্দেশ : ,,
লঘুভাগবতামৃত : .
স্তবমালা : ,,
বিদগ্ধমাধব : ,, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত
ললিতমাধব : ,,
দানকেলিকৌমুদী : ,,
রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা : রূপ গোস্বামী-কৃত
মথুরামহাত্ম্য :
পদ্যাবলী : রূপ গোস্বামী-সংকলিত, ড· সুশীলকুমার দে সম্পাদিত
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু : রূপ-গোস্বামীকৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু : ঐ-টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত
উজ্জ্বলনীলমণি : রূপ গোস্বামী-কৃত, বিষ্ণুদাস-প্রণীত স্বাত্মপ্রমোদিনীটীকাস হরিদাস দাস সম্পাদিত

উজ্জ্বলনীলমণিকিরণলেশ : উজ্জ্বলনীলমণি-টীকা, বিশ্বনাথ প্রণীত
স্তবাবলী : রঘুনাথ দাস-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত
নবদ্বীপশতকম্‌ : প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত
চৈতন্যচন্দ্রামৃত : প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত, শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশিত
গোপালচম্পূ [পূর্ব ও উত্তর] : শ্রীজীব গোস্বামী-কৃত, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত
ষট্‌সন্দর্ভ : শ্রীজীব-প্রণীত, শ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত

তত্ত্বসন্দর্ভ : শ্রীজীব-কৃত, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণচন্দ্র ভাগবত-সিদ্ধান্ত সম্পাদিত

,, : ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত

ভগবৎসন্দর্ভ : শ্রীজীব-কৃত, ভক্তিবিলাসতীর্থ মহারাজ সম্পাদিত

ভক্তিসন্দর্ভ : শ্রীজীব-কৃত, রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ ও ড · · গোপাল গোস্বামী স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ সম্পাদিত

প্রীতিসন্দর্ভ : শ্রীজীব-কৃত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

সর্বসংবাদিনী : শ্রীজীব কৃত, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

চৈতন্যমতমঞ্জুষা-টীকা : শ্রীনাথ চক্রবর্তী প্রণীত

চৈতন্যচন্দ্রোদয় : কবিকর্ণপূর-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত

অলংকারকৌস্তুভ :

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা :

গোবিন্দভাষ্য : বলদেব বিদ্যাভূষণ

মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য : মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত

চৈতন্যভাগবত : বৃন্দাবনদাস-কৃত, ড রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত

চৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য-রত্ন ও সুবোচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

চৈতন্যমঙ্গল : লোচনদাস-কৃত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত

গোবিন্দলীলামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত, যদুনন্দন দাস অনূদিত

বিদ্যাপতির পদাবলী : খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

চণ্ডীদাসের পদাবলী : ড° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

বাসু ঘোষের পদাবলী : মালবিকা চাকী সম্পাদিত

জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী : ° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ : ড° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণবিজয় : মালাধর-কৃত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী : রঘুনাথ ভাগবতাচার্য-প্রণীত, ঔড়ুলোমি মহারাজ সম্পাদিত

ভক্তিরত্নাকর : নরহরিদাস-কৃত

১০ পদসংগ্রহ

পদকল্পতরু : বৈষ্ণবদাস-কৃত, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত

বৈষ্ণব পদাবলী : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত,সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

বৈষ্ণব পদাবলী : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

পাঁচশত বৎসরের পদাবলী : ড° বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত

গৌরপদতরঙ্গিণী : জগদ্বন্ধু ভদ্র সংকলিত

১১ বৈষ্ণবীয় কোষগ্রন্থ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান : হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত

১২ অপরাপর বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থাদি

ভক্তমাল : নাভাজী-প্রণীত, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত

যামুনাচার্যস্তোত্রম্ : যামুনাচার্য-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত

জগন্নাথবল্লভ নাটক : রায় রামানন্দ-কৃত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত

১৩ বাঙ্‌লা সাহিত্যের কিছু কিছু মূল রচনারাজি

কৃত্তিবাসী রামায়ণ : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পা দত্ত

কাশীদাসী মহাভারত :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বড়ু চণ্ডীদাস-কৃত, বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত

বাইশ কবির মনসামঙ্গল : ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

কবিকঙ্কণচণ্ডী, প্রথমভাগ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ড° শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত

লোকসঙ্গীত-রত্নাকর : ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বাংলার বাউল গান : ড° উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বাংলা প্রবাদ : ড° সুশীলকুমার দে সংগৃহীত

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত

রামমোহন-গ্রন্থাবলী :

ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী : বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত
আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মধুসূদন-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত
হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী : ১ম, ২য় খণ্ড :
বঙ্কিম-রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ : কেশবচন্দ্র সেন, নববিধান পাবলিকেশন কমিটী
জীবনবেদ : „
মাঘোৎসব : „ নববিধান প্রেস প্রকাশিত
নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ১-৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত : শ্রীম-কথিত
গিরিশ-রচনাসম্ভার : প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত
রবীন্দ্র-রচনাবলী : বিশ্বভারতী প্রকাশিত
শান্তিনিকেতন. ১ম খণ্ড „

১৪ মূল ইংরেজী রচনা

Lectures in India by Keshub Chunder Sen : Navavidhan Publication Committee

Life & Works of Brahmananda Keshav : Dr. Prem Sundar Basu

The Complete Works of Swami Vivekananda : Mayabati Memorial Edition

[অনুবাদ : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : উদ্বোধন কার্যালয়]

The Song of Solomon, The Holy Bible [Old Testament]: The British & Foreign Bible Society, London প্রকাশিত

The Poetic Image : C. Day Lewis

১৫ বাঙলাদেশ ও বাঙলা সংস্কৃতির ইতিহাসমূলক গ্রন্থাবলী

বৃহৎ-বঙ্গ, ১ম খণ্ড : ড° দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : ড° দীনেশচন্দ্র সেন
History of Bengal, Vol I : ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [৪টি খণ্ড] : ড° সুকুমার সেন
প্রাচীন বাংলার সংগীত : রাজ্যেশ্বর মিত্র
বাংলার বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্য : ডঃ বাসন্তী চৌধুরী
বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড : ড° সুকুমার সেন
নানা নিবন্ধ : ড° সুশীলকুমার দে
Nineteenth Century Bengali Literature : ড° সুশীলকুমার দে
পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিনবিহারী গুপ্ত
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী
বাংলার লোকসাহিত্য : ড° আশুতোষ ভট্টাচার্য

১৬ বিভিন্ন বিষয়ক বাংলা আলোচনা গ্রন্থাবলী

ভারতের সাধক [১-৮] : শঙ্করনাথ রায়
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ : ড° রাধাগোবিন্দ নাথ
চৈতন্যচরিতের উপাদান : ড° বিমানবিহারী মজুমদার
প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য : ড° সতী ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ : মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে : ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত
বাংলার বৈষ্ণব দর্শন : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন : ড° রাধাগোবিন্দ নাথ
গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব : ড° উমা রায়
পঞ্চোপাসনা : ড° জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১-৯ খণ্ড : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত
সাহিত্যলোক : অমলেন্দু বসু

শব্দসূচী

শব্দসূচী